ভারতী

১৩১৩

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

উত্তরার্দ্ধ।

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

ভারতী

১৩১৩

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

উত্তরার্দ্ধ।

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

"মা আমার।"

"মা এসেছে" কি বলিস্ অবোধ সন্তান
মা কবে রে তোর ঘর ছাড়া ?
অনাদি জননী যার, জন্মজন্মান্তরে
সে কি কভু ছিল মাতৃহারা ?

সারদে বরদারূপা দশভুজা মা আমার
দম্ভ-দানবেরে মথি নাশিছে ধরার ভার।
শারদ কৌমুদীরাশি ছড়ায় মায়ের হাসি
প্রসন্না দিগ্বধূগণ আরতি-প্রদীপ করে।
শশী রবি করে নতি সহস্র বিমল করে॥

কোজাগরী পৌর্ণমাসী মহালক্ষ্মী মা আমার
ধান্যশীর্ষে বরবেশ আশিষ বচন তাঁর।
করালকালিকাবেশে অমার আঁধারে এসে
মা আমার দেন তাঁর সন্তানে আশিষ-ধারা,
পরে দেখে ভয়ঙ্করী, পুত্রে বরাভয়করা॥

ব্রহ্মাণ্ড-জননী যে গো জগদ্ধাত্রী মা আমার
ঢালেন জগতে পুণ্য অজস্র পীযূষধার।
নদী-হ্রদে ধরি সুধা নাশি ক্ষুধিতের ক্ষুধা
টানি পীড়িতেরে ক্রোড়ে, ঢাকিয়া স্নেহ-আঁচলে
মা আমার আছে বসি হেমন্ত ধরণীতলে॥

শিশিরে শিশিরলক্ষ্মী স্নেহময়ী মা আমার

বসন্তে বসন্তরাণী দ্বিভুজা মা বীণাপাণি,
কুন্দেন্দুতুষারশুভ্রা, শ্বেতশতদলোপরে।
অচ্যুত-শঙ্কর-ব্রহ্মা যোড়করে স্তুতি করে।

অমলা বালিকা বেশে মায়াবিনী মা আমার
ঢালেন বীণার যন্ত্রে সঞ্জীবনী সুধাধার।
সে স্বর গগনে উঠে ভুবনে ভুবনে ছুটে,
অমল কমল স্থিত যার চরণের তলে ;
মুখ চেয়ে আছে বসে' ভাবমগ্ন শিশুদলে॥

বাসন্তী সুখদারূপা শোভাময়ী মা আমার,
সৌন্দর্য্যে সৌরভে পূর্ণ অটুট ভাণ্ডার তাঁর।
মাধবী মঙ্গলালয়ে, অন্নপূর্ণা নাম ল'য়ে
মা আমার বিলাইছে ভুবনে অতুল সুধা।
তৃষিতের তৃষ্ণা নাশি, নাশি ক্ষুধিতের ক্ষুধা॥

নিদাঘে অশ্বথ ছায়ে পল্লীগৃহে মা আমার
দ্বিভুজা হেমগৌরাঙ্গী,—ষষ্ঠীরূপা মাতৃকার।
বরষার ঘনঘটা তিতায় পিঙ্গল জটা,
কাষায়বসনা, দীনা, তরুতলে অবস্থান
দীন সন্তানেরে দিতে মাতৃস্নেহ-অঙ্ক-দান।

মা আমার দীনা আজ দীন পুত্র তরে,
মা যে মোর রাজরাজেশ্বরী।
দুর্দ্দিনে তরুর তলে ভাবি বসে, কবে
পোহা'বে এ বরষা-শর্ব্বরী॥

শবসাধন।

হিন্দুমাত্রেই শবসাধন কাহাকে বলে তাহা জানেন। তবে কালের কুটিল গতিতে অনেক অত্যুচ্চ ভাব অতি নীচভাব-প্রকাশক হইয়া পড়িয়াছে। কত উচ্চ আদর্শ, উচ্চ অনুষ্ঠান, উচ্চ সাধন আমাদের স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইয়াছে। কোথাও বা নব্যসম্প্রদায় পুরাতনের আদর না করিয়া স্বভাবসুলভ নবীনপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া নূতনের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। কোথাও বা পুরাতনের আদর আছে বটে, সে পুরাতন অনেক সময় বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডায়মান। আমাদের নাই কি? সবই আছে, তথাপি আমরা দীনহীন। আমাদের জন্মভূমির সমান দেশ আর জগতে কোথায় আছে? এখানে ষড়ঋতুর সমাবেশ; অষ্টধাতু ও নবরত্নের খনি দেশকে স্বর্ণগর্ভা করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশের উর্ব্বরত এতই অধিক যে, অতি সামান্য আয়াসে লোকে প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথাপি আমরা দীনহীন, তথাপি আমরা অন্নাভাবে হাহাকার করি। আমাদের কামদুঘাকে অপরে দোহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। আমাদের দেশের লোক দুর্ব্বল নয়, আমাদের মধ্যে বীরত্বের আদর্শের অভাব নাই, তথাপি আমরা পরপদদলিত। আমরা রক্তমাংসের দেহবিশিষ্ট হইলেও কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইয়া আছি। আমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, পদ থাকিতে পঙ্গু, হস্ত থাকিতেও নিষ্ক্রিয়। ইহার রহস্য কি? রহস্য আর কিছুই নয়, শক্তি নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের অবসান হইয়াছে, আমাদের শবাবস্থা। এ অবস্থায় শক্তিকে পুনর্জ্জাগ্রত করিতে হইলে শবসাধনার প্রয়োজন।

শবসাধন বীরের সাধন। বীর সাধক ভিন্ন শবসাধন করিতে

পারেন না। নির্জ্জন শ্মশানে শবোপরি সমাসীন হইয়া বীর সাধক মহাশক্তির উদ্দীপনাকল্পে কঠোর জপযজ্ঞ আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে শ্মশান কত প্রকার মূর্ত্তিই ধারণ করে। কখন বা সুন্দরী যুবতী রমণীগণ আসিয়া সাধকের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তপোবিঘ্ন করিতে চেষ্টা করে; কখন বা সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ তাড়না করিতে থাকে; কখন বা ঝড়-বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি মহোৎপাত সকল আরম্ভ হয়, কখন বা ভূত, প্রেত, বেতাল, পিশাচেরা নানাবিধ বিভীষিকা উৎপাদন করে; কখন বা শবাসন জীবন্ত হইয়া, বিকট হাস্য করিয়া সাধককে দূরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সাধক—বীর সাধক যদি এই সকল উৎপাত, এই সকল বিঘ্ন ও বিভীষিকা গ্রাহ্য না করিয়া অচল-অটল থাকিয়া একাগ্রহৃদয়ে মূলমন্ত্রের সাধন করিতে পারেন, তবেই সিদ্ধি হয়, অন্যথা অতীব বিষময় পরিণাম হয়। সিদ্ধ হইতে না পারিলে সাধককে উন্মাদগ্রস্ত অথবা কোন কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এই শবসাধনের সিদ্ধিকল্পে কয়েকটী বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম, উত্তরসাধক গুরু। গুরু উপদেষ্টা। তাঁহার দত্ত মহামন্ত্রই সাধক জপ করিয়া থাকেন, আর যখন প্রলোভন বা বিভীষিকা, হৃদয়ে কামক্রোধাদি রিপুগণকে জাগ্রত করিয়া অথবা ভীতির সঞ্চার করিয়া সাধনে বিঘ্ন করিবার যত্ন করে, তখন সেই গুরুরই "মাভৈঃ" "মাভৈঃ" অভয়বাণী সাধককে স্থির রাখিয়া থাকে। শিষ্যের গুরুতে বিশ্বাস চাই, তবে না তাঁহার বাক্যে সাধক স্থির থাকিতে পারিবেন? দ্বিতীয়তঃ, সাধকের চিত্তের বল চাই। সাধককে বীরসাধক হওয়া চাই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন করিব বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সংকল্প-পাশবদ্ধ হওয়া চাই, তবেই সিদ্ধি হইবে, নচেৎ সেই বিষময় পরিণাম।

তাই আমরা মৃত। এই মৃতদেহে জীবনসঞ্চার করিতে হইলে শবসাধনার প্রয়োজন।

আবশ্যক দেশ-কারু-বস্তুজাতের কোন অভাবই নাই। আজ ভারতভূমি মহাশ্মশান। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিজেতার প্রহরণ, সোণার ভারতকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছে। প্রাণহীন জাতীয়ত্ব শবে পরিণত, সুতরাং আসনার্থ উপযুক্ত সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত শবেরও অভাব নাই। সাধন-মন্দির ভারতে যে সমস্ত উচ্চসাধনাদর্শ আছে তাহার মধ্যে শবসাধন সর্ব্বপ্রধান। মরিয়া গিয়াছে বলিয়া শব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, হাহাকার করিলে হইবে না। মরিয়াছে ত' মরিয়াছে, সেই মরাকে—সেই শবকে আসন করিয়া মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। শবসাধানায় যখন শবের প্রয়োজন তখন মরাই প্রয়োজন, সেই মরা হইতে নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত হইবে, নবশক্তি জাগ্রত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিবেন। সুতরাং এ মরায় দুঃখ নাই বরঞ্চ সুখেরই কথা। তবে, চাই পাত্র—বীর সাধক চাই, চাই অভয়দানে সক্ষম গুরু। তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ। নিশাবসানে মহাশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। মহাশ্মশান-জন্মভূমিতে জাতীয়-শবের উপর সমাসীন হইয়া যদি কোন বীর সাধক "বন্দেমাতরং" মহামন্ত্রের সাধন করিতে পারেন, যদি কোন মহাপুরুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে "মাভৈঃ" "মাভৈঃ"রবে সাধককে প্রোৎসাহিত করেন, তাহা হইলে যে অচিরে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহই নাই। ভূত-প্রেত, পিশাচ, বেতাল বিকট চীৎকারে অস্থিমাংসাদি অনেক বস্তু নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে সাধকের আসন টলিবে না। সাধক—বীরসাধক নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ অচল অটল ভাবে মন্ত্রের সাধন করিয়া যাইবেন, তাহা হইলেই সিদ্ধি নিশ্চিত।

ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত দিকচতুষ্টয় নিনাদিত করিয়া সাধকের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে যত্নবান হইবে। সাধক সে সকল তুচ্ছজ্ঞানে অবজ্ঞা করিবেন, একমনে একপ্রাণে মন্ত্রের সাধন করিয়া যাইবেন। তাহা হইলেই সিদ্ধি তাঁহার করতলস্থ হইবে।

নানাপ্রকার প্রলোভন সাধকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে। সাধক অকিঞ্চিৎকরজ্ঞানে সে সকল আদৌ লক্ষ্য করিবেন না। তাহা হইলেই মন্ত্র সাধনে সিদ্ধ হইবে।

যে শবকে আসন করিয়া সাধক সাধন করিবেন, সেই শবই অকস্মাৎ জীবন্ত হইয়া তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবে। সাধক আপন আসন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিবেন। সর্ব্বপ্রযত্নে অহিতকর জীবনীশক্তিতে শক্তিমান শবকে চাপিয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহার হাস্য, তাহার টিট্‌কারী, তাহার তর্জন-গর্জনে কর্ণপাত না করিয়া আপন মন্ত্র জপ করিয়া যাইবেন। তাঁহার কর্ণ গুরুর অভয়বাণীর উপর থাকিবে। তিনি আর কিছুই শ্রবণ করিবেন না। সিদ্ধি নিশ্চয়।

ব্যক্তিগত সাধকসম্বন্ধে সাধকবিশেষ শববিশেষের উপর সমাসীন হইয়া মন্ত্রবিশেষের সাধন করিয়া বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লয়েন, তাঁহার গুরুও ব্যক্তিবিশেষ। জাতি ব্যক্তিসমষ্টি সুতরাং জাতীয়-শব-সাধনে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা অপেক্ষা ব্যক্তিবহুলের সাধনই বিশেষ ফলদায়ক হইবার কথা। ব্যক্তিবিশেষের সাধনায় যে হইবে না, এ কথা বলা হইতেছে না; একজন সিদ্ধিলাভ করিলে যে মহাশক্তি জাগ্রত হইবে তাহাতেই যুগান্তর হইবে। যদি বলেন গুরু কই? গুরু মিলাও কঠিন, কারণ স্বয়ং সিদ্ধ না হইলে অপরের সিদ্ধিসাধন করা অতীব কঠিন। কিন্তু এক প্রবাদ আছে, "গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, চেলা মিলে এক।" গুরুর অভাব হইবে না। সাধক প্রস্তুত হইলে—সাধনার্থ চিত্ত প্রস্তুত হইলে, গুরু আপনি আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইবেন।

কারণ, সাক্ষাৎ ভগবান্ই গুরুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধক দ্বারা আপনার শক্তিই প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। মানবের আপন চিত্ত ও ভগবান্ কি সহজ গুরু? (Heart within and God over head)। ভগবানে অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া, সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া বীরসাধক যদি সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন মহাশক্তিই যেমন তাঁহাকে প্রলোভনাদি দ্বারা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন, আবার পক্ষান্তরে গুরু হইয়া অভয়দানে তাঁহাকে স্থির রাখিবেন। এ সাধনরহস্য বড় সহজ নহে। আমাদের জাতীয়-শবসাধনের জন্য জন্মভূমিই মহাশ্মশানরূপে বিস্তৃতা। যদি বীরসাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তবে আবার এই মহাশ্মশান প্রফুল্ল নন্দনকাননে পরিণত হইবে।

জাতীয়-জীবনই সাধনার্থ শবরূপে বর্ত্তমান। মরাকান্না না কাঁদিয়া, সকল আশা-ভরসা ত্যাগ না করিয়া, এই শবকেই আসন করিয়া উপবেশন করিতে হইবে। মহামতি বঙ্কিম কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে জগদম্বার বিবিধমূর্ত্তিতে জন্মভূমির মূর্ত্তি দর্শন করিয়া "বন্দেমাতরম্" এই মহামন্ত্রের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। যদি বীরসাধক বা বীরসাধকগণ এই মন্ত্রের সাধন করিবার জন্য জাতীয়-শবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তবেই মন্ত্রের সিদ্ধিদাতৃত্ব প্রমাণীকৃত হইবে অন্যথা ইহা উপন্যাসের কল্পনার বিষয়ই হইয়া থাকিয়া যাইবে।

উপসংহারে শবসাধনে সাধকের লক্ষণ কিছু বলা প্রয়োজন। সাধকের বীর হওয়া চাই, এ কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ বীরের লক্ষণ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা; সুতরাং এ লক্ষণ বীরসাধকেও থাকা চাই। যে মহামায়ার মহাপাকে বদ্ধ হইয়া জীব ইহসংসারে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে, সেই মহাপাক তাঁহারই হস্তদ্বারা ছিন্ন করিবার মানসে অথবা কোন অসহ্য দুঃখ দূর করিয়া ঈপ্সিত সুখরাশিভোগার্থ, অথবা কোন দুষ্কর কার্য্য সাধন করিবার জন্য

তান্ত্রিক সাধক শবসাধনে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, দুঃখের সম্যক অনুভূতি ও তাহার পরিহার-বাসনাই এই শবসাধনার প্ররোচক। অতএব ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত যে, যতক্ষণ না লোকের অন্ততঃ একজন সহৃদয় মহাপুরুষের হৃদয়ে দেশের দুঃখের, জাতির দুঃখের এবং তৎসহ আপনার ও আপনার জনের দুঃখের সম্যক অনুভূতি হইতেছে, ততদিন এ জাতীয়-শবসাধনার প্রস্তাবই হইতে পারে না। ইহাও পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, যে-সে লোকে শবসাধন করিতে পারে না। সাধককে অন্তর্বাহিরে বীর হওয়া চাই। সাধক অন্তরস্থ রিপুষট্‌কের দমন করিয়া আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক কোন ব্যাপারে ভীত, মোহিত বা পদচ্যুত না হইবার শক্তি ধারণ করিলে পর বহির্বীর হইতে পারেন। তখন তিনি শবসাধনের অধিকারী। চিন্তাশীল লোক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, বিনা জাতীয়-শবসাধনে মৃতজাতির পুনরুদ্ধার হয় না। পতিতের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, অবনতকে উন্নত করিতে হইলে, মৃতকে জীবিত করিতে হইলে—শবসাধনই একমাত্র উপায়। কিন্তু চাই গুরু ও সাধক, আর সমস্তই প্রস্তুত আছে। জাতির পুনরুদ্ধারকল্পে শ্মশান, শব, মহামন্ত্র প্রভৃতি সকলই প্রস্তুত। চাই গুরু ও সাধক।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

প্রকৃতির মাধুকরী।

পঞ্চঠাঁই হ'তে নিত্য পঞ্চমুঠি ভিক্ষা ক'রে আনি'
তুমি করিতেছ রক্ষা আপনার জীব-দেহখানি!
তব এ যোগিনী-সাজে লুকাইয়ে আছে কি মাধুরী
যার দ্বারে যাও যবে ভিক্ষা-ঝুলি দেয় সেই পুরি!
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে কত যুগ, কত বর্ষ-মাস,
কালের বিরাট গর্ভে রচে' নিল আপন আবাস;
নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লান্তি, শৈথিল্য-বিশ্রাম-ক্ষণ আর—
তুমি সদা একভাবে পালিতেছ ব্রত আপনার!
এ ব্রতের কোথা আদি, কোন্‌খানে হ'বে অবসান,
বিশ্বের কল্পনা কিছু নাহি করে সদুত্তর দান!
জানি শুধু রাজেন্দ্রাণী, তব এই ভিখারিণী-বেশ,
সাধিতেছে প্রতি পলে জগতের কল্যাণ অশেষ!
আনন্দে বিস্ময়ে তাই ভাবি বসে' দিবা-বিভাবরী—
কিবা আশে কল্পে কল্পে আচরিছ পূত মাধুকরী!

শ্রীব্রহ্মাণ্ডেশ্বর শম্ভুনারায়ণ দেব বর্ম্মা।

আরাধ্যের আরাধনা।

প্রত্যেক অবস্থায়ই বিপদ্‌সাগর পার হইবার পূর্ব্বে দৈবে একটা সুবাতাস বহিয়া থাকে। সে সুবাতাসের দিকে চাহিয়া আনন্দকোলাহল করিলেই যে কার্য্যসিদ্ধি হয় এমন নহে; কিন্তু সেই সুবাতাসে পাল উড়াইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে হয়। কর্ণধার সুদক্ষ না হইলে সেই সুবাতাসজাত তরঙ্গেও নৌকা ডুবিয়া যাইতে পারে। আবার কর্ণধার দক্ষ হইলেও পাল, দড়ি, মাস্তুল, গুন সংগৃহীত না থাকিলে এবং সুদক্ষ নাবিকগণ সহায়তা না করিলে সে সুবাতাসেও সাগর পার হওয়া যায় না।

যিনি উপকরণাবলীর প্রকৃতি ও শক্তি বুঝিতে চান, তাঁহাকে প্রত্যেক জাতির লোকের ইতিহাস জানিতে হইবে। ইতিহাসের একদেশের প্রতি মনঃসংযোগে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যিনি শিবজীর বিজয়-কাহিনী হইতে মাউলী বীরগণের চিত্র পরিত্যাগ করেন, যিনি রণজিৎসিংহের কাহিনী হইতে জাঠচরিত্র বাদ দেন, যিনি পেশোয়াসাম্রাজ্যের ইতিহাস হইতে বল্লমধারী মহারাষ্ট্রী কৃষক-বৃন্দের বিয়োগ করেন, যিনি ভরতপুরাধিপ-কর্ত্তৃক ইংরেজ-পরাজয়ের বৃত্তান্তে জাঠ-কৃষককুলকে, ভুলিয়া যান, বলিতে হইবে, তাঁহার ইতিহাস-আলোচনা সম্যক বিফল হইয়াছে। সেইরূপ যিনি বঙ্গের বীরগৌরব গাহিবার সময় বঙ্গের সুপরিচিত শ্রেণিগুলিকে মোহবশতঃ ভুলিয়া আকাশকুসুমে মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হন, তিনিও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট রহিয়াছেন বলিতেই হইবে। কর্ত্তব্যপালনে উদাসীনতা বা ক্ষুদ্রতা বাঞ্ছনীয় নহে।

দেশের কে কিরূপ শক্তিসম্পন্ন তাহা বুঝিতে হইলেই প্রত্যেক

শ্রেণীর মনুষ্যের ইতিহাস চর্চা করিয়া সেই শ্রেণীস্থ লোকের প্রতিভা সন্ধুক্ষিত করিতে হয়। বোধ হয়, ইহাই সফলতার অমোঘ অস্ত্র।

আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই, মহাবীর হনুমান্ সমুদ্রলঙ্ঘনের পূর্ব্বে নব্যবানরসমাজে অপরিচিত ছিলেন; যখন মন্ত্রকুশল বৃদ্ধ জাম্ববান্ সভাস্থলে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ঘোষিত করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, তখন হনুমানের স্বকীয় শক্তি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল এবং তিনি এক লম্ফেই মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়া বসিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাই, অর্জ্জুনের প্রতিরথ মহাবীর কর্ণ সারথি শল্যের তিরস্কারে আত্মশক্তি অকর্ম্মণ্য ও হীনতর মনে করিয়া ভীত ও অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। কাজেই বীরশক্তি-পূজা ভিন্ন বীরশক্তি সন্ধুক্ষিত হইতে পারে না। এই জন্যই প্রত্যেক দেশেই বীরপূজার পদ্ধতি আছে।

এই বীরপূজা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ফলের তারতম্য উৎপাদন করে। শিবাজীর কাহিনী মহারাষ্ট্রজাতির হৃদয়ে যে শক্তি সন্ধুক্ষিত করে, কুমারসিংহের ভক্ত ভোজপুরীর হৃদয়ে সে শক্তি সন্ধুক্ষিত করে না; রণজিৎসিংহের বিক্রমে জাঠ ও শিখগণ যত উৎফুল্ল হন, দ্রাবিড়দেশীয় লোক সেরূপ হন না। এইজন্য দেশ ও সম্প্রদায়-ভেদে যদি কোন বীরশক্তি কোনকালে জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে সেই সেই কাহিনী শ্রবণ করাইয়া সেই সেই সম্প্রদায়কে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত; তাহা হইলেই তাঁহারা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। এ বিষয়ে কৃপণতা ও ক্ষুদ্রতা একেবারে পরিত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের এই বঙ্গদেশে এমন কয়েকটি শ্রেণী আছেন, যাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিক্রমশালী বীরসঙ্ঘ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সেই সমাজের মুখ চিরতরে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল

সম্প্রদায় কি এই বঙ্গের মায়াই সুসন্তান নহেন? তাঁহাদের কীর্ত্তি গান করিয়া কি সেই সেই সমাজে আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া উচিত নহে? সেই প্রাচীন গাথায় কি সকলে মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে? আমার বিবেচনায়, যখন আমরা শিবাজীর নাম গান করিয়া অপরিচিতকল্প মহারাষ্ট্রজাতির অভিনন্দন করি, তখন বনবিষ্ণুপুরের স্বাধীন ভূপালবৃন্দের পূজা করিয়া বারমল্লগণের সম্বর্দ্ধনা করা কর্ত্তব্য; অজয়দুর্গপতি ইছাই ঘোষের নামে জয়ধ্বনি করিয়া আভীরগণের সম্মান করা উচিত; তম্‌লুক, হিজলী, ময়নাগড়, তুর্কাধিপতি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের জয়ধ্বনি করিয়া পরাক্রান্ত মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণের সম্বর্দ্ধনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কামতেশ্বর নীলধ্বজ-প্রমুখ বিক্রান্ত খ্যান্‌ভূপতিগণের নাম করিয়া খ্যান্‌জাতিকে স্মরণ করা বিহিত; কোচবেহারাধীশ্বরগণের আদিবীর বিশ্বসিংহের জয়ধ্বনি করিয়া রাজবংশী সম্প্রদায়ের আনন্দবর্দ্ধন করা নিতান্ত উচিত। আসামেশ্বর বীরগণের স্মৃতি অভিনন্দন করিয়া আহম্‌গণকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের প্রদেশে প্রদেশে এই সকল জাতি বিক্রমের যে গভীর পাষাণরেখা পাত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এক ভগবান্ ভিন্ন মানবের সাধ্য নাই যে মুছিয়া ফেলে; তবে উৎফুল্লকণ্ঠে এই সকল প্রথিত জাতির গৌরব গান করা কি কর্ত্তব্য নহে?

আশা করি মাতৃপূজকগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, এবং তত্তৎ সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ হইতে বা ইতিহাস হইতে চাহিয়া লইয়া তত্তৎ সমাজের পূজ্য বীরগণের কীর্ত্তি গান করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি কোন ইতিহাস লিখিতে বসি নাই; কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, সেই বিষয়ে বীরপূজকগণের চিন্তা-সৌকর্য্যার্থে নিম্নে সেই সেই সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিগাথাসম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুইচারিটি কথা বলিলাম। ইহা বলা কর্ত্তব্য। কেননা,

মাতৃপূজকগণের সকলেই যে দেশীয় ইতিহাস আলোচনা করেন এরূপ নহে। সুতরাং ইতিহাসের কঙ্কালটা জানিয়া রাখা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। পরস্পরের ইতিহাস পরস্পরের অজ্ঞাত থাকিলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি জন্মিতে পারে না, পরস্পরের প্রতি গৌরবের ভাবও জন্মে না, জন্মে কেবল ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও ক্ষুদ্রতা। এখন সে সকল ক্ষুদ্রতাপোষণের দিন নহে।

ভাগীরথীর পশ্চিমতট হইতে পশ্চিমমুখে ছোটনাগপুরের সীমা পর্য্যন্ত, এবং বঙ্গসাগর হইতে উত্তরাভিমুখে বীরভূম পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত ভূখণ্ড রহিয়াছে, এই বিশাল ভূমিখণ্ড প্রধানতঃ বহুকাল তিনটি জাতির শাসনাধীনে ছিল। এই সমগ্র ভূভাগকে তিন অংশে বিভাগ করুন। দক্ষিণে সমুদ্রতট হইতে আরম্ভ করিয়া মেদিনীপুর, হাওড়া ও বর্দ্ধমানের একাংশ লইয়া অবশিষ্ট বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়ার সীমানাপর্য্যন্ত ধরুন প্রথম খণ্ড। এই প্রথম খণ্ড বাদে সমগ্র বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম প্রদেশের বহুলাংশ লইয়া বুঝুন দ্বিতীয় খণ্ড। বর্দ্ধমান ও বীরভূমের অবশিষ্ট লইয়া ধরুন তৃতীয় খণ্ড। ইহার প্রথম খণ্ড মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণের রাজ্য, দ্বিতীয় খণ্ড মল্লজাতির রাজ্য, ও তৃতীয় খণ্ড গোপগণের রাজ্য।

মল্লরাজ্য ও গোপরাজ্যের দক্ষিণ হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রথম খণ্ডে বিক্রান্ত মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পাঁচটি রাজবংশ সমবেতভাবে বিভাগ করিয়া এই খণ্ড শাসন করেন। এই পঞ্চ রাজবংশের রাজধানীর নাম (১) তম্‌লুক্‌গড়, (২) ময়নাগড়, (৩) হিজ্‌লী বা সুজামুঠাগড়, (৪) কুতুবপুরগড়, (৫) তুর্কাগড়। এতন্মধ্যে ছত্রপতি তম্‌লুকরাজবংশ অধিকাংশ সময়ে চক্রবর্ত্তী থাকিতেন। হিজ্‌লীর রাজারাও অনেক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিতেন। পাঠানগণ

বারেই প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই খণ্ড মোগলের করায়ত্ত হয়। নবাবাধিকারে এই সকল রাজাদের দুর্গম মুখ্য গড়গুলি প্রায় স্বাধীন ছিল। ময়নাগড় ইংরেজাধিকারের প্রথম কতিপয় বৎসর একেবারেই বশ্যতা স্বীকার করে নাই। দ্বাদশ শতাব্দাতে তমলুকের বীরবর্গ ত্রিবেণী ও সুন্দরবন হইতে সমগ্র উৎকল পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ১৪শ শতাব্দীর প্রথমাংশে বঙ্গের পাঠান পাৎসা সেকেন্দর সসৈন্যে হিজ্‌লী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তখন হিজ্‌লীতে পরাক্রান্ত রাজা হরিদাস রাজ্য করিতেছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রাজা গোবর্দ্ধন রণঝাপের সময় পাঠানবীর মছন্দলী অতিকষ্টে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে হিজ্‌লী অধিকার করেন। হিজ্‌লীর রাজা সুজামুঠাগড়ে আশ্রয়লাভ করেন ও বশ্যতাস্বীকার করেন। এই হইতে হিজ্‌লীপতিগণ সুজামুঠাগড়ের রাজা বলিয়া খ্যাত হন। মছন্দলী ও তদীয় পুত্রের হস্তে হিজ্‌লীরাজ্য অতি অল্পকাল ছিল। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য পাঠানের হস্ত হইতে হিজ্‌লী কাড়িয়া লন। প্রতাপাদিত্য অল্পকালমধ্যেই নাশপ্রাপ্ত হইলে হিজ্‌লীরাজ্য মোগলের খাশ হয়। সুজামুঠাপতি রাজা গোড়াইপটনায়ক হিজ্‌লী আবার হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। হিজ্‌লী নির্ব্বাণের পরেও কুতুবপুরপতি দুর্দ্দান্ত রাজা দলসিংহ ও ভিকারী সিংহ, তুর্কার গজেন্দ্রমহাপাত্রগণ, ময়নাগড়ের বাহুবলীন্দ্রগণ ও তমলুকপতিগণ যেমন-তেমন পরাক্রান্ত ছিলেন না। বলিতে কি, সমগ্র মুসলমান-আমল-ভরা ইঁহারা অধৃষ্য ও সতেজ ছিলেন। তাম্রলিপ্তের বর্ত্তমান ভূপতি, মূলরাজা হইতে ৬০ পুরুষ দূরবর্ত্তী। যিনি বীরপর্য্যায়ে এই সকল রাজপুত্রের পূজা করিতে ভুলিয়া যান; তিনি এখনও তাঁহার মাতৃগর্ভে বাস করিতেছেন। ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে এই বিক্রান্ত ও সমৃদ্ধ সম্প্রদায় অতি প্রাচীনযুগেই

বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছিলেন; ইঁহাদের রণতরী সিংহল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত সাগরবারি শাসন করিত এবং স্থলদেশেও ইঁহাদের বিক্রম সুবিস্তৃত হইয়াছিল।

বনবিষ্ণুপুর, মধ্যখণ্ডপতি মল্লজাতির রাজধানী। ইঁহাদের আদি বিক্রান্ত রাজার নাম রঘুনাথ বা আদিমল্ল। তাঁহার সন্ততিগণই এই রাজ্য শাসন করেন। এই রাজ্যের প্রতাপ অসাধারণ ছিল। মুসলমান-অধিকারেও ইঁহারা করদান করেন নাই। মুসলমান-অধিকারে বনবিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় দীল্লি বলা হইত। বনবিষ্ণুপুরের ন্যায় বিখ্যাত পাচক ও গায়ক অন্যত্র ছিল না। বনবিষ্ণুপুরী মল্লবীরগণের যষ্টির সাহায্যে নবাবগণ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রগণকে তাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মল্লরাজ্য অতাব বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত ছিল। এই রাজ্যের রাজবংশের ৬০।৭০ জন স্বাধীনরাজা মহাবিক্রমে এই বিশাল ও গৌরবান্বিত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপুরের গড়ে আদিমল্লের বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান। এই বংশের বীরহাম্বীরপ্রমুখ ভূপতিগণ অতি বড় বীর ও ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন। ইঁহারা বীরপূজা পাওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় খণ্ডই গোপরাজ্য। গোববংশ অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতের বীরজাতিমধ্যে গণ্য। রাজস্থানোক্ত ৩৬ রাজকুলমধ্যে গোপগণ স্থান পাইয়াছিলেন। মহাভারতযুগে ইঁহারা অতি প্রবল ছিলেন। মধ্যদেশের আহীরবারাপ্রদেশ তাহার নিদর্শন। বীরভূম অঞ্চল এই জাতির মৌলিক স্থান। রাজা ভল্লুকপদ রায়, ইছাই-ঘোষপ্রমুখ পরাক্রান্ত স্বাধীন ভূপতিবৃন্দ এই গোপবংশসম্ভূত। ইছাই ঘোষের পিতাও রাজপুত্র ছিলেন, বিশেষ কারণে কিয়ৎকাল দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। ইছাই ঘোষ অজয়গড় অধিকার করিয়া, উত্তর-ময়না পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তখন ময়নাগড়রাজ্য পশ্চিমে বিষ্ণুপুর এবং উত্তরে অজয়গড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সকল গোপরাজার

সন্তানগণ এখন কোঙর-শব্দে পরিচিত। সত্য বটে, গোপরাজ্য মুসলমান-অধিকারে প্রায় বিলীন হয়, কিন্তু গোয়ালাগণ যে যোদ্ধৃগণের অগ্রগামী তাহা এখনও বুঝা যায়। মল্ল ও গোপকুল হইতে পরবর্ত্তী-কালে অনেক পরাক্রান্ত মহাদস্যু প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারাও বীরপূজার্হ।

যেমন দক্ষিণসমুদ্র হইতে বীরভুম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড তিনটি সামরিক জাতির করায়ত্ত ছিল, ঠিক সেইরূপ কোচবেহার হইতে আসামের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমাচলপাদস্থ প্রত্যন্ত ভূভাগ কালক্রমে তিনটি জাতির অধিকারভুক্ত হয়। এই সমগ্র দেশকেই পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলা হইত। অতিপূর্ব্বে এই সমগ্র ভূভাগ ভগদত্ত রাজার বংশধরদিগের অধীন ছিল। শেষ রাজা ভবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে নানাবিধ পার্ব্বত্যজাতি এ সকল দেশ অস্থায়িভাবে ভোগ করেন। পরিশেষে খ্যান্‌নামক একজাতি তাঁহাদের নেতা নীলধ্বজের অধীনে এই দেশের বহুস্থান অধিকার করেন। কামতপুর নীলধ্বজের রাজধানী। কামতপুরের ভগ্নদুর্গের পরিধি ২৪ মাইল। এই বংশে তিনজন পরাক্রান্ত ভূপাল রাজ্য করিয়া পাঠানগণের হস্তে নির্ম্মূল হন। কিন্তু এখনও খ্যান্‌জাতির লোপ হয় নাই. এই জাতি রঙ্গপুর প্রভৃতি উত্তরবঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র লক্ষিত হয় না।

খ্যান্‌গণের পতন হইবার পরই রাজবংশীনামক একটি প্রত্যন্ত দেশীয় বীরজাতি বর্ণিত সমগ্র ভূভাগ অধিকার করেন। এই বীর-জাতীয় নেতার নাম বিশ্বসিংহ। ইনিই কোচবেহারের আদি নৃপতি। তদীয় ভ্রাতা শিশুসিংহের সন্ততিগণ বিজনীরাজ্যের রাজা। ইঁহারা আসামের কামাখ্যাপ্রভৃতি প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। কোচ-বেহারপতিগণ এখনও মানসম্ভ্রমে বঙ্গে অদ্বিতীয়। গৌড়ের পাঠান-পাৎশাহগণ ইঁহাদের কেশাগ্রও ছিন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। এখনও

রাজবংশীগণ ভারতসম্রাটের মিত্রস্থানীয়। ইহারাও এই রত্নপ্রসূ বঙ্গমাতার সুকৃতি বীরসন্তান।

কোচবেহাররাজ্য ও কামতেশ্বর রাজধানীর পূর্ব্বস্থিত সমগ্র দেশ এখন আসামনামে খ্যাত। আসাম প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের পূর্ব্বখণ্ড মাত্র। পশ্চিমাংশে কোচগণের, খ্যান্‌গণের ও ছুটিয়াগণের পরাক্রম হ্রাস পাইবার পর, আহম্‌নামক একটি প্রখ্যাত বীরজাতি সমগ্র আসাম অধিকার করিয়া ঐ দেশকে আসাম নাম প্রদান করেন। এই জাতি শ্যামদেশের পূর্ব্ব অধিবাসী। ইহারা আসামেশ্বর হইয়া বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং বহুতর ব্রাহ্মণ ও "গোহাই" (গোঁসাই) স্থাপিত করেন। গোহাইগণ আসামের ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং রাজসম্মানে সম্মানিত। আহম্‌রাজার হস্ত হইতেই ইংরেজগণ আসামরাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য গভর্ণমেণ্ট আহম্‌গণের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছেন। আসামেশ্বর বীর আহমজাতির সংখ্যা আসামে প্রচুর। ইহারাও বঙ্গদেশের সুকৃতি বীরসন্তান।

উল্লিখিত পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ জাতিগুলির সুমহতী কীর্ত্তি সর্ব্বপ্রকারেই আরাধ্য।

শ্রীপ্যারীমোহন দাস।

পৃথিবীতে মানবাগমন।

(২)

আমরা বলিলাম যে, মস্তিষ্কপদার্থের পূর্ণবিকাশে মানবের দেহ ও মন উভয়ই ইহার কার্য্যসাধনে অক্ষম হইবে। এথনই উহারা মস্তিষ্কের নিকট পরাস্ত হইয়াছে, ক্রমে আরও হইবে। এস্থলে মস্তিষ্কশব্দ বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছি। মানবের বুদ্ধি, দেহ ও মনের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াছে; এবং উত্তরোত্তর আরও করিবে। দেহ নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ; মনের শক্তি যদিও দেহ অপেক্ষা অধিক, তথাপি মনও সীমাবদ্ধ; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।* ইহার গতি অনন্তের দিকে, ইহার প্রসার অনন্ত। দেহ দেশকাল অতিক্রম করিতে অক্ষম; মন দেশকালের দ্বারা আবদ্ধ নহে। কিন্তু এথনই বুদ্ধি যাহা প্রতিপন্ন করিতেছে, মন তাহা ধারণাই করিতে সক্ষম হয় না। ক্রমে বুদ্ধির প্রসার এত বৃদ্ধি হইবে যে, মন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া যাইবে। কথাটা অন্যরূপে দেখা যাউক।

---

* ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীব হইতে মানব পর্য্যন্ত বুদ্ধি সর্ব্বঘটেই আছে। কাহারও বুদ্ধি নাই, এরূপ বলা যায় না। জীবমাত্রেই, কি উদ্ভিদ, কি জন্তু, সকলেরই অল্পাধিক বুদ্ধি আছে। জীবাণুগণ (microbes) অতীব ক্ষুদ্র; উহাদিগের লক্ষ লক্ষ একত্রে একটী সূচের ছিদ্র দিয়া গতায়াত করিতে পারে। ইহাদিগেরও বুদ্ধি থাকা প্রমাণিত হইয়াছে। "Microbes do not nourish themselves indiscriminately, nor do they feed blindly upon every substance hat chances in their way. They exercise a choice ; and as Dr. G. J. Romanis, F. R. S. has observed the power of choice may be regarded as the criterion of psychical faculties. * * * Micropes are capable of discriminating between their own kind and other micropes, for they generally live in colonies."

Griffiths Micro Organism, p. 120.

জীবদেহ বহুল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান মানবাকারে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতি শীত, গ্রীষ্ম, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, আহারের অসদ্ভাব ও অযোগ্যতা—এই সকল বিবিধ উপায়ে ঐ পরিবর্ত্তন সিদ্ধি করিয়াছে। জীব এই সকলের সহিত প্রাচীনকাল হইতে নিয়ত সংগ্রাম করতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। যাহারা এই সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে তাহারাই বাঁচিয়াছে, অন্যেরা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই জীবন-সংগ্রাম কি? ইহারই ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ করে নাই ত? আমার মনে হয়, এই জীবন-সংগ্রামই ক্রমশঃ দেহ ও মনের উপর বুদ্ধির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টার নামই জীবন-সংগ্রাম। ধরাপৃষ্ঠে শীত-গ্রীষ্মাদির আধিক্যহেতু, অথবা জীবনধারণোপযোগী আহারের, অপ্রাচুর্য্যবশতঃ জীব যখন ক্লিষ্ট ও পীড়িত হয়, তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। সে চেষ্টা সফল হইলেই জীবদেহ বাঁচিয়া যায়; নচেৎ বিলুপ্ত হয়। জীবন-সংগ্রামে একদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা, যাহার ফল বংশবিস্তৃতি; অন্যদিকে বিনাশ। ইহা ব্যতীত তৃতীয় পন্থা নাই। আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ যখন সম-শ্রেণীস্থ * জীবগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়, তখন যে জয়ী হয়, তাহারই বংশ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়; যে পরাজিত হয়, সে সম্পূর্ণ-

---

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্য যেখানেই আছে, ক্ষুদ্র দেহই হউক আর বৃহৎ দেহই হউক, সেইখানেই বুদ্ধিও আছে। বুদ্ধি চৈতন্যের লক্ষণ। জগৎ চৈতন্যময়।

Prof. J. A. Thomson বলিয়াছেন, "The modern conception of matter tends to make the whole world alive."

সুতরাং বুদ্ধিও ব্রহ্মাণ্ডময় সর্ব্বত্র বিরাজমান, তবে ঘটে ঘটে বিভিন্নরূপ প্রকাশ, এই মাত্র।

* The struggle for existence takes place not between different species, but between individuals of the same species.

Nature and Man, p. 14.

রূপে বিনষ্ট হয়। পরাজিতের নাশই এই কঠোর সংগ্রামের শেষ-ফল।* এই সংগ্রামে জয়ী হইতে কেবল দৈহিক বলের আধিক্য থাকিলেই প্রচুর হয় না। অনেক সময় দুর্ব্বলতাও জয়ী হইবার সহায়তা করে; এবং সময়বিশেষে সবলতাই পরাজয়ের কারণ হয়। এ সংগ্রামে জয়লাভের নিয়ত চেষ্টায় বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রতিকূল অবস্থায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই বুদ্ধির উৎকর্ষতা। একবংশে যে উৎকর্ষতা উৎপন্ন হইল, পরবংশে তাহা আরও মার্জ্জিত ও উন্নত হয়। এইরূপে জীবনসংগ্রামের ফলে পর পর বংশীয়গণের বুদ্ধি উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সংগ্রামে যাহারা জয়ী হয়, তাহারা কেবল যে বাঁচিয়া যায় তাহা নহে, ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তিতেও উন্নত হইয়া উঠে।

আমরা অন্যত্র † দেখাইয়াছি যে জীবদেহ জন্তুযুগের মধ্যাবস্থায় অথবা শেষভাগে (Lower miocene age) অতীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; তদবধি এপর্য্যন্ত দেহ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমেই উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, মানবের বুদ্ধি, দেহের ক্ষমতাকে অবশ্যই অতিক্রম করিবে। দেহ, অন্ততঃ স্থূলদেহ, বুদ্ধির কার্য্যসাধনে ক্রমেই অপটু হইবে। বুদ্ধিবলে আকাশমার্গে উড্ডীন হইবার যন্ত্র উদ্ভাবন করিলাম; কিন্তু কিয়দ্দূর উঠিতেই দেহ অবসন্ন হইয়া গেল;

* * * In Nature's struggle for existence, death, immediate obliteration, is the fate of the vanquished; whilst the only reward to the victors * * * is the permission to reproduce their kind, to carry on by heredity to another generation the specific qualities by which they triumphed.

Roy Lankester Nature and Man, p. 15.

আর উঠা হইল না। জীব কি তখনই সে চেষ্টা হইতে বিরত হইবে? বোধ হয় না। ধ্বংসশীল দেহ যতই উন্নতজীবের কার্য্যসাধনে অপটু হইবে, ততই উহা পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি হইবে। দেহ এত অকিঞ্চিৎকর ও সীমাবদ্ধ যে, উহা মন ও বুদ্ধির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত, মন যাহা সঙ্কল্প করে, বুদ্ধি তাহা সিদ্ধি করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু দেহ কত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে! মন মঙ্গলগ্রহে যাইয়া কত তথ্য আবিষ্কার করিতে লালায়িত; কিন্তু দেহ তাহার কার্য্যসাধনে অক্ষম। এ দেহ পরিত্যক্ত হউক, তখন মনের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আবার, বুদ্ধি যাহা প্রতিপন্ন করিতেছে, মন তাহা ধারণা করিতেই সমর্থ হয় না। বুদ্ধিবলে প্রমাণ করিলাম যে, কোন বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত দুইটি রেখা ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটস্থ হইবে, কিন্তু অনন্তকালেও মিলিত হইবে না। এত তত্ত্ব গণিতজ্ঞের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু তিনি ইহা কখনই মনে ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন না। এই যে, "অনন্ত" কথাটা ব্যবহার করিলাম, মন ইহাকে কি ধারণা করিতে সমর্থ হয়? কখনই না। এইরূপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন বুদ্ধির বহুপশ্চাতে পড়িয়া থাকে; সুতরাং কালে মনকে বুদ্ধি এতদূর পরাস্ত করিবে যে, মন থাকা-না-থাকা সমান হইতে পারে। এইরূপে দেহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ মনের, এবং মন বুদ্ধির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলে, মানব উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।* জীবাত্মা তখন অন্নময়

* ইন্দ্রিয় পশিলে মনে, বুদ্ধি মাঝে মন,
আত্মায় পশিলে বুদ্ধি; আত্মাও তেমন
প্রবেশলে অব্যক্ত সু-সূক্ষ্ম কারণে
পরমাত্মরূপী যিনি; পরমাত্মা ক্রমে
বিরাটপুরুষে পশি হইলে বিলীন,
মুক্ত হবে দেহী, শান্ত স্থির গতিক্ষীণ। উপনিষদ পদ্যাবলী।

কোষকে (দেহকে) স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম জানিয়া, তথা হইতে প্রাণময় ও তথা হইতে মনোময় কোষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে৷ পরে ইহাদিগকেও অকিঞ্চিৎকর এবং অসমর্থ জানিয়া জ্ঞানময় কোষে আশ্রয়গ্রহণ করিবে। বিশেষ-অবিশেষের প্রভেদ বুঝাই জ্ঞানের কার্য্য। এই জ্ঞান, সম্পূর্ণ স্ফূরণ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানময়কোষের পূর্ণ সফলতা। সাধারণতঃ এই জ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু যখন বিশেষ-অবিশেষ জ্ঞান একমাত্র মূলীভূত তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইবে, তখনই জীবের অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি, তখনই আত্মা আনন্দময় কোষে নির্বিষয় ও নিরুপাধি হইয়া বিরাজ করিবেন। * পৃথিবীতে মানবের আগমন এইজন্যই। যিনি আসিলেন, তিনিই নানারূপে ভ্রমণকরতঃ আবার স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার লীলা পূর্ণ করিলেন। এ লীলার ইহাই উদ্দেশ্য, ইহাই সফলতা।

শ্রীশশধর রায়।

বাঙালী।

বাঙালী মোরা বাঙালী—
   চিরদিন কাঙালী!
তোরা, মায়ের দেহ কাটিয়া কেন—
   মোদের জাগালি?
ছিলাম মোরা ঘুমে—
   ধর্ম্ম ছিল চেয়ে,
তোরা বহিতেছিলি পরের ধন—
   সাগর বেয়ে বেয়ে।
ধর্ম্ম যদি মিথ্যা হ'তো—
   ছলনা হ'তো খাঁটি,
তবে, পারিতি তোরা লইতে দেশে—
   সোণার এই মাটি!
রত্নময় অলঙ্কার
   মায়ের ছিল যত;—
তোরা নিছিস্ কেড়ে আপন হাতে—
   বেদনা দিয়ে কত!
পাবেনা, আর পাবেনা তাহা—
   বিধির যত খেলা,
মোরা, মায়ের পায়ে গাঁথিয়া দিব—
   বনের ফুলমালা।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

জেলা ময়মনসিংহ নেত্রকোণামহকুমার অধীন মদনপুরগ্রামে মহর্ষি শাহ সোলতানের দরগা অবস্থিত। এই দরগার চতুষ্পার্শ্বে প্রায় চারি বিঘা ভূমি লইয়া অত্যুচ্চপ্রাচীর বেষ্টিত আছে,

মদনপুর শাহ সোলতানের দরগা।

ঐ প্রাচীরের মধ্যস্থলে দরবেশ শাহ সোলতানের পবিত্র সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমাধির পশ্চিমদিকে প্রাচীরের বহির্ভাগে একটী প্রকাণ্ড মস্‌জিদ বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরের তিনদিক বন্ধ, দক্ষিণদিকে একটী দ্বার। সিংহদ্বারে পার্শীঅক্ষরে প্রস্তরফলকোপরি লেখা আছে, যথা—

"৪০৫ হিজ্‌রীর ১২ই রবিওল আউয়াল তারিখে শাহ সোলতান পরলোক গমন করিয়াছেন।"

ইহাতে অনুমিত হয় যে, শাহ সোলতান প্রায় নয়শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের আগমন হয় নাই। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে ইস্‌লামধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক মুসলমান ফকিরগণের দ্বারাই যে প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে ইস্‌লামধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার ওয়াইজ্‌ এবং গোলামহোসেন প্রভৃতি ইংরাজ ও পারসিক ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেক প্রাচীন সন্দর্ভেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ প্রাচীনকালে 'কামরূপ' রাজ্যের অধীন ছিল। মদনপুরে রাজা মদনমোহন, জঙ্গলবাড়ীতে

অধীনে থাকিয়া ময়মনসিংহজেলা সীমাবদ্ধরূপে শাসন সংরক্ষণ করিতেন। ইহারা সকলেই বঙ্গের আদিম অধিবাসী "কোচজাতি"-সম্ভূত ছিলেন। ইঁহাদের প্রচুরপরিমাণে যুদ্ধসামগ্রী ও সৈন্যসামন্ত ছিল। আজ পর্য্যন্তও নেত্রকোণার অন্তর্গত "মদনপুরে," সেরপুরের নিকটবর্ত্তী "গড়জরিপায়" এবং কিশোরগঞ্জমহকুমার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী ও ঘাগরা প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের সুবৃহৎ পরিখাবেষ্টিত বাটী এবং দুর্গ ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

শাহ সোলতান বলখদেশের অতিশয় অত্যাচারী সম্রাট ছিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে হঠাৎ তাঁহার মনের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং রাজ্যপাট পরিত্যাগ করিয়া, পরমেশ্বরসম্বন্ধীয় পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৃতসংকল্প হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত আরাধনা ও উপাসনার পর পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, এবং সাহাজাদপুরনিবাসী আব্দুল মজিদ্ খন্দকার-প্রণীত "সোলতান বলখী"নামক (দুভাষী বাঙ্গালায়) ঐতিহাসিক পুঁথী এবং মুন্সী গওছআলী-কৃত (পার্শীভাষায়) "সোলতান বলখী"-নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ণ দরবেশী প্রাপ্ত হইয়া এই মহাপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। প্রথমতঃ বগুড়ার অন্তর্গত "মাহাস্থানগড়ে" আসিয়া তথাকার রাজ্যাধিকারিণী শিলাদেবীর সহিত ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রাণী শিলাদেবী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া করতোয়া-সলিলে ঝম্ফপ্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শাহ সোলতান তাঁহার দুরাক্রম্য প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ ভগ্ন করতঃ তদুপরি এক মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। সেই মস্‌জিদ্ ও রাণী শিলাদেবীর গভীর ও বিস্তৃত পরিখাবেষ্টিত সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় দুর্গ, তদুপরি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃঢ় অতলজলস্পর্শী কূপ, শ্বেত ও কৃষ্ণ

অতুল ঐশ্বর্য্য ও দৈববলে বলীয়ান শাহ সোলতানের অলৌকিক ক্ষমতার স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে। বগুড়ার ৫ মাইল উত্তরে এই "মাহাস্থানগড়" একটী দেখিবার জিনিস্, এই গড় ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। শুনা যায়, এই স্থানেই পরশুরামের বাড়ী ছিল। আবার ইহার অনতিদূরেই চাঁদসওদাগরের আবাসবাটীর চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, শাহ সোলতান কিছু দিন "মাহাস্থানগড়ে" অবস্থান করিয়া পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে কোচরাজ মদনমোহনের রাজধানীতে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তথায় নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। "ফারাস," "কবির" ও "খাদেম" নামধারী একশত "চেলা" (শিষ্য) তাঁহার সঙ্গে ছিল। শাহ সোলতান সর্ব্বদা একটী পালিত শার্দ্দূলের পৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়াইতেন, এবং ঐ শার্দ্দূলের পৃষ্ঠেই আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। আজকালও তাঁহার দরগার সমীপবর্ত্তী স্থানে অনেক ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

দরগার প্রাচীরের ভিতরে একটী সুবৃহৎ লবঙ্গবৃক্ষ ও একটী খোরমাবৃক্ষ আছে, তাহাতে অল্পবিস্তর লবঙ্গ ও খোরমা জন্মিয়া থাকে। মদনপুর অতি বৃহৎ জনপদ, দীর্ঘে ছয় মাইল ও প্রস্থে দুই মাইল হইবে। এই বিস্তৃত জনপদ ফকিরগণ নিষ্কর ভোগ করিয়া থাকে। শুনা যায়, এই গ্রাম কেহ জরিপ করিতে পারে না, যদি কোন আমিন জরিপ করিতে আরম্ভ করে, তবে সে কোন-না-কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। গবর্ণমেণ্ট এই গ্রাম আজ পর্য্যন্তও জরিপ করেন নাই, কিম্বা পথকরও ধার্য্য করেন নাই। সমস্ত গ্রাম "গাব"-নামক একজাতীয় প্রকাণ্ড বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ, অন্য কোন বৃক্ষ মদনপুরে প্রায়ই দেখা যায় না।

শাহ সোলতানের সমাধির দক্ষিণদিকে প্রাচীরের বাহিরে সুবর্ণ-

গ্রামের দ্বিতীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তা বাহাদুরখাঁর সমাধি বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে, বাহাদুরখাঁ বলপূর্ব্বক জনৈক হিন্দু রাজার দুহিতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাহাতে রাজা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে বাহাদুরখাঁকে জামাতাসম্ভাষণে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বালয়ে লইয়া যান, এবং হস্তিপদতলে দলিত করিয়া প্রাণবিনাশ কবেন। "ছিমু"নাম্নী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠাভগিনী তাঁহাকে মদনপুর শাহ সোলতানের সমাধির নিকট সমাধিস্থ করেন। নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট এতৎসম্বন্ধে ধুঁয়ার মত একটী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ গীত নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হয় না, তবে তাহাতে অনেকগুলি অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত বিষয় আছে বটে, তৎসমস্তই এস্থলে পরিত্যক্ত হইল, আবদুলমজিদ ও গওছআলীর অতিরঞ্জিত বিষয়গুলিও উল্লেখ করা গেল না। নেত্রকোণাথানার অধীন সাল্‌কিমাটিকাটাগ্রামে বাহাদুরখাঁর দীঘি, কেন্দুয়াথানার অধীন জালালপুরের নিকটবর্ত্তী অমাবস্যাবিলের পাড়ে "ছিমুর দীঘী" মদনপুর গ্রামে "মদনকোচের দীঘি" ইত্যাদি সুবৃহৎ ও শেওলাবিশিষ্ট দীর্ঘিকাগুলি ইহাদের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মদনকোচের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ মদনপুরে বর্ত্তমান আছে।

রোয়াইলবাড়ী।

জেলা ময়মনসিংহ কেন্দুয়াথানার এলাকাধীন রোয়াইলবাড়ী একটী ঐতিহাসিক স্থান। এখানে তিনচারিটী বৃহৎ দীর্ঘিকা ও স্ফটিকস্তম্ভের বাঁধাঘাট, দুর্গচিহ্ন, বিস্তৃত প্রাচীর, অর্দ্ধনির্ম্মিত শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের দালান, ও অসংখ্য শ্বেত, পীত, হরিত, কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি প্রস্তররাশি নিবিড় অরণ্যে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, সুবর্ণগ্রামের স্বাধীন শাসনকর্ত্তা দেওয়ান ঈশাখাঁ মসনদ্‌আলীর

প্রভৃতি পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়া, এই রোয়াইলবাড়ীতে সুরক্ষিত ও বিচিত্র প্রস্তরময় আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিবার উদ্যোগ করেন, কিন্তু অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। ১১৮৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত দেওয়ান মসজিদজ্জালালের বংশধর ফতেইয়ার খাঁ প্রভৃতি রোয়াইলবাড়ীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর দেওয়ানসাহেবদের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে; তাঁহাদের জমিদারী অন্যান্যের হস্তগত হইয়া যায়। আজিও নানাস্থানে এই বংশের দেওয়ানগণ অতিশয় দীনহীনভাবে বর্ত্তমান আছেন। রোয়াইলবাড়ীর চতুর্দ্দিক পরিখাবেষ্টিত। মধ্যস্থলে এবং পরিখার পাড়ে ৪৷৷০ ফিট্ হইতে ৫ ফিট্ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য, ২ ফিট্ হইতে ৩ ফিট্ পর্য্যন্ত প্রস্থ, ১ ফিট্ হইতে ১৷৷০ ফিট্ পর্য্যন্ত পুরু নানাবর্ণের হাজার হাজার প্রস্তররাশি পতিতাবস্থায় দেখা যায়, এবং স্থানে স্থানে অনেক স্ফটিকস্তম্ভও দৃষ্টিগোচর হয়। দীর্ঘিকার পূর্ব্বদিকের ঘাট প্রস্তরদ্বারা বাঁধান এবং আটটী স্ফটিকস্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। বাস্তবিক রোয়াইলবাড়ীর নিবিড় অরণ্যে মুল্যবান প্রস্তরের আড়ম্বর ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মৃত হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সুবৃহৎ প্রস্তরের তক্তা ও স্ফটিকস্তম্ভ দুষ্প্রাপ্য বলিতে হইবে। শুনা যায়, মস্‌জিদ্‌জ্জালাল একজন ঐশীশক্তিবলে বলীয়ান তাপস ছিলেন, দৈত্যদানব তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল, এবং তিনি তাহাদের দ্বারাই এই মূল্যবান প্রস্তরের আমদানী করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা মস্‌জিদ্‌জ্জালালের বাসনানুযায়ী তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ করিতে আসিয়াছিলেন, মস্‌জিদ্‌জ্জালাল কোন অনাচার করায় বিরক্ত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া যান, এবং কিশোরগঞ্জের পরামাণিকদের বাটী নির্ম্মাণ করেন। পরামাণিকদের বাটীর অবস্থা পরে বর্ণিত হইবে। এই রোয়াইলবাড়ীর ভীষণ অরণ্যে অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় একটী মস্‌জিদও আছে, ব্যাঘ্র ও সর্পাদির ভয়ে আমরা মস্‌জিদের সন্নিকটে যাইতে সাহস করি নাই। বোধ করি মস্‌জিদের দ্বারের প্রস্তরফলকে কিছু লেখা থাকিতেও পারে।

[ক্রমশঃ]

পাঞ্জাবের মুজ্‌হালব্রাহ্মণ।

বঙ্গের যশস্বিনী নন্দিনী শ্রীমতী সরলা দেবী আমাদের ঘরে আসিয়াছেন। এ ঘরের ইতিবৃত্ত শুনিবার আকাঙ্ক্ষা হয় ত অনেক বঙ্গবাসীই পোষণ করিয়া থাকেন। আজ তাঁহাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার মানসে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় পাঞ্জাবের মুজ্‌হালব্রাহ্মণ-গণের ইতিহাস কিছু বিবৃত করিব।

লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় একবার আমাদের—পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণের বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন :—

"কিছুদিন হইল ঝীলামনগরে পাঞ্জাবের উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ-সমূহের কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে গিয়াছিলাম। ঝীলাম * নদীর তীরে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরের মধ্যে একটী সুন্দর বৃহৎ পাণ্ডাল্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চারিদিকে সারি সারি তাঁবু ফেলা হইয়াছিল। পাণ্ডাল্‌টী পত্রপুষ্পদ্বারা পুরাতনধরণে সাজান হইয়াছিল। বৈকালবেলা ট্রেণ হইতে নামিয়া সোজা সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় কখনও আনন্দে স্ফীত হইল, এবং কখনও লজ্জায় ও ক্ষোভে আকুঞ্চিত হইল। আনন্দের কারণ এই যে, যে ব্রাহ্মণমণ্ডলী দেখিলাম, তাহা আমাদের দেশে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। একদিকে দলবদ্ধ জঙ্গী-বৃদ্ধেরা (Military Veterans) কাতার-দিয়া বসিয়া আছেন। ইঁহাদের বুকভরা মেডেল, কোমরে তলোয়ার, "চারা-দেওয়া" সাদা গোঁপ-দাড়ি। ইঁহারা সকলেই

ব্রাহ্মণ এবং সরকারবাহাদুরের সম্মানিত অফিসার। ইঁহাদের মধ্যে একজন বড়লাটের আর একজন জঙ্গীলাটের এ-ডি-কং। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন বিলাতের 'ডায়ামণ্ডজুবিলী' ও 'করোনেশন্' উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং মহাধূমধামের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মনে মনে দ্রোণাচার্য্যের যে ছবি কল্পনা করা যায়, ইঁহারা তাহারই প্রতিরূপ। অন্যদিকে সারি সারি ধপ্‌ধপে চোগা-চাপ্‌কান্‌-আগংরাখা-পাগ্‌ড়ি-পরা মহাকায় গৌরবর্ণ 'মুন্সী' (civilian) ব্রাহ্মণেরা বসিয়া আছেন। খুব কমই দেখিলাম, যিনি দৈর্ঘ্যে ছয় ফিটের কম, এবং যাঁহার চেহারা সম্পূর্ণ আর্য্যধরণের নয়। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বড়লোক ছিলেন, যাঁহারা বর্ম্মাজেলায় গুলি-চালনায়, ঘোড়দৌড়ে বড় বড় ইংরেজ অফিসারদের মাৎ করিয়াছেন। এই বিপুল ৩।৪ সহস্র ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে নির্জীব অবনতদেহ, নিস্তেজমুখ, ধুতিচাদর-পরিহিত, কই, একটীও ব্রাহ্মণ দেখিলাম না। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিত হয় ত পড়িয়া রাগ করিবেন; কিন্তু আমার এই বেশ, এই সজ্জা, এবং এইরূপ তেজশালী ব্রাহ্মণ দেখিয়া মহা আনন্দ হইল।

কিন্তু একটি লজ্জার কারণও ছিল। দেখিলাম ও শুনিলাম, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের শুদ্ধমাত্র "ব্রাহ্মণ" বলিতে লজ্জা বোধ করেন। ব্রাহ্মণশব্দের সহিত অন্য কোন সম্মানসূচক পদবী না লাগাইলে ক্ষুব্ধ হন; যেমন "মেহতা," "সর্দ্দার," "দেওয়ান," "চৌধুরী," "রায়" ইত্যাদি। আমি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিতেছি তখন ৩।৪ জন পক্ককেশ সুবাদার আমার নিকট আসিয়া কহিলেন—'বাবুজী, আমাদের "বাবু" বলিবেন আর সব বলিবেন, কিন্তু "মিশির" ও "পণ্ডিত" বলিবেন না।' ইহা শুনিয়া কোন ব্রাহ্মণসন্তানের

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত :—পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়। 'পঞ্চগৌড়'ব্রাহ্মণদের আবার ৫টী শাখা আছে :—(১) সারস্বত, (২) কান্যকুব্জ, (৩) গৌড়, (৪) মৈথিল ও (৫) উৎকল। পাঞ্জাবের মুজ্হাল বা মহীয়াল ব্রাহ্মণেরা সারস্বতশ্রেণীভুক্ত। মহীয়ালনামের উৎপত্তিসম্বন্ধে ৬।৭টি বিভিন্নরকমের ব্যাখ্যান প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে মহীয়ালেরা যে শত 'মুহ' বা বংশে বিভক্ত তাহা হইতেই তাঁহাদের নামের উৎপত্তি—ইহাই পঞ্জাব-গেজেটিয়রে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইঁহারা নিম্নলিখিত সাত বংশে বিভক্ত :—(১) দত্ত (২) ছিব্বার (৩) বালী (৪) মোহন (৫) বয়েদ (বৈদ্য) (৬) লৌ এবং (৭) ভীম্বাল। লৌ এবং ভীম্বাল সকলের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ। বাকী পাঁচেরও আবার সব্‌ডিভিজন্ আছে, যাহার মধ্যে প্রত্যেকের দুই দুই প্রধান—যাহাকে বাঙ্গলাভাষায় কুলীন ও শ্রোত্রিয় বলা যায়। যেমন কুলীন দত্ত এবং শ্রোত্রিয় দত্ত, কুলীন ছিব্বার ও শ্রোত্রিয় ছিব্বার ইত্যাদি। কুলীনেরা শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু দেন না। আজকাল ইংরেজী-শিক্ষা-প্রভাবে এই বাঁধাবাঁধি শিথিল হইয়া আসিতেছে।

এই সাতটী বংশ সাতজন ঋষি হইতে উৎপন্ন বলিয়া অভিহিত :—(১) ভরদ্বাজ (২) জামদগ্ন্য (৩) অত্রী (৪) কাশ্যপ (৫) গৌতম (৬) বশিষ্ঠ ও (৭) বিশ্বামিত্র। প্রত্যেক বংশের স্বনামখ্যাত পুরুষদের নাম :—

(১) দত্ত।—কুরু এবং পাণ্ডবকুলের অস্ত্রশিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য দত্তদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

(২) ছিব্বার।—বিষ্ণুর ৬ষ্ঠ অবতার পরশুরাম—যিনি একবিংশবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়শোণিতে ভারতবর্ষ

(৩) বালী।—রামায়ণরচয়িতা মহাকবি বল্মীকি বালীদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

(৪) মোহন।—কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠাতা কেশব, মোহনদের পূর্ব্বপুরুষ।

(৫) বৈদ্য।—ভেষজবিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা ধন্বন্তরি বৈদ্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

(৬) লৌ।—রাজা রামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ লৌদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

(৭) ভীম্বাল।—রাজা রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের অস্ত্রশিক্ষাগুরু বিশ্বামিত্র ভীম্বালদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

মুজ্‌হালব্রাহ্মণদিগের রীতিনীতি এবং ক্রিয়াকলাপাদি অনেকটা রাজপুতদিগের মত। রাজপুতদের ন্যায় তাঁহাদেরও "মোহিন্"* আছে, এবং তাঁহাদের অধীনে বংশাবলী-রচয়িতা ভাট আছে। মহীয়ালব্রাহ্মণেরা মাংস খান এবং তাঁহাদের সন্তানদের শিরমুণ্ডন-উৎসবের সময় ছাগবলি দেওয়া হয় ও ইহার রক্তদ্বারা শিশুর কপালে তিলক পরাইয়া দেওয়া হয়। শিশুকন্যাহত্যা এবং সতীদাহপ্রথা ইহাদের মধ্যে অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও বিশেষ প্রচলিত ছিল। রাজভক্তি, শরণাগতবাৎসল্য এবং বিশ্বস্ততা-প্রভৃতি গুণে তাঁহারা গুণান্বিত। প্রভুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাদের আত্মজীবন বিসর্জ্জন করার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা নিম্নলিখিত উপাধিগুলিতে খ্যাত:—সুলতান, মেহতা বক্সী, রায় চৌধুরী, মালেক এবং দেওয়ান। 'সুলতান' উপাধি মুসলমানরাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য উপাধি আজও প্রচলিত আছে। মধ্য ও পূর্ব্ব পঞ্জাবে—যেখানে ব্রাহ্মণের

* বরের পিতা ভাট এবং অন্যান্য কুলকবি (যাঁহারা বংশাবলী রচনা করেন) প্রভৃতিকে যে মূল্য বিতরণ করেন তাহাকে "মোহিন" বলে।

পূর্ব্বগৌরবের অস্পষ্ট ম্লান রেখা এখনও একটুমাত্র বাকী আছে, এবং ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া শিক্ষিতদের মধ্যে পূর্ব্বগৌরবগরিমা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে—সেখানে মুজ্‌হালব্রাহ্মণেরা নিজেদের নামের পূর্ব্বে "পণ্ডিত" লিখিতে লজ্জিত হন না। কিন্তু ঝীলাম, রাওলপিণ্ডী, হাজারা, কোহাট, পেশোয়ারাদি সীমান্ত অঞ্চলে, যেখানে সাধারণ ব্রাহ্মণ —যাঁহারা পৌরোহিত্য করেন ও অন্যান্য ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন বলিয়া নীচজাতির মধ্যে গণ্য, সেখানে মুজ্‌হালরা ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হইতে একেবারেই অস্বীকার করেন। এমন কি, শেষ আদমসুমারীর সময় উত্তরদেশীয় মুজ্‌হালরা 'রাজপুত'দিগের মধ্যে স্থান পাইবার জন্য যুঝাযুঝি করিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার তাঁহাদের আবদার গ্রাহ্য করিলেন না। এইজন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও সীমান্তপ্রদেশের মুজ্‌হাল ব্রাহ্মণেরা এখনও নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিতে বাধ্য।

সমস্ত পাঞ্জাবে মুজ্‌হালব্রাহ্মণের সংখ্যা ৫০-৬০ হাজারের মধ্যে। ভারতবর্ষের বাহিরে, কাবুল, কান্দাহার, আরব এবং তুরস্কপ্রভৃতি স্থানেও মুজ্‌হালব্রাহ্মণগণের বসতি আছে, এবং তাঁহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তিকাহিনী-সম্বন্ধে ভূরি ভূরি কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে।

মুজ্‌হালদিগের ভাটগণ "কঞ্জরুরের" (পণ্ডিত রামভজ দত্তের জন্মভূমি) দত্তদিগকে কোন আরবপ্রবাসী ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই পূর্ব্বপুরুষের কাহিনী অদ্ভুত রোমাঞ্চজনক। ভাটের ভাষায় আমরা নিম্নে তাহার কতক কতক উদ্ধৃত করিতেছি। মূল পাঞ্জাবী কবিতা হইতে বাঙ্গালী পাঠকগণ পাঞ্জাবী ভাষার কতকটা স্বাদ পাইবেন বলিয়া, প্রথমে মূল পরে তাহার অর্থ সন্নিবদ্ধ করিতেছি।

সিদ্ধ্‌ ঝুঙ্গা কি অন্‌শ্‌ হ্যাঁয় দত্ত্‌ নাম সুলতান্‌ ১৭

সিদ্ধ্‌ ভোগ মো বীর জী আরব কিও [illegible]

ভরদ্বাজ যো ঋষি জী তাঁকি ইয়ে সন্তান্ ৩।
শির দীনে নাম হুসেন্ কে আরব্ কিও আস্থান ৪।
সিদ্ধ্ দত্ত্ যো নন্দ্ জী সাহস্ স্বায় পর্মান্ ৫।
হর্ষরায় যো দত্ত্ জী রাখেঁ টেক্ যো ময়্দান্ ৬।
রাখেঁ টেক্ যো ময়দান্ সের জিয়োঁ শস্তরধারী ৭।
রামসিংহ্ বল্বান ফারী বর্ছী যো কাটারী ৮।
রায় পুন্ পুন্ আস্থে করেঁ দেশ যো ধীমান্ ৯।
ধারু পারু যো দত্ত্ হ্যায় আরব্ কিও আস্থান্ ১০।
চড়্হে আরব্ছে দত্ত্ বড়ে যোধ্হে বল্কারী ১১।
বাজে হ্যায় সুত্রী ভাড়্ আল্ ফৌজা কি সওয়ারী ১২।
বড়ী ধুম ঔর ধাম্ শেষ ছিপ্ গিও পাটারী ১৩।

দোহিরা।

সব কাফের যো লক্ষা দেশ বীচ্ সব্ ছিপ্ গিও ১৪।
চড়হেও দত্ত্ বাদ্সা জী লোগ্ দেখ্ আচর্য ভেও ১৫।
ছুটে দত্ত্ যো বীর সার্ দো টাক্ বাজাই ১৬।
সব শত্রুকো মার্ বীচ্ রণ্ ফিরি দোহাই ১৭।
সব কাফের গেও ভাগ্ যাওঁদে নজর না আওয়েঁ ১৮।
মদদ্ দি হুসেন্ কদম্ পিছে নাহিঁ পাওয়েঁ ১৯।
লড়িও দত্ত্ দল খেত জী তিন্ লোক শাখা পড়হিও ২০।
চড়হো দত্ত্ দল গাহ্ জী গড়্ কুফা চড়্হ্ লড়িও ২১।
বাজে ভীড়্ চোট ফতে ময়দান্ যো পাই ২২।
বদ্লা লিয়া হুসেন ধন্ ধন্ করে লোকাই ২৩।
রাহিব নে যো যদ্ নছল হুসেন বাচাই ২৪।
দীনে সাত ফরজন্দ্ ভাই কাবুল কামাই ২৫।

যো হুসেন কি বদ্ হ্যাঁয় দত্ত্ নাম সব ধীয়েও   ২৬।
আরব্ সহর্ কে বীচ্ মেঁ রাহিব্ তক্ত্ বঠায় ও   ২৭।
হরিয়া বন্দর বাগ্ মেঁ দেরা দিয়া উতার   ২৮।
বহু বহু কোহিলী মুরলী কা পর্‌বার্   ২৯।
মুরলীকা পার্‌বার্ সব্ হি শর্‌ণি আ পড়িও   ৩০।
দত্ত্ বন্‌শ্ অব্ তার শিস্ ছত্তর আন্ ধরিও   ৩১।
সিধানি মীর্ যো নাল হ্যায় ধাক্ক কি সন্তান্   ৩২।
মুর্‌লী গুরু তব ধরিও সেরখান্ দেওয়ান্   ৩৩।
হরিয়া বন্দর ছোড়িয়া তাঁ পাক্‌ড়া তলোয়ার   ৩৪।
আয়ে বারে ফির্ রুম্‌শাম্ বাজে নাগারা   ৩৫।
ফির্ গজ্‌নী লিয়া আয়েকে সঙ্গ্ বল্‌ক্ বুখারা   ৩৬।
কাম্বে কিনারে সিন্ধ্‌কে হয়বৎ কান্ধারা   ৩৭।
ফির্ আয়ে চড়হে হ্যাঁয় অটক থিঁ মুল্‌ক্ পঞ্জাব সিধারা   ৩৮।
আ বৈঠে সন্দাল বার দত্ত্ ব্রাহ্মণ সর্দ্দারা   ৩৯।
পির বিয়াহুঁ বোলিয়া এক্ বচন হামারা   ৪০।
শির্ শির্ বাজী লাওনা এ ধরম্ হামারা   ৪১।
পির চৌপাট্‌ চা বিছেয়া কিতা খেল খেলারা   ৪২।
খেলেঁ বাজী চার বার্ চাল্লে নাহিঁ চারা   ৪৩।
পির্ পহ্‌লি বাজী হারিয়া হোয়া লাচার   ৪৪।
যদ্ ত্রয় বাজীয়াঁ হরিয়া পাই গয়া হাঁকারা   ৪৫।
ত্রয়্ শির্ জিতে সাহস্ রায় পির্ সির্‌রে করতারা   ৪৬।
সাহস রায় সঙ্গ্ রায়মিও্ বয়ঠ্ কিও বিচারা   ৪৭।
শির না লৈয়ে পিরদা কারয়ে উপ্‌কারা   ৪৮।
তুর্‌থা সন্দ্ রাজ হ্যায় ইয়ে বাজু ভারা   ৪৯।

দোহিরা।

ভাই চারা রাখি পীর বিয়াহুঁ সঙ্গ্ ৫১।
শিব সুত বরহাম্ মালায়কে রাখ্ সাখী সুরয চান্দ ৫২।
বচন কিও শির দেব জিয়েঁা থির রাখিও পরবার ৫৩।
শির পর ছায়া মাইকল কিনো ধরম্ আকারা ৫৪।
বেদ্ পরমান্ বিখাণিয়ে নাম চৌহাঁ যুগাঁ গাঁউ ৫৫।
পাঁচো মিত্তর মানায়ে সদা তাঁকি গুণ গাঁউ ৫৬।
মিদ্ মাই ঔর রবি চান্দ্ পঞ্চমে পির বিয়াহুঁ ৫৭।
কিনে ধরম্ আচার থাল কাঞ্চন ভর পাঁউ ৫৮।
মিল্ সাত মুহি যশ্ মণ্ডল কিও চার্ বীর শর্ণি পড়হেঁ ৫৯।
জাগো সুমিত্তর জগত কালা দত্ত্ বন্শ্ কি রক্ষা করেঁ ৬০।
সাহুস্ রায় কি নন্দ্ জী মিধ্ নাম সদ্দার ৬১।
চন্দর কি উপমা সাজে সন্দাল লিয়া উতার ৬২।
সন্দাল লিয়া উতার পির সৈয়দ হ্যায় আলি ৬৩।
করেঁ শথাবৎ দেশ ধরম্ বক্‌সিসে আলি ৬৪।
মজ্‌লিস্ লায়ে দেওয়ান্ ছে কিতে কোল কড়ার ৬৫।
দত্ত্ বন্শ্ কি অন্শ্ পর কির্পা কর্ করতার ৬৬।
করি তিয়ারী মিণ্ডনে আয়ও সন্দাল বার্ ৬৭।
হর্ষ রায় ঔর সের খান্ আ লাবেঁ দরবার্ ৬৮।
আ লায়ও দরবার সবহি ফির লোক বোলায়ে ৬৯।
বড়ে খান সুলতান্ দূরছে তুড় কর্ আয়ে ৭০।
পুছেঁ লোক যো আয়েকে কোন্ বিলায়ত পির ৭১।
আরব্ সহর বদ্‌লা লিয়া হাসেন হুসেন ফকির ৭২।

অনুবাদ :—

পুরুষ সিদ্ধঝুজা এবং সিদ্ধভোগ আরবে বসতি করিয়াছিলেন, এবং হুসেনের জন্য শির দিয়াছিলেন। ১—৪ ॥

সাহস্‌ রায় সিদ্ধ দত্তের নন্দন। হর্ষরায় দত্ত শস্ত্রধারী সিংহের ন্যায় রণভূমির গৌরবরক্ষাকারী। বলবান রামসিংহ বর্ষা ও কাটারীধারী। পুণ্যাত্মা রায়পুন্‌ দেশের ধ্যানে রত, এবং ধারু এবং পারু দত্তও তখন আরবে বসতি করিয়াছিলেন। ৫—১০ ॥

বলবান বড় বড় যোদ্ধা দত্তেরা আরব হইতে কুচ্‌ করিলেন। ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে সুত্রী, ভীড় (ভেরী) প্রভৃতি বাজিতেছিল। ধূমধামের চোটে বাসুকীনাগ পলায়ন করিল। ১১—১৩ ॥

দোহা।

যত সব কাফের-(তাঁহাদের প্রিয় হুসেনের শত্রু)-সৈন্য সব দেশের ভিতর লুকাইল। দত্ত বাদসাকে চড়াও করিতে দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যখন দত্তেরা শত্রুকে আক্রমণ করিলেন, তখন শত্রুদলকে দুই ভাগে ছিন্ন করিবার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। তাঁহারা সব শত্রুকে মারিয়া রণক্ষেত্রে "দোহাই, দোহাই" ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিলেন। ভীরু কাপুরুষেরা পলাইয়া গেল। যাইবার সময় আর নজরে (দৃষ্টিপথে) পড়িল না। তাঁহারা হুসেনকে সর্ব্বথা সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং এক পাও পিছু হটেন নাই। ১৪—১৯ ॥

তখন যোদ্ধা দত্তদের যশঃ ত্রিভুবনে গীত হইয়াছিল। ২০ ॥

তারপর দত্তসৈন্য গড়কুফাদুর্গ আক্রমণ করিলেন, এবং তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা হুসেনের হত্যার প্রতিশোধ লইলেন, এবং লোকে তাঁহাদিগকে "ধন্য ধন্য" করিতে লাগিল। ২১—২৩ ॥

রাহিব (সিদ্ধ দত্ত) এই যুদ্ধে নিজের সাতটী পুত্রকে উৎসর্গ করিয়া

হুসেনের বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই হইতে যাঁহারা হুসেনের বংশধর তাঁহারা আজও দত্তদের প্রশংসা গান করেন। ২৪—২৬॥

তারপর রাহিব আরবসহরে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করিলেন, এবং "হরিয়া বন্দর"নামক বাগানে তাঁবু খাটাইলেন। ২৭—২৮॥

বস্থ বস্থ 'মুরলী কোহিলী'নামক ক্ষত্রবংশসম্ভূত। ইহারা সকলেই তখন তাঁহার শরণাপন্ন হইল, এবং দত্তবংশকে অবতার মনে করিয়া তাঁর শিরে রাজছত্র ধারণ করিল। ২৯—৩১॥

ধাক্কুর পুত্র সিধানি মির (মিরাশী বা ভাট) তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। (সেবনে) মুরলী বংশীয়েরা দত্তদের দেওয়ান সেরখাঁকে তাহাদের গুরুপদে বরণ করিয়াছিল। ৩২—৩৩॥

তার পর তাঁহারা হরিয়া বন্দর ছাড়িয়া আবার তলোয়ার ধারণ করিলেন, এবং নাগারা বাজাইয়া রুম্‌গামে (তুরস্কে) প্রবেশ করিলেন। ৩৪—৩৫॥

ফিরিবার সময়ে তাঁহারা বল্‌ক্ এবং বুখারার সহিত গজ্‌নী অধিকার করিলেন। তাঁহাদের ভয়ঙ্কারিতায় সিন্ধুদেশের কিনারা কম্পমান হইল, এবং কান্দাহার ভীত হইল। তার পর অটক হইয়া তাঁহারা পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং দত্তব্রাহ্মণদের সর্দ্দার সন্দালবারে (The sandal plains) আসিয়া পৌঁছিলেন। ৩৬—৩৯॥

এখানে পির বিয়াহুঁর (তখনকার একজন প্রসিদ্ধ ফকির) সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তখন সে বলিল "আমার একটী বচন শুন, শিরের পরিবর্ত্তে শির বাজী রাখা আমার ধর্ম্ম।" এই বলিয়া পির চৌপাট বিছাইয়া তার খেল্ খেলিতে আরম্ভ করিল। তখন চার বীর খেলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমশঃ চাল বন্ধ হইল। ৪০—৪৩॥

পির প্রথমেই বাজী হারিয়া লাচার বনিল এবং ক্রমান্বয়ে যখন তিন

সাহস্‌ রায় যখন তিনটী শির (পিরের নিজের, তার স্ত্রীর ও ছেলের) জিতিলেন, তখন পির ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিল। ৪৬ ॥

তখন সাহস্‌ রায় মিণ্ড্‌ রায়ের সঙ্গে বসিয়া বিচার (পরামর্শ) করিলেন :—"চল, শির না লইয়া এই পিরের উপকার করি। এখন তুরকীদের রাজ্য। ইহাকে ক্ষমা করিলে আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব থকিবে।" তার পর পিরের সঙ্গে ভাই-আচার (ভ্রাতৃভাব) করাই ঠিক করিলেন। ৪৭—৫০ ॥

দোহা।

শিব-সুত (গণেশ) এবং ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়া চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী রাখিয়া পির বিয়াহ্‌ঁর সঙ্গে ভাই-আচার করিলেন। ৫১—৫২ ॥

পির তখন বাক্যদান করিল "যখন তোমরা আমার শির রক্ষা করিয়াছ এবং আমার পরিবারকে স্থির রাখিয়াছ, তখন যেরূপ এই মাইকলবৃক্ষ * আমাদের শিরোপরি ছায়াদানে আমাদের রক্ষা করিতেছে, আমিও তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিব। ইহাই আমার অকাট্য ধর্ম্ম।" ৫৩—৫৪ ॥

বেদকে প্রমাণ মানিয়া আমি (কবি) চারিযুগে নাম গান করি। পঞ্চমিত্রের মানত করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের গুণ গান করি। ৫৫—৫৬ ॥

মিদ্‌ মাই, রবি, চন্দ্র এবং পঞ্চম পির বিয়াহ্‌ঁ, ইহাদের উপস্থিতিতে ধর্ম্মাচার হয়, এবং আমি একখান কাঞ্চন পাই। ৫৭—৫৮ ॥

সাত মুহি একত্র হইয়া এক যশঃসভা অহ্বান করিল এবং এই চার বীরের শরণাপন্ন হইল। ৫৯ ॥

---

* ঝাণ্ডবৃক্ষ। দত্তব্রাহ্মণদের মধ্যে আজও এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, মুণ্ডনসংস্কারের সময় তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িয়া ঝাণ্ডবৃক্ষের নীচে যান এবং তলোয়ার

হে জগজ্জ্যোতি সুমিত্রগণ! জাগো, দত্তবংশকে রক্ষা কর। ৬০ ॥

মিধনামক সর্দ্দার সাহুস্ রায়ের নন্দন। চন্দ্রের সঙ্গেই তাঁহার উপমা সাজে। তিনি যেন চন্দ্রের ন্যায় চন্দনক্ষেত্রে (The sandal plains) আতীর্ণ হইলেন। পির সৈয়দআলি সেখানে প্রধান ছিল। তিনি তাহাকে দেশ এবং ধর্ম্ম বক্‌শিস্ দিলেন। ৬১—৬৪ ॥

তাহারা সেখানে একটী মজলিস্ (সভা) আহ্বান করিয়া কড়ার করিল এবং দত্তবংশকে রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। ৬৫—৬৬ ॥

সব ঠিক-ঠাক করিয়া মিদ্ সন্দান-বার আসিলেন। হর্ষরায় ও সেরখাঁ তখন এক দরবার ডাকিলেন এবং চারিদিকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন। বড় বড় সুলতান এবং খাঁবাহাদুরেরা অনেক দূর হইতে আসিলেন। লোকে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করে "এই বীর কোথা হইতে আসিলেন?" (উত্তর) "ইনি ফকির হাসেন-হুসেনের হত্যার প্রতিশোধ লইয়া আরব হইতে আসিয়াছেন।" ৬৭—৭২ ॥

ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পর পানিয়ারের প্রথম যুদ্ধে রাজা মীনকে পরাস্ত করিয়া দত্ত-সুলতানেরা পাণিয়ার দখল করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, সম্রাট বাবরের রাজত্বকালে একজন পাঠান লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি খুব অত্যাচারী এবং হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। একদা তিনি মিল্‌কীরামনামক একজন ক্ষত্রিয়ের কন্যার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে লাভ করিবার আশয়ে একজন দূত প্রেরণ করেন। দূতমুখে বার্ত্তা শুনিয়া মিল্‌কীরাম অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং কিছুকাল মৌনভাবে থাকিয়া 'কাল সকালে ইহার উত্তর দিবেন' এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। এই উত্তর শুনিয়া দূত চলিয়া যাওয়ার পর মিল্‌কীরাম তাঁহার আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব

হইলেন, এবং শাসনকর্ত্তার আদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, এবং কিংকর্ত্তব্য কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ প্রস্তাব করিলেন 'চল আমরা এই কুমারীকে পানিয়ারে প্রেরণ করি। সেখানকার দত্ত-সুলতানেরা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় দিবেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন দিল্লীতে সম্রাটের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।' বৃদ্ধের এই পরামর্শ সকলেরই খুব মনোমত হইল, এবং তখনই তাহাকে পানিয়ারে পাঠান হইল।

পরদিন সকালে আবার শাসনকর্ত্তার লোক এক পরোয়ানা লইয়া উপস্থিত হইল। তখন মিল্‌কীরাম সেই পরোয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলেন,—'আপনি যে কন্যারত্নটীকে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে আমার নিজের কন্যা নয়, সে পানিয়ার হইতে আসিয়াছিল, আবার পানিয়ারে চলিয়া গিয়াছে।'

শাসনকর্ত্তা মিল্‌কীরামের এই উত্তর শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং দিল্লীতে সম্রাটের নিকট এক লম্বা-চওড়া পত্রে এই কন্যার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া এবং তাহাকে যে সম্রাটের জন্যই চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন এইরূপ জানাইয়া, এই প্রস্তাবে মিল্‌কীরাম যে উত্তর দিয়াছে তাহা বিস্তারিতভাবে জ্ঞাপন করিলেন। আরও লিখিয়া দিলেন যে, সেই কন্যাটী এখন পানিয়ারে আছে। তাঁহার দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত যে দত্ত-সুলতান আছেন তাঁর বাড়ীও পানিয়ারে। তাঁহাকে আদেশ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সেই কন্যাকে আনিয়া দিতে পারিবেন। সম্রাট এই ব্যাপার অবগত হইয়া দেওয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং কন্যাকে তাঁর সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। দেওয়ান উত্তর করিলেন, 'তিনি চিঠি লিখিয়া জানিবেন, সেই কন্যা পানিয়ারে আছে কি না।' তদনুসারে তিনি তাঁর আত্মীয়দের নিকট

সেই কন্যাকে আশ্রয় দিয়াছেন, এবং বিনাযুদ্ধে তাহাকে ম্লেচ্ছের করে সমর্পণ করিবেন না। দেওয়ান সম্রাটকে এই উত্তর জানান উপযুক্ত মনে করিলেন না। তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার আত্মীয়েরা সেই কন্যাটীকে অতিশয় যত্নসহকারে লালন-পালন করিয়াছেন এবং তাঁহারা তাহাকে এরূপভাবে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় এই যে, যদি সম্রাট্ তাহাকে সসম্মানে বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তাঁহারাও তাহাকে সম্প্রদান করিতে রাজী আছেন। সম্রাট ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং দেওয়ানকে তাঁর ইচ্ছা-মত অর্থ সঙ্গে লইয়া বিবাহের সব বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য পানি-যারে যাইতে আদেশ করিলেন।

দেওয়ান পানিয়ারে পৌঁছিয়াই নগর সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীর-পরিখা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদাদিতে দুর্গ পূর্ণ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, তাঁহারা প্রাণ দিয়াও সেই কন্যাকে রক্ষা করিবেন, এবং সেজন্য তাঁহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত।

তার পর দেওয়ান সম্রাটের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লিখিয়া দিলেন যে, তাঁহারা সেই কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারিবেন না, এবং হুজুর যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ লাহোরের শাসনকর্ত্তাকে সৈন্যসামন্ত লইয়া পানিয়ারের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করিলেন। এদিকে কেবল দত্ত-সুলতানেরা নহে অন্যান্য অনেক হিন্দুজাতিও যুদ্ধের অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তার পর এক ভীষণ যুদ্ধে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিজাম সম্পূর্ণরূপে

তিনি নিজে বহুসৈন্যসামন্ত লইয়া রওয়ানা হইলেন। পানিয়ারের নিকটস্থ কালাগৌরনামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন। এক মহাযুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধেও দত্ত-সুলতানেরা জয়ী হইলেন।

অবশেষে দত্ত-সুলতানদের একজন পাচকব্রাহ্মণ (কেহ কেহ বলেন পুরোহিত) সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইল, এবং প্রচুর পুরস্কারের আশায় লুব্ধ হইয়া দত্ত-সুলতানেরা কিরূপে সহজে পরাজিত হইতে পারিবেন, তার উপায় কহিয়া দিল। সে বলিল—"আজ দত্ত-সুলতানেরা একাদশীর উপবাস করিতেছে। কাল দুপুরবেলা যখন উপবাস ভঙ্গ করিবে তখন সকলেই অসজ্জিত থাকিবে। সেই সময় আমি এক সঙ্কেত করিব, তখন আপনাদের সৈন্য অগ্রসর হইলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে।" সম্রাট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণ খুব দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিল। দত্ত-সুলতানেরা সকলেই পরাজিত এবং নির্দ্দয়ভাবে হত হইলেন। তাঁহাদের নেতাকে জীবিতাবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সম্রাট তাঁহার শিরচ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দত্ত-সুলতান তাঁহার বংশীয়দিগের উদ্দেশে এই কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন:—(১) কোন দত্ত বা দত্তানী যেন পানিয়ারে জলগ্রহণ করে না।* (২) কোন দত্ত যেন বৃহস্পতিবার এবং দ্বাদশীতে কোন কাজ করে না। (৩) বৃহস্পতিবারে নির্জ্জলা একাদশী হইলে কোন দত্ত যেন উপবাস করে না।"

সেই মহাবীরের মৃত্যুর পর সম্রাট তাঁর সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে এবং সেই কন্যাকে পর্দ্দাঘেরাও করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

---

* বঙ্গীয় পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য জানাইতেছি যে, বঙ্গকুমারী শ্রীমতী সরলা দেবীকে তাঁহার শ্বশুরকুলের প্রায়-নির্ব্বংশক্ষেত্র পানিয়ারগ্রাম দেখাইয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন ঘটনাচক্রে কোন দিন অত্যন্ত পিপাসিতা অবস্থায় এই

কিন্তু তাহারা নগরের ভিতরে ভস্মের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সমস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে পতিপুত্রগণকে হত হইতে দেখিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জীবন্ত ভস্মীভূত হইয়াছেন। এই সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ঘটনাক্রমে এই ভীষণ যুদ্ধের সময়ে দত্ত-বংশের দুইটী নাবালকসন্তান কাশ্মীরের জম্মুপ্রদেশে সাম্বানগরে তাহাদের মাতুলালয়ে ছিল। তাহাতেই দত্ত-সুলতানবংশ রক্ষা হয়।

এই যুদ্ধের কিছুকাল পরে লাহোরের শাসনকর্ত্তা একপ্রকার কর্ণরোগে আক্রান্ত হন। অনেকরকম ঔষধ ব্যবহারেও কোন ফল লাভ হইল না। একদিন একজন দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিলেন যে, দত্ত-সুলতানদের নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়া এতগুলি ব্রাহ্মণহত্যার পাতকেই নিজাম এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সেই দত্ত-সুলতান-বংশের কোন লোক যদি তাঁহার শরীরে থু থু নিক্ষেপ করে তবেই তিনি আরোগ্য হইবেন। ইহা শুনিয়া নিজাম দত্তদের কেহ অবশিষ্ট আছে কিনা খোঁজ করিবার জন্য নানাদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। অবশেষে অনেক তল্লাসের পর সাম্বানগরে বালকদুইটীকে পাওয়া গেল। কিন্তু, যে নিজামের চক্রে দত্ত-সুলানদের এই দুর্দ্দশা তাঁহার নিকটই আবার এই শিশুদুইটীকে প্রেরণ করিতে তাহাদের অভিভাবকেরা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর নিজামের অনুচরগণ তাহাদের নিজেদের দুই পুত্রকে সেখানে জামিন রাখিয়া সেই দত্তবংশজ বালকদ্বয়কে লইয়া লাহোরে পৌঁছিল। কিন্তু নিজামের উপর থু থু নিক্ষেপ করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলে বালকেরা কিছুতেই রাজী হইল না, এবং থু থু নিক্ষেপ করিল না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া দৈবজ্ঞ বলিল যে, যখন তাহারা ঘুমাইয়া

লেই চলিবে। তদনুসারে তাহাদিগকে ঘুম পাড়ান হইল এবং ঘুমাইবার পর যখন তাহাদের মুখ হইতে লালা বাহির হইতে লাগিল তখন সেই লালা নিজামের কর্ণে লাগান হইলে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন।

সেই বালকদের একজনের নাম শাহ স্বরূপ এবং অন্তটীর নাম শাহ খোলাম ছিল। নিজাম তাহাদের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পণ্ডিতদের পরামর্শে তাহাদের দুইজনকে দুইটী ঘোড়া দিয়া বলিলেন যে, পাঞ্জাবপ্রদেশে তাহারা এই ঘোড়া ৮ প্রহর (২৪ ঘণ্টা) দৌড় করাইবে, এবং ইহাতে যে যে নগর তাহারা অতিক্রম করিবে, সেইগুলি তাহারা "মুয়াফী" দানস্বরূপ পাইবে। ইহাতে শাহ স্বরূপ গুরুদাসপুর জিলা, এবং শাহ খোলাম শিয়ালকোট জিলা, "মুয়াফী" দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় হইতেই গুরুদাসপুর জিলায় কঞ্জরুর এবং শিয়ালকোট জিলায় জাফরওয়াল, দত্তদের প্রধান বাসস্থান হইল, এবং আজ পর্য্যন্ত দত্তদের মধ্যে সেই রোগ আরোগ্য করিবার প্রথা বিদ্যমান আছে। কিন্তু এখন তিনবার থু থু নিক্ষেপ করার পরিবর্ত্তে তিনবার গোবরের ছাই ফেলার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। পণ্ডিত রামভজ দত্তের নিকট শুনিয়াছি—সনির্ব্বন্ধে অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের গ্রামের হিন্দুমুসলমান—সকল শ্রেণীর রোগাক্রান্ত লোকের উপরই তাঁহাকে বহুবার এইরূপ ভস্মের মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। বিশ্বাসের বলে রোগীরা অধিকাংশস্থলে আরোগ্যলাভও করিয়াছে।

কথিত আছে, মোহন-বংশীয়েরা সম্রাট মহম্মদশাহকর্ত্তৃক সবংশে নিহত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় কেবল একজন মাত্র পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। তিনিই বর্ত্তমান 'মোহন'দের পূর্ব্বপুরুষ।

ভিন্ন ভিন্ন মুজহালদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রীতি আছে।

বংশীয়েরা পানিয়ারের যুদ্ধের স্মরণার্থে বৃহস্পতিবারে কোন কাজ করেন না। ইঁহারা আবার তুলার চাষ করেন না। কারণ, ইঁহাদের একজন পিতৃপুরুষ তুলাক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিলেন। মহীয়ালেরা কখনও সাপ মারেন না। তাঁহারা—বিশেষতঃ দত্তেরা, বিবাহকালে সর্পপূজা করিয়া থাকেন। দত্ত এবং ছিব্বারেরা গলায় একরকম কাষ্ঠোপবীত ধারণ করেন, এবং সম্বৎসরে দুইবার পরিবর্ত্তন করেন। ইহার কোন কারণ জানা যায় নাই।

ঝীলাম-গেজেটিয়রের সঙ্কলনকর্ত্তা সাহেব অনুমান করেন যে, ভারতের ইতিহাসে যত ব্রাহ্মণ রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই মুজ্‌হালবংশজ ছিলেন। কারণ, অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তখন রাজত্ব করিতে পারিতেন না। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ইম্পিরিয়াল-গেজেটিয়ার অব্ ইণ্ডিয়া (সপ্তম খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা) হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা যায়।—"ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ক্ষমতা সংস্থাপন করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতি পুরাকাল হইতেই ইঁহাদের নেতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহারা আধ্যাত্মিক প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তবে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। পৌরোহিত্য বজায় রাখিতে অধিক মনোনিবেশ করিয়া তাঁহারা রাজকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা অন্যান্য জাতির গুরু ও রাজোপদেষ্টার পদে দৈবাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা রাজত্ব করিতে পারিতেন না।"

৬২৫ খৃঃ অঃ যখন প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হুয়েন্ সাং ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি সাক্ষ্য দেন যে, তখন কাশ্মীরে একজন ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। শালদত্ত (ব্রাহ্মণ) কানোজের রাজা ছিলেন। প্রয়াগ, উজ্জয়িনী প্রভৃতির রাজাও ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্ব্বোপরি

ইহাঁর রাজধানী প্রথমতঃ কাবুলে ছিল, এবং সেখান হইতে লাহোরে স্থানান্তরিত হয়।"

ভেরার (Bhera) রাজা দাহির এবং রাজা গুজ্জো ও কক্কু ছিব্বার-বংশসম্ভূত। ভেরাকে এখনও "ছিব্বারান্দি রাজধানী" অর্থাৎ ছিব্বার-দের রাজধানী বলে। ভদ্রাবতীনগরে মহম্মদ গজ্‌নবির সঙ্গে রাজা দাহিরের এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং সেই যুদ্ধে হাজার হাজার মুজ্‌হাল নিহত হন। এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজও আহম্মদাবাদের নিকট পর্য্যাপ্তপরিমাণে বিদ্যমান আছে।

মহীয়ালদত্তদিগের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও কম নহে। আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর গুরু কাশীর ৺ বিরজানন্দস্বামী স্বয়ং দত্ত ছিলেন। কঞ্জরুরের আর একজন দত্ত কাশীর ৺ ভাস্করানন্দ স্বামীর এতদূর সম্মানার্হ ছিলেন যে, যখন পণ্ডিত রামভজ দত্তের পিতা পণ্ডিত রাধাকিষণ দত্ত কাশীতে গমন করেন, ভাস্করানন্দস্বামী তাঁহাকে উক্ত দত্তের আত্মীয় বলিয়া বিশেষভাবে সৎকার করিয়াছিলেন। ৺ পণ্ডিত রাধাকিষণ দত্ত স্বয়ং একজন বৈদান্তিক জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'বেদান্ত-অনুব সিদ্ধান্ত' তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষ্য।

মুজ্‌হালদিগের দুইটী মুখপত্র আছে,—একটি ঝীলাম হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম—'মুজ্‌হাল গেজেট'। অপরটি লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়, নাম—'মুজ্‌হাল মিত্র'। এই প্রবন্ধের লেখক প্রথম পত্রিকাখানির সম্পাদক।

মেহতা শ্যামদাস ছিব্বর।

ঝীলম, পাঞ্জাব।

মহীশূর-ভ্রমণ।

কারখানাটি দেখা শেষ হইলে সেই বিশাল অধিত্যকার দৃশ্যাবলীর মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া দিগন্তবিস্তৃত জঙ্গল—বন্ধুর জনশূন্য সেই প্রান্তরের অদ্ভুত শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বাটী ফিরিলাম। শিলাময় প্রান্তরের সেই বিশাল নির্জ্জনতা যেন কতকটা আতঙ্কপ্রদ। সেই জনশূন্য অতি বিস্তৃত অনুর্ব্বর প্রান্তর ও তন্মধ্যবর্ত্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাস্তূপগুলি বাঙ্গালীর চক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য। শীঘ্রই আমরা সহরে প্রবেশ করিলাম। নূতন সহরের ছায়া সুশীতল বনবীথির মত রাস্তাগুলি বড়ই সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমরা বাড়ী পৌঁছিলাম। বন্ধুর সরল ও আন্তরিক আতিথেয়তায় দুই চারি দিনের মধ্যে বাড়ীটিকে যেন আমার অত্যন্ত পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই মহীশূর-পরিবারের মধ্যে বাসকালীন তাঁহাদের নিত্যাধিক ও দুঃসহ ভদ্রতায় আমাকে কোনরূপ কুণ্ঠিত হইতে দেখিলে অস্ফুট হাস্যবহুল ধিক্কারবাক্যে আমাকে বড়ই লজ্জা দিতেন। এই পরিশ্রমী বন্ধুটী তাঁর সরল ও অতীব ভদ্রজনোচিত রহস্যপূর্ণ আলাপে মনোবাকে সত্যসত্যই মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় নিত্যশ্বেত মঙ্গলালেপনলেপিত সেই গৃহদ্বার ও ধূপ-গন্ধিত আমার সেই ঘরটী আমাকে গৃহস্বামীর পরিবারস্থ কোন আত্মীয় মনে করিয়া যেন অত্যন্ত পরিচিতভাবে অভ্যর্থনা করিত।

কিছুদিন ব্যাঙ্গালোরে থাকিবার পর কাবেরীর প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত ও কোলারের সুবর্ণখনি দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইলাম। মিঃ সি প্রত্যহই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। মহীশূররাজ্যের অন্যান্য দর্শনীয় প্রদেশগুলি দেখিবার বাসনা প্রকাশ করায় তিনি ও বন্ধুবর

অতীব উৎসাহসহকারে উহার অনুমোদন করিলেন ও উভয়ে বরাবর আমার সঙ্গে যাইবেন, এই বাসনা প্রকাশ করিলেন। বিদেশভ্রমণে এই বন্ধুদ্বয়ের ন্যায় সঙ্গী পাইব শুনিয়া যার-পর-নাই সুখী হইলাম ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম। ব্যাঙ্গালোরে আরও কিছুদিন থাকিতে বন্ধুবর বিশেষ অনুরোধ করায় সেখানে আরও কিছুদিন থাকিতে হইল।

পরদিন মিঃ সি, তাঁহার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বন্ধুবরের সহিত পরদিন স্নানান্তে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বিধিমতে নিমন্ত্রণরক্ষা করা গেল। ভোজনান্তে গল্পগুজবে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। কথায় কথায় মিঃ সির নিকট শুনিলাম যে, বর্ত্তমান ষ্টেট্-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে নাকি একজন বাঙ্গালী আছেন। শুনিবামাত্র আমার স্বদেশী এই বাবুটীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিল। প্রবাসে স্বদেশিদর্শন-স্পৃহাটা যে কত তীব্র হয় তা বিদেশে না গেলে বোঝা যায় না। আমার উদ্যমশীল বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ এক ব্রুহাম ঠিকাগাড়ী আনাইয়া উক্ত ভদ্রলোকটীর বাড়ী আমাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শুনিলাম, ভদ্রলোকটী রাজসরকারে খুব বড় একটী চাকরী করেন। বাঙ্গালি-বর্জ্জিত দেশে এই বাঙ্গালী বাবুটীর সহিত আলাপ করিবার ও মাতৃভাষায় তাঁহার সহিত দুটো কথা কহিবার স্পৃহাটা এত বলবান হয়েছিল যে, অযাচিত হইয়া তাঁর বাড়ী যাওয়া উচিত কি না, এ প্রশ্নটী মনে একবার উদয়ই হইল না। ব্যাঙ্গালোরে আসা অবধি দিবারাত্রি শুধু ইংরাজিতে কথা কহিয়া যেন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। মিনিট কুড়িকের মধ্যে আমরা ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কোন চাকরবাকর বাহিরে নাই দেখিয়া বন্ধুবর গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁর বাড়ী

গোড়াতেই অমঙ্গল লক্ষণ। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী বাঙ্গালী যুবক বাহিরে আসিয়া বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি চান। কি যে চান, ঠিক সেটা সহজে বন্ধুবর বুঝাইতে না পারিয়া পকেট হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া সেই লোকটির হাতে দিলেন ও গৃহ-কর্ত্তার নাম করিয়া বলিলেন যে, তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। লোকটী ২।৩ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সন্দিগ্ধনেত্রে বন্ধুবরের ও আমাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অপনারা কিজন্য সাক্ষাৎ করিতে চান, খুলিয়া বলুন"। আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম; দেখিলাম, শ্রাদ্ধটা কিছু বেশী দূর গড়াইতে চলিল। স্বজাতি-দর্শন-লালসায় উত্তেজিত হয়ে যে একটু বাড়াবাড়ী করিয়া ফেলা হইয়াছে সেটা বেশ বুঝিতে পারিলাম। 'গায়ে পড়িয়া' আলাপ করিতে যাওয়া যে অতীব মূঢ়ের কার্য্য ও কোনরূপ দেশ-কাল বা পাত্রভেদে যে এই সনাতন আইনটীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, তা এই বাঙ্গালী যুবকের সন্দেহপূর্ণ প্রশ্নটী শুনিবামাত্র আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল। সে যাহাই হউক, উপস্থিত প্রহসনটী কিন্তু এতদূর গড়াইয়াছে যে, এখান হইতে ফেরা অসম্ভব; সুতরাং ভবিষ্যতে আমার এই স্বজাতি-দর্শন-লালসাটা সংযত করিব, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম ও কি অভিপ্রায় যে তাঁদের বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, সেটা লোকটীকে বুঝাইয়া দিলাম। বারাণ্ডায় আমাদের বসাইয়া লোকটী গৃহস্বামীকে ডাকিয়া আনিলেন। আমার মনে হয়, গৃহস্বামীটি ভাবিয়াছিলেন যে, কোন বন্ধুহীন বাঙ্গালী এই ব্যাঙ্গালোরসহরে আসিয়া-পড়িয়া আর কোন স্থানে সুবিধা করিতে না পারিয়া, তাঁর স্কন্ধে চাপিবার অভিপ্রায়েই তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এবং এই অনাহূত ও অনধিকারপ্রবেশোদ্যত স্বদেশী অতিথিটির

আপত্তি থাকাতেই আমার বোধ হয় তিনি দেখা দিতে এত নারাজ হইয়াছিলেন। শেষে যখন শুনিলেন যে, আমরা কোনরূপ গোলযোগ ঘটাইতে আসি নাই, শুধু তাঁর সঙ্গে ফাঁকা আলাপ কত্তে এসেছি, তখন তিনি দেখা দিলেন। দেখা দিলেন বটে, কিন্তু আমি যে শুধু তাঁর দর্শনাভিলাষেই এসেছি, এ কথাটা তাঁর মুখের ভাব দেখে বোধ হ'ল যেন তিনি বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছেন না। এতে কিন্তু তাঁর বিশেষ দোষও দিতে পারি না, কারণ, যে রকম কাল পড়েছে তাতে "শুধু তোমায় দেখ্‌তে আসি দেখা দিতে আসি না" গোছের নিস্বার্থ দর্শনাভিলাষটা আজকাল নায়কনায়িকারাই বিশ্বাস করে না, তা তাঁর আর কি দোষ দিব। মনে মনে কিন্তু বড়ই অপ্রতিভ হইলাম। এই স্বদেশী ভদ্রলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পূর্ব্বে যে পরিমাণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল, এখান হইতে কোনওরকমে প্রস্থান করিবার জন্য এখন তার শতগুণ আগ্রহ জন্মিল। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! শেষে দুইচারিটি প্রচলিত শিষ্টাচারসূচক কথাবার্ত্তার পর বিদায় গ্রহণ করিলাম,—বাবুটিও বলিলেন "তথাস্তু"। আমিও "দুর্গাদুর্গা" বলিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বলা বাহুল্য, বাবুটী আমার এই ভিজিটটি এখনও পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দেন নাই, এবং আমি সেজন্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ হই নাই।

পরদিন আমরা কোলারে সোণার খনি দেখ্‌তে গেলুম্। ব্যাঙ্গালোরসহর থেকে ঐ খনিগুলো বেশী দূর নহে। সকালে গিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, দেখিয়া, আবার সন্ধ্যা ৮ টার মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসা যায়। আমরা ভোর ৬টার সময় ব্যাঙ্গালোর হইতে যাত্রা করিয়া মাদ্রাজ রেলওয়ে দিয়া প্রায় ৯টার সময় Bowring pet Junctionএ পৌঁছিলাম। এই ৪০ মাইল

নাকি বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ এই অধিত্যকার উপরে লাইনগুলি সর্ব্বস্থানে সমতল নহে। এইখানে গাড়ী বদলাইয়া আমরা কোলার গোল্ড ফিল্ডের মধ্য দিয়া বেলা ১০টার মধ্যে উরগাম্ খনিতে পৌঁছিলাম। মিঃ সি, মহীশূরগবর্মেণ্টের জিওলজিক্যাল্ ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তার নিকট হইতে খনির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আমাদের পরিচিত হইবার জন্য একখানা পত্র আনিয়াছিলেন। আমরা ষ্টেশন হইতে বরাবর সাহেবটির বাংলাতে উপস্থিত হইলাম। সাহেবটিও আমাদের আগমনসম্বন্ধে জিওলজিক্যাল্ ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তাটির নিকট হইতে পূর্ব্বে একখানা পত্র পাইয়াছিলেন। পৌঁছিবামাত্র কুঞ্চিতভ্রূ হইয়া আমাদের সুপ্রভাত ইচ্ছা করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কোন্ খনিটা দেখিতে ইচ্ছা করি। কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি-কর্ত্তৃক পরিচালিত ১২।১৩টি খনি আছে। যে-কোন একটি খনি দেখিবার অনুমতিপত্র পাইলেই আমাদের যথেষ্ট হইবে, ইহা জ্ঞাপন করাতে, তিনি নিকটস্থ একটি খনির কারখানার ফোর্‌ম্যান্‌কে একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন ও আমাদের সঙ্গে একজন লোক দিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এই পত্র পাইবামাত্র ফোর্‌ম্যান্‌সাহেব খনিটির ওয়ার্কশপ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই মাইনিং অপারেশন্‌টি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, ও কর্ম্মবীর ইংরাজের শত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইংলণ্ডের বড় বড় ধনীরাই, শুনিলাম, এই খনিগুলির অধিকারী; মহীশূরগবর্মেণ্টের যৎসামান্য কিছু অংশ আছে। এই সোণা বাহির করিয়া যা-কিছু লাভ হয়, সমস্তই অংশীদারদের প্রাপ্য তবে যতটা সোণা বাহির হয় তার উপরে একটি নির্দ্দিষ্ট সামান্য হারে মহীশূর সেই রয়াল্টি পান। মহীশূররাষ্ট্রের রয়ালটির হারটি এক

সামান্ত শুনিয়া, পূর্ব্বে প্রায়ই আমার মনে হইত যে, সাগরপার হইতে কতকগুলা শ্যালীপুত্র ইংরাজ আসিয়া এই অসহায় মহীশূরজাতির রাজ্যস্থিত সোণার খনিগুলি জবরদস্তি করিয়া হস্তগত করিয়াছে। মাইনিং অপারেশনের ব্যাপারটি দেখিয়া কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সাগরপার হইতে এই শ্যালীপুত্রেরা আসিয়া এই কাজে হস্তক্ষেপ না করিলে, যেখানকার সোণা সেইখানেই থাকিত, এবং কোলারের Synite পাহাড়ের উপর ফসল বোনাইয়া মহীশূর গবর্মেণ্টের যৎকিঞ্চিৎ খাজনা আদায় দ্বারা আর কিছু হইত কিনা সন্দেহ। ট্রেনে আসিতে আসিতে দেখিলাম, অনেকগুলি মাইনিং সংক্রান্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা সব বন্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, সে সব কারখানা এখন উঠিয়া গিয়াছে। কারণ, সেখানে আর সোণা পাওয়া যাইতেছে না। দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সোণার খনি হইলেও এই মাইনিং ব্যাপারে টাকা speculate করা বড় সাধারণ সাহসের কাজ নয়। সেই জনমানবশূন্য অধিত্যকাটি, এই সব খনি ও তৎসংক্রান্ত কারখানাদির কল্যাণে, দেখিলাম, একটি প্রকাণ্ড সহরের আকার ধারণ করিয়াছে। অসংখ্য কুলিসেড্, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মিস্ত্রীখানা, চারিদিকে রেলের লাইন্—সাহেবকর্ম্মচারীদের থাকিবার বাংলা—মায় রেস্ কোর্স এবং ক্রিকেট্ ও গল্ফ খেলিবার মাঠ। কারখানার কাজ এখন সমস্তই তাড়িৎশক্তিতে চলিতেছে। পূর্ব্বে সব ষ্টীম্-এঞ্জিনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কাবেরীর জলপ্রপাতে বিখ্যাত ইলেক্‌ট্রিক্ ওয়ার্কস্ স্থাপিত হইবার পর কোলারের সমস্ত কারখানাতেই তাড়িৎশক্তির ব্যবস্থা হইয়াছে।

কোলার জেলার পাহাড়গুলা অধিকাংশই Synite জাতীয় এবং তন্মধ্যে claystateএর একটি range আছে। এই পাথরের

সোণা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। যে সমস্ত স্তরে এইরকম দাগ দেখা যায় ও পরীক্ষা করিয়া কার্য্যোপযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়, সেই সমস্ত স্তরে সুড়ঙ্গ করিয়া গিয়া পাথর কাটিয়া আনা হয়। সেই পাথর উপরে আনিয়া চূর্ণ করা হয় ও পরে অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা অশোধিত অবস্থায় সোণাটাকে পাওয়া যায়। শুনিলাম, এই অবস্থায় উহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয় ও সেখানে শোধিত হইয়া বিক্রয়োপযুক্ত হয়। যাহা হউক, যত সোজা কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কার্য্যটি দেখিলে কিন্তু এত সহজ বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের সমস্ত দেখা শেষ হইলে, আমরা নীচে সুড়ঙ্গের ভিতর যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সাহেবটি কিন্তু মহা আপত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। আপত্তির কারণটা শুনে আমারও সুড়ঙ্গে নামিবার উৎসাহটা একটু কমিয়া আসিল। শুনিলাম, সম্প্রতি সুড়ঙ্গপথে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া একটি লোক মারা গিয়াছে এবং সুড়ঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটা খুবই সম্ভব বলে' বিশেষ অনুমতিপত্র না থাকিলে, এখন কোন দর্শককে নীচে যাইতে দেওয়া হয় না। আমার বন্ধুদ্বয় কিন্তু নাছোড়বন্দা হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বড়সাহেবের নিকট হইতে সুড়ঙ্গে নামিবার এক বিশেষ অনুমতিপত্র আনিয়া হাজির করিলেন। সাহেব তখন অনন্যোপায় হইয়া আমাদিগকে সুড়ঙ্গে নামাইবার খাঁচার দিকে লইয়া চলিলেন। উপর হইতে বরাবর নীচের সুড়ঙ্গমুখ পর্য্যন্ত একটি খাড়া (vertical) গর্ত্ত আছে। শুনিলাম, সুড়ঙ্গমুখে যাইতে হইলে লৌহনির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব খাঁচা চড়িয়া এই গর্ত্তের ভিতর দিয়া নামিতে হইবে। খাঁচাটি দেখিলাম দ্বিতল ও চতুষ্কোণ। প্রত্যেক তলে চারিজন কি পাঁচজন লোক কোনরকমে ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া দাঁড়াইতে পারে। একটি তার দিয়া উহা ঝুলান। লোক

দেওয়া হয়। শুনিলাম, নীচে নামিবার সময় গর্ত্তপথের চতুর্দ্দিক হইতে ভূগর্ভস্থ জল টোপাইয়া টোপাইয়া খাঁচাটিকে ও তন্মধ্যস্থ প্রাণিগণকে আর্দ্র করিয়া থাকে। ম্যাকিণ্টস্ বা ঐ জাতীয় কোনরকম ওভারকোট্ সঙ্গে না থাকায় কথাটা শুনে একেবারে দমিয়া গেলাম। অসাধারণ উদ্যমশীল বন্দুদ্বয় কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন। আপত্তিটা তাঁরা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যা' হোক অনেক জল্পনার পর—শেষে 'কোট্,' 'ওয়েষ্টকোট্' ও 'সার্ট্' ইত্যাদি সব খুলিয়া কেবলমাত্র একটী 'ভেষ্ট্' গায়ে রাখিয়া খাঁচায় ঢোকাই সাব্যস্ত করা গেল। সাহেবটি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কতদূর নীচে নামিতে ইচ্ছা করি। প্রশ্নটির অর্থ প্রথমে ভাল বুঝিতে পারিলাম না, শেষে শুনিলাম যে, এই খনিটির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ৪টি কি ৫টি সুড়ঙ্গ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতমস্তরের সুড়ঙ্গমুখে যাইতে হইলে, শুনিলাম, প্রায় ২৫০০ ফুট নামিতে হইবে। প্রথম স্তরের ষ্টেশনটি ৭০০ কি ৮০০ ফুটমাত্র নীচে। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্" মনে করিয়া আমি প্রথম ষ্টেশনটিতে যাইবার মত প্রকাশ করিলাম। বন্ধুদ্বয়ের কিন্তু সব কাজেই বাড়াবাড়ি—"সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্" মতটা তাঁদের কার্য্যের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না। তাঁদের সব কাজেই "অধিকন্তু ন দোষায়ঃ"—একেবারে সেই ২৫০০ ফুট নীচে সর্ব্বশেষষ্টেশনে নামিবার জন্য তাঁরা জিদ্ করিতে লাগিলেন ও অনেক তর্ক ও বচসা করিয়া শেষে নিজেদের জিদটাই বজায় রাখিলেন।

আমাদিগকে সুড়ঙ্গপথে লইয়া যাইবার জন্য একজন মহীশূর দেশীয় গাইড্ নির্ব্বাচিত হইল। শুনিলাম, গাইড্ সঙ্গে না থাকিলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা, কারণ সুড়ঙ্গের যেদিকে উপস্থিত খনন-কার্য্য চলিতেছে, সেদিকে না গিয়া সেই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথে পথহারা

দূষিত বায়ু বা বায়ুর অভাবে সদ্য "কৃষ্ণপ্রাপ্তির" সম্ভাবনা। যেদিকে খননকার্য্য চলিতেছে সেখানে উপর হইতে বরাবর পাইপের ভিতর দিয়া compressed বায়ু পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং উহা দ্বারাই শুনিলাম সুড়ঙ্গের সেই অংশে উপযুক্ত বায়ু সরবরাহ করা হয়। তা ছাড়া নীচে পাহাড় কাটিবার যন্ত্রও এই compressed বায়ু দ্বারা চালিত হয়। যাহা হোক, আমারা সেই চতুষ্কোণ খাঁচাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বস্তাঠাসা মালের মত ঘেঁসাঘেসি হইয়া দাঁড়াইলাম। খাঁচার দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে বিশেষরূপে আঁটিয়া দেওয়া হইল, কারণ গর্ত্তের ভিতর নামিবার সময় কোনরকমে দরজা খুলিয়া গেলে পার্শ্ববর্ত্তী পাথরে ঠেকিয়া উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া একটী বিষম দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব। 'Don't be afraid' বলিয়া আশ্বাস দিয়া সাহেবটী খাঁচা নামাইবার সিগ্ন্যাল্ দিলেন। হু হু করিয়া খাঁচাটী আমাদের লইয়া সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া শূন্যপথে ঝুলিতে ঝুলিতে রসাতলপুরে যাত্রা করিল। গর্ত্তপথের নিস্তব্ধতা অতীব ভীষণ। সেই অন্ধকারময় পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় হইতে টপ্ টপ্ করিয়া খাঁচার উপর জল পড়িতে লাগিল। জলের সেই অস্ফুটশব্দ গর্ত্তপথের নিস্তব্ধতাটাকে যেন শতগুণ বাড়াইয়া তুলিল। সত্যকথা বলিতে কি, আমার গাটা যেন একটু ছম্ ছম্ করে' উঠ্ল, বোধ হইতে লাগিল যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট প্রেতলোকে যাত্রা করিয়াছি। খাঁচার ভিতর আমরা মধ্যে মধ্যে দিয়াশালাই জ্বালিতে লাগিলাম, দিয়াশালায়ের ক্ষীণালোকে পার্শ্বস্থ স্যাঁৎসেঁতে পাথরগুলি খাঁচার ছিদ্র মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে বেশ দেখা যাইতেছিল। এক, দুই, তিন করিয়া সব ষ্টেশনগুলি পার হইয়া আমরা নিম্নতম সুড়ঙ্গমুখে পৌছিলাম। বাতিহাতে ধুলামাখা কতকগুলো কুলি আসিয়া খাঁচার কাছে উপস্থিত হইল। অন্ধকারময়

লাগিল। বাহির হইতে খাঁচার দরজা খোলা হইলে আমরা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। প্রত্যেকে একএকটি বাতি জ্বালিয়া সাবধান পদবিক্ষেপে সেই সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়া গাইডটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সুড়ঙ্গটী ৯ ফুট কি ১০ ফুট চওড়া এবং ৭।৮ ফুটের অধিক উঁচু হইবে না। বাতির আলোতে আমরা পাথরের গায়ে সোণার হল্‌দে হল্‌দে শিরার দাগগুলি দেখিতে পাইলাম। সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গে দেখিলাম ছোট একটী রেলের লাইন পাতা রহিয়াছে। ছোট ছোট মালগাড়ীতে পাথর বোঝাই করিয়া সুড়ঙ্গমুখে আনা হয় এবং সেখান হতে গর্ত্তপথ দিয়া উপরে টানিয়া তোলা হয়। আমরা সুড়ঙ্গপথ দিয়া ক্রমে অনেক দূর গিয়া যেখানে পাথর কাটা চলিতেছে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত দেখা শেষ হইলে আমরা পুনরায় খাঁচায় চড়িয়া উপরে সূর্য্যালোকে আসিয়া বাঁচিলাম। ব্যাঙ্গালোরে ফিরিবার ট্রেনের আর বেশী সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি আমরা ষ্টেশনে আসিলাম। রাত্র ৮টার মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীযতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

শিরীফরীদ।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যানের বহির্দ্দেশ।

বৃদ্ধ কৃষক ও প্রহরিগণ।

কৃষক। আমি ঠিক্ দেখেছি।

১ম প্র। থাম্ পাগল।

কৃষক। পাগল আমি না তোরা। এখনও বল্‌ছি, শীগ্‌গির যা পাহাড়ে ওঠ্। রাণীকে আমাদের রক্ষা কর্।

১ম প্র। তবু দেখ চেঁচাতে লাগ্‌লো।

কৃষক। অবিশ্বাস্ করছিস্, না বেইমানী করছিস্। যা বেইমান্, এখনও যা—নিজেরা না পারিস্, উজীরকে খবর দে, রাণীকে রক্ষা কর্। বিলম্ব কর্‌লে রাণী বাঁচবে না।

১ম প্র। দেখ্ বাড়াবাড়ি করিস্ ত, মেরে হাড়ভেঙ্গে দেবো।

কৃষক। তুই হাড় ভাঙতে চাস্, পরে ভাঙ্গিস্। আগে আমার কথা রক্ষা কর্। রাণীকে বাঁচা। সে নিষ্ঠুর ডাকাত যদি সেই পাহাড়ের ওপর থেকে রাণীকে ফেলে দেয়, তা হ'লে সে সোণার অঙ্গ ছাতু হয়ে যাবে।

১ম প্র। না এ বেটা বুড়োকে মার্ না দিলে আর নড়বে না দেখ্‌ছি।

২য় প্র। এক্‌শোবারই যখন বল্‌ছে, তখন এক্‌বার দেখেই আয় না ভাই।

১ম প্র। তুইও কি ক্ষেপ্‌লি নাকি! এই আমি রাণীমাকে বাগানে

কৃষক। কখনই নয়—তোর চোখ্ গেছে। তোর মগজ গেছে, তোর ইমান্ গেছে।

১ম প্র। তবেরে পাজী নচ্ছার্—

(শিরীর প্রবেশ।)

শিরী। কি কর—কিসের গোলমাল?

১ম প্র। তবেরে শালা বুড়ো, পাগ্‌লামী কর্‌বার আর জায়গা পাওনি।

সকলে। মার্ শালাকে, ধর্ শালাকে।

শিরী। হাঁ হাঁ! করিস্ কি! বৃদ্ধকে প্রহার কর্‌তে উদ্যত হয়েছিস্ কেন?

কৃষক। না, না ভাই, তোরা বাঁধ্, মার্, কাট্, টুক্‌রো-টুক্‌রো কর্।

শিরী। কেন বৃদ্ধ, এ বৈরাগ্য কেন?

কৃষক। যে রাজ্যের রাণী ভেল্‌কিওয়ালী, সে রাজ্যে থাকার চেয়ে মরা ভাল।

শিরী। ছেড়েদে, ছেড়েদে—ছেড়ে দিয়ে তোরা চলে যা।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

আমায় তুমি কোথায় দেখ্‌ছ বৃদ্ধ?

কৃষক। কোথায় দেখেছি! সবত জান মা তুমি!
কেমনে আসিলে রাণী? সে বৃদ্ধ দস্যুর
হস্তে নির্দ্দয় প্রহার, কেমনে সহিলে
রাণী? কোন্ যাদুবলে প্রাণ বাঁচাইলে?
কেমনে এ কোমলাঙ্গ রাক্ষসের মুখ
হ'তে অটুট্ ফিরালে! পর্ব্বতশিখরে
কেন উঠেছিলে?

শিরী। তুমি কোথা ছিলে ?

কৃষক। আমি

পর্ব্বতের অন্ত প্রান্তে শিখরের পাশে
চরাইতেছিনু মেষপাল। দেখিনু মা,
দস্যুহস্তে বিপন্না তোমারে। কোথা যাব,
কি করিব, কেমনে আসিব উপকারে—
ভাবিয়া অস্থির মাগো, এখানে সংবাদ
দিতে এসেছি ছুটিয়া। সে বৃদ্ধ দস্যুর
কাছে কি তোমার ছিল প্রয়োজন ? কেবা
সে ফরীদ ? কোথায় রেখেছ তারে ? রাণী
তুমি দুনিয়ার—তুচ্ছ ভিখারীর ধনে
এত কি তোমার প্রয়োজন ? ছেড়ে দাও—
ফেলে দাও। দস্যুহস্তে যাবে কি জীবন !
মমতারে আজীবন করে যে পীড়ন,
সর্ব্বাঙ্গ নির্ম্মম যে মা তার। তার কাছে
মমতার লোভে গর্ব্ব ফেলে ছুটেছিলি
তাতারের রাণী ! দেখে লজ্জা, ভেবে লজ্জা—
কহিতে যাতনা মর্ম্মে—আসামী, সে কিনা
কাজীর বিচার করে !

শিরী। জাননা স্থবির
আমি তার অতি প্রিয়ধন।

কৃষক। প্রিয়ধন !
রসশূন্য বৃদ্ধ, তুমি তার প্রিয়ধন !
মমতাবিহীন যেবা, আদরে মমতা

দিবে, তবু, একবিন্দু আদর-সুধায়
তৃষিতের বাসনায় তৃপ্ত না করিবে।
যেইজন আজীবন অভ্যস্ত হিংসায়
সর্ব্বাঙ্গ অজ্ঞাতে তার, স্বপনে তাহার,
রত থাকে পরের পীড়নে। তুমি তার
প্রিয়ধন! প্রিয়ধন তুমি মানুষের,
প্রিয়ধন—চক্ষু আছে যার। প্রিয়ধন—
যে জানে কি ধন তুমি এসেছো ধরায়।
শার্দ্দুলে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান! এ কোমল কায়া
শুধুই সুন্দর যে মা তার রসনায়!
হও প্রিয়ধন, তবু তার কাছে আর
যেয়োনা জননী। এ অঙ্গে যে নরাধম
প্রহার করিতে পারে, তাতার-ঈশ্বরী—
যেয়োনা যেয়োনা তার কাছে। কেবা
সে ফরীদ? কোথা সে ফরীদ? শত শত
দাস-দাসী তোর সেবা করে, শত শত
রাজপুত্র পড়ে' তোর দ্বারে—তবু তুচ্ছ
ফরীদের লোভ! চরণে মিনতি তোর
ছেড়েদে মা নরাধম বৃদ্ধের ফরীদে।

শিরী। সাবধান! গুরুনিন্দা কর'না আমার।

কৃষক। একি কহ রাণী! সে তোমার গুরু!

শিরী। প্রেম-
শিক্ষা-অভিলাষে, তার পদপ্রান্তে বসে',—
শুন হে স্থবির,—ফরীদের সনে আমি
দীর্ঘযুগ করেছি যাপন। পাঠশালে

প্রেমের সে প্রথম অঙ্কুর, ঝলসিয়া
চক্ষু মোর, ফেলে দেছে এ ক্ষুদ্র তাতারে।
নীরস তাতার-বক্ষে, প্রেমের আভাস-
স্মৃতি—শুধু, জাগায়ে দুর্জ্জয় অভিমান,
আমারে করেছে অভাগিনী। প্রেমরাজ্যে
একক সম্রাট, কোন্ প্রেমতটিনীর
কূলে, এবিশ্বের প্রলোভন ভুলে, আছে
বসে' আপনার হৃদয় লইয়া। আছে
বসে' আমারে ভুলিয়া! অসহ্য যাতনা—
শীঘ্র বল, কোথা বৃদ্ধে করেছ দর্শন!

কৃষক। এইত বলিনু রাণী!

শিরী। ক্ষম হে স্থবির!
বিস্মৃতির রাজ্য হ'তে ফিরিয়া আসিতে,
আপনার ঘরে যেতে পথ ভুলে গেছি।
সাবধান! আর কেহ নাহি যেন শুনে।
এখন হইতে তুমি এ রহস্যকথা
সাবধানে আপনারে করহ গোপন।

কৃষক। যথা আজ্ঞা তাতার-ঈশ্বরী!

শিরী। ধনাধ্যক্ষে
আদেশিব, লক্ষমুদ্রা পাবে পুরস্কার।

[কৃষকের প্রস্থান।

আর স্থৈর্য্য রহেনা আমার। ফণিগ্রাস
মত, প্রথমে স্বপনে ধ'রে, ধীরে ধীরে
চিন্তা-দন্ত পরশিল জাগ্রতজীবনে!

কাটিল জ্ঞানের গ্রন্থি, ছিঁড়িল হৃদয়
আর বুঝি বাঁচিনাকো ! ফরীদ ! ফরীদ !
পণ, পণ—নিদারুণ পণ—অসম্ভব
তাহার পূরণ। দরিদ্র ফরীদ ! শুধু
স্বপ্নরাজ্যেশ্বর—একবস্ত্রপরিহিত
নিত্যপরমুখপ্রেক্ষী ভিখারী ফরীদ !
কামনা কি পূরেনাকো—সখা ! তারকা কি
ঝরে নাকো, বর্ষে নাকি আকাশকুসুম
তোমার দারিদ্র্যপিষ্ট বিশীর্ণ কম্পিত
বাহু হ'তে ? কোথা যাই, কাহারে সুধাই—
কার কাছে বাসনা মিটাই ! কে দেখাবে,
কে বলিবে কোথা আছে ফরীদ আমার !
কণ্টকিত গুপ্তপথ, একমাত্র তুমি
জান গুরু ! ফরীদ পথিক সেই পথে।
আমিও সে পথে যাব। পথে বাধা, শত
বাধা, তবু যাব ফিরাব না গতি—পাছু
ফিরি আর না চাহিব। কারে ভয়, কেন
ভয় ! নাহি কি এ রাজ্যে রাণী ? শুধু রাণী
নাম ? শুধু রাশীকৃত উচ্চ অভিলাষ
অস্থির চিন্তার স্রোত সম্পত্তি আমার ?
কার্য্যতঃ বন্দিনীমত প্রতি পদক্ষেপে
হতাশা-প্রাচীরে গতি ব্যাহত হইবে ?
কখন না, ঐশ্বর্য্যে রব না বন্দী আর।
হে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ! দয়া করে'
ফরীদ-কুসুম-শির স্বপ্নের হিল্লোল

দেখায়েছো যদ্যপি আমায়, সন্তরিয়া
ধরি যাহে বেণীতে বাঁধিতে পারি, সেই
শক্তি দাও। লও—রাণীর ঐশ্বর্য্য সঙ্গে
দেছ যে দারুণ অভিমান, তুলে লও।
তোমারে স্মরিয়া, এই চলিলাম প্রভু
দরিদ্রের পদলিপ্ত ধূলির কণায়
পারস্যের সম্রাটের গর্ব্ব অন্বেষণে।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণভেরী বাজিয়াছে। রাণীর মর্য্যাদা রাখিবার জন্য রস্তমের আদেশে তাতারী বীরগণ রণোল্লাসে মাতিয়াছে। আপনার সৌধ-সম্মুখস্থ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া রস্তম আমিনার অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমিনা বায়না ধরিয়াছিল, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাইবে। রস্তম তাহার আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, রাণীর আদেশ লইতে পাঠাইয়াছেন। রস্তম মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করেন নাই, শিরী যুদ্ধে মত দিতে কুণ্ঠিত হইবেন। আমিনা আসিল—কিন্তু তার মুখে বিষাদের চিহ্ন।

রস্তম। সংবাদ কি প্রাণেশ্বরী!
আমিনা। রাজপ্রতিনিধি!
রস্তম। আজ্ঞাকর, গোলাম্ হাজির।
আমিনা। যে অভাগা
সাজাদীরে তুচ্ছ করে জ্ঞান, কিম্বা তার
অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়, তারে দণ্ড দিতে
কোন্ শাস্তি করেছ বিধান?

রস্তম। প্রাণদণ্ড।
কিন্তু প্রিয়ে ক্ষমাশীলা রাণী, সে কারণে
তাতারনগর হ'তে পাপীর শাসন
উঠে গেছে।

আমিনা। সে ত দরিদ্র প্রজার পক্ষে।
কিন্তু যেথা অপরাধী রাজপ্রতিনিধি,—
নিজে ভাঙ্গি ব্যবস্থামর্য্যাদা সাজাদীর
করে অপমান্।

রস্তম। প্রাণবধ শাস্তি তার।

আমিনা। তবে নিজ অপরাধ করিয়া বিচার
নিজশিরে দণ্ড তার করহ গ্রহণ।

রস্তম। কি করেছি অপরাধ ?

আমিনা। স্বেচ্ছায় ক'র না
প্রভু, ভ্রম আবাহন। না লয়ে' রাণীর
মত, পারস্যের রাজা সনে করিয়াছ
সমরঘোষণা। ক্রুদ্ধা রাণী, আচরণে
তব।

রস্তম। সত্য! মরণ ইচ্ছা নহে কি রাণীর ?

আমিনা। রাণী বলে "সন্ধি দিব পারস্যের সনে।"

রস্তম। রণসাজে সজ্জিত তাতার—রহস্যের
এ নয় সময়।

আমিনা। গুরু বিষয়ের কথা,—
তা নিয়ে রহস্য কবে করেছে আমিনা ?
সৌধশিরে আরোহিয়া, স্বচক্ষে নেহারি

নারী সম্রাটের বিপুল বাহিনী, প্রাণ-
ভয়ে পণ ভুলেগেছে। উন্মাদিনী রাণী,
সম্রাটের বন্দিনী হইতে অভিলাষী।

রস্তম। উন্মাদিনী রাণী ?

আমিনা। এই ত বিশ্বাস মোর।

রস্তম। মুছে ফেল মস্তের বিশ্বাস। উন্মাদিনী
তুমি। জ্ঞান যদি আপনি উন্মত্ত হয়,
পর্ব্বত কাঠিন্য ভুলে, দাবানল আনে
শীতলতা, তবু ওই ক্ষুদ্র বালিকার
ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরের ক্ষুদ্র প্রাণপাখী
ভুলিবে না আত্মজয়-গান। তুমি তার
কথার গভীর অর্থ বুঝিতে অক্ষম,
উন্মাদিনী ভাবিয়াছ তারে।

আমিনা। তবে তাই—
যাও তবে পণ্ডিতপ্রধান। রাণী তোমা'
কাছে যেতে করেছে আদেশ। তিরস্কার-
ছলে, তব কর্ণমূলে, যা কিছু সুমিষ্ট
বাক্য ঢেলে দিবে রাণী, আঁখিদুটী মুদে
টীকায় গভীর অর্থ কর আবিষ্কার।

(রস্তম কটীদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষদেশে বস্ত্রাভ্যন্তরে
রাখিতেছিলেন, আমিনা দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিল :—)

ওকি কর প্রাণেশ্বর ?

রস্তম। হয়োনা বিস্মিতা।
কিম্বা বালিকার দাস, নীচ দুঃখভার
যদি বুঝি আজীবন বহিতেছি আমি—

মূল্যহীন সে জীবনে লোকচক্ষে আর
না রাখিব। মানবদেহে এ বিষম ব্যাধি
মুহূর্ত্তে করিতে দূর, এই এক শুধু
সুতীব্র ঔষধ, প্রাণেশ্বরী!

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। ওগো! রাণী
কোথা গেল ?

আমিনা। সেকি বাঁদী! সহস্র-প্রহরী-
বেড়া রাজ অট্টালিকা—সে সব প্রাচীর
লঙ্ঘি, সকলের চক্ষে দিয়ে ধূলি, রাণী
কোথা গেল!

পরি। তন্ন তন্ন করেছি সন্ধান—
কইত কোথাও তারে পাই না খুঁজিয়া।

আমিনা। রস্তম রস্তম!

রস্তম। যাও তুমি দেখে এস—
যদি খুঁজে না পাও সন্ধান—উচ্চকণ্ঠে
কর' না চীৎকার—প্রাসাদপ্রাচীর লঙ্ঘি
যায় যদি রাণী—প্রাসাদপ্রাচীর লঙ্ঘি
নাহি-যায় যেন তার পলায়নকথা।
যায় যদি, তোমাদের প্রাণের প্রাচীর
আমি চূর্ণ করে' দিব।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

রস্তম। প্রাণের আমিনা!
জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-অহঙ্কার, একদণ্ডে
হইল মৃত্তিকাসাৎ। তর্কের বিষয়

করে' শক্তি ঈশ্বরের, যেমতি শয়তান
বিচ্যুত হইয়াছিল সপ্তলোক হ'তে,
বালিকার ক্ষুদ্র হৃদে ঋষির বিপুল
জ্ঞান করিয়া বিশ্বাস, আমারো সে দশা।
প্রাণেশ্বরী ! আমি আজ পড়েছি যেথায়
সেথা শুধু জ্বালা, সেথা শুধু অন্ধকার !
অস্তিত্বের কথা গেল পুড়ে—ভস্ম তার
ডুবিল আঁধারে—প্রিয়ে ! আমি আত্মদ্রোহী
নরাধম। বল দেখি শাস্তি কি আমার ?

আমিনা। আত্ম হ'তে প্রিয়তর জ্ঞানে, বক্ষে যারে
দিয়েছ আশ্রয়, তারে যদি ধরা হ'তে
দাও পাঠাইয়া, নাথ ! এখনি নিজস্ব
আসে ফিরে। মত্ততাই যে দেশের জ্ঞান,
সে দেশে আমার থাকা হ'ল না, রস্তম !
তুমি থাক, রাণী থাক্—আর থাক্, শত
শত উন্মাদ-দলিত, সহস্র সহস্র
অনিদ্রার অশ্রুতরলিত, লক্ষ লক্ষ
হতাশ-নিশ্বাস-নিষেবিত, তোমাদের
প্রিয় এ তাতার। আমি চলে যাই, কিম্বা
আমারে পাঠাও।

রস্তম। তাই হবে, কিন্তু প্রিয়ে,
অগ্রে নয়। সর্ব্বাগ্রে কারণ ধ্বংস করি।
পরস্পরবিসংবাদী নূতন কথায়
নিত্য যার উৎক্ষিপ্ত অন্তর, এতদিন

সেনাবীর দাসত্ব করেছি, আগে তার
করি প্রতীকার। আত্মহারা সে রমণী
যায় যদি পারস্তের লইতে শরণ,
শুধু সে সোণার অঙ্গ যাইবে সেথায়—
প্রাণটী রহিবে তার রস্তমের হাতে।
তার পর যুদ্ধ দিয়া সম্রাটের সনে
রণাঙ্গনে পাশাপাশি করিব শয়ন।
চলে' এস—বিলম্বে মর্য্যাদা যাবে। এস,
রমণীর অধঃপাতে গতি রোধ করি।

(পটক্ষেপ।)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

আদি বাঙ্গালি-খৃষ্টান।

খৃষ্টোত্তর ১৮০০ অব্দে ২৮শে ডিসেম্বরে হুগলীজিলাস্থ দিনামার-রাজধানী শ্রীরামপুরের গঙ্গাতটে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম পাদরী কেরীসাহেবকর্ত্তৃক "কৃষ্ণচন্দ্র পাল" নামা জনৈক বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কৃষ্ণচন্দ্র পালকে বাঙ্গালি-খৃষ্টানকুলের আদিপুরুষ বলিলেও বলা যায়। এই কৃষ্ণচন্দ্র পাল কে? ইঁহার পরিচয় ও খৃষ্টানধর্ম্মগ্রহণের বিবরণ আধুনিক বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন। এজন্য ইঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া কৌতূহলী পাঠকবৃন্দের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিব।

হুগলীনদীতীরস্থ চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে সূত্রধরের (ছুতারের) গৃহে ইংরাজী ১৭৬৪ অব্দে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মুলুকচাঁদ পাল। চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মই ইঁহাদের পৈতৃক ধর্ম্ম। কৃষ্ণচন্দ্রও পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং জাতীয় ব্যবসায় সূত্রধরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালে বঙ্গের আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। প্রসিদ্ধ আউলচাঁদ-প্রবর্ত্তিত কর্ত্তাভজার দল বঙ্গের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আপনাদিগের ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র কৌলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই কর্ত্তাভজার দলে প্রবেশ করেন। কর্ত্তাভজাগণ কেবল যে নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন, এমন নয়; তাঁহারা মন্ত্রতন্ত্রদ্বারা অনেক কঠিন রোগগ্রস্তকেও নিরাময় করিতেন। কথিত আছে, কোন সময় কৃষ্ণচন্দ্র একটী কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকেরা অপারগ হইলে জনৈক কর্ত্তাভজা তাঁহার রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রকে কর্ত্তাভজাদিগের তীর্থভূমি ঘোষপাড়ায়

আউলচাঁদের বংশধর পালমহাশয়দিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লন। কৃষ্ণচন্দ্রও স্বীকৃত হইয়া কর্ত্তাভজার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলে নাকি, তিনি কঠিন রোগ হইতে নিরাময় হন। সেই অবধি কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তাভজা হইলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কোন্ সময়ে চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আসিয়া বাস করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। যাহা হউক, তাঁহার শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে বঙ্গের প্রথম পাদরী কেরীসাহেব তাঁহার সহযোগী মিঃ টমাসের সহিত ১৮০০ খৃঃ অঃ ১০ই জানুয়ারী তথায় আগমন করিয়া বঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত হন। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরামপুরের বাজার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, টমাসসাহেব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। লোকে নূতন দ্রব্য দর্শনে বা নূতন গল্প শ্রবণে যেমত মুগ্ধ হয়, কৃষ্ণচন্দ্রও তেমনি খৃষ্টানী বক্তৃতা শ্রবণে তন্ময় হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ, কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক যে খৃষ্টানী বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অশিক্ষিত জাতির ভিতর ধর্ম্মালোচনা, শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। তাহারা লোকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া যা-কিছু ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং তাহারা যাহা শুনিত তাহার ভালমন্দ সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই ধ্রুবসত্য বলিয়া গ্রহণ করিত। কৃষ্ণচন্দ্রও মিসনারী টমাস্সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অহোরাত্র কেবল পাদরীদিগের সঙ্গলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কর্ত্তাভজার ন্যায় এবারেও তাঁহার খৃষ্টানসংসর্গলাভের উপায় হইল। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র নদীতে স্নান করিতে করিতে সহসা পদস্খলিত হইয়া তথায় পড়িয়া যান, এবং সেই কারণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মিসনরীদিগের মধ্যে একজন ভাল ডাক্তার আছেন। এই শুনিয়া তিনি ডাক্তারসাহেবকে আনিবার

জন্য স্বীয় কন্যা ও তাঁহার জনৈক বন্ধুপুত্রকে প্রেরণ করেন। ইনিই সেই পাদরী মিঃ টমাস্ যাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র মুগ্ধ হন। টমাস্‌সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে কেরীসাহেবও আসিয়া পীড়িত কৃষ্ণচন্দ্রকে কতকগুলি খৃষ্টধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুস্তিকা পড়িতে দেন। বাঙ্গালাদেশে কৃষ্ণচন্দ্ররূপী শিকারলাভের জন্য পাদরীদিগের এই প্রথম প্রয়াস। এই সময় হইতেই কৃষ্ণচন্দ্র পালের সহিত পাদরীগণের ঘনিষ্টতা হইতে আরম্ভ হয়। তিনি আরোগ্য হইয়া প্রত্যহ খৃষ্টানী আখড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সেখানে মিঃ ওয়ার্ড ও কেরীপুত্র ফেলিক্সের সহিত প্রত্যহ খৃষ্টানী ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। এক দিন মিঃ টমাস্‌সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যাহা পড় তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কিনা?" কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন "হাঁ, শুধু আমি কেন, আমার বন্ধু গোকুলও বুঝিয়াছে।" টমাস হাসিয়া বলিলেন "তবে আজ হইতে তোমরা আমার ভাই হইলে। আইস, আজ আমরা সকলে একসঙ্গে আহার করি।" টমাসের কূটকৌশলে সূত্রধর-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় বন্ধু গোকুল ধরা পড়িলেন। জাতিভেদের কঠিন নিগড়-পরিহিত কৃষ্ণচন্দ্র পাদরীসাহেবের আমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইয়া জাতিভেদবন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন। এই সময় তাঁহাদের দিবা-আহারের (Dinner) স্থান হইয়াছিল। পাদরীপ্রসাদলাভলোলুপ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় বন্ধু গোকুল, হিন্দুর চিরন্তন জাতিভেদপ্রথার মস্তকে পদাঘাত করিয়া মিশনরী-জালে আবদ্ধ হন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে আহার করিলেন। বোধ হয়, বাঙ্গালি-কর্ত্তৃক ইংরাজী-খানা-গ্রহণ এই প্রথম!

এইরূপে নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া এদেশের লোককে খৃষ্টান করা পাদরীদিগের চিরন্তন নীতি। কিন্তু প্রখ্যাতনামা স্পষ্টবাদী [illegible]

প্রণালীতে খৃষ্টান-করাকে অবৈধ ও মূর্খের কৌশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাদরী টমাসের এবম্ভূত অবৈধকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা লালবিহারী দে বলিয়াছিলেন "It was unnecessary because the kingdom of heaven does not consist in meats, and drinks, and a Hindu may be an excellent Christian though he may have never eaten with a single Christian." বস্তুতঃ তখনকার সমাজের কঠোর জাতিভেদশৃঙ্খল এইরূপে ভগ্ন করিতে পারিলেই, এদেশের লোককে খৃষ্টান করা যেন সহজ হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টানগণ হিন্দুসন্তানের জাতি নষ্ট করিয়া পরে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এই কারণে স্পষ্টবাদী তেজস্বী রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয় ঐ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন "And we consider the act to have been unwise as it might lead Hindus and Mahomedans believe that to become Christian was only to eat and drink with Europeans." ফলতঃ খৃষ্টান পাদরীদিগের এই সনাতন নীতি এখনও বর্ত্তমান!

মিসনরীদিগের সহিত কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলের একত্রে ভোজন-করণের সংবাদ শ্রীরামপুরে শীঘ্রই প্রচারিত হইল। কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধু গোকুল কে এবং তিনি কোন্ জাতিভুক্ত ছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি ; তবে তিনি যে তৎকালীন বঙ্গের উচ্চশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কেননা, এখন ইংরাজী শিক্ষার অবাধ-প্রচলনে যেমন উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর লোকই একই বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে লেখাপড়া শিক্ষা করেন, এবং তজ্জন্য পরস্পরের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জন্মিয়া থাকে, তখনকার দিনে কিন্তু তেমন ছিল না। তখন এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার আদৌ প্রচলন ছিল না বলিলেই হয়। সুতরাং উচ্চ

শ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর বন্ধুত্ব অসম্ভব ছিল। এরূপ স্থলে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত গোকুলের বন্ধুত্ব সমশ্রেণীর প্রতিবেশী ভিন্ন কখনই সম্ভবে না। যাহা হউক, তাঁহাদের এবম্ভূত হঠকারিতায় সমগ্র শ্রীরামপুর মহা উত্তেজিত হইল। হিন্দু-ইস্কুলের "ইয়ংবেঙ্গল"গণ শূকর ও গোমাংস দ্বারা প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের গৃহ কলঙ্কিত করিয়া আপনাদিগের যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু তাঁহাদের বহুপূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু গোকুল প্রকাশ্যভাবে বিজাতীয়দিগের সহিত একত্রে হিন্দুর অস্পৃশ্য ও অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন। হিন্দুসন্তান কৃষ্ণচন্দ্র, খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণে যেমন বাঙ্গালি-খৃষ্টানের আদিপুরুষরূপে গণ্য হইয়াছেন, বিজাতীয়দিগের সহিত একত্রে হিন্দুর অখাদ্য ভোজনেও তিনি তেমনি প্রথমপথপ্রদর্শক, এ কথাও বলা যায়! কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয়গণ এই অভাবনীয় ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার শুনিয়া ক্রোধ ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন। তাঁহারা তখন কৃষ্ণচন্দ্রের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাটী হইতে তাঁহার কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিলেন, এবং শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের এজলাসে উপস্থিত হইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা জানাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-মহোদয় স্বজাতিবাৎসল্যবশতঃ ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বিফলমনোরথ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয়গণ শ্রীরাম-পুরের তৎকালীন ডিনেমার শাসনকর্ত্তার সমীপে কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়া সাহেব হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহার সহিত আর তাহার কন্যাকে রাখিতে পারি না। বিদেশীয় বিচারকগণ আপনাদিগের খামখেয়ালীর বশে যেমন অপরূপ যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গবর্ণরসাহেব প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিলেন "কৃষ্ণচন্দ্র সাহেব হয় নাই, খৃষ্টান হইয়াছে মাত্র। খৃষ্টান হইয়া সে ভালই করিয়াছে। সে আপনার বিবেকানুরূপ যে কাজ করিয়াছে, তজ্জন্য তোমরা তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ঐ কন্যাকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে আইনের

আয়ত্তে আনিতে না পারিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার প্রতি নানা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। পাছে এই উত্তেজিত আত্মীয়গণ তাঁহাকে হত্যা করে, এই ভয়ে গবর্ণরসাহেব তাঁহার রক্ষার্থ একজন সিপাইকে তাঁহার বাটীতে রক্ষা করিলেন। তৎপরে খৃষ্টোত্তর ১৮০০ অব্দের ২৮শে ডিসেম্বর খৃষ্টানী বিশ্রামবারে সূত্রধরপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গের প্রথম পাদরী কেরীসাহেবকর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের গঙ্গাতীরে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাদরী কেরী তদীয় আত্মজ ফেলিক্সকে হিন্দুর পবিত্র নদী গঙ্গাগর্ভে নামাইয়া দীক্ষিত করেন; তৎপরে বাঙ্গালি-খৃষ্টানের আদিপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র পাল "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ" হিন্দুর এই সনাতন নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া ঐ স্থানে দীক্ষিত হন।* খৃষ্টানের পবিত্র নদী জর্ডনের জলের পরিবর্ত্তে হিন্দুর পরমপবিত্র গঙ্গাজলে উহাদের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইল! ইহাতে কেরীপুত্র ফেলিক্সকে হিন্দু করা হইল কি না, অথবা কৃষ্ণচন্দ্রের হিন্দুত্বই বজায় রহিল, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। পাদরী কেরীপুত্র ফেলিক্স গঙ্গাজলে দীক্ষিত হইয়া, জাফরখাঁ-নামক ত্রিবেণীর প্রখ্যাত "গাজীসাহেবে"র ন্যায় নিম্নলিখিত গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বীয় হৃদয়ের পাপতাপ দূর করিয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না :—

"সুরধুনী মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
সা তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
যদিচ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনাং মাম্
তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বম্ মহত্বম্।"

কৃষ্ণচন্দ্রের পর তারাচাঁদনামক জনৈক বাঙ্গালী ডাক্তার ডফ্‌নামক সুবিখ্যাত পাদরী-কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদরী-শ্রেণীভুক্ত হন। ইনিই বাঙ্গালী "পাদরী"গণের আদিপুরুষ। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরস্থ গির্জ্জাই বঙ্গের প্রথম গির্জ্জা।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

* এই দীক্ষা-উৎসবের অব্যবহিত পরে পাদরীগণ-কর্ত্তৃক অপরূপ বাইবেলী বাঙ্গালার একটী যিশুনাম গীত হয়, তাহার প্রথম চরণ এইরূপ :—হে স্বর্গের স্তব্য প্রভো খ্রীষ্ট!"

সমসাময়িক ভারত।

(৬)

রাষ্ট্রনীতি।

একজন ভ্রমণকারীর বিপদের কথা ত তোমরা জান; রুস-দেশের মরুপ্রান্তর দিয়া একজন পথিক চলিতেছিল; একদল ক্ষুধিত নেকড়েবাঘ তাহাকে অনুসরণ করে। প্রথমে সে তাহার সমস্ত খাদ্যসামগ্রী তাহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল; তাহারা এক-গ্রাসেই সে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া আবার সবেগে তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার পর সে তাহার একটা ঘোড়া—পরে দুইটা ঘোড়া সেইখানে ছাড়িয়া আবার চলিতে লাগিল। কিন্তু ঘোড়াদের ত্যাগ করায় সে আরো বিপদে পড়িল। তাহার দ্রুতগমনে ব্যাঘাত জন্মিল। ভারতে ইংরাজদিগের ব্যবহার এই পথিকের ন্যায়। কিন্তু ইঁহারা কাজের লোক, ইঁহারা কতকগুলা শব-কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই।

ক্ষুধিত লোকদিগকে "ভোগা দেওয়াই" যে রাষ্ট্রনীতির কাজ, সে রাষ্ট্রনীতি বেশী দিন টিকিতে পারে না। শান্তপ্রকৃতি দেবতারাই সস্মিতবদনে যজ্ঞধূম গ্রহণ করেন; শুধু ধূমে আর কেহই পরিতৃপ্ত হয় না। এ বেশ জেনো, ইংরাজেরা ভারতবাসীদিগকে যে সকল অধিকার দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, ভারতবাসীরা সেই সব অধিকারের প্রসর ও মূল্যসম্বন্ধে ঠিক্‌ই বুঝিয়াছে; ভারতবাসীরা বলে, এই সব অধিকার যতই স্বল্প হউক না কেন, উহা ইংরাজদের নিকট হইতে আদায় করিতে হইলে, পিল্‌পাই-(Pilpay)-বিবৃত নীতিকথা বলিলে কোন ফল হইবে না; রীতিমত 'আন্দোলন' করা চাই।

এইখানে সেই মেকলের রাষ্ট্রনীতি, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের অধিকার-পত্র, এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেই রাজবিধির কথা স্মরণ করা যাক—যাহা দেশীয়দিগের স্বত্তাধিকার-সমূহের পত্তনভূমি; তাহা হইলেই এখনকার মতামতের ভাবগতিক বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে, লোকেরা সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করে:—"ভারত কবে বিদ্রোহী হইবে?" ভারত বিদ্রোহী হইবে না। কেবল এইটুকু সম্ভব যে, ভারত ধীরে ধীরে ধৈর্য্যের বলে বিদেশিশাসনের বিলোপসাধন করিবে। আমি জানি, কতকগুলি রক্ষণশীল লোক যাহা-কিছু দেখিতেছেন, তাহাতেই সন্ত্রস্ত হইতেছেন, এবং কংগ্রেস্‌কে বিদ্রোহী বলিয়া এখনও ভর্ৎসনা করিতেছেন। পক্ষান্তরে, কংগ্রেস স্বকীয় আনুগত্য ও রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া, উহার প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। উহারা এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, নিম্নস্বরে বলিতেছে, লিখিতেছে; এবং অকপট-ভাবে এই মত পোষণ করিবার পক্ষে তাহাদের কতকগুলি উত্তম হেতুও আছে। ইহা ভাবুকতার কথা নহে, ইহা সুবিবেচিত স্বার্থের কথা। আজ ইংরাজদিগকে বহিষ্কৃত করিবে? কিন্তু কাল.........? পুনর্ব্বার তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে হইবে;—কোন এক ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছেন। বিদ্রোহই বল, আর রাষ্ট্রবিপ্লবই বল—তাহাতে নিশ্চয়ই ভারতবাসীদিগের প্রকৃত স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে। হয় ভীষণ প্রতিশোধ—নয় পূর্ব্ব আক্রমণকারী অপেক্ষা হয়ত আরও কঠোর কোন নূতন আক্রমণকারিকর্ত্তৃক দেশাধিকার, ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইবে। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ড যদি অল্পস্বল্প অধিকারও প্রদান করেন, তাহাই আপাতত ভারতের পক্ষে যথেষ্ট। তাই ভারতবাসীরা এক্ষণে সরলান্তঃ-করণে শুধু আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছে—সংপূর্ণ স্বাধীনতা চাহিতেছে না; তাহারা বিলক্ষণ জানে, এই স্বাধীনতার দান তাহাদের পক্ষে এক্ষণে অতীব বিপদজনক। বিদেশীয় অনধিকারচর্চ্চা,

বিদেশীর কর্ত্তৃত্ব যতদূর সম্ভব কমাইয়া আনা, এবং দেশশাসনকার্য্যে দেশীয় লোকদিগকে অধিকতর কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা—ইহাই উহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকা। এইরূপে সমস্ত ভারতবাসী এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে (অন্ততঃ এইরূপ তাহাদের কল্পনা); ইংলণ্ডের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্রমেই শিথিল হইবে;—এবং এইরূপ শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া আপনা-আপনি একেবারেই রহিত হইবে। কোনপ্রকার দারুণ বিচ্ছেদ ঘটিবে না।......জাতীয়ভাব ও রাজভক্তি—এই দুই শব্দে এখনকার আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষণ পরিব্যক্ত হইতে পারে।

এই কার্য্যতালিকার দুইটি মাত্র মুখ্য বিষয়:—একটি, ভারতীয়-ব্যবস্থাপকসভায় দেশীয়-প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন; অপরটি, দেশীয়দিগের দ্বারা শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ।

ভারতবাসীরা এই বলিয়া অভিযোগ করে—(আমার বিবেচনায় এই অভিযোগটি ন্যায়সঙ্গত,) সরকার-প্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থার উপর তাহাদের ইষ্টানিষ্ট যতটা নির্ভর করে, এমন আর কাহারও নহে—যেহেতু তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—অথচ তাহাদের মতামত না লইয়াই ঐসকল বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হয়। ভাইসরয়ের মন্ত্রিসভায় চারিটি দেশীয় সদস্য আছে সত্য:—কিন্তু আসলে সে ব্যাপারটা কি? সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই রাজকর্ম্মচারী। য়ুরোপীয় বণিক ও কারখানাওয়ালার মধ্য হইতেই অধিকাংশ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। একবার তুলনা করিয়া দেখ: য়ুরোপীয় Chamber of Commerce-এর একটি আসন; আর সমস্ত ভারবর্ষের চারিটি আসন। এবং এই চারিজন প্রতিনিধি কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে না—শাসন-সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতে পারে না। রমেশদত্ত লিখিয়াছেন:—"ভারতসরকার যেরূপ অকপটভাবে প্রজার মঙ্গল ইচ্ছা করে না

সেরূপ বিদেশীয় কোন রাজসরকারই করেন না; তথাপি প্রজার স্বার্থ ক্রমাগতই জলাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে; কেননা, স্বকীয় স্বার্থের ব্যবস্থাবিধানে প্রজার কোন হাত নাই। প্রজার অর্থে কিম্বা প্রতিভূবদ্ধ সুদের নিয়মে নূতন নূতন রেলপথ উদ্‌ঘাটন করা; চা-কুঠিয়ালদিগের জন্ম জোর করিয়া মজুর খাটাইবার উদ্দেশে বিশেষ করিয়া দণ্ডবিধায়ক আইন প্রণয়ন করা; রাজস্বের নিয়োগ ব্যবস্থা, লবণ-করের হ্রাসবৃদ্ধি; জলসেকের জন্ম খালাদির বিস্তার···এই সমস্ত গুরুতর বিষয়—যাহার উপর প্রজার ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে—দেশীয় লোকের সহিত সরলান্তঃকরণে পরামর্শ না করিয়া, দেশীয় প্রতিনিধির সহিত অকপটভাবে বিচারবিতর্ক না করিয়াই নিষ্পত্তি করা হয়। তাছাড়া, ইংরাজ-কারখানাওয়ালা, ইংরাজ-বণিক, ইংরাজ-মূলধনী, ইংরাজ-কুঠিয়াল—ইহাদের "ভোট" আছে; ভারতবাসীদের "ভোট" নাই; উদ্দেশ্য যতই ভাল হউক না কেন, এরূপ অসমান পক্ষসমূহের মধ্যে সমান ওজন বজায় রাখা কোন রাজসরকারের পক্ষেই সম্ভব নহে... ভারতসরকারের গলদ্ এই জায়গায়। অসংযত ব্যয়বাহুল্য,...লোকের অপ্রিয় হওয়া, কৃষকবর্গের দুঃখদারিদ্র্য—এই সমস্তের ইহাই প্রকৃত কারণ।" আমি রাজপুরুষদিগের মতামত পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি; তাঁহারা দেশীয় লোকের দাবীদাওয়া একেবারে আমলেই আনেন না। ইহা নিশ্চিত, সরকারের মন্ত্রিসভায় যে সকল রাজকর্ম্মচারী আসন-গ্রহণ করেন, তাঁহাদের এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইতে পারেন। এমন কি, তাঁহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও দেশের অনিষ্টসাধন করেন। প্রজার স্বার্থ অপেক্ষা নিজের শ্রেণিগত স্বার্থরক্ষায় তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা। তাঁহারা মোটামোটা বেতন যতক্ষণ ভোগ করেন, ততক্ষণ রাজশাসনে কোন দোষ দেখিতে পান না—সবই সুচারুরূপে চলিতেছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হয়। ইঙ্গভারত-

রাজ্যে, ইংরাজ বণিক, ইংরাজ শ্রমশিল্পী এবং দেশীয় দোকান্দার, দেশীয় কৃষক—ইঁহাদের পরস্পরের স্বার্থ এক হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রায়ই তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। ব্যবস্থাপকসভায়, ইংরাজ বণিকপ্রভৃতিরই স্বার্থ উত্তমরূপে সমর্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের কথাই গ্রাহ্য হয়। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রমেশদত্ত সরকারী রেলপথের উল্লেখ করেন। সরকারী বজেটে, এই রেল-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যয়ের চাপ অত্যন্ত বেশী। ফলতঃ এইরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, অমুক শ্রমশিল্পীর দল, কিম্বা কোন মূলধনী, এমন একটা রেল-লাইন খুলিতে চাহেন, যাহা তাঁহার বিশেষ-স্বার্থের অনুকূল। তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে, সরকার ব্যয়ভার বহন করিলেন ; হয় ত সে লাইন লাভজনক নহে ; কিন্তু অর্থ দিল কে ?—দেশীয় করদাতৃগণ।

এ কথা ঠিক্, যেহেতু ভারতসরকার বৈদেশিক, দেশীয় লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া চলিলে, শাসনকার্য্যে সুবিধা হইবারই কথা। এইরূপ পরামর্শ অকপটে গ্রহণ করিতে হইলে, ব্যবস্থাপকসভায় অর্দ্ধেক দেশীয় প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। প্রথমকার কয়েক অধিবেশনে ন্যাশানাল-কংগ্রেস আগ্রহাতিশয়সহকারে এই সংস্কারটির জন্য প্রার্থনা করেন ; ইহার প্রত্যুত্তরে ১৮৯২ সালে যে আইন হইল, তাহাতে সম্পূর্ণ ফললাভ হইল না। কেননা, কংগ্রেস চাহিয়াছিলেন,—প্রথমতঃ, ব্যবস্থাপকসভায় অর্দ্ধেক সদস্য, প্রতিনিধিনির্ব্বাচনের নিয়মে মনোনীত করা হয় ; দ্বিতীয়তঃ, আইনঘটিত সমস্ত প্রস্তাব, আয়ব্যয়সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন, এককথায় বজেটের হিসাব, ব্যবস্থাপকসভার সমক্ষে উপস্থিত করা হয় (১৮৮৭ মাদ্রাজ-কংগ্রেস)। ঐ কংগ্রেসে বাগ্মী ব্যানর্জ্জি ঐ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া, এইরূপ বলেন :—"ব্যবস্থাপক-সভার সংস্কারই অন্য সকল সংস্কারের মূল ও পত্তনভূমি"। যেদিন, সরকারী তহবিলের চাবি দেশের হাতে অসিবে, সেইদিন আর সমস্তই

আসিয়া উপস্থিত হইবে। ভারত এমন একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, যাহার দ্বারা তাহার দাবীদাওয়া ব্যবস্থাপকসভায় উপস্থাপিত করিতে পারুক বা না পারুক অন্ততঃ ভাইসরয়ের কানে পৌঁছাইতে পারে। এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, যাহা একমাত্র সরকারী কর্ম্মচারিগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে, অকর্ম্মণ্য ও শক্তিহীন হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বরাবর জাতীয়-জীবনের বাহিরে থাকিলে, এই সকল ব্যবস্থাপকসভারও সেই দশা উপস্থিত হইতে পারে। তথাপি, এই ন্যাশানাল-কংগ্রেস, যাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বর্ষে-বর্ষে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে ন্যাশানাল-কংগ্রেস, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা না রাখিয়া, তাহাদের নিজের কতকগুলি সুবিবেচিত মতামত ইংরাজ-সরকারকে শুনাইতেছে সেই ন্যাশানাল-কংগ্রেসই—কেহ কেহ মনে করে—ভবিষ্যতের ভারতীয় পার্লেমেণ্ট—যেখানে, ভারতের বিভিন্নজাতি—স্ব স্ব প্রভাব ও সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া, স্বকীয় স্বার্থসম্বন্ধে আপনারাই আলোচনা করিবে।

কোন শাসনতন্ত্রের কর্ত্তৃপুরুষগণ যদি সমস্তই পরদেশীয় হয়, এবং—মালাবারির উক্তি অনুসারে—যদি তাহারা "অস্থির-বাস" (nomad) হয়, তাহা হইলে যে দোষ ঘটে, নিরবচ্ছিন্ন রাজকর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক গঠিত কোন ব্যবস্থাপকসভাতেও সেই একই দোষ ঘটিয়া থাকে। আমি জানি, আমাদের দেশে, ভারতের সিভিলিয়ানদের কথা উঠিলে, লোকের মুখে প্রশংসা আর ধরে না। তাহার পরেই, আমাদের "উপনিবাস-রাজ্যের"সহিত তুলনা করা হয়:—ইংরাজেরা নাট্যদৃশ্য-প্রদর্শনে যেরূপ সুনিপুণ, এরূপ আর কেহ নহে। ফরাসীপর্য্যটককে ভুলাইবার জন্য তাহারা যেরূপ "ছলা-কলা" অবলম্বন করে, তাহাতে

আছে, যখন Prince of Wales এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার শীকারের জন্য খড়ের বাঘ জঙ্গলে-জঙ্গলে রাখা হইত। যুবরাজবাহাদুর এইরূপে অসংখ্য "নিরীহ জীব"-সংহারে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহা···একটা কিম্বদন্তী মাত্র। কিন্তু প্রকৃত কথাটা এই—যে, Potemkine, দ্বিতীয় ক্যাথরীনের ক্রাইমিয়া-ভ্রমণের সময়, যেখান দিয়া রাণী চলিয়া যাইতেন, সেইখানেই গ্রামপল্লীতে পূর্ণ করিয়া দিতেন। ইংরাজেরা সেই পটেম্‌কিন্ অপেক্ষাও জবরদস্ত। ফরাসীপর্য্যটক Darmesteter আফ্‌গান্-সীমাপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া, অতীব মুগ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। "ইহুদিদেশের সিদ্ধপুরুষবৃন্দ"গ্রন্থের রচয়িতা সেই Darmesteter, বাইবেলের সামগানের ধরণে ইংরাজের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। একটা অতি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন:—একুশবৎসরের একটি যুবক, লক্ষ লোকের বসতি একটি নগর শাসন করিতেছেন; আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই, আর একজন ফরাসীপর্য্যটকও দেখিয়া আসিয়াছেন, ঐ একই যুবক, লক্ষ লোকের বসতিপূর্ণ ঐ একই নগর শাসন করিতেছে: এই চিরযৌবন যুবকের বয়স চিরকালই একুশবৎসর···যদি চাও ত এই কল্যাণকামী শাসনকর্ত্তাদিগকে আমি হদ্দ এই বলিয়া তারিফ করিতে পারি যে, "প্রকৃত বাদশাহী ধরণে" (truly imperial) হুকুম দিবার একটা পটুতা উঁহাদের আছে। কিন্তু এইরূপ অক্ষতভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে পরদেশে চিরকাল বাস করা সম্ভব নহে।

ইহা কি আমার কথা?—না, ইহা উঁহাদেরই মুখের কথা। Beck লিখিয়াছেন:—"আমরা আমাদের একটি দোষের প্রতি মনোযোগ করি না, সে দোষটি ইংরাজমাত্রেরই আছে,—সেটি আমাদের দ্বীপবাসিসুলভ সংকীর্ণভাব।" প্রসঙ্গক্রমে বেক্ বলেন, যাঁহাদের উপর প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণের ভার, যাঁহারা সমস্ত সাম্রাজ্যের রক্ষক,

তাঁহারা প্রজাদের মধ্যে থাকিয়া জীবনযাপন কেন না করেন, এ কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার আমাদের অধিকার আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জাতিগত ও বর্ণগত বদ্ধমূল সংস্কারগুলা, কর্ত্তব্য অপেক্ষাও প্রবল। একজন সামান্য ইংরাজকর্ম্মচারীও 'নেটিভ'দের গৃহে যাতায়াত করিবে না, পাছে তাহার মান যায়।

ইঁহারাই আবার বিদেশী পর্য্যটকদিগকে উপহাস করিয়া থাকেন। ইঁহারা কোন্ মুখে উপহাস করেন বলিতে পারি না; কেননা, ভ্রমণ-কালে, ঐ সকল ব্যক্তি আসিয়া উঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং বিস্ময়ের বিষয় এই, পর্য্যটকেরা উঁহাদের নিকট কোথায় দেশসম্বন্ধে সংবাদবার্ত্তা অবগত হইবেন, না উঁহারাই পর্য্যটকদিগকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সমস্তই উল্টা অভিনয়; এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার; ইহাতে পর্য্যটকের বৃথাভিমান পরিতৃপ্ত হয়, এবং ইংরাজরাজপুরুষেরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

ইংলণ্ডীয় সমুদ্রখাড়ীর এ পারে (অর্থাৎ ফ্রান্সে) জন্মগ্রহণ করিলেই যে, এই দোষটি খণ্ডিয়া যায়, তাহাও নহে। কলিকাতায় একজন কন্সল্‌কে দেখিয়াছি, যিনি কোন বৃহৎ য়ুরোপীয় রাজশক্তির স্বার্থাদির তত্ত্বাবধান করেন, তিনি ইংরাজীর টুক্‌রা-টাক্‌রা শিখিবার জন্যও কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। তিনি ইংরাজী সংবাদপত্রও পড়িয়া বুঝিতে পারেন না। তিনি য়ুরোপীয় অঞ্চল ও সাধারণের বেড়াবার জায়গাগুলি ছাড়া কলিকাতার আর কিছুই জানেন না। কোন দোকানের সামান্য কেরাণীর পক্ষে যাহা শোভা পায়, তাহা একজন কন্সলের পক্ষে শোভা পায় না, আর জেলার বড়কর্ত্তার পক্ষে তাহা ত একেবারেই শোভা পায় না। এই সকল উচ্চপদস্থ কর্ত্তৃপুরুষ-গণ, "স্বর্গ-পুত্রের" ন্যায় লোকের দুরধিগম্য, লোকলোচনের অদৃশ্য। তাঁহাদের বর-তনু লোক-সংস্পর্শ হইতে সযত্নে রক্ষিত।

তাঁহাদের গায়ে এই কথাটি লেখা আছে:—"কার্য্যোপলক্ষ ছাড়া আর সকল সময়েই প্রবেশ নিষেধ।" ইহারা প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় রেলিং-ঘেরা একটা মঞ্চের উপর নিয়ত বাস করেন। তাঁহাদের গৃহ বিজনবাসী তাপসের আশ্রয়, না রাজ্যপরিচালকের বাস-ভবন? জীবন্ত ব্যক্তির ন্যায় সাজসজ্জায় সজ্জিত তাঁহাদের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তিগুলি খোলা জায়গায় প্রকাশ্যস্থানে সংরক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের প্রস্তর-নেত্র কিছুই দেখিতে পায় না...এই কারণে, প্রেষ্টিজ ছাড়া তাঁহাদের আর সমস্তই নষ্ট হয়। এই সকল প্রেষ্টিজ্‌ওয়ালা রাজপুরুষদিগের "বাদশাই" ফলাইবার পটুতা আছে, কিন্তু ভাষাশিক্ষার পটুতা নাই। যখন কোন ইংরাজ আপন মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষায় কথা কহেন, তাহা শুনিতে আমোদ আছে; সে এক তামাসা। খুব উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ আমার নিকট কবুল করিয়াছেন, কতকগুলি ফরাসীশব্দ এখনো পর্য্যন্ত ভুলিতে না পারায়, হিন্দুস্থানী বলিবার সময় বড়ই বাধে। ইচ্ছা না করিলেও ঐসকল শব্দ ক্রমাগত জিহ্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এদিকে আবার, মার্সেই-বন্দরে যখনি তাঁহারা পদার্পণ করেন, অমনি ফরাসীশব্দ বাহির না হইয়া হিন্দুস্থানীশব্দ তাঁহাদের মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হয়। অবশ্য ইহা বড়ই বিরক্তিজনক, কিন্তু "নেটিভদের ভাষা না জানিলে, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কিরূপে চালাইবে? একদিকে যেমন ইংরাজরাজপুরুষেরা "নেটিভদের" ভাষায় কথা কহিতে পারেন না, অপরদিকে তেমনি আবার, নানাপ্রকার সঙ্কোচ ও শাস্ত্রীয় নিষেধ-নিয়মাদি সজারুর কাঁটার মত হিন্দুশরীরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; —সুতরাং এইরূপে হিন্দুও দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। দুই পক্ষী একবৃক্ষে পাশাপাশি বাস করিতেছে, অথচ উভয়েই উভয়ের নিকট দুর্ব্বোধ; উভয়েই উভয়ের বিরুদ্ধপক্ষ। যিনি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ

করিয়া দেশীয়-প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, সেই Theodore Beck বলেন :—"দেশীয়দিগের চরিত্র সম্বন্ধে ইংরাজ-সমাজে যে সকল ধারণা প্রচলিত, তাহা নিতান্ত অদ্ভুত, অসঙ্গত ও অন্যায়......তাছাড়া, যাঁহারা এদেশে আসেন, দেশীয় লোকের মধ্যে তাঁহাদের বাস করা উচিত; আপনাদিগকে এতটা প্রাচ্য করিয়া তোলা উচিত যে, সরকার-কর্ত্তৃক কোন বিশেষ আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, দেশীয়দিগের মধ্যে তাহার ফলাফল কিরূপ হইবে তাহা তাঁহারা নিজের অন্তর হইতেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।" এ কথা সত্য; যে শাসনকর্ত্তা আপনার অধীন লোকদিগের সহিত একত্র বাস করিবেন, তাহাদের সহিত মন-খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিবেন, (অবশ্য তজ্জন্য ভাষা জানা আবশ্যক) তিনিই আদর্শ-শাসনকর্ত্তা। অন্তরের ভাব প্রাচ্য হইলে, প্রাচ্যদিগকে সহজেই তিনি বুঝিতে পারিবেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"বন্দে মাতরম্"।

নদী সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে কোন এক অজানিত পর্ব্বত-গহ্বরে চারিদিক হইতে বিন্দু বিন্দু জল সঞ্চিত হইতে থাকে। বহুকাল জলসঞ্চয়ের পর যখন সেই গহ্বরটী পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন সেই জল ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া, কখন এদিক, কখন ওদিক, নানা ছুতা ধরিয়া নির্গত হইতে চেষ্টা করে। তারপর যখন সেই ভূমধ্যস্থ প্রস্রবণে অলক্ষিতে আরও জল সঞ্চিত হইতে থাকে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার নির্গমন-শক্তিও বাড়িতে থাকে এবং অবশেষে আর ভিতরে লুক্কায়িত থাকিতে না পারিয়া সেই কঠিন প্রস্তরস্তর ভেদ করিয়া বেগবতী স্রোতস্বতীরূপে নির্গত হয়, এবং কত দেশ জনপদ অতিক্রম করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়। সামান্য জলকণা হইতে এরূপ মহানদীর সৃষ্টি হইয়া কত অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া দেশকে "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" করে। প্রায় বিশবৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবু "আনন্দমঠে" প্রথম "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্র প্রকাশ করেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ভূমধ্যস্থ প্রস্রবণের ন্যায় ইহাও এতদিন দেশের লোকের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। শেষে আর লোক-হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া, জাতীয়মহামন্ত্রস্বরূপ সমগ্র ভারত-ময় ব্যাপ্ত হইয়া ভারতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন ও জাতীয়-জীবন গঠন করিয়া ভারতবাসিমাত্রকেই অন্তিম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিতেছে। গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালীর "রাখি-বন্ধন ও অরন্ধনের" দিন

ভারতের যে কোন প্রদেশেই থাকুক না কেন, করে। এখানেও “বন্দে মাতরম্” মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পরের ান অপরিণাম বন্ধন করিয়াছে। সে'দিন তাহারা বলিয়াছে “ভাই ত লোে একঠাই, ভেদ নাই ভেদ নাই।” সেদিন তাহারা ব্যক্তিগত, জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া দেশের মঙ্গলার্থে পরস্পরের সখ্য স্থাপন করিয়াছে। ঈশ্বরকে এবং জননীস্বরূপা জন্মভূমিকে সাক্ষী করিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দেশকে দুভাগ করিলেও এক মায়ের সন্তান তাহারা কখনও পৃথক হইবে না। তারপর গত বরিশাল-প্রাদেশিক-সমিতিতে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কতজন পুলিশের হস্তে নির্দ্দয়ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ভগীরথ যখন গঙ্গা আনয়ন করেন, তখন এক মত্তহস্তী গঙ্গার গতিরোধ করিতে যাইয়া যেরূপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেরূপ এই মহামন্ত্র রোধ করিতে যাইয়া বঙ্গের দ্বিতীয় সায়েস্তা খানও বিতাড়িত হইয়াছেন। সম্বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধনের এই পবিত্র মহামন্ত্র এতদূর সফলকাম হইয়াছে, এবং সমগ্র ভারতবাসী এখন ইহাকে মূলমন্ত্ররূপে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। যাহা কিছু ভাল এবং আদরের জিনিস্ তাহারই নাম “বন্দে মাতরম্” রাখা হইতেছে। যেমন “বন্দে মাতরম্” গানের বহি, ইহা শতাধিক জাতীয় সঙ্গীতে পরিপূর্ণ; “বন্দে মাতরম্ সাবান,” “বন্দে মাতরম্ হল”। মোট কথা “বন্দে মাতরম্” বলিতেই আমাদের মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব জাগিয়া উঠে এবং আমরা দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হইয়া উঠি। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা হইতে— “Babu Bipin Chandra Pal—Editor in chief” নাম দিয়া “বন্দে মাতরম্” নামে একটী ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইয়া এই পবিত্র নামকে কলুষিত করিয়াছে। ঐক্যবন্ধনের মহামন্ত্র

ই, ইহা তাহাই প্রসব করিতেছে। "ওল্ড পার্টি" এবং ' দুই বিরোধী দল সৃষ্টি করিয়া দেশের এই দুর্দ্দিনে দলাদলি ও করিয়াছে। স্বীকার করি, ইংলণ্ডেও পরস্পর-মত-বিরোধী উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল—দুই দল আছে। তাহারা একদল অন্যদলের কার্য্যকলাপের দোষগুণ বিচার করে। কিন্তু যখনই সমগ্র ইংরেজসমাজের স্বার্থসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে, তখন তাহারা সকলেই একমত। যখন পকেটে হাত পড়ে, তখন উদার-নৈতিকে ও রক্ষণশীলে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ইংলণ্ডের ভারতসচিব ও কোম্পানী-আমলের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী উভয়ের মধ্যে একবার এরূপ আলাপ চলিয়াছিল—"এ কথা মনে রাখিও, উদারনৈতিক মত রপ্তানী জিনিস্ নহে, উহা শুধু ঘরের ব্যবহারের জন্য ("home consumption")।"

এখানে আমরা বিপিনবাবুকে কিছু বলিতে চাহি না। তাঁহাকে আমরা ভাল লোক বলিয়াই জানি। বৃক্ষ যেমন প্রথম প্রথম ভূমি হইতে রস, সূর্য্য হইতে আলো এবং বায়ু হইতে carbon dioxide ইত্যাদি সব সংগ্রহ করিতে থাকে, এবং শেষে পরিপুষ্ট হইয়া ফল, ফুল, সুগন্ধ, ছায়া এবং শোভা বিতরণ করিয়া লোককে আনন্দিত করে, সেরূপ বিপিনবাবুও প্রথমতঃ ইহাঁর নিকট হইতে একটু, উহাঁর নিকট হইতে একটু, এরূপে যাঁহার যাহা কিছু শিক্ষণীয় গুণ দেখিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া দেশের অন্যতম নেতৃত্বপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ এবং পলিসি অতি উচ্চ এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও মহৎ। তাঁহার সম্পাদিত "নিউ ইণ্ডিয়া"ই তাহার পরিচায়ক। ভারতবর্ষে তাঁহার মতাবলম্বী লোকের সংখ্যাও কম নহে। এই লেখকও সেই দলেরই একজন। কিন্তু বিপিনবাবু প্রায়ই মফস্বলে

নামের দোহাই দিয়া কর্ম্মচারীরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। এখানেও তাহাই হইতেছে। বিপিনবাবুর নাম দিয়া হয়ত কোন অপরিণামদর্শী লোক এরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছে। একদেশদর্শী লোকের ন্যায় দোষগুণ বিচার না করিয়া এবং পরিণামে কি হইবে না ভাবিয়াই যাকে-তাকে আক্রমণ করিতেছে। এ কথা ঠিক যে, তোষামোদকারী বন্ধু এবং অন্ধ ভক্ত অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী শত্রু ভাল। ইহাতে এই লাভ হয় যে, যাঁর যেখানে ত্রুটি এবং দুর্ব্বলতা আছে, সেটা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তিনি সেটুকু সংশোধন করিবার অবসর পান। কিন্তু দোষগুণ বিচার করিবারও একটা নিয়ম আছে। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ইহাতে বিপিনবাবুর বড় দুর্নাম হইতেছে, এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তের দলের ভক্তি কিছু কমিয়া যাইবে। সকলে ত আর ভিতরের খবর রাখে না। বিপিনবাবুর নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ, তিনি কি ইহার কিছু প্রতীকার করিবেন না ?

এইত সুরেন্দ্রবাবুর "শান্তি-সেচন" লইয়াই কতদূর বাড়াবাড়ি চলিতেছে। স্থানীয় কাগজ উৎসবের সব সঠিক সংবাদ জানা সত্ত্বেও ভাই হইয়া ভাইয়ের বিরুদ্ধে এরূপ লেখালেখি? ইহাকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছাড়া আর কি বলিব? "বন্দে মাতরম্" নামের কি এই সার্থকতা? কয়েকজন পণ্ডিত মিলিত হইয়া সুরেন্দ্রবাবুর স্বদেশ-সেবার দরুণ তাঁহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়া এবং তাঁহার কল্যাণার্থে হোম করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও ত আমাদের আর কয়েকজন দেশবন্ধুকে "রাজা," "মহারাজা" ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। সে বিষয়ে ত কেহ কোন আপত্তি করে নাই। তবে কি সুরেন্দ্রবাবু দেশের সেবায় এতই পশ্চাৎপদ যে, তাঁহার

সব বুঝিতে পারিয়া কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। আর ভিন্নপ্রদেশের কাগজেরাও—বম্বের "মারহাট্টা" এবং পঞ্জাবের "ট্রিবিউন," "নাইট" প্রভৃতি—বেঙ্গলির রিপোর্টারের কাঁচা লেখার দোষ বলিয়া সারিয়া নিলেন। কিন্তু আমাদের সার্থক-নামা "বন্দে মাতরম্" ইংলিসম্যানের সুরে সুর মিলাইয়া "সুরেন্দ্রবাবু রাজা হইয়াছেন" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের চীৎকার রয়টারের সঙ্গে সঙ্গে সাতসমুদ্র-তেরনদী পার হইয়া বিলাতে পৌঁছিল। একে মনসা তায় ধূনার গন্ধ। বিলাতের লোকে বুঝিল ভারতসাম্রাজ্য বুঝি তাহাদের হাত হইতে যায় যায়। সেখানকার সংবাদপত্র সকল দ্বিতীয় সিপাহীবিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া "সাজ সাজ" রব উঠাইলেন। Pall Mall Gazette লিখিলেন,—

" * . * * They know that the Sahibs hold India upon precisely the same tenure as they themselves have held their respective possessions in the past—by the sword. If, then, they hear sedition openly preached and permitted, if they see British goods boycotted and British men and women insulted, if above all they see an absurd Babu not only strong enough to obtain the dismissal of a great British official, but offering, with impunity, a grotesque insult to the sovereignty of the Emperor of India and his representative the Viceroy, what will they think of all this? Surely they will conclude that the Sahibs cannot or will not, depend their own dominion. When we hear the absurd Banerjee reviving the old Hindu and Moslem prejudices with regard to the use of animal matter in the preparation of British goods, we cannot forget the alleged bonedust

Mutiny. The time, then has come for Lord Minto and Mr. Morley to stiffen their backs to pay no attention to the Cottons, the Wedderburns, the Keir Hardies and the Byleses, and all the mischievous brood which flourishes under the projection of the present Government, and to let it be known and felt in India that the law must be kept, that sedition will be punished, and that the mighty hand of the British Raj is not withered nor the stretched out arm withdrawn. In short, there must be no more temporising with Babu disloyalty, let a worse thing come unto India and ourselves. India may be ruled by King Edward or King Banerjee ; but it cannot be ruled by both."

The Daily Telegraph লিখিলেন,—" It will be exceedingly interesting to see what course of action is adopted by the Indian Government and by Mr. Morley, as the Secretary for India, in the matter of the Bengali agitator, Surendra Nath Banerjee. He has just surpassed himself by being crowned and anointed king—whether of India or of Bengal only is not stated—and this mock Coronation ceremony is understood to have taken place in Calcutta. In the old days the shrift of such an imposter would have been short. The Government would either have clapped him under restraint as a dangerous lunatic or ended his days in summary fashion. But now, in the British Empire at any rate, treason is apt to be regarded as a curious eccentricity than as a crime and Banerjee's neck is, no doubt, quite safe. * * * ". " The Daily Mail," " The Evening

বিভীষিকা দেখিতেছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সার হেন্‌রী কটন রয়টারের তারের সংবাদ যে মিথ্যা এবং এই "শান্তিসেচন"-উৎসব যে একটা সাধারণ ঘটনা তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে "বন্দে মাতরম্" লিখিয়াছেন—" * * * But the halting and disingenuous defence that Babu Surendra Nath's *foolish friends* have been publishing, has, it seems to us, clearly but a serious if not, sinister aspect to the whole thing which did not originally belong to it. * * * কিন্তু ইহার মূলে কে, কে তিলকে তাল করিয়াছে, "Bande Mataram" নন কি? এরূপে কি ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরী বসায়?

তার পর কংগ্রেসের সভাপতিনির্ব্বাচনের বিষয় ধরুন। সুরেন্দ্র বাবুর দল যাহাতে বঙ্গ-বিভাগ রহিত হয় তাহার জন্য আবার ষ্টেট্ সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিতে চান। তাই তাঁহাদের পলিসিকে ঠাট্টা করিয়া "বন্দে মাতরম্" এক স্থলে লিখিয়াছেন—" Regeneration by agitation is a delightfully novel idea and the *Indian Mirror* deserves well of the country for having discovered it. 'Shake the patient well twice a day and await results; if no result, shake again; repeat the process until something happens.' These we believe are the directions. The treatment should be varied by occasional applications of petition plaster; moderation pills should be administered once a day to quiet the system; and the patient should be advised to

posture is believed to be very salutary and effective." পরিহাসই সব স্থলে তর্কের জবাব নহে। বঙ্গবিভাগ বঙ্গের পক্ষে অনিষ্টকর এ কথা যখন আমরা মানিয়া লইয়াছি এবং তাহারই জন্ত যখন এত বড় ব্যাপার, তখন এবার দরখাস্ত করিলেই যদি বঙ্গবিভাগ রহিত হয়, তবে দরখাস্ত করিতে আপত্তি কি? আমাদের যে অবস্থা তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমাদের ন্তায্য দাবীগুলি দরখাস্ত দ্বারাই আদায় করিতে হইবে। গায়ের জোরে আদায় করিবার ত আর ক্ষমতা নাই। তবে যেগুলি আমরা নিজে করিতে পারি তাহার জন্ত গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইবার আবশ্তক নাই। নব্যদল এই দরখাস্তের বিরোধী এবং তাঁহারা মহামতি তিলককে সভাপতি করিতে চান। সেজন্ত বিপিনবাবু মফঃস্বলে নানা স্থানে ঘুরিয়া সভাসমিতি আহ্বান করিয়া তিলককে সভাপতি করার চেষ্টা করেন। ওদিকে সুরেন্দ্রবাবু নাকি অভ্যর্থনা-কমিটির মতামত না লইয়াই নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন যে, এবার কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার জন্ত শ্রদ্ধাস্পদ দাদাভাই নৌরজীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন। স্বীকার করি সুরেন্দ্রবাবুরও দোষ থাকিতে পারে। চন্দ্রেরও ত কলঙ্ক আছে। তাই বলিয়া কি লোকে তাহাকে অনাদর করে? একা সুরেন্দ্রবাবুর কিম্বা বিপিনবাবুর কাহারও সভাপতি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা নাই। অভ্যর্থনা-কমিটি নৌরজী কিম্বা তিলক যাহাকেই নির্ব্বাচিত করেন তিনিই হইবেন। এই বিষয় লইয়াই বিবাদ-বিসম্বাদে কাজ কি? ঘরোয়া বিবাদই ভারতের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ। তাহা জানিয়াও কি আমাদের নেতারা এরূপ ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিবেন, না, সকলে একমত হইয়া আপোসে দেশের যাহাতে উপকার হয়, তাহাই করিবেন? যিনিই সভাপতি হউন না কেন,

কন্‌ষ্টিটিউশন্ চান, তাঁহাদের দাবীটা এবার কংগ্রেসে যাহাতে যথারীতি আলোচিত হয়, তাহার চেষ্টা করুন। আমাদের অন্তিম লক্ষ্য আমরা হিমালয়ে চড়িব। কয়েক জনের কাছে কোন্ পথে যাইব জিজ্ঞাসা করাতে কেহ বলিলেন "দার্জ্জিলিং দিয়ে যাও," কেহ বলিলেন "সিমলা হয়ে যাও," অন্য একজন বলিলেন "নাইনিতাল হয়ে যাও" অপর কেহ বা বলিলেন "ওসব পথ ভাল নয়, আমার কথা শুন, ডেলহৌসি হয়ে যাও," ইত্যাদি। এখন আমরা কোন্ পথ দিয়া যাইব, তাহা ঠিক না করিয়া কি লাঠি নিয়া ঝগড়া করিতে যাইব যে, কোন্ পথ দিয়া যাওয়া উচিত? অন্তিম লক্ষ্য যখন হিমালয়ে পৌঁছান, তখন যে দিক দিয়াই যাই না কেন, সেখানে পৌঁছিতে পারিব। তবে যে পথটা সোজা এবং যাহাতে বাধাবিঘ্ন কম, সে পথে যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

গত ৪ঠা আগষ্ট শ্রীযুক্ত গোখলে "লণ্ডন ডেলিনিউসের" প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "গত কয়মাসে পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, ভারতে বৃটিশরাজত্বকালে এরূপ আর দেখা যায় না।" ইহা নিয়া আমাদের সুযোগ্য "বন্দে মাতরম্" তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া লিখিয়াছেন—"It is a matter of painful surprise to us that one who was for some years Professor of History in an Indian College should have the audacity to declare in England that outrages similar to those committed in Eastern Bengal under Sir Bamfylde Fuller have been happily unknown in the annals of British rule in India." তার পর Clive এবং Warren Hastingsএর সময়ের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আবার লিখিয়াছেন—'These instances of British oppression in India to quote only a few will convince

all fair-minded people that Mr. Gokhale's statement is utterly untrue." শেষকালে বিপিনবাবু "নিউইণ্ডিয়া"তে একবার যে বিষয়টার সামান্ত একটু উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"But this must not be raked up. Such things are better to be forgotten." সেইটাই আবার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই কি বুঝা যায় না যে, বিপিনবাবুর নামে অন্য লোকে কাজ করিতেছে? আরও লিখিয়াছেন—Mr. Gokhale's statement to the representative of the 'Daily News" afford one more illustration of the relation between mendacity and fear and of the truth of the remark made by Livingstone who while speaking of the falsehood of the East Africans says: "One can scarcely induce a slave to translate anything truly; he is so intent on thinking of what will please." To turn to the pages and prophets of the East we wish Mr. Gokhale would be guided in his political utterances by the teachings of Manu and Mohammed with reference to truth. While the Indian lawgiver lays down that "one should not speak agreeable falsehood." The prophet enjoins: "Say what is true, although it may be bitter and displeasing to people." আচ্ছা, স্বীকার করিলাম শ্রীযুক্ত গোখলে নয় একটা কথা ভুলই বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা লইয়া এত সোরগোল বাধাইবার কি দরকার? আর কেহ ত এরূপ ইতিহাসের বিদ্যা জাহির করিতে আসেন নাই। হইতে পারে "বন্দে মাতরম্"এর উদ্দেশ্য খুব মহৎ।

সবই অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু দেখাইবারও ত অনেক রকম রীতি আছে। পদে পদে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করা কি ভদ্রোচিত? এখনও দেখিতেছি, প্রতিদিন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা গোখলের নামে উৎসর্গীকৃত হইতেছে। তাঁর নামে অমূলক-সমূলক-নির্ব্বিচারে দোষারোপ হইতেছে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের এত জাতক্রোধ কেন? ইহাই কি নব্যদলের দেশহিতৈষণার লক্ষণ? আমরা বিপিন বাবুকে আবার অনুরোধ করি, হয় তিনি কাগজ হইতে তাঁহার নাম উঠাইয়া লউন, নয় ত ভবিষ্যতে যাহাতে ভালমতে চলিয়া "বন্দে মাতরম্" নাম সার্থক করিতে পারে তার উপায় করুন।

আর এক কথা, আমরা সুযোগ্য সম্পাদকমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, পবিত্র "বন্দে মাতরম্" কি হেলাফেলায় ব্যবহার করার জিনিস্? কোন এংগ্লোইণ্ডিয়ান একজন দেশীয়কে তাচ্ছিল্য করিয়া Mr. Bande Matarm বলিতে পারে। তাই বলিয়া কি আমরা বাঙ্গালীরা কোন সম্পাদককে Mr. Bande Mataram বলিয়া সম্বোধন করিব? যে শব্দ গায়ত্রীমন্ত্রের ন্যায় শুদ্ধ ও পূত, তাহার এরূপ ম্লেচ্ছজনোচিত ব্যবহার করিব? "Bande Mataram" পত্রিকার পরিচালকগণের আচারব্যবহারে ইহাঁদের মধ্যে বিলাতফেরতের ট্যাঁস গন্ধ পাইতেছি। তোমরা নিজেরা নয় লোক-দেখাবার জন্য বিলাতী খোলোসটা ছাড়িয়া দিয়াছ, সৌখীন ধুতি-চাদর পরিয়াছ ও পবিত্র "বন্দে মাতরম্"এর টীকা মাথায় ধারণ করিয়াছ—কিন্তু পদে পদে তার অপমান করিতেছ এবং তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিলাতী অনাচারের দুর্গন্ধ নিঃসরণ হইতেছে। তোমাদের মুখে আবার ভূপেন্ বোসের সোশ্যাল রিফরমের এত ঠাট্টা কেন?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ধর।

ময়মনসিংহ সুহৃদ্-সমিতির জনৈক সভ্য।

নবজীবন।

আসিয়াছি আমি জাগিয়া প্রভাতে
প্রবেশিতে নবজগত-সভাতে,
শুভ্র পুণ্য- বসন অঙ্গে
পরিয়ে দে মা।
করিয়ে আশীস্ শিরে উষ্ণীষ্
জড়িয়ে দে মা।

কর্ম্মের পথ রুধিয়া আমার
দাঁড়ায়ে উচ্চ জড়তা-পাহাড়,
ঠেলিয়া চরণে সে বাধা ভীষণ
সরিয়ে দে মা।
আছে তার পর নিরাশা-সাগর,
তরিয়ে দে মা।

সমরের পথে হইব যাত্রী,
দেহ গো শস্ত্র জগত-ধাত্রী;
প্রীতির ধর্ম্মে অটুটবর্ম্ম
গড়িয়ে দে মা।
তূণেতে আমার শর সাধনার
ভরিয়ে দে মা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ফিরিঙ্গির বাণিজ্য।

মিশরের সুলতান কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন যে, যে প্রকারেই হউক ভারতমহাসাগর হইতে ফিরিঙ্গিবণিকদিগকে বিদূরিত করিয়া নিষ্কণ্টক হইবেন, তাই সুয়েজবন্দরে মহাআড়ম্বরে দ্বাদশখানি বৃহৎ রণতরী নির্ম্মিত হইতেছিল। সুদক্ষ রণপণ্ডিত সেনানায়কগণ অবিলম্বে সেই সকল রণতরী লইয়া ফিরিঙ্গিনিপাতে অগ্রসর হইলেন। ফিরিঙ্গিগণ প্রমাদ গণিল! তাহারা দেখিল, ভিনিসিয়গণ ভারতবর্ষের নৃপতিদিগের ন্যায় নহে, ভিনিসিয় সৈন্য ভারতীয় সৈন্য নহে, সুলতানের রণতরী মুসলমানের রণতরী নহে—ফিরিঙ্গিবণিকগণ বেশ বুঝিতে পারিল "এ সব শত্রু নহে তেমন"; ইহারা সমরকুশল—ইহাদিগের রণতরী সুদৃঢ়, সুসজ্জিত—নানাবিধ যুদ্ধোপকরণে পূর্ণ। কিন্তু ভারতের বাণিজ্য তখন ফিরিঙ্গিদিগের হৃদয়ে নবশক্তি সঞ্জীবিত করিয়াছিল; আল্‌মিদা তখন পর্ত্তুগালের ভারতপ্রবাসী রাজ-প্রতিনিধি। তাঁহার সাহসী পুত্র লোরেঙ্কো-আলমিদা তখন কমলার কৃপায় সিংহল আবিষ্কার করিয়া তথায় পর্ত্তুগীজ-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ফিরিঙ্গিগণ ভারতীয় পণ্যসম্ভারের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিল না—সুলতানের সমরসজ্জা দেখিয়াও তাহারা পশ্চাৎপদ হইল না।

সুলতানের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবামাত্র তিনি ১৫০০ সৈন্যসহ মির-হোসেনকে ফিরিঙ্গি-সমরে প্রেরণ করিলেন। মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রবলপ্রতাপে ফিরিঙ্গিদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য মির-হোসেন ইতিপূর্ব্বেই সুলতানকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি যথাসম্ভব উত্তরবোম্বাইপ্রদেশের সমুদ্রতীরস্থ মুসলমানদিগের

সহিত সংমিলিত হইলেন। ফিরিঙ্গি আলমিদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদি সমগ্র মুসলমান-শক্তি সুলতানের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে ফিরিঙ্গির নাম নিমেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! আর কালবিলম্ব না করিয়া, মির-হোসেনের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত তিনি আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, বিদায়কালে লোরেঙ্কোকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে-প্রকারেই হউক, মির-হোসেনের সহিত মুসলমান-সংমিলন যাহাতে না হয়, তাহা করিতেই হইবে।

লোরেঙ্কো-আলমিদা বয়সে নবীন ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলেন, মির-হোসেন মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিলে, সুলতানের রোষবহ্নি মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিঙ্গিদিগকে ভস্মীভূত করিয়া দিবে—ফিরিঙ্গির সকল আশা-ভরসা নিমেষে সাগর-সলিলে নিমজ্জিত হইবে! লোরেঙ্কো বীর ছিলেন—ফিরিঙ্গির গৌরব-প্রতিষ্ঠাও তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল। গুরুকর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি সম্মুখ-সমরে অগ্রসর হইলেন। পর্ত্তুগীজ-বল তখন চারিদিকে বিচ্ছিন্ন। লোরেঙ্কো নিরুপায় হইয়া স্থির করিলেন, কোনক্রমে মির-হোসেনের পথ রুদ্ধ করিবেন, তাহা হইলে যদি তাঁহার পিতা সৈন্যসমাবেশ করিতে সমর্থ হয়েন। তখন ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না।

সুলতান-সৈন্যের সহিত লোরেঙ্কোর বিষম সংগ্রাম বাধিয়া গেল। লোরেঙ্কো সমর-সভা আহ্বান করিলেন। এই কাল-সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহার সেনাপতিগণ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লোরেঙ্কো সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না—প্রভাতে আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। মুসলমানের অনলবর্ষণে ফিরিঙ্গিগণ প্রতি মুহূর্ত্তেই নিতান্ত বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল! লোরেঙ্কো তখন স্বদেশের গৌরবরক্ষার নিমিত্ত আপন সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে-ছিলেন, অকস্মাৎ শত্রুনিক্ষিপ্ত একটী গোলা আসিয়া তাঁহাকে

ভগ্নপদ করিয়া দিল। লোরেঙ্কো তথাপি নিরস্ত হইলেন না। পাছে তাঁহার সৈন্যগণ ভীত হয়, ভাবিয়া, তাঁহার রণতরীর প্রধান গুণবৃক্ষতলে একখানি কেদারায় কষ্টে উপবেশন করিয়া সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন। আবার বিপক্ষের কামান ঘোররোলে গর্জ্জিয়া উঠিল, আবার গোলা ছুটিল;—একটী তপ্তলৌহ আসিয়া লোরেঙ্কোর হৃদয় ভেদ করিয়া চলিয়া গেল! মুরগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

তাহারা নিমেষমধ্যে লোরেঙ্কোর অর্ণবযানে প্রবেশ করিয়া উহা ডুবাইয়া দিল। হতাবশিষ্ট উনিশ জন ফিরিঙ্গিনাবিক বন্দীকৃত হইয়া ক্যাম্বেনগরে প্রেরিত হইল। মির-হোসেনও বীর ছিলেন; তিনি মহাসমারোহে ফিরিঙ্গি লোরেঙ্কোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহার বীরত্ব-গাথা আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। পরাজিত বিনষ্টগৌরব ফিরিঙ্গিগণ পর্ত্তুগাল-প্রতিনিধি আলমিদার নিকট তাঁহার বীর তনয়ের সংগ্রাম-মৃত্যু-সংবাদ বহিয়া লইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে কোচিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সুলতানের ভীষণ প্রতিশোধ-প্রতিজ্ঞা আবার যেন তাহাদিগের কর্ণে বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বীরতনয়ের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে আলমিদা কম্পিত হইলেন—পুত্রঘাতী অরাতিনিধনের জন্য আবার কৃতসংকল্প হইলেন!

১৫০৬ খৃষ্টাব্দে যখন ত্রিস্তাঁও-দা-কান্‌হা লিসবননগর পরিত্যাগ করেন, তখন আফোনেসা-দা-আল্‌বুকার্কও ছয়খানি পোত এবং ৪০০ শত সৈন্যের অধিনায়কস্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যাত্রাকালে পর্ত্তুগালাধিপ ইমান্নুয়েল আল্‌বুকার্ককে গোপনে বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই ভারতবর্ষের ফিরিঙ্গি-রাজ-প্রতিনিধি হইবেন—আলমিদা তিনবর্ষমাত্র গবর্ণর থাকিবেন।

উচ্চ অভিলাষ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পারস্তউপসাগর এবং লোহিতসাগর পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হরমুজে (Ormuz) একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন; তাঁহার সহকারী ফিরিঙ্গিসেনাপতিগণ আলবুকার্কের কার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হরমুজে দুর্গনির্ম্মাণ পর্ত্তুগালপতির আদেশ নহে। আলবুকার্ক তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করায়, তাঁহারা বিদ্রোহ করিবার উপক্রম কারলেন। তন্মধ্যে তিন জন কালবিলম্ব না করিয়া আলবুকার্কের অজ্ঞাতে ভারতবর্ষে আলমিদার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রধান অধ্যক্ষের নামে অভিযোগ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

আলবুকার্ক মনে করিয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজ-শক্তি যুদ্ধ করিয়া যাহা জয় করিবে, তাহা চিরদিনই পর্ত্তুগালের থাকিবে। তাই ভারতবর্ষে আগমনকালে তিনি আফ্রিকার পূর্ব্বসীমায় পর্ত্তুগীজশক্তি সুরক্ষিত করিয়া লোহিতসাগরের প্রবেশমুখে সকোটরা অধিকার করিয়া লইলেন।

সকোটরার বন্দর তখন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল—মুসলমান-শক্তিই তখন সকোটরায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল—মুসলমান নাগরিকেই তখন সকোটরা পূর্ণ;—মালাবারের সেণ্টটমাস্ খ্রীস্তানের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি আসিয়াটিক খ্রীস্তানও যে সকোটরায় না ছিল এমন নহে। আলবুকার্ক মুসলমানদিগের ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন; খ্রীস্তানদিগকে ক্যাথলিকশাখায় দীক্ষিত করিলেন এবং নির্ব্বিবাদে দীক্ষাগ্রহণের পুরস্কারস্বরূপ মুসলমানদিগের তালকুঞ্জ-সমূহ তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া নিজেও তৃপ্ত হইলেন—খ্রীস্তানদিগকেও তুষ্ট করিলেন! তার পর সকোটরায় একটী সুদৃঢ় দুর্গ

করিলেন—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সকোটরার রক্ষকস্বরূপ থাকিয়া ফিরিঙ্গির বাণিজ্যবিস্তারে মনঃসংযোগ করিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, আলবুকার্কের সেনাপতিদিগের মধ্যে নানাকারণে বিদ্রোহের ভাব দেখা যাইতেছিল। সে সকল অসুবিধাসত্বেও আল্‌বুকার্ক কুরিয়ত (Kuriyat) এবং মস্কট (Muscat) কামানবর্ষণে চূর্ণ করিলেন!

পারস্ত উপসাগরের প্রবেশমার্গে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর ছিল, আলবুকার্ক সে সমুদয় অধিকার করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, একদিকে সকোটরার দুর্গ এবং অপরদিকে হরমুজের দুর্গ, বিনিদ্রপ্রহরীর মত ফিরিঙ্গির বাণিজ্যপথ বহুদূর পর্য্যন্ত রক্ষা করিত। কালে হইয়াছিল তাহাই। হরমুজ-অধিপতি অবশেষে আল্‌বুকার্ক-প্রদত্ত সন্ধিসর্ত্তে সম্মত হইয়া বানকাক্ষরে * একখানি সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন, 'প্রধান সেনাপতি আপন শক্তি-প্রভাবে আমাকে হরমুজের সিংহাসন হইতে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, আমি আবার তাঁহার নিকট হইতেই সকল অধিকার ফিরিয়া পাইলাম। তাঁহার অধীনে যত সৈন্ত আছে তাহাদিগের বেতন আমি বর্ষে বর্ষে পর্ত্তুগালাধিপকে রাজকরস্বরূপ প্রদান করিব।' সন্ধিপত্র পাইয়া আলবুকার্কের অভিলাষ পূর্ণ হইল—ফিরিঙ্গির ইতিহাসে একটী নূতন চিত্র লিখিত হইল!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলবুকার্কের তিনজন বিদ্রোহী সেনাপতি আলমিদার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহাদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া আলমিদা হরমুজের অধিপতি সৈম-অল্‌দ্দিন ও তথাকার শাসনকর্ত্তা খোজা আতরের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, 'রাজার নামে আলবুকার্ক যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছেন,

তাহার জন্য তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।’ খোজা আতরের নিকট আলমিদার পত্র দেখিয়াই আলবুকার্ক বুঝিলেন, আলমিদার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে! কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না;—রাজা ইমানুয়েল গোপনে ভারতের শাসনভার তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া আলবুকার্কের সাহস ছিল। যাহা হউক, আলবুকার্ক আপনার ইচ্ছামত হরমুজে দুর্গনির্ম্মাণ করিলেন—হরমুজের অধিপতিকে আপনার সুবিধাজনক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিলেন, এবং তদ্দেশে পর্ত্তুগাল-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে উপনীত হইলেন।

আলমিদা তখনও পুত্রশোক বিস্মৃত হন নাই; তাঁহার অকুতোভয় বীরতনয়ের বীরের ন্যায় সংগ্রাম-মৃত্যু প্রতিমুহূর্ত্তেই আলমিদাকে পুত্রহন্তার শাস্তিবিধানে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছিল। আলমিদা যখন দিউনগর আক্রমণ করিয়া মুসলমানদিগকে চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষ হইতে উৎখাত করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, আলবুকার্ক সেই সময় ভারতে আসিয়া উপনীত হইলেন। আলবুকার্ক আসিয়াই আলমিদার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নরপতি ইমানুয়েলের আদেশ জ্ঞাপনপূর্ব্বক ভারতবর্ষের শাসনভার প্রার্থনা করিলেন, এমন কি, তাঁহার “বেলেম” পোত দেখাইয়া বলিলেন, আলমিদার পক্ষে বেলেমে আরোহণ করিয়া লিসবনে প্রত্যাগমনই সুবিধা হইবে! নরপতি ইমানুয়েল তখন সাতসমুদ্র-তেরনদী-পার, আলবুকার্কের মুখে শুনিয়াই কি আলমিদা ভারতবর্ষের আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন? তিনি পর্ত্তুগাল-সিংহাসনতলে আবেদন করিলেন, আলবুকার্কের ঔদ্ধত্য ও নরপতির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন প্রভৃতি লিখিয়া অভিযোগও করিলেন। কি জানি, যদি এত করিয়াও ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতে হয়—যদি আলবুকার্কই সত্য সত্য ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হয়েন, আলমিদা তাই নানা উপায়ে প্রভূত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে

লাগিলেন! এতকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া কোন্ মূর্খ রিক্তহস্তে আপনার পর্ণকুটীরে নিতান্ত ভিখারীর বেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে? শোষণ করিবার জন্য অনন্ত সুধা-সমুদ্র সম্মুখে থাকিতে কোন্ মূঢ় পিপাসা-কাতর-তপ্ত-শুষ্ককণ্ঠে পুনরায় মরুভূমির আশ্রয় গ্রহণ করে? আলমিদা মূর্খ ছিলেন না—তিনিও তাহা করিলেন না!

মিরহোসেন তখন দিউনগরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আলমিদা উনিশখানি রণতরী এবং ১৬০০ সৈন্য লইয়া রণযাত্রা করিলেন। ফিরিঙ্গিগণ অঞ্জদ্বীপ হইতে দভোলবন্দরে উপনীত হইয়া মহা-সমারোহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দভোলবাসিগণ, যাহারা পারিল, পর্ব্বতে-কাননে পলায়ন করিল। ১৫০০ শত দভোল-বাসীর তপ্তশোণিতে রঞ্জিত হইয়া আলমিদা নগরলুণ্ঠনের আদেশ প্রদান করিলেন; ফিরিঙ্গিদিগের দুর্ভাগ্য যে, অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড হইয়া দভোল ভস্মসাৎ হইয়া গেল! ইতিহাস অতীতের সাক্ষী। সেই ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছে, পাছে ধনরত্নের লোভে ফিরিঙ্গিগণ আলমিদার অনুগমন করিতে অসম্মত হয়, এই কারণেই তিনি শেষে দভোল ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এদিকে তখন মালিক-আজ এবং মিরহোসেন ২০০ শত যুদ্ধোপ-যোগী অর্ণবযান লইয়া আলমিদার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রমত্ত আলমিদা ভীমবেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ফিরিঙ্গির সেই অপ্রতিহত বেগ মিরহোসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আহত হইয়া পরাজয়বার্ত্তাবহস্বরূপ ক্যাম্বেরাজের নিকট গমন করিলেন! তাঁহার ৩০০০ সহস্র সৈন্য মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া ফিরিঙ্গিবিজয় বিঘোষিত করিল। আলমিদা শত্রুর নৌবহর লুণ্ঠন-পূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন—কেবল চারিখানি বৃহৎ ও দুইখানি ক্ষুদ্র পোত ফিরিঙ্গি-সেনার নিমিত্ত রক্ষিত হইল। সুলতানের ও

মিরহোসেনের বিজয়পতাকা, বিজেতা সেনাপতির সগৌরব অভিনন্দন-স্বরূপ পর্ত্তুগালরাজসিংহাসনতলে প্রেরিত হইল!

দিউবন্দরের নৌযুদ্ধ যুদ্ধের ইতিহাসে ক্ষুদ্র বটে—শোণিতপাতের হিসাবে সামান্য হইতে পারে—কিন্তু ফিরিঙ্গির ইতিহাসে একটী অতি স্মরণীয় ঘটনা, ফিরিঙ্গির গৌরবের ইতিহাসে অতুলনীয়! আসিয়াখণ্ড হইতে সেদিন যে গৌরব-রবি সুনীলসাগরতলে হতাশে ডুবিয়া গিয়াছে, আর তাহা উদিত হইল না! মুসলমানগণ তখন হয়ত বুঝিতে পারিয়াছিল না যে, ফিরিঙ্গির নিকট পরাভূত হইয়া তাঁহারা সমগ্র ভারতীয় বাণিজ্যকে হত্যা করিয়াছেন! এতদিন যে বাণিজ্যলক্ষ্মী আসিয়াখণ্ডে পূজা পাইতেছিলেন, দিউএর যুদ্ধের পর হইতেই তিনি খ্রীষ্টরাজ্যের নিকট বাঁধা পড়িলেন! ফিরিঙ্গির অত্যাচার সহ্য করিয়াও আসিয়ার নৌ-শক্তি এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর পর আর পারিল না! সেই শক্তি নিতান্ত হতগৌরব হইয়া ম্লানমুখে খ্রীষ্টরাজ্যের সম্মুখে নতজানু হইল—মুসলমান-বাণিজ্য এতদিনে সত্য সত্যই বিলুপ্ত হইল—ক্রুশ এতদিনে কোরানকে পরাজয় করিল! সে পরাজয় শুধু মুসলমানের হইয়াছিল না, হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেক ভারতবাসীই সেই পরাজয়ের ফলভোগ করিয়াছিল! ভারতমহাসাগর এতদিন পর, বহুকালের জন্য ফিরিঙ্গির লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল—এতদ্দেশীয় আন্তর্জাতিক বিষাদ ও হীন স্বার্থপরতা তাহার অন্যতম কারণ। তাই বলিয়াছি, দিউবন্দরের জলযুদ্ধ ক্ষুদ্র হইলেও ফিরিঙ্গির গৌরবের কাহিনী—ফিরিঙ্গির সুপ্রতিষ্ঠার কাহিনী—ফিরিঙ্গির নৌ-শক্তি যে বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতমহাসাগরে অজেয় ছিল, তাহারও কাহিনী। শুধু ইহাই নহে, সে যুদ্ধ সুলতানের পরাজয়ের কাহিনী—ভারতের ফলভোগের কাহিনী, তাই ফিরিঙ্গির ইতিহাসে অতি স্মরণীয়,

সুলতানের অদৃষ্ট সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়াছিল; দিউএর পরাজয়ের কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার রাজ্য, সিংহাসন সমস্তই গেল। প্রথম সেলিম, মিসর, সিরিয়া এবং পেলেস্তাইন করায়ত্ত করিয়া লইলেন। ফিরিঙ্গিরাও যেমন মির-হোসেনকে পরাজয় করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল না, এখন সেলিমও তেমনি সুলতানের মত ফিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন! হায়, যদি উভয় সুলতান সময় থাকিতে সংমিলিত হইতেন—তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের পার্থক্য ছিল না, জাতিগত পার্থক্য ছিল না—যদি তাঁহারা বিদ্বেষ ভুলিতে পারিতেন—যদি সময় থাকিতে এক সুলতান অপর সুলতানকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন! বিধিলিপি অবশ্য ঘটে। তাই অল্পকাল পর যখন তুর্কী এবং ভেনেসিয়গণ আপন আপন দ্বন্দ্ব-কলহ বিস্মৃত হইয়া, বিদ্বেষ ভুলিয়া, ফিরিঙ্গিকুলকে উৎখাত করিবার জন্য একমনঃপ্রাণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল—ভারতের বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার জন্য জীবনপণ করিয়াছিল, তখন কোনই ফল হইল না! প্রথম, সেলিম ভেনিসিয়দিগকে সর্ব্বস্থানে বাণিজ্যের পূর্ণঅধিকার প্রদান করিয়াছিলেন—প্রতীচ্যের পণ্যসামগ্রী আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আনীত হইলে, রাজবিধি তাহাতে কোনই বাধা প্রদান করিত না—কিন্তু লিসবনের পণ্যের উপর রাজকরের গুরুভার চাপিয়া পড়িল।

ফিরিঙ্গির বাণিজ্য তাহাতে মরিল না, কারণ তাহারা জলপথে অতি সহজে অল্প আয়াসে বহুমূল্য পণ্য বহিয়া লইয়া য়ুরোপে বিক্রয় করিতেছিল—য়ুরোপীয় বাণিজ্যে তাই ভেনিসিয়দিগের স্থান দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। ক্যাম্বের অভিশপ্ত সন্ধিসূত্রে ভেনিসিয়গণ প্রতিদিন হতগৌরব, হীনশক্তি হইয়া যাইতে লাগিল। শেষে এমন দিনও আসিয়াছিল, যখন ভেনিসিয়গণ মসল্লা বিক্রয়ের জন্য পর্ত্তুগালসিংহাসনতলে আবেদন জানাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

শত্রুবিজয় করিয়া আলমিদা বিজয়গৌরবে কোচিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহার এক চিন্তা রহিল—আলবুকার্ক! আলবুকার্ক যাহাতে ভারতের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিতে না পারেন, আলমিদা তাঁহার সহকারী সেনাপতিদিগের সহিত তাহার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

কোচিনরাজ একটা সুযোগের অনুসন্ধানে ছিলেন। তিনি দেখিলেন, বর্ত্তমান ও ভাবী রাজপ্রতিনিধির মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন উভয়েই আপন আপন শক্তি-প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত—বাণিজ্যের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। তিনি সময় বুঝিয়া মাল-রপ্তানী বন্ধ করিয়াছিলেন। কোচিনরাজ ফিরিঙ্গিদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন না! চিনিলে হয়ত এরূপ বিবেচনা করিতেন না। ফিরিঙ্গি কোন দিন বাণিজ্যকে বিস্মৃত হয় না, আলমিদাও হইয়াছিলেন না। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র আলবুকার্ককে কিছুদিনের জন্য ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কোচিনরাজ সময় বুঝিয়া অবিলম্বে আলবুকার্কের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পর্ত্তুগালে দূত প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন।

আলমিদা সে সংবাদও পাইলেন,—তথাপি আপনার শাসনকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিলেন না। তিনি একেবারে শেষের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কর্ত্তৃত্বলিপ্সা আলমিদাকে এতদূর অন্ধ করিয়াছিল যে, তিনি সত্যাসত্য বিচার না করিয়া আলবুকার্কের বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইতে প্রয়াস পাইলেন—যাহাতে তাঁহার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়—আলবুকার্ক যাহাতে কোচিনরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও না পারেন, আলমিদা তাহারই বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

লোভ হইতে চিরদিনই পাপ আসে। আলমিদা ও আলবুকার্কের

কলঙ্ক-মলিন! আলমিদার লোভ ছিল, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিল। তিনি আলবুকার্কের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিলেন! আলবুকার্ক যে বিদ্রোহী, আলবুকার্ক যে গোপনে সামুরীরাজের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে ফিরিঙ্গির উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, আলমিদা এই সমস্ত বলিয়া আলবুকার্কের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিলেন। শুধু ইহাই নহে। পাপের পথ চিরদিন পিচ্ছিল। আলমিদা সেই পিচ্ছিল পথে প্রতিদিন নিম্ন হইতে নিম্নে নামিতে লাগিলেন। বিদ্রোহী বলিয়া আলমিদা কন্নন্ধরদুর্গে আলবুকার্ককে বন্দী করিয়া রাখিলেন—তাঁহার বাসগৃহাদি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন! যে ব্যক্তি আলবুকার্কের পক্ষাবলম্বন করিবেন, আলমিদা তাহাকেই কারারুদ্ধ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আলমিদার পার্শ্বচরগণ ভিন্ন আর সকলের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কি জানি, যদি আলবুকার্কের পক্ষ হইয়া তাহারা কোন বিবাদ ঘটায়! আলমিদা স্বজাতিদলনেরও ত্রুটী করিলেন না। যে সকল ফিরিঙ্গিবণিকদিগকে তিনি আলবুকার্কের বন্ধু বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে কারাকক্ষে নিক্ষেপ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ছাড়িলেন না! পত্রাদি জাল করিয়া আলবুকার্ককে অপদস্থ, অপমানিত ও পর্ত্তুগাল-সিংহাসনের বিরক্তিভাজন করিবার প্রয়াসও শৈশবেই মরিয়া গেল। এত করিয়াও যখন কিছু হইল না, তখন ভারতবর্ষশাসনের ইচ্ছা তাঁহার এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি পাকেচক্রে আলবুকার্ককে বিষ-প্রয়োগে নিহত করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন! এইরূপে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিয়াও আলমিদা ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন না। আলবুকার্কের ভ্রাতুষ্পুত্র মার্যাল-ডন-ফার্ণান্দো-কৌটিন্‌হো পর্ত্তুগাল-নৃপতির আদেশপত্র লইয়া একদিন অকস্মাৎ কন্নন্ধরে আসিয়া উপনীত

এতদিনে আলমিদা দেখিলেন আর তাঁহার কোন ভরসা নাই। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, বিনাবাক্যব্যয়ে আলবুকার্কের হস্তে ভারতবর্ষ সমর্পণ করিয়া নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে কোচিন ত্যাগ করিলেন। •

পরমেশ্বর দুষ্কৃতের দমন করেন; আলমিদার পাপেরও শাস্তি না হইয়াছিল এমন নহে। লিসবনে প্রত্যাগমনকালে সাল্‌দানা-উপসাগরের তীরে আলমিদার অনুচরদিগের সহিত তথাকার নিরীহ অধিবাসিবৃন্দের কলহ উপস্থিত হইলে, আলমিদার একজন ভৃত্য, দুইজন নির্দ্দোষী নিতান্ত নিরীহ অধীবাসীকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেওয়ায়, তাহারা সেই দাম্ভিক ভৃত্যের দন্তপাটি উৎপাটন করিয়া দিল। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বয়ং আলমিদা পারিষদবর্গের অনুরোধে লোকজন সঙ্গে করিয়া তীরে অবতরণ করিলেন, কিন্তু দূর-নিক্ষিপ্ত একটী তীক্ষ্ণ বর্শা তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিল। আলমিদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। আপনার তপ্তশোণিতে সেই জনহীন বালুময় বেলাভূমি রঞ্জিত করিয়া আলমিদা পাপের বোঝা নামাইলেন—দুস্তর সাগর সফেন তরঙ্গ তুলিয়া ভৈরবগর্জ্জনে দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া আলমিদার শেষ আর্ত্তকণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দিল। ধর্ম্মের জয় হইল—পাপের পরাজয় হইল!

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

"আশা-নিরাশা-দুরাশা"।

আশা ধায় পিছু পিছু, দুরাশা সম্মুখে,
নিরাশা নীরবে ভাবে বসিয়া উন্মুখে।
আশা হ'তে উচ্চতর যায় সে দুরাশা,
বিফলে সে যায় আগে হইতে নিরাশা।
আশা বলে এই দূর, দুরাশা অদূর,
নিরাশা ভাবিছে এবে নহেত সুদূর।
আশা চলে হিমশিরে, দুরাশা আকাশে,
নিরাশা কেবল তাই ভাবে আর হাসে।
কতদূর যাবি তোরা ও দুরাশা আশ,
টানিছে চুম্বক হেথা লইয়া নিরাশ।
লক্ষ্যচ্যুত হয়ে আশা লইয়ে দুরাশ,
আসিতেছে ধীরে ধীরে হইয়ে উদাস।
নিরাশার আশা হয়, আশার নিরাশা,
বিধি ভিন্ন কেবা পারে ভেদিতে সমস্যা।

শ্রীনিশিকুমার সেন।

পাণিনি-প্রচার।

(কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক।)

ছাত্র। না Sir, সংস্কৃতব্যাকরণের কথা আর বলিবার নয়। সে বড়ই কঠিন। আমি দিবারাত্র যত সময় পাড়ি, তার তৃতীয়াংশই সংস্কৃতে ব্যয় করি। মাথামুণ্ডু আমি মুখস্থ করি, আর অমনি ভুলিয়া যাই। দু' এক সময় বুঝ্‌তে চেষ্টা না করি, এমন নহে। কিন্তু, সে প্রণালীতে পড়িয়া পাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহাতে রঘুবংশের একটি শ্লোক পড়িতেই সারাদিন লাগে। ভট্টির কথা আর কি বলিব। তাই পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া, সে চেষ্টা এক-প্রকার ছাড়ানই দিয়াছি। মুখস্থই সব করিয়াছি, দেখি যদি যেন-তেন-প্রকারেণ পাশটা হইতে পারি। শুনা যায়, কেবল ইংরাজী Translation ও Explanation ভাগের উত্তর দিয়াও অনেকে পাশ হইয়াছে। আর পাশভিন্নও সংস্কৃতদ্বারা কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। কারণ, উহা Dead Language.

অধ্যাপক।—বুঝিলাম। আচ্ছা, তোমার কোন সংস্কৃতব্যাকরণ আছে ?

ছাত্র। আজ্ঞে, ছিল। এক্ষণে তাহা নাই। এণ্ট্রান্স ক্লাসে একখানি ছিল, তা পাশ করিয়াই জনৈক বন্ধুকে দিয়া ফেলিয়াছি।

অধ্যা। ভাল, তুমি "নর"শব্দের রূপ জান ?

ছাত্র। আজ্ঞে, জানি।

অধ্যা। লিখ দেখি, "নর"শব্দের তৃতীয়ার একবচনে, ষষ্ঠীর ও সপ্তমীর বহুবচনে কি হয় ?

অধ্যা। বেশ। "মুনি"শব্দের রূপও বোধ হয় জান?

ছাত্র। আজ্ঞে, হাঁ।

অধ্যা। লিখ ত, "মুনি"শব্দের দ্বিতীয়ার, ও ষষ্ঠীর বহুবচনে কি রূপ হয়?

ছাত্র (লিখিল)। মুনিন্, মুনিনাম্।

অধ্যা। "স্ত্রী"শব্দের সপ্তমীর একবচনে?

ছাত্র (লিখিল)। স্ত্রীয়াম্।

অধ্যা। আচ্ছা, ভূধাতুর রূপ জান? লিখ দেখি, লিট্ 'অ' ও লুঙ্ 'দ' বিভক্তিতে উহার কি রূপ হয়?

ছাত্র (লিখিল)। বভুব, অভুৎ।

অধ্যা। দেখ, আমার বিবেচনায়, অবিলম্বেই তোমার একখানা সংস্কৃতব্যাকরণ সংগ্রহ করা উচিত। কোন বন্ধুর নিকটে পাও ত ভাল, নতুবা কিনিতেই হইবে, অসন্তুষ্ট হইও না। উহাকে তুমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পারিবে, তবু উহার নূতনত্ব যাইবে না।

ছাত্র। আজ্ঞে, আমি বড় গরিব। তা—উহার মূল্য কত?

অধ্যা। অনূর্দ্ধ ৪৲ টাকা।

ছাত্র। বা-পৃ রে! সংস্কৃত বহির এত দাম!

অধ্যা। কেন হে, বাপু! গণ্ডায়-গণ্ডায় মুটো মুটো টাকা ইংরাজী বহিতে ফেল্‌তে পার, আর একখানি প্রয়োজনীয় সংস্কৃত বই কিনিতেই "বাপ্‌রে ডাক্"।

ছাত্র। আজ্ঞে, আপনাদের বড় রাগ।

অধ্যা। সে অন্যায় কি? অনুরাগ হইতেই রাগ আসে। তুমি না-জেনে-শুনে গাছে-মাছে একটা কথা বলে ফেল্‌লে, আর আমি অম্‌নি তাহা পকেট করিলাম। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা খাটি (খাঁটি?) লোক। বাক্যামৃত হওয়া তাহাদের কুষ্ঠিতে লিখা নাই।

ছাত্র। আচ্ছা, Sir, একখানি সংস্কৃতব্যাকরণ কিনিব।

অধ্যা। বেশ কথা। পথে এস। উহাতে প্রকৃতি-প্রত্যয় দেওয়া আছে। শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। প্রচলিত শব্দসমূহের লিঙ্গও আছে। তোমার বেশ সুবিধা হইবে। অন্যদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কিনে ফেল। আবার কাহাকেও উহা দিয়া ফেলিও না। উহা চিরকাল তোমার কাযে আসিবে। উহা Dead Languageএরই ব্যাকরণ, সুতরাং আর Obsolete হইবার আশঙ্কা নাই।

ছাত্র। আজ্ঞে, সংস্কৃতে ব্যাকরণও ত অনেকগুলো! তা কোন্‌খানা কিনিব?

অধ্যা। বিষম সমস্যাই বটে। মুগ্ধবোধ, কলাপ, সারস্বত, সুপদ্ম-প্রভৃতি বহুব্যাকরণ আছে। তা,—উহাদের সকলেই পাণিনিমূলক। সুতরাং তোমাকে একখানা পাণিনি কিনিতেই আমি বলি।

ছাত্র। Sir, 'পাণিনি'শব্দটী, শুনিয়াছি, ব্যাকরণ-রচয়িতা একজন মুনির নাম। আর আপনি আমাকে 'পাণিনি' ক্রয় করিতে বলিলেন। সে কেমন ক'রে হয়?

অধ্যা। তোমরা Shakespeareএর Worksকে Shakespeare বলিয়া থাক, Miltonএর Worksকে Milton এবং, Cowperএর Worksকে Cowper বল। সংস্কৃতেও 'শকুন্তলা' 'রত্নাবলী' (মুদ্রা) 'রাক্ষস' প্রভৃতি মানুষের নামে কাব্যগুলির নামকরণ হইয়াছে। ইহাকে ইংরেজীতে Transferenc of Epithet, এবং সংস্কৃতে অভেদোপচার (অভেদকল্পনা) বলা যায়। সুতরাং 'পাণিনি' বলিলে, প্রসঙ্গক্রমে যেমন পাণিনিমুনিকে বুঝাইবে, প্রসঙ্গান্তরে তেমন পাণিনিকৃত ব্যাকরণকেও বুঝাইতে পারে।

ছাত্র। Sir, পাণিনি পড়িতে হইবে শুনিয়া, মনে বড় ভয় হয়। উহা কি আমি বুঝ্‌তে পারবো?

অধ্যা। বুঝিবে না কেন? বৎস, অবশ্যই বুঝিবে। আর কোনও বিষয় নুতন পড়িতে, মহাপুরুষদের সঙ্গ ধরাই ভাল। সাধু-সঙ্গে থাকিয়া, অসাধুও সাধু হয়। অকর্ম্মাও কর্ম্মঠ হয়। বহ্নিযোগে অঙ্গারও সুবর্ণ হয়। উপসর্গবলে অকর্ম্মকক্রিয়াও সকর্ম্মক হয়। তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, মহাজনের সঙ্গে থাকিয়া তুমিও মহান্ হইবে। কিন্তু, একটি সংকেত মনে রাখিও। কঠিন বিষয় পড়িতে সর্ব্বদাই "Read by predilection"। পুস্তকের যে যে অংশ, এমন কি, যে যে কথাটী, তোমার ভাল লাগে, সর্ব্বাগ্রে সে সমুদয়ই পড়িবে। কাব্য পড়িতে পড়িতে যখন যখন ঠেকিবে তখন তখনই ব্যাকরণ দেখিবে। না-জানা বিষয় জানিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সমুদয় তোমার একটু একটু জানা আছে, সে সমুদয়কে ভালরূপে জানিবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি অনেক জান। তুমি ব্যাকরণেরও অনেক বিষয় জান, কিন্তু ভালরূপে জান না। ঐ অল্প-অল্প-জানা বিষয় পড়িতে তোমার যেমন ঔৎসুক্য হইবে, একেবারে অজ্ঞাত-বিষয় পড়িতে তোমার তদ্রূপ আগ্রহ হইবে না। সুতরাং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে পদার্পণ না করিয়া, যে ক্ষেত্র তোমার ন্যূনাধিক পরিচিত, সেই ক্ষেত্রেই বিচরণ করিতে অভ্যাস কর। দেখিবে, তথায় প্রায় সকলেই তোমার পরিচিত, সকলেই তোমার বহুদিনের বন্ধু। মনের আনন্দে বন্ধুদের সহিত বন্ধুত্ব দৃঢ় করিতে করিতে তাহাদের প্রসাদেই অপরিচিতের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইবে। সুতরাং সংস্কৃতব্যাকরণের নামেই ভীত হইও না। একখানা ব্যাকরণ ক্রয় করিয়া শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধি ও ণত্ব-ষত্বের কেবল পাতা উল্টাও। ইহারা সকলেই তোমার পরিচিত,—চিরপরিচিত। ইহাদিগকে ভয় করা কেবল তোমার কাপুরুষতার কার্য্য নহে, তোমার

ঘন-পরিচয় করিতে বলিলাম, পাতা উল্টাইতে বলিলাম—ইহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিও না। কারণ, এরূপে অনেক সুপরিচিত তোমার আত্মীয় হইবে, অনেক অপরিচিত সুপরিচিত হইবে, অনেক অজ্ঞাত পরিচিত হইবে। এবং আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, মহাপুরুষদের সহিত এরূপ ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাতে তুমি অকস্মাৎ তাঁহাদের অসাধারণ ধরাটা বুঝিয়া ফেলিবে। দেখ, বঙ্গভাষা বহুকাল যাবৎ, নানাদেশীয় নানাশব্দের সহিত প্রণয় করিতেছে, ইহাতে বঙ্গভাষার নিত্য নূতন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ভালই। কিন্তু, সংস্কৃতভাষাই বঙ্গভাষার দিদিমা। বঙ্গভাষা যদৃচ্ছা (যতদুর ইচ্ছা) সুন্দরী হউক না কেন, উহা উহার দিদিমার সাবেক হাড়পেশীখানির রূপান্তরমাত্র। বালিকা চঞ্চলা ও বর্দ্ধিষ্ণু বটে, কিন্তু, দিদিমা তদ্রূপ নহে। দিদিমা সার্‌ল্টি (সার-টী) কাঠ, দিদিমা স্থিরা। সুতরাং সংস্কৃত পাঠ করিলে, কেবল Dead Language শিখিলে, এমন নহে, প্রচলিত বঙ্গভাষার তত্ত্বগুলিও শিখিতে পারিলে। 'রথ-দেখা ও কলা-বেচা' (বিক্রী) এক কর্ম্মে দুই ফলই ফলিল, ভাল নয় কি? 'রথ দেখার' ফল গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিলে, বরং একগুলিতে দুই পাখী মারিলে, তা'ত ধর্ম্মানুগত!

ছাত্র। বুঝিলাম, Sir, পাণিনি পড়িব। কিন্তু, 'মহাপুরুষদের' কথা বলিলেন কেন? গৌরবে বহুবচন হইয়াছে কি?

অধ্যা। গৌরবেও বহুবচন হয়, বটে। যেমন, 'শ্রীচরণেষু'। কিন্তু, এস্থলে বহুবচনের সে অর্থ নহে। পাণিনিব্যাকরণ মুনিত্রয়-কর্ত্তৃক বর্ত্তমানাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। উহাদের নাম পাণিনি, কাত্যায়ন (বররুচি) ও পতঞ্জলি। পাণিনিমুনির অষ্টাধ্যায়ী, কাত্যায়নের বার্ত্তিকসূত্র (Supplementary rules) এবং পতঞ্জলির ইষ্টি (Implications) এবং ভাষ্য (Commentary) ...

সূত্রগুলিই এক্ষণে পাণিনিব্যাকরণ নামে পরিচিত। ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়কারিকাতে ভাষ্যকারের মত উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, কৈয়ট, পতঞ্জলিভাষ্যের টীকা করিয়াছেন। টীকার নাম ভাষ্যপ্রদীপ। আবার, নাগোজিভট্টের ভাষ্যপ্রদীপোদ্যাতনামে একটী টীকা আছে। ভট্টোজিদীক্ষিত পূর্ব্বে শব্দকৌস্তুভনামক অষ্টাধ্যায়ীর এক বিস্তৃত টীকা করেন। অনন্তর, তিনি তৎকালে প্রচলিত মুগ্ধবোধের প্রণালী অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী লিখেন। ইহাতে তিনি পাণিনির সূত্রগুলিকে প্রকরণ-অনুসারে যথাসম্ভব বিভক্ত করিয়া, সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বৃত্তি ও উদাহরণ দিয়াছেন। তাহাতেও যেন পরিতৃপ্ত না হইয়া, প্রৌঢ়মনোরমানামে স্বকায় সিদ্ধান্তকৌমুদীর এক টীকাও লিখিয়াছেন। মনোরমারও এক টীকা আছে, তাহার নাম লঘুশব্দরত্ন। ইহা ভট্টোজিদীক্ষিতের পৌত্র হরিদীক্ষিতকৃত। প্রৌঢ়মনোরমা ও তদ্ব্যাখ্যা ভিন্ন, সিদ্ধান্তকৌমুদীর আরো একটী টীকা আছে, তাহার নাম শব্দেন্দুশেখর। তাহা, বোধ হয়, আবার গুরুলঘুভেদে দুইখানি। ইহার গ্রন্থকার নাগেশভট্ট। শব্দেন্দুশেখর ও প্রৌঢ়মনোরমার সার গ্রহণপূর্ব্বক, সিদ্ধান্তকৌমুদীর এক অভিনব টীকা হইয়াছে, তাহার নাম তত্ত্ববোধিনী। সিদ্ধান্তকৌমুদীর আর একটী ব্যাখ্যা আছে, উহার নাম ভাবপ্রকাশ। উহা মধ্যদেশীয় শ্রীকৃষ্ণভট্টপ্রণীত।

ছাত্র। গুরুদেব, এতগুলি টীকা-টিপ্পনীর কথা শুনিয়া, আমার হাত-পা যেন অবশ হইয়াছে, মুখ শুষ্ক হইয়াছে। সাশহৃদয় নিরাশ হইয়াছে। অধিক কি বলিব, দেব, আমার যেন চিত্তভ্রমি হইতেছে। তবে কি, আমি সংস্কৃতব্যাকরণ পড়িতে পারিব না?

অধ্যা। অবশ্যই পারিবে, বৎস, অবশ্যই পারিবে। ধৈর্য্য ধারণ

পথ অনুসরণ কর, অবশ্যই পারিবে। বৎস, ভয় কি? নদীতে ঢেউ দেখে', কূলেই কি নৌকা ডুবাইতে আছে?

ছাত্র। দেব, আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পাণিনিব্যাকরণই প্রচলিত ব্যাকরণগুলির আদ্য, এবং সর্ব্বগ্রাহী ব্যাকরণ। তজ্জন্যই মহাপুরুষেরা তাহার এত টীকা করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাকরণের কথা আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে তাহারা অসম্পূর্ণ ও পাণিনির ছায়া-মাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়।

অধ্যা। বৎস, অন্যান্য ব্যাকরণের কথা তুলিলে বলিয়া, এ প্রসঙ্গে আমাকে আরো একটী কথা বলিতে হইল। মুগ্ধবোধব্যাকরণ, কলাপাদি ব্যাকরণ হইতে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ বটে। কিন্তু, উহাতে এমন অনেক সূত্র আছে যে, তাহাদের একটী একশ্বাসে উচ্চারণ তোমার দুঃসাধ্য। আর, তার মধ্যে কৃত্রিম নামের ছড়াছড়ি বড় বেশী। এরূপ নামের মাহাত্ম্যে পুস্তকের আকার সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু, সূত্রগুলির উচ্চারণ বড় বিটকাল হইয়াছে। অনেক সময় 'উট্‌কেশ্বর চট্‌কি'র মত ধ্বনি হয়। যেখানে উচ্চারণ সুকর, সেখানে অর্থও যেন 'হ য ব র ল'র মত হয়। যাহা হউক, বোপদেব মহা পণ্ডিত ছিলেন, তদ্‌বিরচিত মুগ্ধবোধও আমাদের শিরোধার্য্য।

ছাত্র। টীকাটিপ্পনী ভিন্ন, মুগ্ধবোধও নাতিবৃহৎ পুস্তক বটে। ছোটকালে, আমি উহার কয়েকটী সূত্র পড়িয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, শব্দগুলি দন্তস্ফুট হইলেও তাহাদের অর্থাবগতি কিছুতেই হইতে চায় না। আমরা মল্লিনাথ ও জয়মঙ্গল প্রভৃতির টীকাতেও পাণিনিসূত্রই পাইয়া থাকি, তাহারা ছোট ছোট বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষতঃ উহাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সাহায্য হইবে। এক্ষণে কোন্ পুস্তক পড়িব, তাহাই বলিয়া দিন।

পাণিনিসূত্রের টীকা, 'তস্যা টীকা, তস্যা টীকা' ইত্যাদি অনেক টীকার কথা বলিয়াছিলাম। 'টীকার টীকা, তস্যা টীকা' পড়িতে হইবে মনে করিয়া তুমিও অধীর হইয়াছিলে, কাজেই আমি পাণিনির আর এক খানা ভাল পুস্তকের কথা তুলিতে অবসর পাই নাই। উহার নাম কাশিকা (বৃত্তি), উহা জয়াদিত্য ও বামন আচার্য্যের মিলিতকার্য্য। তাহার প্রথম-দ্বিতীয় ও পঞ্চম-ষষ্ঠ অধ্যায়ের বৃত্তি জয়াদিত্যের, এবং অবশিষ্ট অধ্যায়ের বৃত্তি বামন আচার্য্যের লিখিত। বামন ও জয়াদিত্য জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কাশিকারও টীকা আছে—যথা, জিনেন্দ্রবুদ্ধি-বিরচিত কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা। উহার আর এক টীকার নাম পদমঞ্জরী, ইহা হরদত্ত-কৃত। ন্যাসকারও পাণিনিশাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন। কিন্তু, ইহাঁরা অনেকেই জৈন ছিলেন বলিয়া, ইহাঁদের গ্রন্থের স্থানে স্থানে নাস্তিকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অর্ব্বাচীন ছাত্রগণ, পাছে, তাঁহাদের নাস্তিক্যজালে পতিত হয়, এই আশঙ্কানিরাকরণের জন্য, ভট্টোজি ও হরিদীক্ষিত-প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ পুস্তকপ্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এবং যাহাতে ঐ সকল নাস্তিক টীকা ছাত্রদের গোচরে না আইসে, এই অভিপ্রায়ে নানারূপ আস্তিক উদাহরণ দ্বারা শিশুগণের মন ঐদিক্ হইতে ফিরাইয়া দিলেন। কালে, ভট্টোজিদীক্ষিত-প্রভৃতির মত প্রচলিত হইয়া কাশিকার মতকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। ভাষাবৃত্তিনামে অষ্টাধ্যায়ীর আর একটী বৃত্তিও আছে। ইহা পুরুষোত্তমদেব-কৃত এবং উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত। ইহাও একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বটে। কিন্তু, উহা অদ্যাপি মুদ্রিত অবস্থায় দৃষ্ট হয় নাই।

ছাত্র। আচ্ছা, গুরুদেব, বামন ও জয়াদিত্য অষ্টাধ্যায়ীর অগ্র পশ্চাৎ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভট্টোজিদীক্ষিতও পূর্বে সেই নিয়মেই শব্দকৌস্তুভ লিখিলেন। পরে, কেন ভট্টোজি বিভি

পাণিনি ব্যাখ্যা করিলেন? উভয়ের উপাদেয়তার পার্থক্য আছে কি? লোকে বলে, পাণিনির সূত্রগুলি যে আট অধ্যায়ে বিভক্ত আছে, ঐ আট অধ্যায় আদ্যোপান্ত না পড়িলে, কোনও পদ সাধা যায় না। কিন্তু, কৌমুদীর প্রণালীতে সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদিক্রমে স্বতন্ত্র ভাবেই সাধা যায়, আদ্যোপান্ত পড়িয়া লইতে হয় না। দেব, উভয় প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টী হেয়, কোন্‌টীই বা উপাদেয়?

অধ্যা। সে অনেক কথা। ভাষ্য ও কাশিকা অতিপ্রাচীনগ্রন্থ। সিদ্ধান্তকৌমুদী সেদিনকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা মুগ্ধ-বোধেরও পরবর্ত্তী। সর্ব্বাগ্রে, শব্দকৌস্তুভ দ্বারা ভট্টোজি, বেশ ক'রে, কাশিকার জৈন মত ঢাকিয়া ফেলিলেন। পরে, যখন দেখিলেন যে, 'ভিন্ন মতির্হি লোকঃ' তখন দেশ, কাল ও পাত্রবিশেষের জন্য মুগ্ধবোধের প্রণালীতে প্রসঙ্গগুলি বিভক্ত করিয়া, সিদ্ধান্তকৌমুদী লিখিলেন— ইহাই অনুমান হয়। কিন্তু, তা বলিয়া, মনে ক'রো না যে, মুগ্ধবোধের প্রণালীই এক অভিনব প্রণালী এবং পাণিনির সময়ে ঐ প্রণালী প্রচলিত ছিল না। শাকটায়নের নাম পাণিনিতেও পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, বোপদেব ও শাকটায়ন একই প্রণালীতে স্ব স্ব ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং শাকটায়নই বোপদেবের পথ-প্রদর্শক, ইহা বলা অসঙ্গত নহে।

আর, কাশিকা ও কৌমুদীর হেয়তা-উপাদেয়তা-সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা আমি এক্ষণেই তোমাকে বলিয়া দিতে ইচ্ছা করি না। আমি দুইটীর কথাই বলিব। তন্মধ্যে তোমার ইচ্ছানুরূপ একটী তুমি বাছিয়া নিবে। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, উহারা উভয়েই যার যার মতে সে সে ভাল; এবং উহাদের মধ্যে যার মত তোমার হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহাই পড়িবে। প্রাচীন গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব এই যে,

তাঁহার ভাষ্যও তত সহজ, ইহা সর্ব্বসম্মত। আমি পাণিনির যত টীকা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা সরল, এবং সুখপাঠ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে, উহার রচনা-প্রণালী একটু প্রাচীন ধারায়, এবং মধ্যে মধ্যে বিচারমিশ্রিত। কিন্তু, অষ্টাধ্যায়ীর সকল সূত্রেরই ব্যাখ্যা করা পতঞ্জলির অভিপ্রেত ছিল না। যে যে সূত্রের ব্যাখ্যা তাঁহার সময়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল সেই সেই সূত্রেই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যান্য সূত্র তিনি স্পর্শও করেন নাই। পতঞ্জলি বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরবর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন, কাত্যায়ন পাণিনির দোষৈকদৃক্ ছিলেন, এবং অনেক স্থলে তিনি পাণিনির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু, 'সূত্রে এব হি তৎসর্ব্বং যদ্বৃত্তৌ যচ্চ বার্ত্তিকে' প্রাচীনদের এই বাক্যপ্রদীপ শিরোধারণ-পূর্ব্বক আমি বলি, কাত্যায়ন পাণিনির পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন মাত্র। 'উপসংখ্যানম্' শব্দটীকে বহুবার্ত্তিকসূত্রের শেষে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও উপযুক্ত মতই সমর্থন করিতেছে। কারণ, 'উপসংখ্যানং' শব্দের অর্থ পরিশিষ্ট বা supplement ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর, যে সমুদয় সূত্রের শেষে 'বক্তব্যম্' 'বাচ্যম্', ইত্যাদি শব্দ আছে, সে সে স্থলেও 'বাচ্যম্' শব্দের অর্থ 'বচনীয়ম্' (দোষ) না ধরিয়া সাধারণ অর্থ ধরিলেই বোধ হয়, উক্ত কটাক্ষপাতের সব চিহ্ন দূর হইয়া যায়। যাহা হউক, এস্থলে সে সব কথার প্রয়োজন নাই।

তবে, পতঞ্জলি তাঁহার ভাষ্যে এমন বালসুলভ সরলতার সহিত প্রশ্নের উত্থাপন ও উত্তর করিয়াছেন যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তার পরে, বামন ও জয়াদিত্যের কাশিকা। মানুষ ছোটকালে যেরূপ সরল থাকে, জ্ঞানবৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধ হইলেও যেন সেই সরলতা পুনরায় তাঁহার মধ্যে আসে। ইহাঁরা উভয়েই অগাধ পণ্ডিত। সূত্রগুলিকে

পরে, মহাবৈয়াকরণ ভট্টোজি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ব্যাকরণকারের সিদ্ধান্তগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া, উহাদিগকে অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে নিজের সিদ্ধান্তকৌমুদীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই অংশে, সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রামাণ্যই আমাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সূত্রকে যে প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, সেই সূত্রকে তিনি যথাসম্ভব সেই প্রসঙ্গেই স্থান দিয়াছেন। সুতরাং তুমি যদি কেবল পদ সাধিয়া চরিতার্থ হইতে চাও, তবে সিদ্ধান্তকৌমুদীই ধর। আধুনিক সমস্ত ব্যাকরণই এই ছাঁচে গঠিত হইয়াছে, সুতরাং সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রণালীগত বিশেষত্বসম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। কিন্তু, অষ্টাধ্যায়ীই সমগ্র সংস্কৃতশাস্ত্রগুলির মধ্যে একমাত্র শব্দবিজ্ঞান; এবং শব্দবিজ্ঞান শিখিতে হইলে, তোমাকে সিদ্ধান্তকৌমুদীর পথ পরিহার করিয়া অষ্টাধ্যায়ীর পথই ধরিতে হইবে। অর্ব্বাচীন পাঠক সিদ্ধান্তকৌমুদীর সাহায্যে শব্দ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে, অনেক কাণা-খোঁড়া পদ হইবে,—'বিশ্বকর্ম্মা'র পুত্রই নাকি চিকা (ছুঁচো) হইয়াছিল। অর্ব্বাচীন আর কিসে লাগে। পরন্তু, পদনির্ম্মাণ-(Synthesis)-প্রণালী অপেক্ষা পদ-বিশ্লেষণ-(Analysis)-প্রণালী অত্যন্ত সহজ এবং সেই পথ অবলম্বন করিলে, অষ্টাধ্যায়ী ভিন্ন 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,' 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

ছাত্র। দেব, আমি শুনিয়াছি, পাণিনির সূত্র বড় কঠিন। আমরা না পারি তা বুঝতে, না পারি তা উচ্চারণ করিতে! উহা সংস্কৃত, না গ্রীক্, না কামস্কট্‌কার ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়েই যেন সন্দেহ হইতে চায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভগবদ্গীতায় কেবল অসংলগ্ন কতকগুলি শ্লোক যদৃচ্ছাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে, সাধারণের ধারণা, যেন পাণিনিসূত্রপাঠও এরূপ একটা কিছু হইবে। শিক্ষিত-সমাজে উহাকে সকল ব্যাকরণের শীর্ষস্থান দেয় দেউক, সাধারণের

অধ্যা। ওসব মিছে কথা। অন্ধে কি বুঝিবে প্রদীপের মর্ম্ম? লোকে বলে 'হাটতে না জান্‌লেই উঠান বাঁকা হয়'! নয় কি? আর ভগবদ্গীতার কথা যে বলিলে, তা উহা শ্রীধরস্বামীর টীকাসহ পড়িয়া দেখো দেখি, কেমন লাগে। শ্রীধরস্বামীর টীকা অত্যন্ত সরল ও ভক্তিরসাশ্রিত।

ছাত্র। Sir, আপনার কথায় বোধ হয় যে, পাণিনির প্রণালী খুব সুশৃঙ্খল। শুনিয়াছি, উহাতে আটটী অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেকটী অধ্যায় চারিভাগে (বা পাদে) বিভক্ত। কিন্তু, পুস্তকখানি কোন বিষয়ানুসারে অধ্যায় ও অধ্যায়াংশে বিভক্ত বলিয়া ত ইদানীন্তন কোন পণ্ডিত বলেন নাই। পাণিনির সূত্রসংখ্যা পর্য্যন্ত যাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পাণিনিতে বড় Scholar. নিশ্চয়ই তাঁহারা সটীক সভাষ্য পাণিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা কি বলিতে পারিতেন না যে, অষ্টাধ্যায়ীর সিদ্ধান্তকৌমুদীধৃত প্রণালী ভিন্ন বিজ্ঞানসঙ্গত কোন ব্যাপ্য-ব্যাপক (Species and genus) ভাব আছে?

অধ্যা। এজন্যেই ত এদেশে পাণিনির এত অনাদর। আর এজন্যেই এদেশীয়ের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া বিদেশীয়েরা খাইয়া থাকে। এজন্যেই সংস্কৃতে বাঙ্গালীদের এত পাণ্ডিত্য! এজন্যেই, দেশী অসংস্কৃত জিনিসগুলি বিদেশ থেকে সংস্কৃত বা রূপান্তরিত হইয়া না আসিলে, উহা এতকাল ভাল লাগে নাই। সূত্রসংখ্যা, সূত্রসংখ্যা,—বল দেখি, Oriental scholarরা সূত্রসংখ্যা কত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

ছাত্র। আজ্ঞে, ৩৯৯৩ বা ৩৯৯২।

অধ্যা। হ'তে পারে না।

ছাত্র। আজ্ঞে, স্বয়ং Gold Stücker এরূপ লিখিয়াছেন বলিয়া

অধ্যা। জানি হে, জানি। আর জ্বালাইওনা। ওসব কথা রেখে দেও। কেবল সাহেব কেন? সাহেবের পদলেহী কোন প্রবন্ধলেখকও ঐ সুর ধরিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর কপাল পুড়িবে না, কেন? করবে নকল, পড়বে ধরা—তবু নাম ফাটাইতে বড় সখ্।

ছাত্র। আজ্ঞে, আপনি সূত্রসংখ্যা কত বলেন?

অধ্যা। ৩৯৮৩। তা হ'তে আরো বাদ দেও ৬। কারণ, গত দশ বৎসরে আমার গোচরে অন্ততঃ ছয়টী বার্ত্তিক অষ্টাধ্যায়ীতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা পড়িয়াছে।*

শিষ্য। আজ্ঞে, আজকাল স্বাধীনচিন্তার দিন, এ কথা আপনাদের নিকটেই শুনি। যদি ধৃষ্টতা ক্ষমা করেন ত একটী কথা বলিতে চাই।

অধ্যা। বলনা, ভয় কি?

শিষ্য। আজ্ঞে, একে ত Gold Stücker, তার পরে আবার দেশীয় একজন পণ্ডিতেও তাঁহার মত পোষণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায়—

অধ্যা। এমতাবস্থায় আর কি? এমতাস্থায়, তুমি একটী কুষ্মাণ্ড। বলি, ওহে, যাঁহারা ঐরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাণে-কাণে জিজ্ঞাসা করিও দেখি, তাঁহারা এই অঙ্কটী গণিয়া পাইলেন, না শুনা-কথা বলিয়া নাম কিনিলেন? 'সাক্ষাৎ পুত্র, বাপ্ অপুত্রক' বিশ্বাস করিবে! কাণ থাকিতেই, পরের কথায় 'কাণ চিলে নিল' বিশ্বাস করিবে, কর; তা'তে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ তোমরা ত অনেকেই কিনিয়াছিলে, একবার গণিয়াই দেখ।

ছাত্র। আচ্ছা, Sir, বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ব্যাকরণকৌমুদীতেই

---

* অডভ্যাসব্যবায়েঽপি। ৬।১।১৩৬। কারস্করো বৃক্ষঃ। ৬।১।১৫৬। কৌপিঞ্জল-

ত আমাদের জ্ঞেয় বিষয় সব আছে। আর, তাহার অধিকাংশই বঙ্গভাষায় লিখিত। সেখানা পড়িলেই ত চলিতে পারে।

অধ্যা। পারে বটে। তাহা ত এতকাল যাবৎ প্রচলিত আছে; কিন্তু, কই, তাহা তোমরা মনোযোগপূর্ব্বক পড় কি? আর বাঙ্গলা সূত্রের প্রামাণ্য কতদূর স্বীকৃত হয়, জানিনা। উহার সকল সূত্রেরই মূল-সংস্কৃত-সূত্রটী থাকিলে ভাল হইত, ইহা নাকি বিদ্যাসাগরমহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচ্যগণ চিন্তাশীলতার জন্য বিখ্যাত বটে। কিন্তু, ইহাতে তাহাদিগকে মূল হারাইয়া অবান্তর নিয়াই থাকিতে হয়। বৈয়াকরণগণ নূতন নূতন ব্যাকরণের আবির্ভাব না করিয়া এবং মুগ্ধবোধাদির মত কটমট ব্যাকরণ তৈয়ারে যত্নবান্ না হইয়া, কেবল পাণিনি সুগম করিতে যত্নবান্ হইলে, বোধ হয় দেশের অধিকতর কল্যাণ হইত। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরমহাশয় সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যকে প্রলয়ান্তে যেন জীবন্ত করিয়াছেন। তিনি আমাদের সকলের সম্মান্য।

ছাত্র। আচ্ছা, Sir, বিষয়বিভাগদ্বারা পাণিনির মোটামুটী কথাগুলি বলুন দেখি—পাণিনিতে কি আছে শুনি।

অধ্যা। মোটামুটী শুনিবে? তিন কথায় রামায়ণ? আচ্ছা, তাই বলিব, শুন।

সংজ্ঞা ও পরিভাষা—প্রথম অধ্যায় (সম্পূর্ণ)।

সমাস—দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দুই পাদ (সম্পূর্ণ)।

বিভক্তির অর্থ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ (সম্পূর্ণ)।

সমাসের বচন ও লিঙ্গ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ১ হইতে ৩১ সূত্র।

আর্দ্ধধাতুকে ধাতুর আদেশ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৩২

প্রত্যয়ের লুক্ শ্লু প্রভৃতি—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৫৮ হইতে শেষ।

ধাতু প্রত্যয় (তিঙ্ ও কৃৎ)—তৃতীয় অধ্যায় (সম্পূর্ণ)।

শব্দরূপের প্রত্যয় (সুপ্)—চতুর্থ অধ্যায়ের ২য় সূত্র।

স্ত্রীপ্রত্যয়—চতুর্থ অধ্যায়ের ৩ হইতে ৭৭ সূত্র

তদ্ধিতপ্রত্যয়—চতুর্থ অধ্যায়ের ৭৮ হইতে পঞ্চম অধ্যায় শেষ।

ধাতুর দ্বিত্ব—ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম দ্বাদশটী সূত্র।

বর্ণের আগম ও আদেশ—ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৩ হইতে অষ্টম অধ্যায় শেষ

(Vowelic and Consonantal changes.)

ছাত্র। Sir, পাণিনির কারক কোথায়? আত্মনেপদ পরস্মৈপদই বা কোথায়?

অধ্যা। উহারা সংজ্ঞা বা ব্যবহারিক নাম মাত্র। উহাদিগকে প্রথম অধ্যায়ে পাইবে।

শিষ্য। সন্ধি ও ণত্ব-ষত্ব কোথায়?

অধ্যা। উহারা বর্ণবিকার—একবর্ণ স্থানে অন্যবর্ণের আদেশ মাত্র; উহাদিগকে ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ের শেষভাগে পাইবে। তুমি মোটামুটী জানিতে চাহিয়াছিলে, তাই আমি অতি সংক্ষেপে সারিয়াছি। মনে রেখো, অষ্টাধ্যায়ীর টীকার টীকা তস্যা টীকার কথা শুনিয়া তুমি অধীর হইয়াছিলে। ভবিষ্যতেও উহার আরো কত টীকা প্রকাশিত হইবে, কে জানে?

শিষ্য। Sir, এই ব্যাকরণের সর্ব্বাংশই পড়িতে হইবে? কোন অংশই আমার বাদ দিলে চলে না?

অধ্যা। কি বলিলে,—বাদ? Dead Language, সবই ত

বৈদিকপ্রক্রিয়া বাদ দিতে পার বটে। তাহাতে তোমার অন্যূন ৬০০ সূত্র বাদ পড়িবে। সেটা কম কথা নহে।

ছাত্র। বেশ বেশ, Sir, আমরা ত বাদই চাই। যত কম পড়িতে হয় ততই ভাল। আচ্ছা, Sir, লৌকিক ব্যাকরণ পিপঠিষুর পক্ষে বৈদিকপ্রক্রিয়া বাদ দিলে ক্ষতি নাই, বুঝি। কিন্তু, স্বর-প্রক্রিয়া বাদ দিলে, চল্‌বে কি করে?

অধ্যা। আ—রে গণ্ডমূর্খ! তাও বুঝ্‌লে না—! দেখ, কোন কোন বাঙ্গালা লেখক ইকার ঈকার একাকার, উকার ঊকার একাকার করিয়া থাকেন, ষত্বণত্বকেও বনবাসে দিতে পার্‌লে যেন রক্ষা পান। তাহাতে, তোমরা উদাত্ত-অনুদাত্তকে বহুকালের জন্য দ্বীপান্তর দিলেও কেহ কিছু বলিবেন না।

ছাত্র। দেব, আপনি পূর্ব্বে সিদ্ধান্তকৌমুদীর কথা বলিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর কথাও শুনিলাম। সিদ্ধান্তকৌমুদী এক বৃহদ্‌ব্যাপার। আর, কলেজে আমাকে নানা বিষয়ই পড়িতে হয়। প্রত্যেক পদ প্রতি স্তর সাধিব, এমন সাধ আমার নাই। টোলের ছাত্রেরা বলিবে "কালেজের ছাত্রেরা কিছু জানে না;" তা—বলুক। তাও বরং শ্লাঘ্য। তথাপি অনর্থক সকল পদই সাধিতে ইচ্ছা করি না। যে সমুদয় পদ অহরহ প্রচলিত হয়, সেইগুলো সাধিতে পারিলেই আমার হয়। পাণিনির মূল অষ্টাধ্যায়ী পূর্ব্বে পড়িলে, মোটামুটী-জ্ঞানটা হবে ত। আর সেই মহাপুরুষের মহামহিমার খানিকটা পরিচয়ও পাইব। তাই আমার ভাল।

অধ্যা। দেখ, কেবল সিদ্ধান্তকৌমুদী পড়িলেও যে, অষ্টাধ্যায়ী না পড়িয়া তাহা সম্পূর্ণ বুঝিবে, এমন আশা মনেও স্থান দিও না। "পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্", "অসিদ্ধবদ্ অত্রাভাৎ", "আ কড়ারাদ্ একা সংজ্ঞা" "প্রাগ্ দীব্যতোঽণ" ইত্যাদি ভূরি ভূরি সূত্র অষ্টাধ্যায়ীর ক্রম ভিন্ন

কতদূর চলিবে,—অষ্টাধ্যায়ী ভিন্ন তুমি কি ক'রে তাহা ঠিক্ বুঝিবে? আর সিদ্ধান্তকৌমুদীতে পাণিনিসূত্রগুলিকে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাজান হইয়াছে। অবশ্য, ভট্টোজিও তাহাদিগকে সন্ধি, শব্দরূপ ইত্যাদি প্রসঙ্গে যথাযথ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু সে যেন নদীর জলের বড় বড় মাছগুলিকে পুকুরের জলে ছাড়িবার মত হইয়াছে; এবং তজ্জন্য ভট্টোজিকে বৃত্তিতে প্রত্যেক সূত্রের context বলিয়া দিতে হইয়াছে, নতুবা তাহা স্বতন্ত্রভাবে বুঝা অসাধ্য। আর, আজকাল cramমৃগের যেরূপ মৃগয়া চলিতেছে, সে মতেও সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রণালী অপেক্ষা অষ্টাধ্যায়ীর প্রণালী ভাল বোধ হইতেছে। অনন্যোপায় হইয়া, কেবল বৃত্তি মুখস্থ করিয়া সূত্র মনে রাখা cramming নয় ত কি? যদি ইংরাজী পুস্তকের explanation না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে cramming হয়, তবে, সূত্র না বুঝিয়া বৃত্তি (explanation) মুখস্থ করিলে কেন cramming হইবে না, বুঝি না। অষ্টাধ্যায়ীর ক্রম কিন্তু, অত্যন্ত বিজ্ঞানসঙ্গত। তাহাতে ব্যাপ্যব্যাপক লক্ষণও পরিস্ফুট। এবং তাহাতে পারিভাষিক সঙ্কেতও অত্যল্প এবং ন্যায়সঙ্গত।

ছাত্র। Sir, ভাষ্য ও ইষ্টি যেন ছাড়ানই দিলাম; না শিখিলে কিরূপে চলিবে?

অধ্যা। ওহে, শনৈঃ শনৈঃ। বৃক্ষের মূল রক্ষিত হইলে, শাখা-প্রশাখাও রক্ষিত হইবে, ভাবনা নাই। কিন্তু, শাখাপ্রশাখায়ই দিন কাটাইলে মূলে যেতে বহুবিলম্ব ঘটিবে। এমন কি, কোন কোন পণ্ডিতের মত চিঠিখানা লিখিতেও তুমি বর্ণাশুদ্ধি করিবে। আর বার্ত্তিকসূত্রও ত নেহাত কম নয়! সেও যে হাজার তিন চারি।

ছাত্র। আচ্ছা, Sir, পূর্ব্বে অষ্টাধ্যায়ীই পড়িব। কিন্তু পাণিনি-ব্যাকরণই বা কি, আর তা পড়িবার সহজ সঙ্কেতই বা কি, ইত্যাদি আমাকে না বলিয়া দিলে, আমি অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে সাহস করি না।

অধ্যা। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে শীঘ্রই অন্য এক সময়ে বলিব।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

আজি এই পুণ্যা দ্বিতীয়ার চন্দনের এ শুভ্রতিলক
তোমাদের নাশুক বিপদ ; তোমাদের বিঘ্ন দূর হোক্।
হেমন্তের এ শিশিরকণা-সমাচ্ছন্ন নব-দুর্ব্বাদল,
তোমাদের শিখাক্ নম্রতা দূর করি' যত অমঙ্গল।
কমলার স্বর্ণাঞ্চলচ্যুত আশীর্ব্বাদী এই পুণ্যধান,
ধনে-ধান্যে পূর্ণ করি' গৃহ, তোমাদের করুক কল্যাণ।
অমৃত এ পূত আচমনে হ'বে সবে নববলে বলী,
দূর করি' দুঃখ-দৈন্য-লাজ মাতৃনাম রাখিবে উজলি।
কনিষ্ঠার সভক্তি প্রণাম, অগ্রজার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ
ল'য়ে, আজ ভাই ভাই সবে দূর কর সর্ব্ব অপবাদ।
ভাই হও তোমরা তাহার, যে অভাগী আছে ভ্রাতৃহারা,
তোমাদের সহস্র মস্তকে পড়ুক তাহার স্নেহধারা।

ছাড়ি আজ গৌরব-বৈভব এস ভাই কুটীরের মাঝে
দীনা জননীর পুত্ররূপে, দীনা ভগিনীর ভ্রাতৃসাজে।
ব'স দুর্ব্বা-শ্যামল আসনে, নীলাকাশ-চন্দ্রাতপতলে,
লও ভগিনীর পূজা আজ ছয় কোটী সহোদর মিলে।
"কীর্ত্তি যস্য স জীবতি" ভবে, ভাই মোর যমজয়ী হও,
বর্ষে বর্ষে এই পুণ্যদিনে ভগিনীর "ভাইফোঁটা" লও।

শিখ-স্বাধীনতা।

(২)

শিখগণ কুরনাল্ ও হান্‌সি হইতে ঝিলামনদীর তীর পর্য্যন্ত সমতলভূমির উপরি অংশে সম্মিলিত হয়। ঐক্যবন্ধনের উপযোগিতা আর বেশি দিন সকলের উপলব্ধি হইল না। গ্রাম্য অশিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তদমনের সামর্থ্য কম, তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অপেক্ষা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থই বেশি খুঁজে। তাহাদের কেহ কেহ প্রকৃত বা কল্পিত অনিষ্টের প্রতিদান-স্বরূপ প্রতিহিংসাগ্রহণের ইহাই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিল। অপর কেহ বা স্থানীয় সর্দ্দারগণের সহিত মিলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী সহর বা গ্রাম করতলগত করিতে ইচ্ছুক হইল। কেবল শিক্ষিত ও যথার্থ শিখনামের উপযুক্ত ব্যক্তিগণ, অবিলম্বে স্বাধিকার বিস্তৃত করিতে এবং যুদ্ধে জয়লাভ দ্বারা কিম্বা করস্থাপনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, সাধারণ খালসা-সাম্রাজ্যের উন্নতি করিতে চেষ্টিত হন। কিছুকাল বিশ্রামসুখানুভব দ্বারা ক্লান্তি অপনয়ন করতঃ এই ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, এমন সময়, আমেদশাহার পুনরাগমন-সংবাদে শিখগণ প্রমাদ গণিল। বার্দ্ধক্য ও রোগবৃদ্ধিহেতু শাহার শক্তি হ্রাস হইতে থাকিলেও, তিনি আর-একবার পাঞ্জাব উদ্ধার করিতে প্রয়াস পান। পাঞ্জাবই তাঁহার রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর প্রদেশ ছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আমেদশাহ সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর ছাড়িয়া সাংলেজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। বলপ্রকাশে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তিনি ছলপ্রকাশে কার্য্যসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মহারাজা উপাধিতে বিভূষিত করিয়া শির্‌হিন্দের সেনাপতিপদে বরণ করেন। উমরসিংহ পাতিয়ালা বা মালোয়া শিখসর্দ্দার। পিতামহের দেহাবসানে তিনি ঐ পদে অভিষিক্ত হন। আমেদশাহ কোটোচের সর্দ্দারের সহিতও ঐরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহাকে জলন্ধর, খোয়াব ও তন্নিকটবর্ত্তী গিরিপ্রদেশের সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমেদশাহার নিজ সৈনিকবৃন্দের অবাধ্যতায় তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির অন্তরায় উপস্থিত হয়। তাঁহার অধীনস্থ প্রায় দ্বাদশসহস্র সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাবুল-অভিমুখে প্রস্থান করে, কাজেই শাহকে তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু অনুসরণ-কার্য্যও নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয় না, পথিমধ্যে তাঁহাকে নিরতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। শেরশাহার রোটাস্থিত গিরিদুর্গের সম্মুখে আহম্মদশাহা সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই, রণজিৎসিংহের পিতামহের অধীনস্থ ফুকারচুকিয়াগণ দ্বারা পথ অবরুদ্ধ হয়। অবরোধকারীদের সাহায্যার্থে নিকটবর্ত্তী ভাঙ্গিসম্প্রদায়ের একদল সৈন্যও অগ্রসর হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান শত্রুহস্তে পতিত হইলে, ভাঙ্গিগণ ক্ষিপ্রতার সহিত অনতিকালমধ্যে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে খানপুরের উপত্যকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে। পরাক্রান্ত মোগলসৈন্যের সহিত সংগ্রামে শুর্খাসৈন্য যে রণনৈপুণ্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখাইয়া ধন্যবাদের পাত্র হয়, এক্ষেত্রে তাহারা সেই পুরাতন গৌরব রক্ষা করিতে যৎসামান্যই সক্ষম হইয়াছিল।

অতঃপর ভাঙ্গিগণ হরিসিংহের অধিনায়কত্বে মুলতান-অভিমুখে অগ্রসর হইয়া মুসলমান দাউদপত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করে। নাদিরশাহ এই মুসলমানসম্প্রদায়কে গাজনীতে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার এই অভিলাষ অবগত হইয়া দাউদপত্র-

বর্ত্তমান সময়ে পরিচিত বাহাওলপুর

নামক স্থান ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত।* দলপতি মুবারক খাঁ ও হরিসিং পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, পাকপুত্তাননামক নগর যাহা এক প্রসিদ্ধ মুসলমান্ সাধুর অধিকৃত এবং যাহা লইয়া কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, তাহাই উভয়পক্ষের সাধারণ-সীমানির্দ্দেশক (সীমান্ত-প্রদেশ) স্থান হইবে। এই মীমাংসার পর হরিসিং দেরাগাজীখাঁও সিন্ধু-অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সময় তাঁহার গুজরাটের করদাতা মিত্রসর্দ্দার,—যিনি অনতিকালপূর্ব্বে রাওয়ালপিণ্ডি অধিকার করেন,—তিনি সাধারণ পথ দিয়াই কাশ্মীররাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন।

হরিসিং ভাঙ্গী পরলোক গমন করিলে ঝন্দোসিং তৎস্থলাভিষিক্ত হন; তিনি মিশলের ক্ষমতা-গৌরবের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেন। জাম্মু তৎকালে নানাবিষয়ে বিখ্যাত ছিল; পুনঃপুনঃ আফগান-আক্রমণে এবং শিখ-বিদ্রোহিতায় দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য সমতলভূমি

---

* নাদিরশাহ সিন্ধুপ্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া বাহাওলপুর-পরিবারের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে তাঁহার পৈতৃক প্রদেশ শিকারপুরে দেখিতে পান। শাহ তাঁহাকে তৎপ্রদেশের তৃতীয়বিভাগের ডেপুটী নিযুক্ত করেন; কিন্তু কিছুদিন পরে সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকে গজনীতে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক হন। শাহের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া এই সম্প্রদায় সাতলেজের উপরদিক দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং সুবিধামত গ্রাম-নগর অরক্ষণীয় অবস্থায় দেখিতে পাইলেই অধিকার করিতে আরম্ভ করে। দাউদপত্র-পরিবারের প্রথম ব্যক্তির নাম দাউদ (David ?) ছিল। তাহার নামানুসারে তদ্বংশীয়েরা দাউদপত্রনামে অভিহিত হইত। তাহারা বলিয়া থাকে যে, খালিফ আব্বাস হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না। কানিংহাম লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে Sindhian Belotches বলা যাইতে পারে। সাতলেজ-তীরে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়, তাহারা লংগাও জয়হাদিগের সমূহ অনিষ্টসাধন করিয়াছিল। ইহারা তথায় সিন্ধুদেশীয় পূর্ত্তকার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করে। পাকপুত্তানের নিম্নভাগে নদীর উভয়পার্শ্বেই তাহাদের মৌলিক শিল্পকলা ও কৃষিকার্য্যের প্রতি

ত্যাগ করিয়া বক্র অথচ নিরাপদ পথে পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রস্থান করে। ঝান্দা, এই জাম্মু নিজের করদ-রাজ্যে পরিণত করেন। পাঠান উপনিবেশ কুস্‌মুরেরও ঐরূপ অবস্থা সংঘটিত হয়। অতঃপর ঝান্দা নিজ প্রতিনিধি মোজ্জাসিংহকে মুলতান-অভিযানে প্রেরণ করেন; কিন্তু সেনাপতি, আফগানশাসনকর্ত্তাদ্বয়ের ও বাহওয়ালপুরের সর্দ্দারের সম্মিলিত সৈন্য-কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। পরবৎসর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উক্ত দুই শাসনকর্ত্তার মধ্যে আত্মকলহের সৃষ্টি হয়, তাহাদের একজন ঝান্দাসিংহের সাহায্যপ্রার্থী হন। ঝান্দা উত্তরদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পান যে, জম্মুর অধিনায়কত্বের দাবী করিয়া অপর একজন উমেদার উপস্থিত হইয়াছেন। এই উমেদার সুরতসিং সুকারচুকিয়া ও কুনিয়া মিশ্‌লের উদীয়মান দলপতি জয়সিংহের সাহায্যে বলীয়ান। সুরতসিং নিজের ফাঁপরে পড়িয়া নিজেই মারা যান, এবং জয়সিংহ এমনি শোচনীয় অবস্থাপন্ন হন, যে, ঝান্দাসিংহের সংহারকার্য্য সম্পন্ন করা তৎকালে তাহার ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত হয়। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সুরতসিংহের বিনাশে * সন্তুষ্ট হইয়াই কুনিয়া-দলপতি জাম্মুর অধিনায়কত্বের দাবীদারকে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করেন এবং সূত্রধর জসিসিং—যিনি আমেদশাহের নামমাত্র ডেপুটী কোটোচের ঘোমন্দচাঁদ এবং অপরাপর রাজপুতদলপতিকে করাধীন করিয়াছিলেন,—সেই সূত্রধর জসিকে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে, আলহুওয়ালিয়া জসিসিংহের সহিত মিত্রতা করিতে প্রয়াস পান। রামঘরিয়া জসি পরিশেষে পরাজিত হন এবং হরিয়ানার মরুপ্রান্তে পলায়নপর হইয়া লুণ্ঠনকার্য্য-

* সুরতসিং অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ঝান্দাসিং পরলোক গমন করেন। হরিসিং ভাঙ্গী পাতিয়ালার উমরসিংহের সহিত সংগ্রামে সম্ভবতঃ [illegible] খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কাঙ্‌ড়া'র মোসলমান শাসনকর্ত্তা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোটোচের নবোদ্গত দলপতি ঐ প্রসিদ্ধ দুর্গটি হস্তগত করিতে বহুদিন ধরিয়া চেষ্টিত ছিলেন। কাঙ্‌ড়ার শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে কিম্বা কেবল দিল্লীর বা কেবল কাবুলের অধীনতায় থাকিতে চেষ্টিত হইতেন। জয়সিংকুনিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, তাহাতেই তাঁহার পতন সংঘটিত হয়। শিখগণ দুর্গটি স্বাধিকারে রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, ইহাতে নিকটবর্ত্তী রাজা ও ঠাকুরদের * উপর জসিসিংহের প্রভুত্বের খর্ব্বতাসাধনে তাহাদের সুবিধা হয়।

পঞ্জাবের দক্ষিণে ভাঙ্গী শিখরা ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাপন্ন হইতেছিল। তাহারা মালকেহারা ও মুলতানের বৃহৎ দুর্গ অধিকার করিয়া কালাবাগ হইতে নিম্নপ্রদেশে কর আদায় করিতে আরম্ভ করে। আফগানরা মুলতান হারাইয়া সুজাবাদনামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে, ভাঙ্গীরা তাহাও হস্তগত করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাইমুরশাহ্‌ অবশেষে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য কেবল সিন্ধু, বাহওয়ালপুর এবং নিম্ন-পাঞ্জাবের প্রতিই স্থির ছিল; লাহোর পুনরুদ্ধারের কোন কল্পনাই তাঁহার মনে উদিত হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে দুইবার দুই দল কাবুল-সৈন্য মুলতান হইতে শিখগণকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু দুইবারই তাহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হয়। অবশেষে ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে শাহ স্বয়ং মুলতান-অভিযানে প্রবৃত্ত হন। ভাঙ্গীদের নবদলপতি ঘান্দাসিং অপরাপর সিং-সেনাপতিগণের সমবায়ে সীমান্ত

সংঘর্ষের পর দুর্গ ছাড়িয়া দেন। * ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাইমুর রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ সময় তাঁহাকে সিন্ধু, কাশ্মীর ও উজবেগ-বিদ্রোহেই সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকিতে হয়। শিখগণের রাওলপিণ্ডির অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহাদের লুণ্ঠনলভ্য অশ্ব কাচের সমতল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আটোকের প্রাচীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। †

যুবক উমরসিং-ফুলকিয়া ধারাবাহিকরূপে হরিয়ানা ও দিল্লী অভিমুখে স্বক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি স্বয়ং শিরসা ও ফতেহাবাদ অধিকার করেন, তাঁহার রাজ্যের সামন্তগণ বিকানীর ও বাহওয়ালপুরের দিকে অভিযানে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার জিন্দ এবং কাইথালের করপ্রদানকারী অধিনেতারা হান্‌সি এবং রহতকের চতুর্দ্দিকস্থ উন্মুক্ত প্রদেশ অধিকার করে। দিল্লী-অধিপতি শিখদিগের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে শেষবার প্রয়াস পাওয়ায়, উমর রাজধানী পাতিয়ালায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে এক বপুলবাহিনী তৎকালীন উজীরের ও ফারখুনন্দশাক্তনামক রাজ-পরিবারের এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে অভিযানে বহির্গত হয়। কারনাল পুনরুদ্ধার হয় এবং তথায় কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিস্থ ঘটে এবং প্রসিদ্ধ ক্রোরাসিংহিয়া-দলপতি বাঘেলসিং বশ্যতা স্বীকার করেন। কাইথালের দেহর্মাসং ধৃত হইয়া গুরুতর অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া মুসলমান-বাহিনী পাতিয়ালার প্রবেশদ্বারে উপনীত হইলে, উমরসিং অধীনতা স্বীকার করতঃ করপ্রদানে সম্মত হন। ইহাতে বাঘেলসিং সন্তুষ্টই হন, কারণ, উভয়ের একই পরিণামে কাহারও ঈর্ষা-উদ্রেকের সম্ভাবনা থাকিল না। কিন্তু অচিরেই শ্রুত

* এলফিন্‌ষ্টোনের মতে ১৭৮১ খৃঃ অঃ মুলতান শিখহস্তচ্যুত হয়। (Vide *Canbul*, ii. 303.)

হওয়া যায় যে, এক বিপুল শিখ-বাহিনী লাহোর হইতে যাত্রা করায় মোগলসৈন্য দ্রুতগতিতে পানিপাত-অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। মোগলসৈন্যের এইরূপ দ্রুত প্রস্থানে সকলেরই সন্দেহ হয়; শিখগণের কাঞ্চন-রত্নে উজীরের চিত্ত স্বতঃই বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। তিনি লোভের বশে প্রভুর সর্ব্বনাশসাধনে কিছুমাত্র বিচলিত হন না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উমরসিং অব্যবস্থিতচিত্ত এক নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ করালবদন ব্যাদান করিয়া হরিয়ানার অসংখ্য অধিবাসী ধ্বংস করে। বিভুক্ষায় অস্থির হইয়া অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে। শিরসার অবস্থাও ঐরূপ হয়; বহুতর ভূভাগ জনমানবশূন্য হয় এবং বিভিন্ন অংশে শাসন-শৃঙ্খল শিথিল হইয়া পড়ে। শিখগণ পরে বহু চেষ্টাতেও এই সকল স্থান সুচারুরূপে শাসন করিতে পারে নাই,—তাহাদের সর্ব্ববিধ কঠোরতাই ব্যর্থ হইয়া যায়। *

ভাগীরথী ও যমুনার তীরে ধোয়াবপ্রদেশে, শিখগণ, নাজিবুদ্দৌলার পুত্র জাবিতাখাঁর প্রভুত্বগর্ব্ব খর্ব্ব করে। খাঁ, পরে শিখগণের অকৃত্রিম বন্ধুরূপে পরিণত হন। সাম্রাজ্যের শাসন-বন্ধন শিথিল দেখিয়া, এবং রাজকীয় সৈন্য-বিভাগে কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে সক্ষম হইয়া, জাবিতা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে তদভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু প্রকৃতরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তির উপর সন্দেহ জন্মায়; সম্রাটও তাঁহাকে বেশি উত্যক্ত করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা না করায়, উভয়পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। তাহাতে জাবিতা সাহারণপুর স্বাধিকারে রাখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এই সময় জাবিতার সমভিব্যাহারে একদল শিখসৈন্য ছিল। তিনি তাহাদের

সহিত সখ্যতা করিতে এতই ব্যস্ত হন যে, শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি নিজে শিখ-পরিচ্ছদ ধারণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং পরে স্বীয় পুরাতন নাম পরিবর্ত্তন করতঃ "ধরমসিং" এই অভিনব নাম পরিগ্রহ করিয়া শিখ-উৎসবাদিতে আনন্দের সহিত যোগদান করিতে আরম্ভ করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জসিসিং রামঘরিয়া, কুনিয়া ও আলহুওয়ালিয়ার সম্মিলিত সৈন্যদল-কর্তৃক পরাজিত হইয়া পাঞ্জাব-প্রদেশে পলায়নপর হইতে বাধ্য হন। তথায় তিনি উমরসিং ফুলকিয়ার সাহায্যে হিসারের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে কর-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে তথা হইতে ক্রমে দিল্লীর প্রাচীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একদল ফুলকিয়া ও অপরাপর সম্প্রদায়ের শিখসৈন্য ধোয়াবের নিম্নপ্রদেশে অভিযানে বহির্গত হয়, কিন্তু মিরাটে রাজসেনাপতি মীর্জ্জাসফিবেগ-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই আহবে জিন্দের গজপুতাসিং বন্দী হন। তত্রাচ ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাঘেল সিং অপরাপর সেনাপতিগণের সমবায়ে উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করতঃ গঙ্গা উত্তীর্ণ হইতে মনস্থ করেন। কিন্তু পরপারে আউদ-সৈন্যদল সতর্কতা অবলম্বন করিয়া প্রতীক্ষায় থাকায় তাহাদের গতি প্রতিরুদ্ধ হয়। পূর্ব্বে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই দুর্ভিক্ষে উত্তেজিত হইয়া জসিসিং ধোয়াবপ্রদেশে প্রবিষ্ট হন এবং বেরেলির কুড়ি ক্রোশের মধ্যে রোহিলখন্দ হইতে চান্দসি পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করে। এই সময় জাবিতাখাঁ ঘোষগর-(Ghowsgurh)-দুর্গে একরূপ বন্দিদশায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঘারোয়ালের পার্ব্বত্যায় নরপতি,—যাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ঔরঙ্গজেবের রোষাগ্নি হইতে দারাকে আশ্রয়দানে রক্ষা করিয়াছিলেন,—তিনি এবং তাঁহার

করদরাজরূপে পরিণত হন। আউদের সীমান্ত হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত স্থানে শিখগণের অব্যাহত ক্ষমতা পরিচালিত হইতেছিল। মিঃ ফর্ষ্টার (Forster) ভ্রমণব্যপদেশে এই প্রদেশে উপনীত হইয়া তথাকার শিখ-সৈন্যগণের নানা অদ্ভুত কার্য্যাবলী কৌতুকের সহিত অবলোকন করিয়াছেন এবং স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে তৎসমুদয় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। *

নিজ পাঞ্জাবে জয়সিংকুনিয়া প্রবল প্রতাপে প্রভুত্ব করিতেছিলেন। তিনি স্বরতসিং-ফুকারচুকিয়ার পুত্র মাহাসিংকে আশ্রয় প্রদান করেন, এবং এই নবীন দলপতি যখন চেনাবের তীরস্থিত রসুলনগরনামক স্থান এক মুসলমানপরিবারের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মাহাসিং উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন; ১৭৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বপদে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া আশ্রয়দাতা জয়সিংহের সম্মতি ব্যতীত নিজের স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে জাম্মুব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তাঁহার হস্তক্ষেপ কেবল ঐ স্থানের লুণ্ঠনেই পর্য্যবসিত হয়। লুণ্ঠন-ব্যাপারে তিনি যে নির্ভীকতা প্রদর্শন এবং যে ধনরত্ন হস্তগত করেন, তাহাতে জয়সিংহের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মাহাসিং অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ভূয়োভূয় ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও জয়সিংহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদানমানসে তরবারীর সাহায্য গ্রহণ করেন। রামঘরিয়া জসিসিং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন; রামঘরিয়াও স্বীয় প্রনষ্ট অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ বলিয়া স্থির করেন। তিনি মাহাসিংহের সহিত সম্মিলিত হইয়া সহজেই কোটোচের ঘোমন্দচাঁদের পৌত্র সুপ্সরচাঁদের সহকারিতালাভে

সক্ষম হন। কুনিয়াগণ এই সম্মিলিত সৈন্যদলকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হয়; জয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুবক্সসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হন। ইহাতেই—এই দ্বিবিধ দুঃখেই, বৃদ্ধের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। জসিসিং স্বীয় রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হন এবং মুন্সরসিং কাঙ্‌রাদুর্গে অধিকার লাভ করেন। এই দুর্গ অধিকার করিতে তদীয় পিতা ও পিতামহ অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করেন। মাহাসিং এবম্প্রকারে পাঞ্জাবের মধ্যে মহাপ্রতাপান্বিত ও শক্তিশালী সর্দ্দার হইয়া উঠিলেন। তিনি জয়সিংহের পরিবারের সহিত প্রীতিবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে জয়সিংহের বিধবা পুত্রবধূ সুদ্দাকোউরের প্রস্তাবে আহ্লাদের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইহাতে দুই পরিবার একসূত্রে গ্রথিত হয়। সুদ্দা-কোউরের শিশুকন্যার সহিত মাহাসিং স্বীয় একমাত্র পুত্র বালকরণজিৎ সিংহের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। রণজিৎ, সুদ্দার নিকটেই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং সুদ্দার অপত্যস্নেহেই বর্দ্ধিত হন। কাজেই তাঁহাকে জামাতা করিয়া সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া লালনপালন ও পরিবর্দ্ধন করিতে সুদ্দার মাতৃহৃদয় লালায়িত হইয়া উঠে। সুদ্দা গর্ভ-ধারিণী না হইলেও মাতার ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহরসে বালককে পুষ্ট করেন।

অতঃপর মাহাসিং গুর্জ্জর-আক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করেন। তথাকার বৃদ্ধ ভাঙ্গিসর্দ্দার গুজ্জারসিং, মাহার পিতার বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে গুজ্জার মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাহাসিং গুর্জ্জর-অভিযানে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারেন না। কারণ, যুদ্ধাবসান না হইতেই তিনি পীড়িত হন এবং তাহাতেই ২৭ বৎসর বয়সে ধরণীবক্ষ হইতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ চিরদিনের তরে বিলুপ্ত হয়। *

---

* Forster লিখিয়াছেন যে, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ডের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [illegible] Murray লিখিয়াছেন ১৭৮৫-১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কুনিয়াগণের পরাজয়

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে শাহজুমান কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সর্ব্বদাই ভারতে রাজ্যবিস্তৃতি করিবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রেরিত একজন সৈন্য আসিয়া রোটাসদুর্গ পুনরুদ্ধার করে, কিন্তু রাজ্যের পশ্চিমবিভাগ অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় শীঘ্রই তাহাদিগকে কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। এই সময় আর-একবার দুরানী-আক্রমণের জনরব প্রচারিত হয়; উপর-ভারতের (Upper India) যুবরাজ, যিনি মারাঠা ও ইংরেজ-কর্ত্তৃক পিষ্টক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, —তিনি এ জনরব একবারে ভিত্তিশূন্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে সক্ষম হন না। রোহিলখন্দের অন্যায় অপহরণকারী পরাজিত গোলাম মহাম্মদ, শাহজুমানকে প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব অতিক্রম করেন। শত্রুর কল্পিত অভিসন্ধিতে প্রতিবন্ধকতা করিবার নিমিত্ত আউদের আসোফুদ্দৌলার এজেণ্ট তাহার পশ্চাতানুসরণ করেন। এজেণ্টের আর একটী উদ্দেশ্যও ছিল,—সমগ্র মোসলেমসমাজ শাহকে পরিত্রাণকর্ত্তাস্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে, এই কথা তাঁহাকে বুঝাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে শাহ ত্রিশসহস্র সৈন্যসহ লাহোরে উপস্থিত হইয়া নিজের বহুদিনের পোষিত প্রভুত্ব-স্বপ্ন সফল করিবার আশয়ে শিখগণের সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টিত হন। অনেকানেক শিখদলপতি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেও, ভ্রাতা মহম্মদের বিদ্রোহিতার সংবাদে শাহের স্বপ্ন সফল হইতে পারে নাই তিনি ভারতীয়-সাম্রাজ্য গঠনের কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ব্যাপারে শিখগণের অপেক্ষা মারাঠাগণ ও কুসংবাদপ্রাপ্ত ইংরেজগণই অধিকতর ভীত ও সন্ত্রাসিত হইয়াছিল।

বিপদ্‌পাতের বিষয় প্রকাশ করিয়া সাহায্যপ্রার্থী হয়। নানারূপ যুক্তিতর্কের পর স্থির হয় যে, এই বিপদপ্রতিকারের নিমিত্ত খোয়াব-প্রদেশের অনুসহরে এক সেনাদল সংস্থাপিত এবং আফগানরাজ্য-আক্রমণের নিমিত্ত পারস্যের শাহের মত করাইবার জন্য তেহারণে একটী মিশন প্রেরণ করা হইবে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে শাহজুমান পুনরায় ভারতীয় অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চসহস্র-লোক-গঠিত এক সৈন্যদল অগ্রে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল জেনামনদীতীরে বিপক্ষদলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হয়, কিন্তু শাহ স্বয়ং লাহোরে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্বাসবাক্যে ও ভ্রূকুটিপ্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রস্তাব পুনরুত্থাপিত করেন। কিন্তু তাঁহার যত ভয় কুস্‌সরের পাঠান নিজাবুদ্দীনকে দেখিয়া। ইনি স্বদেশে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। দুরাস্তরালস্থিত শিখগণের সহিত যুবক রণজিৎসিংহের পর্য্যন্ত দলনে ইনি নিযুক্ত হন। শিখগণ, শাহের অতুল বিভব এবং সম্মানের প্রতি আস্থাবান ; কিন্তু নিজাবুদ্দীন শাহের প্রবল প্রতাপের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন। কয়েকটি নিষ্ফল খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয় ; পারস্যের সাহায্যে বলীয়ান হইয়া মহম্মদের আগমন-সংবাদ প্রাপ্তে নিজাবুদ্দীনকে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য করে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি লাহোর পরিত্যাগ করেন। এই দ্বিতীয় আহবে রণজিৎ যেরূপ কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে কেবল তাঁহার স্বজাতীয় শিখদলপতিদের মনে নহে, দুরাণীশাহের মনেও একটা সম্ভ্রমের ভাব—সন্ত্রাসের ভাব, মুদ্রিত হইয়া যায়। লাহোরের আশা তিনি সহজে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, রাজৈশ্বর্য্যাভিলাষী দলপতিগণের মনে উহা পুনরধিকারের কল্পনা জাগাইয়া দিয়া তিনি চিরাভীপ্সিত পাঞ্জাবরাজধানীতে রাজকীয় অধিকার লাভ করিলেন। এই সময় হইতে শিখ-ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার

এই মহান্ 'মহারাজ্যের' উপর অর্পণ করে। কিন্তু ভারতের অপরদিকে মারাঠাশক্তি জাগ্রত হওয়ায় এবং কার্য্যক্ষেত্রে ইংরেজগণের আবির্ভাবে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যসাফল্যের অন্তরায় উপস্থিত হয়।

মাধাজিসিন্ধিয়ার কার্য্যদক্ষতায় উত্তরভারতে মারাঠা-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহারই কার্য্যকুশলতায় ও দূরদর্শিতায়, শাসন-সৌকার্য্য দৃঢ় ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আগ্রায় প্রভুত্ব বিস্তার করেন এবং নামসর্ব্বস্ব সম্রাট শাহআলম-কর্ত্তৃক তদীয় সাম্রাজ্যের সহকারী প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। এই সময় তিনি শিখগণের সহিতও এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন; তাহার ফলে স্থিরীকৃত হয় যে, যমুনার উভয়তীরে উভয়পক্ষের সম্মিলিত সৈন্যের সাহায্যে যে সমুদয় স্থান অধিকৃত হইবে তাহার দুইতৃতীয়াংশ মাধাজি পাইবেন, অবশিষ্ট ভাগ 'খালসা'-রাজ্যের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু মারাঠাধিপতির এই সংকল্প রোহিলা গোলামকাদেরের জন্য কিয়দ্দিবস কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গোলাম, পিতা জাবিতাখাঁর স্থলাভিষিক্ত হইয়া সম্রাটের উপর প্রভুত্ববিস্তারের অসমসাহসিক কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পান। এইরূপ দুর্ম্মার প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি এক দুরূহ কার্য্য হইতে অপর একটী দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। অবশেষে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হতভাগ্য নরপতির চক্ষু উৎপাটন করিয়া, চিরকল্পিত প্রচুর ধনরত্নলাভাশায় প্রাসাদ লুণ্ঠন করেন এবং এক নগণ্য যুবককে আকবর ও ঔরঙ্গজেবের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে সিন্ধিয়ার সংকল্পসাধনের সুবিধা হয়,—গোলামকাদের ও অসভ্য আফগানদিগের উৎপীড়নের পর দিল্লীতে সিন্ধিয়ার প্রভুত্ব সকলেরই বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার কঠিন ও ন্যায়ানুমোদিত শাসনে শিখগণও অচিরে দমিত হয়।

সাহায্যকারী বন্ধু নহে, পরন্তু তাঁহার আশ্রিত আজ্ঞাকারী দাস বা অনুগতমাত্র। যোগাধ্রির (Jugadhree) গোষ্ঠীপতি রাইসিং ধোয়াবের কয়েকটী জেলায় কৃষিকার্য্য করিতেন; দশ বৎসরের মধ্যে কর আদায় ও করের হার বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে পাতিয়ালা ও সির্‌হিন্দের অন্যান্য রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনবার সমরক্রিয়া আরব্ধ হয়। পরলোকগত উমর-সিংহের হিন্দু সচিব নান্নুমলের কার্য্যদক্ষতায় পাতিয়ালা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেও, তাঁহাকে ক্রোরাসিংহিয়া-দলপতি বাঘেল সিংহের নিকট সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়ন আরম্ভ হইলে, অর্থগ্রহণে দু লের সহায়তা করা এবং পাতিয়ালার সঙ্কটের সময় তাহার উদ্ধারসাধন—এতদভি-প্রায়ে বাঘেলসিং বিপুল অশ্বারোহী সৈন্যের ভরণপোষণ করিতেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি পেরোণ (General Perron), দৌলতরাও-সিন্ধিয়ার বৃহত্তম সেনাবিভাগের অধিনায়কত্বে,—স্বদেশীয় ডি-বইগ্‌ণির (De Boigne) পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তদীয় ক্ষমতাধীন না হইলেও, তাঁহার কল্পনা খামখেয়ালিরকম ছিল না। হোলকারকর্তৃক সিন্ধিয়ার প্রভুত্ব খর্ব্ব না হইলে এবং তেজস্বী জর্জ্জটমাসের বিপক্ষতায় ও কৃতকার্য্যতায়, পেরোণের কল্পনা ব্যর্থ না হইলে, নিজের জন্যই হোক্ বা মারাঠাগণের পক্ষেই হোক্, পেরোণ সম্ভবতঃ লাহোরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিতেন। ফিরিঙ্গি-তনয় টমাস সমুদ্রোপরি পরিবর্দ্ধিত হন,—তিনি যুদ্ধজাহাজে সৈনিকের কার্য্য করিতেন। কিন্তু বিভিন্নচরিত্রের জন্য এবং অপরিচিত স্থান-দর্শনের একান্ত আগ্রহবশতঃ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজে যুদ্ধজাহাজ হইতে অবতরণ করেন এবং তৎপ্রদেশের এক সামান্য সর্দ্দারের অধীনে সেনাবিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। টমাস উত্তরভারতের

অধীনে নিযুক্ত হন এবং অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন। কিন্তু ছয় বৎসরেই তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্য বিদূরিত হয়, তিনি আর একস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না। কাজেই, আপাকুণ্ডরাওনামক সিন্ধিয়ার প্রধানতম সর্দ্দারের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ডি-বইগ্নি এই স্থানেই তাঁহার প্রধান সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন। মারাঠাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কালে, টমাস, কারনালের ক্ষুদ্র একদল শিখসৈন্য পর্য্যুদস্ত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কার্য্য করেন। এই সময় দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া নিজের জন্য একটী পৃথক্ রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয়। এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি পূর্ব্বপরিচিত হান্সির জীর্ণপ্রাচীরের তলে উপনীত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ ও কামান প্রস্তুত করতঃ ধীরপদক্ষেপে রাজ্য হস্তগত করিতে অগ্রসর হন। পেরোণ, তাঁহার ক্ষমতা-প্রভায় বিচলিত হন। পেরোণের ভয়ের প্রধান কারণ,—টমাস্, হোলকার-কর্তৃক উৎসাহিত ও লাকোয়াদাদা (Lukwa Dada) ও অপরাপর মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট হইতে সাহায্যলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ফুলকিয়া-সম্প্রদায়ের ভাগসিংহের অধিকৃত জিন্দনগর অবরোধ করেন। প্রবীণ সর্দ্দার বাঘেলসিং, ক্রোরাসিংহিয়া এবং দুর্ব্বল পাতিয়ালারাজের ভগিনী (Amazonian) তৎস্থান উদ্ধার করেন, এবং টমাস্ হান্সিতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ফতেহাবাদ অধিকার করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে ফতেহাবাদ লোকশূন্য হয়, তৎপর কয়েক বৎসর উহা হারিয়ানার

সত্ত্বেও ভুটিয়ারা তৎকালে জনসমাজে প্রখ্যাত হইয়া উঠিতেছিল। পাতিয়ালা-সর্দ্দার পরে ইহাদের সহিত মিত্রতা করিয়া, টমাসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণসময়ে ইহাদের সাহায্য করেন। টমাসের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল,—পাতিয়ালা; সর্দ্দারের ভগিনীকে অস্থায়িভাবে পাতিয়ালার সর্ব্বময় কর্ত্রী হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠে; কিন্তু ভুলেলওয়ালা-সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ তারাসিংহের জন্য তিনি সহজে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন না। এতৎসত্ত্বেও তিনি তারাসিংহের উপর আংশিকরূপে কৃতকার্য্য হন। মালেরকোটলার পাঠানগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে এবং রায়কোটের মোসলমানগণ-কর্ত্তৃক তিনি উদ্ধারকর্ত্তারূপে সাদরে অভ্যর্থিত হন। ইহারা কয়েকদিবস লুধিয়ানা স্বাধিকারে রাখে এবং ইহাদের সকলেই শিখগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। এই সময় নানকের স্বজাতীয় সাহেবসিং-নামক এক ব্যক্তি ধর্ম্মের ভাণ করতঃ এক বিপুল সেনাদল সংগ্রহ করিয়া লুধিয়ানা অবরোধ করেন, মালেরকোটলা হস্তগত করেন এবং ফিরিঙ্গিবিজেতাকে আদেশ করেন যে, শিখ-ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে যেন তাঁহাকে তিনি মান্য করেন। কিন্তু সাহেবসিং বেশিদিন এভাবে নিজের স্বদেশেও প্রভুত্ব করিতে পারেন না; অচিরেই সাতলেজের পরপারে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হয়। সাহেব প্রস্থান করিলেও টমাসের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, কারণ, সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে এক-জোটবদ্ধ হয়। এই অবস্থায় তিনি আস্তে আস্তে লুধিয়ানার নিকট হইতে নিজের শক্তিশালী হান্‌সিদুর্গ-অভিমুখে হটিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরও তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জিন্দের সর্দ্দারের অধিকৃত সাফিদননামক পুরাতন সহর আক্রমণ করেন। প্রথম, বিজয়লক্ষ্মী তৎপ্রতি বিমুখ

পরিত্যক্ত হইলে টমাস তাহা অধিকার করেন। এই সময় না কি টমাসের দশটি সেনাদল এবং ৬০টি কামান ছিল এবং তাঁহার অধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতে প্রায় ৪৫০,০০০ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইত। এই রাজ্যের ⅔ ভাগ তিনি যুদ্ধদ্বারা অধিকার করেন এবং ⅓ ভাগ মারাঠা-মিত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু পেরোণের সমস্ত কল্পনা ও অনুনয় প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পেরোণের সন্দেহ উদ্দীপ্ত হয় এবং তাহা ভঞ্জনার্থ পেরোণ টমাসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সময় টমাস শিখদিগের সহিত মিত্রতা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু এইরূপ ভাব দেখান যে, পেরোণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার নিমিত্তই তিনি শিখদিগের সহিত মিলিত হইলেন। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে তাহাদের ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্ত শিখগণ কিন্তু প্রকৃতই আগ্রহান্বিত হয় এবং মারাঠাদিগের পক্ষে পাতিয়ালা-সর্দ্দারের কার্য্যতৎপরতা ও উদ্যম দেখিয়া ফরাসী সেনাপতিকে হারিয়ানাতে পুনরায় সমরাভিনয় না হয়, তজ্জন্য নানারূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হয়। দুইবার বিধ্বস্ত হওয়ার পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে টমাস বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করতঃ ইংরেজরাজ্যে প্রস্থিত হন, তথায় সেই বৎসরেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। *

পেরোণ ইতিমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী Bourguin সাতলেজপ্রদেশে ভিক্ষা আদায় করিতে সক্ষম হন। পেরোণ আফগান-অধিকারসীমান্ত গিরিপ্রদেশ পর্য্যন্ত একটী স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। Malcolm লিখিয়াছেন যে, পেরোণ এই সময় ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই শিখদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু হোলকারকর্ত্তৃক সিন্ধিয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব হওয়ায় তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটে। রণজিৎসিংহের সহিত যোগদান করতঃ উভয়পক্ষের সম্মিলিত সৈন্য লইয়া সিন্ধুপ্রদেশে অভিযানে বহির্গত হইবার এবং লাহোরের দক্ষিণপ্রদেশ বিভাগ করিয়া লইবার মন্ত্রণা হয়। কিন্তু নানাকারণে তিনি কিছুই করিতে সক্ষম হন না।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

স্বদেশ-স্তোত্র।

জয় মা, জয় মা, বিশ্বে অতুলনা
চিরহাস্যময়ী সুষমাপ্রতিমা !
অতুলনা তোর সকল ভূষা—
অতুল আকাশে অতুলা উষা ;
অতুলা, অমলা শরৎ রাত্রি,
কুসুম-বিচিত্রা শ্যামা ধরিত্রী ;
অতুল তুঙ্গ হিমাদ্রিশৃঙ্গ,
শিখরে-শিখরে সরিৎ-রঙ্গ,
দিশি-দিশি-বাহী তরল তরঙ্গ ;
অতুল চরণে জলধি-ভঙ্গ ;
অতুল অঙ্গে তমাল-তাল,
বট-বিটপ, বিশাল শাল।
সুগন্ধ-মোদিতা সুবায়ু-সেবিতা
তরুকুল-মর্ম্মর— চির-মুখরিতা
ভৃঙ্গ-গুঞ্জিতা বিহঙ্গ-কূজিতা
স্নিগ্ধ-বনরাজি- কান্তি-বিরাজিতা,
দিব্যার্ক-আলোকা, চারু-চন্দ্র-তারকা,
নীলাভ-নির্ম্মল- অম্বর-পুলকা,
জয় মা জয় মা বিশ্ব-মনোরমা
চিরহাস্যময়ী সুষমাপ্রতিমা !
আদি বিভাবরী সুপ্রভাত করি,
তুমিই হেসেছিলে হে ভব-সুন্দরি ;
তুমিই আলোকিলে এ মহা নিখিলে,

আদিম আকাশে　　সে জবা সঙ্কাশে
তুমি সম্বোধিলে　　অম্বুদের ভাষে ;
সে মহতী ভাষা　　সে মহান ছন্দঃ
মুগ্ধ করিছে　　দিক্ দিগন্ত।
অতুলনা ওমা　　প্রকৃতি-পুলকে,
অতুলনা তুমি　　জ্ঞানের আলোকে ;
অজ্ঞান-নাশিনী　　বিজ্ঞান-দায়িনী
কলকণ্ঠময়ী　　বাণী প্রসবিনী,
কাব্য-দরশন-　　প্রভা-সমুজ্জ্বলা,
ধর্ম্ম-সুধা-চির-　　বর্ষণ-নির্ম্মলা,
জয় মা জয় মা　　বিশ্বে অনুপমা
চিরদীপ্তিময়ী　　মহিমা প্রতিমা !
অতুলনা তুমি　　সকল ঐশ্বর্য্যে,
অতুলনা তুমি　　শৌর্য্যবীর্য্যে ;
অতুলনা তোর　　বীরত্ব-কাহিনী
ব্যাস-বাল্মিকীর　　অমৃতের খনি ;
বীর-স্পর্শে পূত　　তোর আর্য্যাবর্ত্ত,
পঞ্চনদ তোর,　　জগতের তীর্থ ;
গঙ্গা-যমুনার　　সুধাসম নীর
আনন্দের অশ্রু　　বীর জননীর ;
বীরের শোণিতে　　পবিত্রা তুই মা,
তোর বীরসুতা　　জগৎ-গরিমা ;
জয় মা জয় মা　　বিশ্বে অতুলনা
চিরদীপ্তিময়ী　　মহিমা প্রতিমা !

স্বদেশী প্রসঙ্গ।

বৎসরেক হইতে বঙ্গে এক অভিনব কর্ম্মস্রোতঃ বহিতেছে। কেবল বঙ্গ নহে, সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া এই অপূর্ব্বশক্তি সঞ্চরণ করিতেছে; যাহা সঙ্কীর্ণ ছিল, তাহা ব্যাপ্ত হইয়াছে; যাহা মনের নিভৃতাংশে আবদ্ধ ছিল, তাহা কর্ম্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা দুই এক দিবসে হয় নাই, বঙ্গাঙ্গচ্ছেদে হয় নাই বা ইংরাজের তথাকথিত অত্যাচারে হয় নাই! বর্ত্তমান প্রচেষ্টা জগতের সমক্ষে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস! রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা ইংরাজ-কৃত অ্যাচার ইহার জন্মদান করে নাই।

সমগ্র ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইংরাজ প্রকৃত-রূপে অত্যাচারী নহে। সেদিন বরিশালে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিলাম, তাহা কয়জন ইংরাজকৃত? ইংরাজ হুকুম দিয়াছিল বটে, কিন্তু রেগুলেশন-লাঠি ধরিয়াছিল আমাদেরই স্বদেশবাসী;—তাহারা কি বুঝে নাই যে, এই কার্য্য স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসহন্তার উপযুক্ত! কয়জন ইংরাজ, দারোগা সাজিয়া গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের ত্রাস উৎপাদন করিয়া থাকে? দারোগা আর কেহ নহে, আমাদেরই জ্ঞাতিবর্গ! ইংরাজের বৃত্তিভোগী দাস হইলেও পুলিস স্বদেশবাসী; তাহার নিকট আমরা সহানুভূতির দাবী রাখি। পুলিস-শাসন গৌণভাবে স্বায়ত্ত-শাসনের অন্তর্মূর্ত্তি! কত দেশীয় হাকিমের অত্যাচার শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতেছি। এ সকল নিন্দা আমাদিগের গায়ে বাজিবে, কেননা—ইহা আত্মনিন্দা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আত্মনিন্দা আত্মহত্যার তুল্য। কিন্তু কি করিব, হৃদয় ভেদ করিয়াও অপ্রিয় সত্য

বশে—তাহা প্রকৃত স্বার্থ নহে, বিকৃতিমাত্র—আমাদের সর্ব্বনাশ আমরা আপনিই করিতেছি। বহুবিধ অত্যাচার হইতে আমরা আমাদিগকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারি, যদি স্বদেশপ্রীতির ছায়ামাত্রও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে! আমাদের উপর অত্যাচারের সুবিধা যদি ইংরাজের নেত্রগোচর না করি, তবে ইংরাজ কি করিতে পারে? হায়! ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াই আমরা এমতপ্রকারে অবমানিত হইতেছি। ইংরাজের কি দোষ দিব? আমাদের যদি শক্তি থাকিত, যদি পুরুষত্ব থাকিত, তবে কি বিদেশী এমন করিয়া হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিতে পারিত! আমাদের বুঝা উচিত, ইংরাজ এদেশে পরার্থ-পরতার বশবর্ত্তী হইয়া করুণা বর্ষণ করিতে আসে নাই। ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় ইংরাজ দেশবিদেশে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্বগৃহে যাহার আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য সে বাহিরে যাইবেই যাইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহাদিগকে অন্যের উপার্জ্জিত ধনের অংশভাগী হইতে হয়, প্রকৃতি তাহাদিগকে নানাপ্রকারে বলীয়ান করেন। অপর জীবের প্রাণহিংসা করিয়া জীবনধারণ করিতে হয় বলিয়া দন্ত-নখরাদিদ্বারা সিংহব্যাঘ্রাদি ভূষিত হইয়াছে। খাদ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ইতর প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় বিবেচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কি প্রকার কৌশল এবং অধ্যবসায়সহকারে পিপীলিকা মিষ্টান্নভাণ্ড আক্রমণ করে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যদি ইতর প্রাণী এতাদৃশ নীতির পরিচয় দিতে পারে; এবং তাহার সমর্থন সঙ্গত বিবেচনা হয়, তবে উচ্চতমবুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সুসভ্য ইংরাজরাজের নীতি সমর্থন করিবে না কেন? পরদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া, প্রকৃতি, বৃটনবাসীকে বিশেষ উপাদানে গঠন করিয়াছেন।

এইজন্য বিদেশী হইয়াও এতদূরে আসিয়া তাহারা আমাদের

করিতে আমাদিগকেই নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভেদনীতি ইংরাজের হস্তে ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া করিতেছে! আমরা যদি হীনাবস্থ না হইব, আমাদের নৈতিক শিক্ষা যদি অধঃগামী না হইবে, আমাদের ধর্ম্মবন্ধন যদি শিথিল না হইবে, তবে আমরা আত্মপীড়নে প্রবৃত্ত হইব কেন? কুলবধূ যখন অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করেন, লক্ষ্মী তখনই চঞ্চলা হয়েন। লাক্ষাকীট আমরা হৃদয়ে আপনি বসাইয়াছি, তাহার দংশন-যাতনা আমাদিগকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। যাক্, কি বলিতে কোথায় আসিলাম! আমরা বুঝিতে চাহিতেছি বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি কোথায়! যতদূর বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে ইহাকে নেশার উত্তেজনা বলিতে পারি না। এই অভিনব শক্তি রাজার অত্যাচারে, বঙ্গাঙ্গচ্ছেদমূলক রাজনৈতিক-অনুশাসন-ফলে উদ্ভূত হয় নাই।

আমাদের নেতৃগণ কিন্তু বলিতেছেন যে, বঙ্গবিভাগই স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত কারণ। যতদিন বিযুক্তবঙ্গ যুক্ত না হইবে, ততদিন এই আন্দোলন চলিবে। যদিও এখন ফুলার নাই, তথাপি, যতদিন ফুলারী হিংসা বিযুক্তবঙ্গের নূতনাংশে ধূমাইতে থাকিবে ততদিন ইহার নিবৃত্তি নাই। এই কথা শুনিয়া, আমরা এক বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি না, নেতৃগণের এতদুক্তির মর্ম্ম কি? আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, বিযুক্ত-বঙ্গ যুক্ত হইলেই এই স্বদেশী প্রচেষ্টার অবসান হইবে? নেতৃগণ কাটা-বাংলা সেলাই করিয়া জুড়িবার জন্য বিলাতি থলিফার শরণাপন্ন হইতেছেন। শ্রীযুক্ত গোখেল বিলাতে তুমুল আন্দোলন করিয়া ফিরিয়াছেন, রমেশচন্দ্র করিতেছেন। কটন, ওডোনেল্-প্রভৃতি পার্লামেণ্ট-মহাসভায় বকাবকির ক্রটি করিতেছেন না। বিলাতি কর্ত্তা দার্শনিক পণ্ডিত মরলিও আশ্বাসবাণী-বর্ষণে ক্ষান্ত নহেন! তিনি সার্কুলারও জারি

করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলারী গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহার সার্কুলার মান্য করেন নাই। এখন হেয়ারী গবর্ণমেণ্টও তাহা সর্ব্বথা মান্য করিতেছেন না। এ রহস্য বুঝা দায়। মরলি ফুলারের যে সার্কুলার প্রত্যাহার করাইলেন, কার্য্যে সেই সার্কুলারের মর্ম্ম প্রচলিত থাকিতেছে! বস্তুতঃ, মরলিমহোদয়ের আশ্বাসবাণীতে ভরসা বাঁধিতে সাহস পাইতেছি না। ভারত-ভাগ্যে উদারনৈতিক, রক্ষণশীল সবই সমান! রক্ষণশীলদলের "India must be bled" কথাটা কত পরিষ্কার, উদারনৈতিকদলের "Wider element of sympathy is the key note of Indian administration," কথাটা তেমনি তমসাচ্ছন্ন। ইহার মর্ম্মানুধাবন বড়ই দুষ্কর! তবে আমরা কোন্ আশায় বুক-বাঁধিয়া ইংরাজের পাষাণ-দুয়ারে রাজনৈতিক ব্যাভিচারের প্রতিকারাশায় মাথা-কুটিয়া মরি! গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে সভা ডাকিয়া Resolution করিয়া ইংরাজের নিন্দাবাদে আকাশ-ফাটাইয়া কি ফল পাইতেছি? উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের ন্যায় লগুড়াঘাত প্রাপ্ত হইয়া, হৃদয়ে দুঃখস্রোতঃ, নয়নে অশ্রু বহাইয়া জগতের নিকট অকৃতিত্বের পরিচয় দিতেছি। যদি অন্তরের বন্ধন অটুট হয়, তবে বঙ্গ বিভাগ হইলেই কি তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে? যাঁহাদের সুখদুঃখে আবাল্য গলাগলি করিয়া হাসিয়া-কাঁদিয়া বেড়াইয়াছি, উদ্ধত প্রকৃতির শাসনকর্ত্তার লেখনী কি তাঁহাদিগকে ছিনাইয়া লইবে?

আজ যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, ইহার প্রতিকার বিলাতের জনসাধারণ কি করিবে! মানিলাম, বিলাতের আন্দোলনের ফলে কাটা-বাংলা জোড়া লাগিল! কিন্তু সেদিন যেসব সোনার চাঁদের রুধির-ধারায় বরিশাল সিক্ত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যথার স্মৃতি লুপ্ত হইবে? দেহের আঘাত মিলাইবে? প্রাণের ব্যথা কি অন্তর করিবে? যদি হৃদয়শল্য উৎপাটিত না হইল, তবে কোন্ আশায় এমন করিয়া বুকের রক্ত পাত

করিয়া জন্মভূমির অঙ্গ রাঙাইয়া ফেলিলাম! সেকি রাজনৈতিক অধিকারজন্য? ইংরাজানুশাসনে ভারতবাসীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ত সম্যকপ্রকারে সম্ভবে না। শ্বেত-কৃষ্ণে প্রভেদ থাকিবে;—তুমি যে বিজিত, তাহারা যে বিজেতা! এ কথা তুমি ভুলিও না! ইংরাজ কদাপি ভুলিবে না! ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ ৭।৮ মাসের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যায়। এজন্য এ দেশের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্ব আবশ্যক। ইহা রাজনীতির মূলমন্ত্র। সাতসমুদ্র-তেরনদী পারে আসিয়া খাদ্যের জন্য ইংরাজ কখনও তোমার কৃপার ভিখারী হইবে না। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, ভারতবাসীর স্বাধীন ইচ্ছার বশে সে তাহার কর্ম্মসাধন করিতে পারিবে না; এ কথা তাহার বুদ্ধির অগোচর নাই। তোমার কটন্, হিউম্, ওয়েডারবরণ কখনও ইংরাজকে এমত পরামর্শ দিবে না, যাহাতে এদেশে ইংরাজাধিপত্যের বিন্দুমাত্র ন্যূনতা হয়। তোমরা হিন্দু-মুসলমান, তাহারা খ্রীষ্টান, এমত অবস্থায়, তোমাদিগকে তাহাদের অক্ষুণ্ণ-প্রতিষ্ঠার অংশ প্রদান করিবে না। ইংলণ্ডের জনসাধারণের জীবিকার অনুরোধে, স্বার্থের অনুরোধে, বলে, ছলে বা কৌশলে, ইংরাজ ভারত করতলস্থ রাখিবে।

ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইবে, আর তোমরা মাত্র উৎপাদন করিবে, ইহা স্থিরসংকল্প করিয়া সে এদেশে আসিয়াছে। তাহাদের কর্ম্মসাধনোদ্দেশে—ইচ্ছা হয়, সমস্ত বঙ্গ এক করিবে, অসুবিধা হয়, খণ্ড খণ্ড করিবে। তোমার সুবিধার দিকে তাকাইবে না; তোমার বাধা গ্রাহ্য করিবে না। আমরা যতই কেন আন্দোলন করি না, হিউম্-কটন্ যতই কেন আশ্বাস প্রদান করুন না, ইংরাজ কখনো স্বায়ত্তশাসন সম্যকপ্রকারে আমাদের হস্তে প্রদান করিবে না। পৃথিবী চিরদিন বীরভোগ্যা! চিরকাল বীর-হস্ত, ভারত-শাসন করিয়া

আসিতেছে। এজন্ত ইংরাজকে দোষী করিতে পারা যায় না। দিগ্বিজয় বীর-ধর্ম্ম, ইংরাজ সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া এদেশে আসিয়াছে ; সে তাহার ইচ্ছামত শাসন করিবে, তোমার কথা শুনিবে কেন ? যতদিন আমাদের দুষ্কৃতি থাকিবে, ততদিন আমরা ভোগ করিব। বৃথা ইংরাজকে গালি দিলে, আমাদের হৃদয়-জ্বালা দূর হইবে না। আমাদের নেতৃগণ এ কথা যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। তবে কেন তাঁহারা বিলাতে রাজনৈতিক-অধিকার-লাভ-আশায় আন্দোলন করেন, এবং শাসন-ব্যবস্থার ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন আশা করেন, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রকীটের জ্ঞানগোচর নহে।

নেতৃগণ যাহাই মনে করুন, আমরা স্পষ্টভাষায় বলিব যে, এই স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গাঙ্গচ্ছেদমূলক নহে ; বা ইহা ইংরাজের অত্যাচারে জন্মে নাই। যে অভিনব কর্ম্ম-চেষ্টা আজ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কখনো অত্যাচারপ্রসূত নহে। অত্যাচার যে শক্তি প্রসব করে, তাহা কখনও মহত্তর ব্রতসাধনের উপযোগী নহে। রাজনৈতিক ব্যাভিচার হইতে যদি এই শক্তি উদ্ভূত হইত, তবে এত শীঘ্র তাহা সর্ব্বহৃদয়সঞ্চারিণী হইত না। কত সভা দেখিলাম, কত জনতা দেখিলাম, কই, এমন উন্মাদিনী উত্তেজনা ত দেখি নাই! কংগ্রেসমঞ্চে রাজনৈতিক আলোচনা যাহা, পারে নাই, স্বদেশী আন্দোলন বৎসরমধ্যে তাহা সমাধান করিল! রাজনৈতিক আলোচনার মতদ্বৈধ দেখিয়াছি, আত্মবিচ্ছেদ দেখিয়াছি, আর আজ দেখিতেছি, অপূর্ব্ব গঙ্গাসাগরসঙ্গম! যে মুহূর্ত্তে জনসাধারণের প্রাণের তারে ঝঙ্কার পড়িয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে এমনি সুমধুর ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে! নেতৃগণ স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া যখন বঙ্গের জনসাধারণকে আহ্বান করিলেন, অমনি অনন্তচিত্ত হইয়া

কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না যে, স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাভিচারমূলক। এক মহাশুভক্ষণে নেতৃগণ জনসাধারণের মর্ম্মকথা বুঝিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের মহামন্ত্রে বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর প্রাণে স্বদেশ-সেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। স্বদেশসেবার আস্বাদ পাইয়া বাঙালীজাতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছে! যে মহত কর্ম্মচেষ্টা, আজ ভারতবাসী, সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; তাহা মানসকাননের কুসুমকুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া এই মুক্ত বিশ্বে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছে। শীতাহত পত্রপল্লবশূন্য বিটপিরাজি নববসন্তাগমে যেমন শ্যামলনবীনপত্রবল্লরীযুক্ত হইয়া যৌবনতেজসম্পন্ন হয়, ভারতের মৃতপ্রায় জাতীয়-জীবন আজি তেমনি প্রাণসম্পন্ন দেখিতেছি।

তাই আশা হয় যে, ঘনান্ধকারময়ী নিশার অবসানে নবারুণ-কিরীটিনী উষার রক্তিম রেখাপাত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান আপনার অতীত মহত্ত্বগৌরব ভুলিতে বসিয়াছিল। পশ্চাত্যজাতির সংশ্রবে আসিয়া আজ তাহাদের গৌরবাধিষ্ঠিত যুগের কথা মনে পড়িয়াছে। অতীতের সেই স্বপ্নযুগের দেবত্ব আজ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাহারা আবার বিশ্ববাসীর সমক্ষে সগৌরবে দাঁড়াইতে বাসনা করিয়াছে! ইহা তাহাদের ন্যায্য দাবী। এই দাবী, এই উদ্যোগপ্রচেষ্টার ফলই স্বদেশী আন্দোলন! বঙ্গবিভাগমূলক রাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা শাসনব্যাভিচার ইহার গৌণকারণমাত্র। আমরা যদি আমাদের লুপ্তগৌরব-উদ্ধারপ্রয়াসী হই, আমরা যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যম করি, তবে আমাদের কার্য্যে কোনও জাতির বাধা দিবার বিন্দুমাত্রও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকিতে পারে না। তবে আমাদিগের কষ্টার্জ্জিত অর্থের সহিত যাহাদের স্বার্থ বিজড়িত আছে, তাহাদের সহিত

সাধনের পথ কুসুমাবৃত নহে। বাধা-বিঘ্ন স্কন্ধে লইয়াই আমাদিগকে গন্তব্যমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতীয়স্বার্থের দ্বারে বলি দিতে হইবে! অন্তঃসারশূন্য প্রলোভন দেখিয়া ভুলিলে মাতৃসেবার ত্রুটি হইবে। ইংরাজানুশাসনে, তোমরা যাহা পাইবে তাহার মূল্য নাই—তাহা ছায়াবাজী! আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হও, তবে ত প্রতিষ্ঠা মিলিবে! আত্মবলিদান দেও, তবে ত মহাশক্তি উদ্বোধিত হইবেন!

সাধক যখন শবসাধন করেন, তখন শব দন্ত কড়মড় করিয়া মুখব্যাদান করিয়া থাকে। সাধক স্বীয় কার্য্যনাশ-আশঙ্কায় সংগৃহীত মাংসখণ্ড শবের ব্যাদিত মুখে প্রদান করিলে, সে তাহা চর্ব্বণ করিতে থাকে; এবং সেই অবকাশে সাধক স্বীয় কার্য্য সমাধান করেন! হে ভারতবাসী! তোমরা শব, ইংরাজ সাধক! ইংরাজ-শাসনে তোমার সময়ে সময়ে লাভ, মাংসখণ্ডমাত্র! এতদিন এমনি ইন্দ্রজালে ভুলিয়াছি! কিন্তু সাধকের মাংসখণ্ডে ভুলিলে আমাদের জাতীয়-জীবন-স্থাপনের আশা কোথায়! তুমি ত মরীচিকায় সন্তুষ্ট হইবে না, তোমার চাহি অক্ষুণ্ণপ্রতিষ্ঠা! "কায়েন মনসা বাচা" মাতৃসেবায় রত হইলে মায়ের শক্তি আমাদের কায়মনঃসঞ্চারিণী হইবে! তখন কেহই সে শক্তির গতিরোধ করিতে পারিবে না। তোমারই হৃদয় দিয়া এই বিশ্বে মায়ের শক্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। আজিও আমরা বিদেশী বস্ত্র একেবারে বর্জ্জন করিতে পারিব না—সে সাধ্য আমাদের নাই। গাভী দোহন করিতে না পারিলে দুগ্ধ মিলিবে কি প্রকারে? সুবর্ণপ্রসবিনী ভারতজননী আমাদিগকে সকলি প্রদান করিতে পারেন। মাকে মা না বলিলে, মা অভিমান করিবেন না কেন? আজকাল স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি

বিদেশীকে চটাইয়া লাভ নাই। বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া কর্কশবাক্যে বিদেশী রাজা এবং বণিকদিগকে বিদ্ধ করিলে মনে একপ্রকার অন্ধপ্রসাদ জন্মিতে পারে। এমত আত্মপ্রসাদে মনে ভক্তি-সান্ত্বনা আনয়ন করে, বস্তুতঃ আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না।

যদি প্রতীচ্যের শিক্ষা আনিয়া, প্রাচ্যের সহিত সংমিলন করিয়া ভারতীয় সনাতনশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলিতে হইবে, অপমানের তীব্রজ্বালা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। বিলাতে আন্দোলন করিয়া ইংরাজানুশাসনে রাজনৈতিক অধিকার-আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখিয়া, যে শক্তিবলে ইংরাজ, দেশবিদেশে অপ্রতিহত-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, সেই মহাশক্তি আহরণ করিয়া যাহাতে ভারতীয় জাতীয়-জীবনে সঞ্চার করিতে পারি, আমাদিগকে সেই শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। যখন এদেশে কংগ্রেস স্থাপিত হয়, ইহা দুই উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রথম, জাতীয়-জীবন-গঠন; দ্বিতীয়, বৃটিশ্ অধীনে রাজনৈতিক-প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়টির মূল শিথিল, তাই তাহা আমরা পাইতেছি না; প্রথমটি স্বভাবানুগত, ন্যায় এবং ধর্ম্মানুগত উদ্দেশ্য; তাই তাহা আমাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতেছে। মহাশক্তি কমলকরে দূর্ব্বাক্ষত লইয়া আমাদিগকে মহাব্রতে ব্রতী করিতে আহ্বান করিতেছেন! আইস, মায়ের চরণে প্রণত হইয়া মহাযাত্রার আয়োজন করি! বল "বন্দে মাতরম্।"

শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারত।

রাষ্ট্র-নীতি।

(৭)

দেশের লোক যে সকল জিনিসের দাবী করে তন্মধ্যে এই দুইটী প্রধান :—কর্ত্তৃত্বের কতকটা ভাগ পাওয়া এবং সরকারী বড় বড় কাজে নিয়োজিত হওয়া। দেশীয় ও জাতীয় রাজ্যশাসনের যে কতকগুলি সুবিধা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। লর্ড-সালিসবরিও তাহা অসংকোচে স্বীকার করিয়াছেন ;—"দেশীয় রাজাদিগের ন্যায় ইংরাজ-সরকার কখনই জোরজবর্দ্দস্তি কিংবা বে-আইনি কাজ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের কতকগুলি দোষ আছে ; তাঁহাদের অভিপ্রায় অসৎ না হইলেও, তাঁহাদের কতকগুলি কাজের ফলাফল অতীব অনিষ্টজনক......জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত ইংরাজ-শাসনপদ্ধতি অপেক্ষা, প্রাচ্যদেশীয় সাধাসিধা শাসনপদ্ধতির কার্য্যফল অধিক সন্তোষজনক......প্রাচ্যশাসনপদ্ধতির যে সুবিধা ও উপযোগিতা, তাহা আমাদের মনে আমরা ঠিক্ ধারণা করিতে পারি না........." কাথেওয়ার-প্রদেশসম্বন্ধে Sir Georges Clark আমার নিকট যাহা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন ;—"এই কাথেওয়ারপ্রদেশে, ইংরাজ-রাজ্য ও দেশীয়-রাজ্য—এই উভয়ের এলাকা-সীমা সুনির্দ্দিষ্ট নহে ; সুতরাং কোন ব্যক্তি অনায়াসেই দেশীয়-রাজ্যের এলাকা-সীমা লঙ্ঘন করিয়া, ইংরাজ-সরকারের এলাকায় আসিতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, দেশীয় লোকেরা ইংরাজ-এলাকা হইতে দেশীয় রাজার এলাকায় আসিয়া বাস

এলাকায় আশ্রয় লইয়াছে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও নাই।" কিরূপে রাজ্য-শাসন করিতে হয়, সে বিষয়ে, মৈশোর-রাজ্য চমৎকার শিক্ষা দিয়াছে। দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত বিষাদ-মগ্ন ইংরাজাধিকৃত প্রদেশগুলি ছাড়িয়া, যখন সমৃদ্ধ ও আমোদ-আহ্লাদপূর্ণ জয়পুরে কিংবা হৈদরাবাদে আসা যায়, তখনই আমাদের চোখ্ খুলিয়া যায়! ইঙ্গভারতীয় রাজপুরুষেরাই সাক্ষ্য দিয়াছেন,—বুদ্ধিতে, ব্যবসায়িক গুণে, উদ্যমতৎপরতায় ইংরাজ ও ভারতবাসী সমতুল্য। তবে কেন ভারতবাসিগণ কর্ম্মকাজ হইতে বর্জ্জিত হয়? ভারতবাসিগণ এই কথা বলিতে পারে:—"আমরা তোমাদিগকে তাড়াইতে ইচ্ছা করি না, কেননা, তোমাদের সাহায্য এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা আমাদের নিজের দেশে আছি; আমাদের নৈলে তোমাদেরও চলিবে না। আমাদের খরচে তোমরা যে জম্‌কাল ভোজের আয়োজন করিতেছ, সেই ভোজের স্থান হইতে আমাদিগকে তোমরা যে বহিষ্কৃত করিতেছ, তাহার কোন উৎকৃষ্ট হেতু কি তোমরা প্রদর্শন করিতে পার?" যাহা ১৮৩৩ সালে, গুরুগম্ভীরভাবে অঙ্গীকৃত হয়, যাহা ১৮৫৮ সালে পরিঘোষিত হয় এবং যাহা ভারতের স্বত্বাধিকারের ঘোষণা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে,—সেই অঙ্গীকারগুলির কথা ভারতবাসিগণ অক্লান্তভাবে পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাই তাহাদের দুর্ভেদ্য আশ্রয়-দুর্গ; এই সকল অঙ্গীকারের উপর ভর দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। এত আশা জাগাইয়া তোলা নিতান্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন এই সকল আশা পূর্ণ না করিলে, ইংরাজকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। কিন্তু ভারতবাসীদের জানা উচিত, একজন রাণীর অঙ্গীকার-বাক্যের মূল্য কি;—জানা উচিত, কোন বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে

আসল কথাটা এই—১৮৩৩ সালের উদারনৈতিক মহাত্মারা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের প্রতিপক্ষগণ ভিতরে-ভিতরে ও চুপিচুপি তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সমস্ত কাজ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। কার্য্যতঃ ভারত-সন্তানগণ বড় বড় সরকারী কাজ হইতে বর্জ্জিত হইল। আমাদের দেশে দলাদলির একপক্ষ ফ্রান্স-অধিকৃত উপনিবেশ-রাজ্যের একটা ছল ধরিয়া দোষ দেখাইতে পারিলে বর্ত্তিয়া যায়। আমাদের মধ্যে একটা কথার খুব প্রচার আছে—একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ইংলণ্ড মুষ্টিমেয় সিবিলিয়ানের দ্বারা ভারত শাসন করিতেছেন : ইহার সহিত আর একটা কথা তুলনা করিয়া দেখিতে তোমাদের অনুরোধ করি—ইংরাজভ্রমণকারীরা, আমাদের উপনিবেশরাজ্যের প্রত্যেক ঝোপ্‌ঝাপের পিছনে উর্দ্দি-পরা এক এক জন সৈনিক দেখিতে পান। আসল কথা—কাশীর রাজার কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয়—(কাশীর রাজা লড়াকা রাজা নহেন) যে-ভারত এক্ষণে দুইলক্ষত্রিশহাজার সৈন্যের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, সেই ভারতকে জয় করিবার জন্য দুই পণ্টন ফরাসীসৈন্যই যথেষ্ট। অল্পসংখ্যক সিভিলিয়ানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের পৃষ্ঠবলস্বরূপ এই বিপুল সৈন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৮৩৩ সালের অধিকারপত্রসত্ত্বেও, অঙ্গীকারগুলির পুনরাবৃত্তিসত্ত্বেও, পার্লেমেণ্টের "ভোট্"নিষ্পত্তিসত্ত্বেও, সম্ভ্রান্ত ইংরাজপরিবারের কনিষ্ঠদিগের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য, সিভিল-সার্ভিসের বড় বড় পদগুলি—মোটা মোটা বেতনের পদগুলি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। শাসনের সকল বিভাগেই এইরূপ : ইংরাজেরা শুধু এইরূপ কতকগুলি কর্ম্মচারী গ্রহণ করেন যাহারা সৎপথে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তাই তাঁহারা জয়োল্লাস-সহকারে বলিয়া থাকেন :—"তোমরা দেখ, ভারতবর্ষ কর্ম্মচারীদিগের উপনিবেশ নহে। দেখ, আমরা কত

এত-বড় দেশটাকে শাসন করিতেছি।” বস্তুতঃ, ছোট ছোট কাজ, কেরাণীর কাজ, কুলির কাজ, ১০ হইতে ২০ টাকা বেতনের কাজ,—যাহা “নেটিভের” উপযুক্ত, তাহা নবাবীচালে মুক্তহস্তে বিতরণ করা হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা, ভারতবর্ষ মোটা বেতনের কর্ম্মচারীদিগেরই রাজ্য। ১৯০০ সালের ‘ন্যাশানাল কংগ্রেসে’ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানর্জ্জি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভার সম্মতির জন্য উপস্থিত করেন :—“পুলিস, পূর্ত্ত, রেল, আফিম্, পোমিট্—এই সমস্ত বিভাগের উচ্চপদ হইতে ভারতবাসিগণ বর্জ্জিত হওয়ায় কংগ্রেস্ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে।” ব্যানর্জ্জি বলেন, ইহার মধ্যে শতকরা ৮০ টা পদ য়ুরোপীয়দিগের জন্য রক্ষিত। তিনি আরও বলেন, তিনশত বৎসর হইল, মোগলসম্রাট্ আক্‌বর যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কর্ত্তৃপুরুষগণ-কর্ত্তৃক সেই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হওয়া কর্ত্তব্য। উদার, সমদর্শী, ধর্ম্মগত ও জাতিগত অন্ধসংস্কার-বিবর্জিত সম্রাট্ আক্‌বর, হিন্দুদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে জড় করিয়াছিলেন।” ব্যানর্জ্জি, নিম্নলিখিত আরও একটি প্রস্তাব কংগ্রেসের সমক্ষে উপস্থিত করেন :—

সরকারী এঞ্জিনীয়ার হইবার জন্য Cooper's Hill বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসরে দুইজনমাত্র হিন্দু ছাত্র ভর্ত্তি হইতে পারিবে,—এইরূপ নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ন্যায়বিচারের খাতিরে এই সংখ্যা কমাইবার নিয়মটি রহিত করা উচিত। রুড়কীকালেজ হইতে যে সকল ইঞ্জিনীয়ার বাহির হয়, তাহাদিগকে সরকারী কর্ম্মে মনোনীত করা সম্বন্ধে, ইংরাজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে যে জঘন্য ভেদবিচার করা হয়, তাহাও রহিত করা কর্ত্তব্য...” বস্তুতঃ, যে সকল দেশীয়ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রুড়কীকালেজ হইতে বাহির হয়, তাহারা যে সকল কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকারী, সেই সকল কাজ পাইবার জন্য

ইঞ্জিনীয়ারদিগের জন্য যে Cooper's Hillকালেজ প্রতিষ্ঠিত, ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে তাহার দ্বারও রুদ্ধ। অথচ, ভারত-তহবিল হইতে Cooper's Hillকালেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। Stracheyই না লিখিয়াছিলেন যে, ইঞ্জিনীয়ারবৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য ভারতবাসীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই? কি সহজ ওজর! রুড়কীকালেজের প্রধানাধ্যক্ষ ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। কলিকাতার এঞ্জিনীয়ারিং কালেজের একজন অধ্যাপকের মুখে আমি এইরূপ শুনিয়াছি:—"আমাদের ছাত্রগণ খুব নিপুণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহারা ছোট ছোট কর্ম্মই পাইয়া থাকে; তাহাদের বেতন খুবই কম" কিন্তু সত্য কখন-কখন বদ্ধ কূপ হইতেও বাহির হইয়া পড়ে। "আমাদের বাণিজ্যব্যাপারের জন্য কি উপায়ে নূতন-নূতন পথ উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে; এবং আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত বেকার যুবকদিগের জন্য কি উপায়ে কর্ম্মকাজ যোগান যাইতে পারে,—ইহাই প্রকৃত সমস্যা।"

সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিবার জন্য হিন্দুরা নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের রাজ্যপরিচালক, ভারতের জিলা-জজ্, ভারতের কালেক্টর, ডেপুটি-কমিশনার, লেফ্‌টেনাণ্টগবর্ণর, এমন কি, কখন-কখন গবর্ণরও—এই সিবিল-সার্ভিসকে যোগাইয়া থাকে। সিবিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিলে, সাক্ষাৎ-কর্ত্তৃত্ব সহজে হস্তগত হয়। এই সিবিল-সার্ভিস্‌কে ভারতবাসিগণ কেন এত মূল্যবান মনে করে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু ইঙ্গ-ভারতীয়েরা পদে-পদে ইহার প্রবেশ-পথ আগ্‌লাইয়া থাকে। তাহারা বলে,—এইরূপ পথ আগ্‌লাইয়া রাখায়, ভারত-সাম্রাজ্য নিরাপদ হইয়াছে! ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কনিষ্ঠ-

মেকলে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলেন। লাটিনের অনুবাদ, পুরাতন ভাষায় পদ্যরচনা, এবং প্রচলিত ভাষাসমূহ—এই সকল বিষয় পরীক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হইল। বেশ বুঝা যাইতেছে, ইংরেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাহাতে সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এইরূপ বিষয়সকল নির্দ্ধারিত হয়। নিয়মের বাধা না থাকায়, ভারতবাসীও প্রবেশলাভ করিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের পক্ষে এই প্রতিযোগিতার কল্পনাটা অতীব বিপ্লবজনক। প্রতিযোগিতার নিয়ম হইলে, জাত্যংশে যতই হীন হউক না কেন, কোন ব্যক্তি যোগ্য হইলেই সিবিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারে। এই প্রতিযোগিতার নিয়মে, শিক্ষিতশ্রেণীরই সুবিধা হইবে; কিন্তু সর্দ্দার-শ্রেণীর লোক,—তলোয়ারই যাহাদের একমাত্র ভরসা, তাহাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে। ইহা হইতে একটা অপ্রত্যাশিত ফল প্রসূত হইল। মুসলমানেরা—যাহাদের অধিকাংশই অনক্ষর—তাহারা মনে করিল, হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, সুতরাং তাহারা হিন্দুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ইংরাজের দিকে ঘেঁসিতে লাগিল। এইরূপে, যে এথিলিসের ভল্লাঘাতে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই আবার সেই ক্ষত আরোগ্য হইল ...

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিয়ম অনুসারে ভারতবাসিগণ প্রতি-য়োগিতার পরীক্ষায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল, কিন্তু ওঃ! এই ইঙ্গ-ভারতীয় রাজনৈতিকগণ কি নিপুণ যাদুকর! আমার মনে হয়, ঠিক্ যেন দুইজন লোক কাজ করিতেছে; একজন লোক একটা জায়গায় বসিয়া আছে; আর-একজন লোক বুনানী কাপড়ের ও-ধারে থাকিয়া, ধৈর্য্যসহকারে প্রথম লোকটির বুনানী নষ্ট করিয়া দিতেছে। উদারভাবে পিছপাও না হইয়া, ইংরাজ "নেটিভের" নিকট প্রতি-

একটা চলিত-কথা আছে,—"দর্জ্জা—হয় খোলা নয় বন্ধ রাখিতে হইবে।" কিন্তু এই চলিত কথার প্রভাব ইংরাজের উপর খাটে না। "রাজা মিত্রাল" নামে একজন হিন্দু (রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ?) বলেন ;—"কথাটা হচ্চে এই :—"এই যৎপরোনাস্তি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য, আমাদের সন্তানদিগকে ১৬ বৎসর বয়সে, পাঁচহাজার মাইল দূরে পাঠাইতে হইবে ; এবং সেখানে তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে তিনবৎসরকাল থাকিতে হইবে। ভাগ্য তাহাদের বিরুদ্ধে ; তাসের কেজোকাগজগুলা তাহাদের হাতে আসে না ; অধিকাংশই বাজেকাগজ আইসে ; এবং প্রবাসে থাকাতেও কত বিপদ ! বস্তুতঃ, অনেক 'বিলাৎ-ফেরৎ' হিন্দুযুবককে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়।" এই পরীক্ষা ইংলণ্ড ও ভারতে একসঙ্গে হয়—ইহা ভারতবাসিগণ গোড়া হইতেই দাবী করিতেছে ! ১৮৫৮ সালের মহা-ঘোষণার একটু পরেই, ভারতসচিব একটা অনুসন্ধান-সমিতি মনোনীত করিলেন ; কেবল ইঙ্গভারতীয়ের দ্বারাই সেই সমিতিটি গঠিত। সেই সমিতি, যৌগপদিক পরীক্ষারই অনুকূলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় দিলেন। সমিতি, ১৮৬০ সালের ২০ জানুয়ারীতে রিপোর্ট দাখিল করিলেন। কিন্তু সেই রিপোর্ট ভারত-সচিবের ঠিক অভিপ্রায়ানুরূপ না হওয়ায়, ভারত-সচিব উহা চাপিয়া রাখিলেন। কিন্তু এবার লণ্ডন ভারতবাসীদিগের দাবীদাওয়ায় প্রতিবাদ করে নাই—প্রতিবাদ করিল কলিকাতা। পার্লেমেণ্ট ও ভারত-সচিব, ভারতবাসীর এই দাবী কতকটা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। আর্গিলের ডিউক্ সার-নর্থকোট্ ও স্যালিস্‌বারি স্বয়ং, পার্লেমেণ্ট মহাসভায় সরলান্তঃকরণে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীদিগের জন্য সিবিল-সার্ভিসের পথ খুলিয়া দিতে আমাদের স্বার্থবুদ্ধি ও আমাদের

কথায়, মহাসভার সদস্যগণ সেই সময়ে তাঁহাকে স্তুতিবাদ করে। ১৮৬৯ সালের ১১ই মার্চ্চমাসে পার্লেমেণ্ট-সভায় আর্গিলের ডিউক্ এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"শিক্ষা ও যোগ্যতার বলে ভারতবাসিগণ, যেসকল পদে নিযুক্ত হইবার অধিকারী, প্রতিযোগিতার পরীক্ষা লণ্ডনে হইলে, সেইসকল পদ লাভ করিবার তাহাদের কি কোন সম্ভাবনা আছে ?" আর্গিলের ডিউক নিজে, যৌগপদিক প্রতিযোগিতার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনার পর তিনি থামিয়া গেলেন :— প্রতিযোগিতায় নির্ব্বাচিত, কিংবা ভারতসরকারকর্ত্তৃক অন্যকোন যোগ্যতার নিয়মে নির্ব্বাচিত ভারতবাসীদের জন্য, সিভিল-সার্ভিসের অন্তর্গত প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কাজ সংরক্ষিত হইবে, এইরূপ স্থির হয়। ১৮৭০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে, এই নিষ্পত্তিসম্বন্ধে একটি মন্তব্য-লিপি ভারত-সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। দুই বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা হইতে কোন উত্তর আসিল না। কলিকাতা ও লণ্ডনের মধ্যে পত্র-চালাচালিতে এত বিলম্ব হইতে পারে, কে বিশ্বাস করিবে ? ১৮৭২ সালের ১৮ই এপ্রিলে আর্গিলের ডিউক্ সেই মন্তব্য-লিপির কথা আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন, পরে, সেই বৎসরের ২২শে অক্টোবরমাসে, তাহার পর আরএকবৎসর পরে, এবং পরে ১৮৭৪ সালে, ভারত-সরকার প্রত্যুত্তর দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। যেরূপ উত্তর দিলেন, তাহা একটা এড়াইবার ওজরমাত্র। এ বেশ জানিবে,—লণ্ডন, ভাইস্রয়দের উপর হুকুম চালাইবেন, ইহা ভাইস্রয়দের মনোগত ইচ্ছা নহে। কি মধুর স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতা !— শাসন-পার্থক্যের দিকে প্রবণতা ইহার মধ্যেই দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর্গিল-ডিউকের অভিপ্রায়ানুসারে, একপঞ্চমাংশ কিম্বা একষষ্ঠাংশ কর্ম্ম ভারতবাসীদের জন্য রক্ষিত হইবে বলিয়া যে নিয়ম

করিয়া তুলিলেন। নিয়মটি খুব সাদাসিধা। প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নাই; ভাইস্-রয় স্বকীয় বিবেচনা-অনুসারে ঐ সকল কর্ম্মে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিবেন। দুর্ভাগ্যের কথা এই, যোগ্যতাসূচক পরীক্ষার অভাবে, ব্যক্তিগত সুপারিস ও মুরব্বির অনুগ্রহই কর্ম্মনিয়োগের প্রবর্ত্তক হইল। এইরূপ নিয়ম হওয়ায় অনেকেই অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর যাহারা নির্ভর করিতে পারে না, সেই সব রাজা ও নবাব—বিশেষতঃ মুসলমানেরা এই সুবিধাজনক নিয়মে পরিতুষ্ট হইল; অজ্ঞ হইয়াও যে, তাহারা উচ্চপদের অধিকারী হইল—ইহাতে তাহারা দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

এই নিয়মে প্রজাসাধারণের পূর্ণসন্তোষ হইবে যাহারা মনে করিয়াছিল, তাহাদের শীঘ্রই ভুল ভাঙ্গিল। রাজার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অঙ্গীকারের বলে বলীয়ান্ হইয়া, ভারতবাসিগণ সাম্য-ব্যবহার পাইবার জন্য অবিরত দাবী করিতে লাগিল। এবং ইহা নিঃসন্দেহ, শুধু কোন-প্রকার লঘু-উপশমের ব্যবস্থায়, কিংবা শুধু আংশিক অধিকারলাভে, ভারতবাসিগণ কখনই বৈধ আন্দোলন হইতে নিরস্ত হইবে না। ১৮৯৩ সালের ২ জুনে, দাদাভাই-নওরোজি-কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ভারত ও ইংলণ্ডে একসঙ্গে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা বসাইবার প্রস্তাবটি পার্লেমেণ্টের সাধারণ-সভায় গৃহীত হইল। তিনি প্রস্তাব করেন;—"এই সকল পরীক্ষার প্রকৃতি ও বিষয়, উভয় দেশেই একসমান হইবে, এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে পরীক্ষা-ফলের তারতম্য অনুসারে একই তালিকায় শ্রেণিবদ্ধ করা হইবে।" এই সংবাদে ভারতবর্ষ দীপালোকিত হইল। কিন্তু হায়! পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর হইলেও, শুধু উদারভাবের অভিব্যক্তি ভিন্ন, এই প্রস্তাবে আর কোন ফল হইল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারত-সরকার স্বভাবতই বধির; তাছাড়া ভারত-

পার্লেমেন্টের মঞ্জুরী প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, কাগজ-কলমে দস্তুরমত উহা লিপিবদ্ধ করিয়া সরকারী দফ্‌তরে নথীর সামীল করিয়া ফেলিয়া রাখিলেন ;—সেই সরকারী দফ্‌তর যেখানে আরো কত প্রস্তাব এইরূপে সন্দেহকটাক্ষপূর্ণ স্মিতহাস্যের সহিত গৃহীত হইয়াছে। এবং এই সকল ক্ষুদ্রনবাব ইঙ্গ-ভারতীয়েরা, যাহাদিগকে কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না, যাহারা আপনাদের হিসাব আপনাদের নিকটেই দাখিল করে, তাহারা খাতির-নদারদ্‌ নবাবীচালে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, এসব বিষয়ে পার্লেমেন্ট কেন হস্তক্ষেপ করে ?

* * * *

যে কারণে ভারতবাসিগণ উচ্চকাজ হইতে বর্জ্জিত তাহা স্বচ্ছজলের মত সুস্পষ্ট। মুখে যাহা-কিছু বলা হয়, যাহা-কিছু স্বীকৃত হয়, তাহা আসলে সত্য নহে। এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না, যাহাতে ইংরাজ উচ্চতর উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া, স্বকীয় অন্তরাত্মার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া না লয়। "সমস্ত সাম্রাজ্যের স্বার্থ সংকটাপন্ন ; সমস্ত সাম্রাজ্যের কথা কি—স্বয়ং ভারত সংকটাপন্ন।" ওঃ! ওসব বড় বড় কথা রেখে দেও ; রাজ্যপরিচালকগণ! এঞ্জিনীয়ারগণ! যদি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখ ত তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে দেখিতে পাইবে, তোমাদের নিজের বৃথাগর্ব্ব ও তোমাদের নিজের হীনস্বার্থই সংকটাপন্ন।

রাজধানী লণ্ডন, উপর হইতে অনেকটা অপক্ষপাতিত্বসহকারে বিচার করিতে সমর্থ ;—ভারতবাসীদিগের দাবীদাওয়া যে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, লণ্ডন তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছে। লণ্ডন, রাশ অনেকটা আল্‌গা দিয়া রাখিয়াছে, কেননা, লণ্ডন বেশ জানে, যাহাই করা যায় না কেন, ভারত আরো শিক্ষিত হইলে, আরো একীভূত হইলে,

অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তোমরা ইঙ্গ-ভারতীয় দল, তোমাদের জাতিগত ও বর্ণগত দ্বেষ এত প্রবল, 'নেটিভেরা' যতই যোগ্য হউক না কেন, সামাজিক মর্য্যাদায় যতই বড় হউক না কেন, তাহারা তোমাদের সহকারী হইবে, তোমাদের প্রধান হইবে, এ কথা তোমাদের অসহ্য। একপ্রকার বদ্-মেজাজি এক-গুয়ঁ্যামির সহিত তোমাদের স্বশ্রেণীর মধ্যে তোমরা তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেও না—দেশীয় লোক বলিয়া নহে,—অস্পৃশ্য মনে করিয়া। নিজের স্বার্থের প্রতি তোমাদের খুবই দৃষ্টি; এবং হয়ত তোমরা ইহাও মনে কর, একটা বিশেষ শ্রেণিগত গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকিলে সেইসঙ্গে ইংলণ্ডেরও স্বার্থ রক্ষিত হইবে। যে সকল কাজে মোটা বেতন আছে,—প্রতিপত্তি আছে, সেই সকল কাজ শুধু তোমাদের জাত-ভাইদের জন্য। অর্গলবদ্ধ দ্বার খুলিতে গিয়া, যে সকল ভারতবাসী আঙুল মচ্‌কাইয়া ফ্যালে, তাহাদিগকে তোমরা অনধিকারপ্রবেশী মনে কর; যাহারা কিয়দংশ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে তোমরা শত্রু মনে কর। তোমরা মনে কর, সাম্রাজ্যের উচ্চতর স্বার্থের জন্য, সমস্ত উচ্চপদ ইংরাজের হস্তে থাকা আবশ্যক। এই কথা কি বলা হয় না যে, লণ্ডনের উদার-নৈতিকেরা, রাজ্যের আভ্যন্তরিক শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে?—শৃঙ্খলিত বৃদ্ধ সিংহ পাছে কখন জাগিয়া উঠে, এইজন্য যতই সাবধান হইবে, ততই ভাল··· আজকাল প্রতিদিনই দেখা যায়, তোমাদের মনের গতি উল্টাদিকে সবেগে চলিয়াছে; আজকাল তোমরা যে কর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করিয়াছ, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে যারপরনাই নিরুৎসাহজনক, যার-পর-নাই মর্ম্মঘাতী। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র,—বেন্‌টিঙ্ক্‌ ও মেকলের শাসন-নীতি হইতে যে বহুদূরে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল মহানুভব উদারনৈতিকেরা মনে করিয়াছিলেন যে, ভারত-বাসিগণকে শিক্ষা দান করিলে এবং কিছুকাল বিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দিলে, ইংলণ্ড অসীম গৌরব অর্জ্জন করিবেন,—তাঁহাদিগের অপেক্ষা রক্ষণশীলেরা কি বড়ই বিজ্ঞ?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিরী-ফরীদ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—দুর্গাভ্যন্তর।

সৈনিকবালকবেশে আমিনা।

আমিনা। এক রাণীর জন্যই তাতারের রমণীর মর্য্যাদা নষ্ট হল! যখন সব তাতারীবীর রাণীর মর্য্যাদা রাখতে, যুদ্ধের জন্য পা-বাড়াতে গিয়ে শুনবে, রাণী অন্তর্হিতা হয়েছে, তখন কি আর কোনও বীরের পা চলবে? সুতরাং প্রভাত হ'তে না হতেই, লোকে রাণীর পলায়নবার্ত্তা জানতে না জানতেই এই যুদ্ধের আয়োজন। রস্তম সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নগরত্যাগ করিয়ে সকলকে প্রান্তরে সমবেত করছে। আমার এখন কর্ত্তব্য কি! যে উল্লাসে রস্তম আমাকে রণাঙ্গণে সহচরী করতে চেয়েছিল, সে উল্লাস তার আর নাই। ভাবে বুঝতে পারলুম, প্রভু আমাকে সঙ্গিনী করতে নারাজ। আমাকে এখন দেখা দিতে রাজ-প্রতিনিধি কাতর। বোধ হচ্ছে যেন, আমার কাছ থেকে তিনি কৌশলে দূরে দূরে সরে যাচ্ছেন। রাণীর ব্যবহারে, রস্তম সমস্ত রমণীজাতির উপর শ্রদ্ধাহীন হয়েছে। তা'তে তা'কে আমি অপরাধ দিতে পারি না। কিন্তু আমি তা'কে ছেড়ে কেমন করে' থাকব! বুঝতে পারছি, এ জীবনপণ-সংগ্রাম। সম্রাটকে পরাস্ত করে' যদি রাণীকে বীর তাতা'

তাতারে জীবিত ফিরবেন না। জেনে আমি চুপ করে বসে' থাকব? বাল্য হ'তে সুখে-দুঃখে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি, আর আজ এই বিষম দুর্দ্দিনে, তাকে চক্ষের অন্তরাল করে, কেবল চিন্তার বন্দিনী হয়ে ঘরে বসে থাকবো? তারাত একদণ্ডের জন্যও আমাকে উৎপীড়িত করতে নিরস্ত থাকবে না। ঘরে থাকতে পারবো না—তাই এই বেশ পরেছি। এই বেশে রুস্তমের মনোরঞ্জনে পরীক্ষা দেব। পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হ'তে পারি, তবেই আমার জন্ম সাথক। নইলে বুঝবো রুস্তমের হৃদয় আকর্ষণে আমার নিজের কোনও কৃতিত্ব নাই। কৃতিত্ব আমার রূপের। ওই রুস্তম সৈন্যসঙ্গে এদিকে আসছে। সকলে দেখছি নগরের বাহিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। আমারও পরীক্ষার সময় এলো। যদি তাতারী বালক হয়ে সঙ্গে যেতে পারি, তবেই বুঝবো পারস্যের সম্রাটকে বন্দী করা তাতারী বালকেরও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি আমি আমিনা হয়ে ঘরে ফিরি, তাহলে বুঝবো তাতারী রমণীর গর্ভ পুরুষসিংহের বাসযোগ্য স্থান নয়।

[প্রস্থান।

(রুস্তম ও কতিপয় সেনানীর প্রবেশ।)

রুস্তম। ভাই সব! সিন্ধুসম পারস্যবাহিনী।
মোরা মুষ্টিমেয় তুলনায় তার। তাই
রণক্ষেত্রে ধীরতার বড় প্রয়োজন।
অঙ্গুলিপল্লবে যার গণনা সম্ভব
এত অল্পসৈন্য তারা, ফুৎকারে উড়ায়ে

সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, কর শক্তি-
ব্যবহার। বড়ই দুর্ম্মূল্য প্রাণ। তার
একটী বিঘোরে যদি যায়, সর্ব্বনাশ
হবে। অক্ষয়স্বরগলাভে, হবেনাকো
সে ক্ষতিপূরণ! পুনঃ বলি, সাবধানে
খেলো এ জীবন-খেলা। স্বদেশ রাখিতে
শত্রু বিনাশিতে রণাঙ্গণে দেহত্যাগ—
জীবনের উচ্চ আশা, বীরের এ প্রাণ-
ভরা সাধ—একদিন ভুলে যাও—যদি
হয় প্রয়োজন, যদি উন্মুক্ত প্রান্তরে
ভূ-বিজয়ী পারস্যের সেনা তীব্রবেগে
করে আক্রমণ—যদি বুঝ অক্ষম সে
গতিরোধে, লুকাইয়ো পর্ব্বতকন্দরে।
শত্রু যদি বলে কাপুরুষ, তবু কথা
তুলিয়ো না কাণে। এক কথা বুঝে রাখ,
বিধি বদি মর্ম্মকথা জানে, মূ᾿াহীন
ভিত্তিহীন অপবাদে কিহেতু করিব
ভয়? মনে রেখো, পবিত্রতাতার-রক্ষা
ধর্ম্ম সবাকার। তাতার যদ্যপি বাঁচে
ধর্ম্ম রক্ষা হবে। বীরত্বের অভিমান—
অক্ষয়স্বরগভোগ পুণ্য তুচ্ছ করি,
এ জীবনে সহস্র বাঁধনে বাঁধি, এস—
এস বীর জননীর গর্ব্ব রক্ষা করি।

১ম সে। যথা আজ্ঞা।

২য় সে। কার পরে কি রক্ষার ভার

রস্তম । তুমি জক্ষর্তিস-পারে,
তুমি রন্ধ্রপথে—তুমি পর্ব্বতশিখরে,
তুমি থাক নিক্রমণ-দ্বারে। প্রকৃতির
সনে যুদ্ধে, তোমাদের বাণে, হবে না কি
কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পারস্যসম্রাট ?

১ম সে। যদি যায় পলাইয়া ?

রস্তম। তাই যদি হয়,
াসম, দৃষ্টির সীমান্ত হ'তে, তীব্র-
েগ, পড়ে তার শিরে। যদি না পলায় ?
যদি ক্ষুদ্রতাতারের সৈন্য ধ্বংস ক'রে
ঘর্ঘর লঙ্ঘিয়া শাহ এপারে আসিয়া
পড়ে !

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। যদি পড়ে, সে চিন্তা তোমার নয়।
যদি পড়ে, হে সুবিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধি ;
তাতারের শিশু-নারী সকলে বুঝিবে
বীরশূন্য হয়েছে তাতার। গেছে বীর—
গেছে চলে প্রতি অস্ত্রধারী ! এমন কি,
যষ্টিধারী বৃদ্ধশূন্য হয়েছে তাতার।
উপদেশ দিতে, কি কর্ত্তব্য বুঝাইতে,
সে সময় শুধু কি তুমিই রবে, রাজ-
প্রতিনিধি ! ভয় নাই, স্তন্যপায়ী শিশু
ফেলে, অস্ত্র-হাতে ছুটিবে জননী—পত্রে
পত্রে ছুরী হবে ক্ষুদ্রকমলিনী। তুমি

দুর্গরক্ষী শত শত বীর। তার পর
তাতার-রমণী। অপোগণ্ড শিশু যে গো
অস্ত্র-ধরা জানে—তার পর রাণী, সেথা
আমিনা রক্ষিণী তার। বীর! ভয় নাই—
নিশ্চিন্ত সমরে যাও।

[সেনানিগণের প্রস্থান।

রস্তম। কে তুমি বালক?

আমিনা। সেনাপতি! দেশের এ দারুণ দুর্দ্দিনে,
বালকের ক্ষুদ্র শক্তি দিতে উপহার,
এসেছি অঞ্জলি দিতে—যদি না করহে
তুচ্ছজ্ঞান, লবে কিহে ক্ষুদ্রব্যবহারে?

রস্তম। মূল্যবান উপহার তুমি! কিন্তু শিশু!
রণাঙ্গণে এ অমূল্যনিধি ছড়াইতে
এখনোত আসেনি সময়!

আমিনা। কিন্তু হায়!
আমি যে তাহাই দেখি রাজপ্রতিনিধি।

রস্তম। কি দুর্ভাগ্যে দেখিলে বালক?

আমিনা। দেখিলাম
তাতারের পূর্ব্বপ্রতিনিধি, বীরবর
রস্তম জীবিত নাই। তার নাম শুনে,
রণক্ষেত্রে গর্ব্বময় পার্শ্বে দাঁড়াইতে,
বহুদূর হ'তে আমি এসেছি উজীর!
এসে, দেখে হতাশ হইনু আমি।

রস্তম। হও
রূঢ়, সত্যভাষী তুমি—যথার্থ মরেছে
তাতারের রাজপ্রতিনিধি।

আমিনা।   আহা, কবে !

কোন্ দুঃখে বীরবর ? ভয়ে কিম্বা প্রেমে ?

রস্তম। ভয়ে নয়, প্রেমে নয়—ভেঙ্গেছে বিশ্বাস।

শিশু ! মর্ম্মে মর্ম্মে বজ্রের প্রহারে, আজি

অকালে জীবনত্যাগ করেছে রস্তম।

আমিনা। তাই আমি দেখিতেছি। রস্তম থাকিত

যদি প্রাণে, রবিদীপ্ত মূর্ত্তি তার, সে কি

লুকাইত রন্ধ্রের ভিতরে ? লক্ষসেনা-

ভয়ে সে কি সাজাইত সৈন্য গিরিশিরে ?

যদি হয় রণজয়, সে জয়ের মান

পাবে গিরি, পাবে রন্ধ্র, পাবে স্রোতস্বিনী।

জগতে বলিবে, গিরি-রন্ধ্র না থাকিত

যদি, দেশে যদি না থাকিত স্রোতস্বিনী,

মুহূর্ত্তে তাতাররাজ্য হ'ত গোরস্থান।

শুনিয়াছি রস্তমের বীরত্বকাহিনী,

লোকমুখে শুনি, তার মত বীর নাই

ধরাতলে। রণরঙ্গে অধর্ম্ম না জানে।

শুধু বাহুবলে ভর তার। যশভাগ

প্রকৃতিরে দিতে সে কাতর।

রস্তম।   দেখেছো কি

রস্তমে কখন ?

আমিনা।   কিবা প্রয়োজন ? ক্ষুদ্র

আঁখি, কতটুকু দৃষ্টির পরিধি তার ? দূর

নীলিমার বুকে, আকুল আনন্দধারা

রূপে, আঁখিরে ভুলাতে চায়—মন বলে
ক্ষুদ্র আঁখি! বিন্দু নয় ব্রহ্মাণ্ড দেখিলি!
রস্তম যেভাবে তার দেখেছে আমিনা,
সেই অন্ধচক্ষু লয়ে দেখিতে রস্তমে
আজ্ঞা কি করহ মোরে রাজপ্রতিনিধি?

রস্তম। প্রাণেশ্বরী! একি ভাব! উষ্ণীষ চরণে
আমি রাখিনু তোমার—দণ্ডধর করে
তুমি এ ভীষণ রণে যোগ্য সেনাপতি!
নয়নে নয়নে রাখি ষোড়শ বরষ
কোথায় দেখিব তোরে ষোড়শ কলায়,—
পূর্ণরসে পূর্ণমূর্ত্তি পুণ্যসুধাধার—
তা' না ক'রে, সন্দেহ-মলিন কাচে আঁখি
আবরিয়া. পাপচক্ষে মলিন দেখিনু
তোরে প্রাণের আমিনা। আয়—আয় মোর
মুণ্ডধারী পরী! হাতে ধরি' এ কবন্ধে
সমর-সাগর কর পার। পূরাইব
বাসনা তোমার। সবে মিলে রণ দিব
উন্মুক্ত প্রান্তরে। যদি জিতি, যদি করি
রাণীর উদ্ধার—লয়ো তুমি যশোভার।
যদি মরি, এক ফোঁটা এ চক্ষের জলে
ধুয়ে দিয়ো বিরহের বিষাদ-স্বপন—
যেন প্রিয়ে জীবন-নদীর পারে বসে'
প্রাণপূর্ণ এ মধু নিশ্বাসে, উষ্ণ থাকে
হৃদয় আমার। আমিনা আমিনা! নহে

আমিনা। ভয় নাই, তাই যদি বিধির বাসনা—
সাথে সাথে রবে তব চিরসহচরী।
ঘরে ফেলে চলে এসেছিলে—অবজ্ঞায়
তাতে মর্ম্মে বাধেনি আমার। বড় সাধে
ভুলাতে তোমারে তাই বালক হইয়া,
কাড়িয়া লইতে এনু আমিনার স্থান।
পথে পথে দুষ্ট সমীরণ, আমিনারে
কত যে করিল পরিহাস! বলে, ছাড়
রস্তমের আশ। এ বীর বালকে হেরে
তরুলতা দেখিয়া হাসিল, নিঝরিণী
কল্লোলে কল্লোলে হাসি শূন্যে পাঠাইল—
সারাপথ দুষ্ট সমীরণ মোরে লয়ে
করিল অসংখ্য পরিহাস। বলে, "কোথা
যাও হে বালক! বল, অভাগী আমিনা
কি শত্রুতা করেছে তোমার; তাই তুমি
আমিনার শিরোমণি প্রেমিক রস্তমে
কেড়ে নিতে চলেছ নির্দ্দয়! মাথা খাও,
ফেরো হে সুন্দর শিশু! তোমারে হেরিলে
জন্মমত আমিনারে ভুলিবে উজীর।
অভাগীর তপ্তশ্বাসে পুড়ে যাবে লতা,
ঝরে যাবে পাদপের পাতা—শুকাইবে
ব্যাকুলা তটিনী।"—শুনহে প্রেমিকবর!
এ বীরবালকমুখে যদিনা দেখিতে
পেতে পরিত্যক্তা আমিনার ছবি—যদি

কাড়িয়া লইত তব আমিনার স্থান—
আর না রহিত ঘরে রস্তমঘরণী—
রস্তম কাতরকণ্ঠে আমিনার নামে
নদী না তুলিত প্রতিধ্বনি। মুছে যেত
তাতার-সমীর হ'তে আমিনার নাম।

রস্তম। অন্তরে অন্তরে আমি নেহারি যে তোরে।
অন্তরের অন্তঃস্তলে যে মুখকমল
আবদ্ধ করিয়া আমি রেখেছি প্রেয়সী,
তাহতে কঠিন ঘন কোথা আবরণ?
তোমারে দেখিতে, মোরে না করিতে হয়
আঁখির নির্ভর। নাও, চল—উর্দ্ধশ্বাসে
বিপুল আলোকমুখে ছুটেছে ধরণী।
দেখিতে দেখিতে মধ্যপথে—আর হেথা
বিলম্ব উচিত নহে—থাকিতে থাকিতে
নিশীথিনী—চল যাই উন্মুক্তপ্রান্তরে
করি সৈন্যসমাবেশ। কিন্তু প্রিয়ে, কিবা
অভিপ্রায়? যাবে কি ছলনাময় বেশে?

আমিনা। ক্ষতি কি প্রাণেশ! রাণী প্রেমাভিলাষিণী
প্রেমরঙ্গে রণ-আবাহন। প্রেম-সরে
সুখাবগাহন। কত তাতারী ডুবিবে,
কত পারসিকা নারী স্বামী হারাইবে—
শিশিরসঞ্চারে আধাফোটা কমলিনী
ফুটিতে ফুটিতে যথা মরমে মরিয়া
যায়, আপনার মৃণালে জড়ায়, আর
মুখ নাহি তোলে—বিরলে প্রেমিকপাশে

বিষাদসোহাগ-নীরে ভেসে, সেই মত
অর্দ্ধ উচ্চারিত কত বিদায়ের কথা
ইহজনমের মত নীরব হইবে—
মুখপদ্ম মৃণাল-বাহুতে দিবে ভর!
এহেন অপূর্ব্ব প্রেমপ্রতিষ্ঠার ঘরে
আমার নারীত্ব যদি দুইদিন রাখি
আমি লুকাইয়া, তার ক্ষতি কি প্রাণেশ?
রুস্তম। বেশ চল—তব পরে রাণীর উদ্ধার-
ভার। শুন, পর্ব্বতশিরে কাড়া বাজে,
চল চল—রণরঙ্গে মাতিল তাতার।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

গোপীচাঁদ।

মারাঠাগণের মধ্যে গোপীচাঁদনামে এক সন্ন্যাসিরাজার বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মারাঠাগণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আহমদনগরনিবাসী মারাঠী কবি মহীপতি-(১৭১৫—১৭৯০)-বিরচিত 'সন্তলীলামৃত' ও পুনার অন্তর্গত ইন্দ্রপুরবাসী শ্রীযুক্ত আপ্পাজী গোবিন্দ ইনামদার-বিরচিত (১৮৬৯) 'গোপীচাঁদ নাটক'-অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত

ত্রৈলোক্যচাঁদের পুত্র রাজা গোপীচাঁদ গৌড় বাংলার রাজধানী কাঞ্চননগরে রাজত্ব করিতেন।

"গৌড় বংগাল দেশীঁ নিশ্চিত।
কাঞ্চননগর অসে কীঁ।
তে থেঁ ত্রৈলোক্য চন্দাচা সুত।
গোপীচন্দ মী রাজা নিশ্চিত॥"

গোপীচাঁদের মাতার নাম মৈনাবতী।

"ভিক্ষা মাগতাঁ নগরান্তরী। গেলা মৈনাবতীচ্যা ঘরীঁ,
ক্ষণেঁ মাতে দুধভাত নির্ধারী। ভোজন সত্বরী ঘালাবেঁ।"

তাঁহার ভগ্নীর নাম চম্পাবতী, ভদ্রাবতী নগরাধিপের মহিষী।

"যাচী ভগিনী চম্পাবতী। ভদ্রাবতী নগরীঁ হোতী।"

রাজা গোপীচাঁদের ষোলশতএক মহিষী ছিলেন।

"সোলা শতেঁ রাণ্যা লাবণ্য খানী।
ত্যা বিরহিত পট্টরাণী॥"

একদা রাজমাতা মৈনাবতী রাজপ্রাসাদের গবাক্ষ হইতে জলন্দর নামে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বিক্রয়ার্থ কাষ্ঠভার মস্তকে বহন করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া রাজমাতার ভক্তির উদ্রেক হইল, এবং তিনি সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে, একদিন রাজা তাঁহার মহিষীগণের সহিত প্রমোদরত আছেন, এমন সময়ে, তাঁহার অঙ্গে উষ্ণজলবিন্দু পড়িল। অনুসন্ধানে রাজা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে প্রমোদরত দেখিয়া তাঁহার অনুতপ্তা মাতার অশ্রুজল তাঁহার অঙ্গে পড়িয়াছে। রাজা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরকালে আত্মার সদ্‌গতির নিমিত্ত মাতা পুত্রকে জলন্দরসন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজার বিষয়ভোগমত্ত চিত্ত সন্ন্যাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; তিনি

সন্ন্যাসীকে একটা গোময়স্তূপের নিম্নে প্রোথিত করিতে গুপ্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

জলন্ধরের প্রিয়শিষ্য কণিকা গুরুর অন্বেষণ করিতে করিতে সেই রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৈনাবতী তাঁহাকে গুরুর অদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহারই পুত্র সন্ন্যাসীকে গোময়স্তূপে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজমাতা পুত্রের নিকট যাইয়া সমস্ত বলিলেন। গোপীচাঁদ ভীত হইয়া সন্ন্যাসীর ক্রোধশান্তির জন্য মাতাকে অনুরোধ করিলেন। মাতা পুত্রকে লইয়া কণিকার নিকট, আগমন করিলেন। মাতার অনুনয়ে কণিকা রাজাকে ক্ষমা করিলেন।

কিয়ৎকাল গত হইলে, সেই নগরে মাচ্ছেন্দ্রনাথ ও গোরখনাথ উপস্থিত হইলেন। কণিকা তাঁহাদের সহিত রাজার পরিচয় করিয়া দিলেন। মাচ্ছেন্দ্রনাথ রাজা ও রাজমাতার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে জলন্ধরনাথের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। তিনি রাজার স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের তিনটী অবিকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া গোময়স্তূপের নিকট রাখিলেন, এবং উহাদের পশ্চাতে থাকিয়া সন্ন্যাসীকে অহ্বান করিতে রাজাকে উপদেশ দিলেন। রাজার প্রত্যেক আহ্বানের উত্তরে স্তূপনিম্ন হইতে উত্তর হইল "পাপী, দগ্ধ হও"। এবং বাস্তবিক তিনটি মূর্ত্তিই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তৎপরে মাচ্ছেন্দ্রনাথ পুনরায় অহ্বান করিতে আদেশ করিলে রাজা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীর ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে আর কোন প্রতিমূর্ত্তি উপস্থিত নাই, এবং মাচ্ছেন্দ্রনাথের আদেশও অবহেলা করা যায় না। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া আহ্বান করিলেন। "বৎস, এখনো জীবিত আছ?" সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন। রাজা বলিলেন, "হাঁ প্রভো, আপনার আশীর্ব্বাদে"। সন্ন্যাসী বলিলেন

"তুমি চিরজীবী হও"। তৎপরে রাজা তাঁহাকে উত্তোলন করাইলেন, এবং তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া তাঁহাকেও শিষ্য করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "সন্ন্যাসকামনা সহজ, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করা বড় কঠিন"। তিনি রাজাকে বাস্তবিকই সংসার-বিরক্ত বুঝিয়া বৈরাগী সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিলেন।

"পূর্ণ অনুতাপী ও লখোনি চিহ্ন।
বৈরাগ্য দিখলেঁ ত্যাগ কারণ॥
সৈলী মুদ্রা কন্থা লেবোন।
বিভূতি চর্চ্চন সর্ব্বাঙ্গী।"

সন্ন্যাসী রাজা ভিক্ষার বহির্গত হইয়া প্রথমে তাঁহার প্রধানা মহিষীর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। রাণী বিস্মিত হইলেন, এবং ঐ বেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা স্থিরসঙ্কল্প। তৎপরে তিনি মাতৃসদনে যাইলেন। মাতা দুগ্ধ-তণ্ডুল দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরদিন তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন। ক্রমে তিনি ভগিনীপতির রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ভগিনী ভ্রাতাকে সুন্দর ভবন ও সন্ন্যাসিযোগ্য উত্তম পরিচ্ছদ দিয়া সেই নগরে রাখিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। সব বিফল হইল। বারবৎসরে ভারতের ৫৬ প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া কাঞ্চনপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে মাতা ও গুরুর সাক্ষাৎলাভ ঘটিল। গুরু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে আদেশ করিলেন।

রাজাও সহস্র বৎসর ন্যায়নিষ্ঠার সহিত প্রজাপালন করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া মহাধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

জি, বি, এম্।

খেয়াল খাতা।

অসহিষ্ণু পত্নী।

তীক্ষ্ণধী রহস্যপটিয়সী, অভিমানিনী, অথবা রুক্ষপ্রকৃতির পত্নীর স্বামী বেচারা যেন দেশালায়ের কারখানার কারিগর। পত্নীরূপিণী ফস্ফরাস লইয়াই বেচারার কারবার; ফস্ফরাস না ঘাঁটিলে তার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন; আবার ফস্ফরাস হইতে জীবন-সঙ্কট সর্ব্বদাই। ফস্ফরাসকে তোসামোদ-জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। আবশ্যক সময়ে সোহাগ-চিম্‌টায় ধরিয়া অতিসন্তর্পণে ব্যবহার না করিলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। ফস্ফরাস সর্ব্বদাই জ্বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই থাকে, একটু বাতাসেরও ভর সহ্য হয় না।

ওঠা আর নামা।

অন্ধকারে অপরিচিত সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সিঁড়ি নিঃশেষ হইয়া গেলেও মনে হয় বুঝি আরো আছে; পদ উচ্চাশায় উত্থিত হইয়া অপ্রস্তুত হইয়া নীচে পড়ে,—মাতা ধরণী যেন তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহেন না।

তেমনি নীচে নামিবার সময়েও সিঁড়ি নিঃশেষ হইয়া যাইবার পরেও নীচগামী পদ অপ্রস্তুত হইয়া ঠোকর খায়,—যেন মাতা ধরণী উঁচু হইয়া উঠিয়া বুক-পাতিয়া তাহার অবনতির মধ্যপথে বাধা দিলেন।

এমনি যাহারা অন্ধভাবে উচ্চাশা পোষণ করিয়া চলে, হঠাৎ একদিন তাহাদের আশা ভঙ্গ হইয়া যায়। চারিদিকে তখন কোথাও আশ্রয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতটা উঠিয়াও একবারের অকৃতকার্য্যতা বড়ই অপ্রস্তুত ও অপদস্থ করিয়া দেয়।

এমনি আবার যাহারা অন্ধভাবে অধঃপাতের দিকে ছুটে, তাহাদের বিষম অবনতির ঝোঁকসত্বেও অবস্থা ও ঘটনা তাহাদিগকে এমন অপ্রস্তুতভাবে বাধা দেয়, যে, তখন তাহাদিগকে সমতলপথে শমতা পাইতে হয়।

দুই আর তিন।

এ বিশ্বনিখিলে যত সংখ্যা আছে সবই দুই আর তিনের সংযোগে নিষ্পন্ন করা যায়, কেবল ১, ২, ৩, ৪ আর ৬ ছাড়া। ২ ও ৩ স্বয়ং নায়ক-নায়িকা, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ৪ শুধু দুয়ের অপেক্ষা রাখে, এবং ৬ হয় ২, নয় তিনের কাছে ঋণী, উভয়ের কাছে নহে। তিন হইতে দুয়ের বিয়োগে একের উৎপত্তি।

আমার মনে হয়, ২ বুঝি পুরুষ ও প্রকৃতির চিহ্ন এবং ৩ ত্রিগুণের চিহ্ন। ত্রিগুণান্বিত যে পুরুষপ্রকৃতি তাঁহারাই নিখিল জগতের স্রষ্টা। ৪ বেদ অর্থাৎ জ্ঞানের চিহ্ন; ৪ পুরুষ প্রকৃতির চিৎশক্তি। ৬ ঋতু অর্থাৎ কালের চিহ্ন; কালের নিত্যতার ব্যাপক পুরুষপ্রকৃতি (২) এবং ত্রিগুণ (৩) উভয়েই। ত্রিগুণাতীত যে পুরুষপ্রকৃতি (৩-২) তিনই এক (১)— "একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম"।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাল।

(১)

বছর চলে বর্ষাজলের
  ঢলের মত ;
কিম্বা ধুলায় পায়ের ঠেলায়
  Ballএর মত।
কালের বায়ু দোলায় আয়ু—
  নলের মত,
পল্‌কা শাখায় কিম্বা পাকা-
  ফলের মত।
চল্‌ছে শরীর বটে ঘড়ির
  কলের মত,
কিন্তু যমে ভাঙ্‌ছে ক্রমে
  খলের মত।

(২)

প্রাণটা মস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ
  Hallএর মত ;
কিন্তু উদাস শূন্য আকাশ-
  তলের মত।
সেথায় যে যে আস্‌ত সেজে
  Dollএর মত,
গেছে ভোজের বাজি গোছের
  চালের মত।

নদীকূলের ঝরা-ফুলের
দলের মত ;
কিম্বা লুপ্ত স্বপ্ন-ভুক্ত
ফলের মত।

(৬)

থাক্‌তে হবে তবুও ভবে
কলের মত ;
শুষ্কতরু কিম্বা মরু-
স্থলের মত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

"বাবু"র আক্ষেপ।

ভাই বাঙ্গালী, আমি আজ বহুকাল যাবৎ তোমাদের উপর রাজত্ব করিতেছি, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় আমার সিংহাসনচ্যুতির উপক্রম হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমি রাজা, জমিদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকের উপরেই রাজত্ব করিতাম,—ক্রমে ইংরাজের শিক্ষার গুণে দেশে যখন সাম্যের বাতাস বহিল, তখন আমার রাজত্ব বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভদ্রলোক-মাত্রেই—যাঁহার কিঞ্চিৎ লেখাপড়াজ্ঞান আছে, অথবা যাঁহার বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার—আমার প্রজা হইলেন। কেবল কতকগুলি বিলাতফেরৎ ব্যক্তি আমার শাসন মানিলেন না,—সমুদ্রপার হইতে

রহিলেন। তাঁহাদিগকে কেহ "বাবু" বলিলে তাঁহারা অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন,—এবং অনেক সময় শান্তিভঙ্গেরও উপক্রম করিয়াছেন, শুনিতে পাই। কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কারণ সংখ্যায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।

আমার এতদিনের রাজত্বের পর, এই বৃদ্ধবয়সে, আমার উপর তোমরা এমন বিরূপ হইলে কেন? "শ্রীযুত"নামক, কোথাকার একটা পাষণ্ড ছোঁড়া আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছে। ও শ্রীযুতটা কে? ও একটা upstart মাত্র;—কোন্ মোহিনী মায়ায় ও তোমাদিগকে ভুলাইল? দেখিতেছি, আজকাল অনেক নব্যতন্ত্রের লোক পরস্পরকে চিঠি লিখিবার সময় "শ্রীযুত" লিখিতেছেন। অনেক সভাসমিতি ও সংবাদপত্র, নিজ নিজ সভ্য ও গ্রাহকগণের ঠিকানা লিখিবার সময় "শ্রীযুত"শব্দই ব্যবহার করিতেছেন। কেন ভাই, আমি কি অপরাধ করিলাম? আমি ত ম্যাঞ্চেষ্টর হইতে আসি নাই—লিভারপুর হইতেও আসি নাই—আমায় বয়কট্ করা কি তোমাদের সুবিচার হইতেছে?

তোমরা হয় ত বলিবে, সাহেবরা আমাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে—তাই তোমাদের বড় অপমান হয়। স্বীকার করি, সাহেবেরা যখন অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সহিত, অত্যন্ত ঘৃণার স্বরে তোমাদিগকে বলে "Look here Baba"—তোমাদের প্রাণে বড় লাগে। স্বীকার করি, যখন আফিসের বড়সাহেব কেরাণীর জন্য বিজ্ঞাপন দিবার সময় কাগজে "Wanted a Babu"—তখন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির অসহ্য হইয়া উঠে—কিন্তু সে কি আমার দোষ, না তোমাদের দুরদৃষ্ট? ঐ শ্রীযুতটা কি তোমাদিগকে সে অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? যখন আমি আর থাকিব না, সকলেই যখন তোমরা শ্রীযুত হইয়া উঠিবে

তখনও তোমরা সাহেবদের ঘৃণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। তখন সাহেবরা বলিবে "Look here, Srijut"—"Wanted a Srijut for a tea garden in Assam, pay Rs10"—তখনও দেখিও, তোমাদের বেদনা ও অপমান একতিল কমিবে না। তখনও হয়ত কোনও বিলাতফেরতের শিশুসন্তান, তাহার পিতার আত্মীয়-স্বজনকে আসিতে দেখিয়া জানালায় বসিয়া মাকে বলিবে—"Mamma, mamma, look, lots of Srijuts are coming"*—তখন কি করিবে?

তোমাদের স্বভাব এই, নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানো। তাহা আমি বহুকাল হইতেই জানি। তোমরা "বাবু" বলিয়াই যে, সাহেবরা তোমাদের হেয়জ্ঞান করে, তাহা নয়,—তাহার অন্য কারণ আছে। সেই কারণটির প্রতিকার কর, তখন দেখিবে, এই বাবু খেতাবই তোমাদের শিরোভূষণস্বরূপ হইবে। সুতরাং আমাকে বিনাদোষে বহিষ্কৃত করিয়া তোমরা পাপের ভরা আরও ভারি করিও না।

আমি একদিন যাইব, আপনিই যাইব। যেদিন সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইবে,—সেদিন ভারতবাসী মাত্রের নামের শিরোভাগ এক হইবার সময় আসিবে। তখন আমার স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য, আর একজন আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে। সে শ্রীযুত নহে, মিষ্টার নহে, মৌলবী নহে, মুন্সী নহে, লালা নহে, পণ্ডিত নহে,—তাহার নামটি আমি এখনও জানি না। সে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেই—আমি তাহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া, স্বহস্তে তাহাকে আমার সিংহাসনে বসাইয়া, ইতিহাসের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব। ততদিন তোমরা অপেক্ষা কর; এবং সে শুভদিন যত শীঘ্র আনয়ন করিতে পার, তাহারই জন্য যত্নবান হও।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

---

* গত আষাঢ়মাসের "বঙ্গদর্শন" দ্রষ্টব্য।

ঘটীরাম ডেপুটী।

ভীম কোলাহল— সলিল কল্লোল
প্রলয় তুফানে যথা ;
থামিল হঠাৎ, যথা বজ্রাঘাত—
থামায় ঝটিকা বাত্যা।

উঠিলা এজ্‌লাসে, ধীরে মহোল্লাসে,
হাকিম সুঠাম ছবি,
হিমাচলশিরে, সিংহশিশু ধীরে
উঠে যথা হেরি রবি।

বসিলা সুন্দর, যমের দোসর
বিচারে বিচারপতি,
আসিল পেস্কার মরি কি বাহার,
মধুর মরালগতি।

Box কাঁধে করি, এল বংশীধারী
চাপ্‌রাশীকুলের মণি,
মুখে বীড় বীড় থেমে গেল ভিড়,
পালাল সকল প্রাণী।

হাকিমরতন টানিলা তখন
জলন্ত cigar এক,
গভীর স্বননে উকীলের সনে
আলাপিল যেন ভেক।

কতক্ষণে নীরবিলা হাকিমপ্রবর,

ধরিল অপূর্ব্ব শোভা এজ্‌লাস তখন,
শমন-সাম্রাজ্যে যথা শমন-আসন।
শোভিল কনকচস্‌মা নাসা আলো করি’
ঘটিরাম-ডেপুটীর যাই বলিহারি।
বুকের উপরে chain বিশুদ্ধ সোণার
জলদ-উরসে যথা বিজলী বাহার!

File হাতে করি’ সুদক্ষ পেস্কার
একে একে একে করিলা পেশ।
একে একে একে পড়িয়া ডেপুটী
বাজেকাজ যত করিলা শেষ।
উঠিল এবার case অভিনব
জমিদার এক বিবাদী যার।
অবাক্ হাকিম পড়িয়া কাহিনী,
হইল কেবল ভাবনা সার।
“বাদীকো বোলাও” জলদনিনাদে
হাকিমের মুখে ফুটিল বাণী;
“বাদী হাজির হ্যায়” ধ্বনিল গভীর
দ্বিগুণ বাজিল সে প্রতিধ্বনি।
কতক্ষণে উপনীত এজ্‌লাস নিকটে
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ভয়ে বাদী থর থর
চলন্ত চিত্রিত যথা ছায়া-বাজি-পটে।
হলপ্ পড়িয়া বাদী দাঁড়াইল Dockএ
কহিলা Deputy এবে
আপোষ করিতে হবে
নহিলে নিশ্চয় জেলে পাঠাইব তোমাকে।

অপরাধী জমিদার ? কল্পিত নালিশ!
খিলাপ তলপে বাদী
হইয়াছে অপরাধী
Prosecute করি Case করিব Dismiss।

এবার পেস্কার বাবু দিগম্বর রায়
মাথা নেড়ে ধীরে তায়
দিলেন হাসিয়া সায়
হেরিয়া মোক্তার স্থির পুতুলের প্রায়।

কাপড়ে ঢাকিয়া মুখ দর্শকগুলা,
হাসিয়া ঈষৎ হাসি করিল প্রস্থান,
সাবাসি মোক্তারগণ ধীরে গেলা চলি,
ষটীরামডেপুটীর বিচারবিধান।

দিগম্বরে জনান্তিকে কহিলা Deputy
"এসব ইতরপ্রাণী বড় 'বে-আদব'
ভাবে মনে জমিদারে যেন চুনোপুঁটী"—
"মধুকর বিনে আর কে চিনে আসব ?"

কহিয়া মধুর হাসি হাসিলা পেস্কার
ভাবেনা সার্থক তার জন্ম দুনিয়ার।
খুলিয়া pocketঘড়ি ধীরে টেনে chain
লাগিলা লিখিতে বাবু হাতে করি pen,
হুকুম লিখিয়া ধীরে পড়িলা দুবার,
শুনিয়া পেস্কার কহে 'legal order'!
Order পড়িয়া বাবু হইলেন লাল,

Deputy কহিলা উচ্চে "শুন সর্ব্বজন !
বিলাতী সাহেব আর জমিদারগণ—

সাত খুন করে যদি একে একে একে
তবু না উঠিবে কভু অসামীর Dockএ।
বিচারের এই বিধি রাখিও স্মরণ—
ওরা যারে মারে যবে, তারই মরণ।

I. P. C. Jail আর নহে অভিপ্রেত,
ইহাদের তরে তোরা জানিও নিশ্চিত।
এবার ক্ষমিনু শুধু দয়া করি ওরে,
আবার এরূপ caseএ যাবে যমঘরে।"
Dismiss হল case আসামী Discharge
C. I. E. জমিদারের কে দেখে উল্লাস।

শ্রীযামিনীমোহন দাস।

মেঘ ও ময়ূর।

"হে শিখি! তোমার পুষ্পকুঞ্জে বসতি
চারুচন্দ্রিকা-সুন্দর তব মূরতি।
মণিমরকতমণ্ডিত তব পুচ্ছ
চন্দ্রচূর্ণ; চন্দ্রিকা চাহি তুচ্ছ।
স্বর্গসুষমা শোভিত সর্ব্বকণ্ঠে,
নিখিল বিশ্বে মধুর দৃশ্য বণ্টে।
আমি—চিরগঞ্জিত অঞ্জননীল, ঘৃণ্য
কৃষ্ণকণ্ঠে কর্কশতার জন্য।
বিলেপি কালিমা শুভ্রবিশ্ব সদনে
চন্দ্রসূর্য্য ঘৃণাঘোরে ঢাকে বদনে।
শিখা বিস্তারি কেন তুমি এস ত্বরিতে
এ হীনে হেরিয়া প্রেম-আবাহন করিতে?"

"কে বলে তোমায় নীচ, নিন্দিত কুরূপ,
(তুমি) চিরবন্দিত সুন্দর শ্যামস্বরূপ।
হাস্যে তোমার নিখিল বিশ্ব হসিত
ঝরিতেছে কিবা যেন কাঞ্চন কষিত।
কোমল কণ্ঠ কিবা কমনীয় মধুর
ললাট লেখায় লজ্জিত লাখ ময়ূর।
তব—সৌম্যশুভদ! স্বর্গসোপানে ভ্রমণ

শান্ত, শীতল, সুরূপ শ্যামল, সুখদ
পুণ্যপ্রতিমা প্রণয়পূত প্রাণদ।
চন্দ্র সূর্য্য লজ্জায় ঢাকে বদন
স্তব্ধ মুগ্ধ বিশ্ব তোমার সদন।
রূপ দূরে থাক গুণে তুমি দেব অতুল
তোমার গুণেতে হইয়াছি আমি বাতুল।
ফণী খেয়ে খেয়ে হৃদয়ে জমেছে গরল
কণ্ঠ ব'হছে সে বিষম বিষ তরল।
বিষজ্বালাময় হৃদয় শীতল করিতে
বাহু বিস্তারি ছুটে আসি দেব ত্বরিতে
ঝাঁপ দিয়ে, প্রভো, তব হৃদসুধা-সরসে
বাসনা, হৃদয় জুড়াই পীযূষ-পরশে।

শ্রীকালিদাস রায় দাসগুপ্ত।

ইতুর কথা।*

কার্ত্তিকের শেষে হেমন্তের নির্ম্মলশিশিরমাথা গাছপালা, ঘাসগুলা ঝল্ ঝল্ করিতেছে। স্বর্ণাভ রৌদ্র এখনও শীতের কুয়াসার মলিনতা মাথে নাই। প্রভাতের তরুণ রবির মুখে এখনও সেই সোণার হাসি। পল্লীগ্রামে আজ বালিকাদের উৎসাহের সীমা নাই। "পুকুরপূজা" অন্থ এ বৎসরের মত সাঙ্গ হইল বটে, কিন্তু আজ হইতে আবার ইতুঠাকুরের পূজার মাসব্যাপী উৎসাহ। "শিউলী" ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহারা আজ জবা, ওড়, কবরী প্রভৃতি সূর্য্যপূজায় ব্যবহৃত পুষ্প সংগ্রহে সচেষ্ট। শুধু তাহারা নয়, নদীয়া-জেলায় পাঁচবৎসরের বালিকা হইতে অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধারাও এই ব্রত পালন করেন। ব্রতটিতে কৃচ্ছ্রও কিছুমাত্র নাই। অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে-রবিবারে পুরোহিত দ্বারা ঘটের উপরে সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে, এবং ব্রতধারিণীরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। বেদোক্ত সর্ব্ব-নিয়ন্তা সবিতাই এই পল্লীবাসিনীদের নিকটে "ইতুঠাকুর" নামে অবিহিত হন।

পুষ্পসংগ্রহের পর তাহারা বাটী গিয়া পূজার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইল, উৎসাহ তাহাদেরই বেশী। কেহ রক্তচন্দন ঘষায়, কেহ নৈবেদ্য-রচনায়, কেহ বা ঘটের শোভাবিধানে মনোনিবেশ করিল। বড় একখানা সরায় পুরু করিয়া মাটি রাখিয়া, ধান, ছোলা, মটর প্রভৃতি শস্য ছড়াইয়া দিল। (মাসব্যাপী জলসেকে এই শস্যবনে ইতুঠাকুর অদৃশ্য হইয়া পড়েন।) তাহার উপরে চিত্রিত ঘটগুলি স্থাপন করিয়া ঘটের মুখে কলা-মূলা ও জবাফুল-দূর্ব্বা-রক্তচন্দন দ্বারা অর্ঘ্য স্থাপিত হইল।

* সম্ভবতঃ সংস্কৃত "সবিতুঃ কথা" হইতেই "ইতুর কথা"র উৎপত্তি।—ভাঃ সং।

ক্রমে বেলা বাড়িল, খড়মপায়ে নামাবলীগায়ে ভট্টাচার্য্যমহাশয় আসিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। তাহার পরে কথা-শোনা—সকলে এক একটা ফুল বা সুপারী হস্তে কথা শুনিতে বসিলেন। পুরোহিত মহাশয় মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সূর্য্যের তেজোহ্রাসের ইতিহাস * শ্রবণ করাইয়া দক্ষিণা ও নৈবেদ্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। বালিকারা কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। "উম্‌নো-ঝুম্‌নোর" কথা না শুনিলে এ ব্রতই তাহাদের বিফল। বৃদ্ধা পিতামহীকে টানিয়া লইয়া তাহারা "ইতুর কথা" শুনিতে বসিল। পিতামহী "ঠাকুর শ্রীসূয্যি"কে প্রণাম করিয়া কয়েকবারমাত্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এই সুদীর্ঘ আখ্যানটি সমাপ্ত করিলেন।

"এক দেশে এক অতিবড় দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী থাকেন। কার্ত্তিক যায়, অঘ্রাণ আসে, সংক্রোন্তির দিন বামুন বলেন "বাম্‌ণি, পিটে-পরমান্ন খেতে সাধ হচ্ছে।" আঃ কপাল—কোথায় পাব পিটে-পরমান্ন—দরিদ্র ব্রাহ্মণ! "যার দুয়োরে যেতে হয় তার দুয়োরে যাব, যার দুয়োরে না যেতে হয় তার দুয়োরেও যাব, যেমন করে পারি তোমায় পিটে-পরমান্ন খাওয়াব।" বাম্‌ণী যার দুয়োরে যেতে হয় তার দুয়োরে গেলেন, যার দুয়োরে না যেতে হয় তার দুয়োরেও গেলেন, ভিক্ষে করে চাল, দুধ, গুড় নিয়ে এসে বাঁশের চোঙ্গায় জল নিলেন, ভাঙ্গা একখানি নিড়িনি নিলেন, সরা নিলেন, নিয়ে পিটে ভাজ্‌তে বস্‌লেন। বামুণের যে দুটী কন্যে উম্‌নো আর ঝুম্‌নো তারা ঝাঁটা-বাড়ুন মাথায় দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। একখান

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়। সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ প্রভাবে বিরাগিনী হওয়ায় বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের তেজোহ্রাস করেন। অগ্রহায়ণমাসের এই ব্রতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটা বেশ সামঞ্জস্য আছে। এই ঋতুতেই সূর্য্যের তেজোহ্রাস হইয়া থাকে।

ভাজ্‌তেই ছঁ্যাক করে শব্দ হ'ল, উম্‌নো উঠে বল্‌লে "মাগো মা, কি ভাজছিস্‌?" "চুপ্‌ চুপ্‌, তোর বাবা শুন্‌লে কেটে ফেল্‌বে।" "তা বল্লেও হবে না কইলেও হবে না, আমায় একখানি দিতে হবে।" তাকে একখানি দিয়ে শুইয়ে রাখ্‌লেন। আর-একখানি ভাজ্‌তেই ঝুম্‌নো উঠ্‌ল "মাগো মা, কি ভাজ্‌ছিস্‌?" "চুপ্‌ চুপ্‌ তোর বাপ শুন্‌লে কেটে ফেলবে"। "তা বল্লেও হবেনা, কইলেও হবেনা, আমায় একখানি দিতে হবে।" তাকে একখানি দিয়ে শুইয়ে রাখ্‌লেন। বামুণ ঘরের পেছনে বসে মাটিতে দাগ কেটে কেটে যে কখানা পিটে ভাজা হয়েছে গুণে রেখেছে। খেতে বসে বামুণ মক্‌ মক্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল "খেয়ে আমার পেট ভর্‌লনা, ঐ আলক্ষ্মী ছার হুটোকে খাইয়েছিস্‌, থাক্‌ কাল ওদের বনবাস দিয়ে আস্‌ব।" "আঃ কপাল! বাছাসকল আমার অম্‌নি শুয়ে আছে।" বামুণের তাতে রাগ পড়্‌ল না। অৰ্দ্ধেক রাত পোয়াতে না পোয়াতে বামুণ বল্লে "উম্‌নো-ঝুম্‌নো তোরা মাসীপিসীর বাড়ী যাবি?" ছোট ঝুম্‌নো বল্লে "সুকালে মাসীপিসী ছিল না, আকালে মাসীপিসী কোথায় পাব? যাব না।" উম্‌নো বল্লে "যাব বই কি, মাথা ভরে তেল পাব, পেট ভরে খেতে পাব, যাব বইকি, যাব।" বামুণ একটা ভাঙ্গা ছাতি, আল্‌তা, শাঁকের ঘুটিং লুকিয়ে সঙ্গে নিলেন, মেয়েদুটিকে নিয়ে বেরুলেন। "ইজোবন" "বিজোডাঙ্গা" জল পড়ছে ঢেকী হচ্চে, পাত পড়্‌ছে কুলো হচ্চে, এমন যে বন সেইখানে উপস্থিত হলেন। বাবা আর কত দূর যাব, এ যে ভয়ানক বন, মাসীপিসীর বাড়ী আর কত দূর"? "আর বেশী দূর নেই, এই বন পেরিয়েই যে 'ওরিচোরী দক্ষিণদুয়োরী' ঘর দেখা যাবে সেই তোমার মাসীপিসীর, একখান ভুঁয়ে সাতখান লাঙ্গল পড়্‌ছে সেই তোমাদের মাসীপিসীর।" "এইটুকু গেলেই যদি হয় তবে আমরা এইখানে একটু শুই"। বামুণ হাঁটুতে মাথা রাখিয়ে মেয়েদুটীকে শোয়ালেন।

পথশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত মেয়েদুটী তখনি ঘুমিয়ে পড়্ল। বামুণ তখন দুখানা গোহাড় কুড়িয়ে মেয়েদুটীর মাথার তলায় রেখে, ভাঙ্গা ছাতি ভেঙে্ ফেল্লেন, শাঁখের ঘুটিং ছড়িয়ে দিলেন, আল্‌তা গুলে ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলে চলে গেলেন। সন্ধ্যে হয়ে আস্‌ছে, এধারে বাঘ ডাক্‌ছে, ওধারে সিংহ ডাক্‌ছে, মেয়েদুটীর নিদ্রাভঙ্গ হল। "ঝুমনো-রে ঝুমনো! ওঠ্, এই দেখ্ বাবাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, ঐ দেখ রক্ত, ঐ দেখ্ হাড়"। ঝুমনো উঠে বল্লে "তাত নয়, কাল যে পিটে খেয়েছিলাম তাই বাবা বনবাস দিয়ে গিয়েছে। ঐ রক্ত চেকে দেখ্‌দেখি যদি তেত হয় আল্‌তা, নোন্‌তা হয় ত রক্ত"। চেকে দেখলেন তেত। "তবে ত বাবা আমাদের বনবাসই দিয়ে গিয়েছেন। সন্ধ্যে হয়েছে, বাঘ-ভালুকে খাবে, চল্ সত্যকালের বৃক্ষের কাছে যাই"। দুজনে সত্যকালের বৃক্ষের কাছে গেলেন। "সত্যকালের বৃক্ষ তুমি দোফাঁক হও, আমরা অনাথা ব্রাহ্মণকন্যাদুটী তোমার মধ্যে সেঁধুই"। সত্য-কালের বৃক্ষ দুফাঁক হলেন, দুজনে তার মধ্যে গেলেন। সমস্ত রাত্রি গাছের প্রহার হ'তে লাগ্‌ল। বাঘ এসে বলে, ভাল্লুক এসে বলে "তোর মধ্যে মনিষ্যি মনিষ্যি গন্ধ, বের করে দে খাই"। গাছ বলেন "আমি গাছ, আমি বৃক্ষ, আমি মনিষ্যি কোথায় পাব? কাল হাটবার, কতলোক এসেছে-গিয়েছে, আমার গায়ে ঠেঁস্ দিয়ে বসেছে, তারি গন্ধ"। রাত পোয়ালে কন্যাদুটি গাছের মধ্য হ'তে বেরুলেন। বনের ফল খেয়ে ঝর্‌নার জল খেয়ে এইরকমে বার বছর কাট্‌ল। ক্রমে তাঁদের দুর্দ্দশার সময় কেটে গেল। একদিন যে দেবকন্যারা স্বর্গ থেকে নেমে "ঠাকুরের" বর্ত্ত কচ্চেন, তাঁদের হাত থেকে ফুল পড়ে গেল। "দেখ্ ত রে বনে কে এসেছে"? চাকরেরা খুঁজে দেখে এসে বল্লে "মা, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব"? "ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও"। "দুটো বুনোকন্যে বনে ঘুরে বেড়াচ্চে"। "তাদের ডেকে নিয়ে আয়"।

চাকরেরা এসে কন্যেদের ডেকে নিয়ে গেল। দেবকন্যারা বল্লেন "তোরা কে?" "আমরা দরিদ্রব্রাহ্মণের কন্যে"। "তোদের এমন দশা কেন?" "বাবা আমাদের বনবাস দিয়েছে।" "তোদের দুঃসময় কেটেছে, এক কাজ কর, এই বর্ত্ত নে।" "এ বর্ত্ত কর্‌লে কি হয়?" "দুঃখদশা দূরে যায়, সুখসম্পত্তি হয়, যে যা চায় সে তা পায়। তোরা নদীতে গিয়ে স্নান করে আয়।" কন্যেদুটী নদীতে স্নান করতে গেলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে নদীর জল শুকিয়ে গেল, মচ্ছি-মকর ধড়্‌ফড়্ কর্‌তে লাগ্‌ল, কাছিম-কুমীরে খেতে এল। "কিরে তোরা ফিরে এলি যে?" "মা, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?" "ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।" মা নদীতে জল নেই।" "বুঝেছি তোরা বড় দুর্ভাগ্য, এই অঙ্গুরী নিয়ে নদীতে ফেলে স্নান করে আয়।" অঙ্গুরী নিয়ে তাঁরা নদীতে ফেল্লেন, যেমন জল তেমনি হল। তাঁরা স্নান করে অঙ্গুরী খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে এলেন। "হাঁরে তোদের এত দেরী হ'ল কেন?" "মা, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?" "ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।" "সে অঙ্গুরী আমরা পেলাম না।" "আমাদের অঙ্গুরী আমরা পেয়েছি, তোরা এখন বর্ত্ত কর—কথা শোন্"। কেউ দিলেন কলাটা, কেউ দিলেন মূলো, কেউ দিলেন নৈবিদ্যি-ধূপ-দীপ। দেবকন্যারা চুল কেটে চামর করলেন, জিহ্বা কেটে প্রদীপ কর্‌লেন, আঙ্গুল কেটে শল্‌তে কর্‌লেন, বুক ঠুক্‌রে ধূপ জ্বাল্লেন, ওড়ের ফুল, কামসিঁদুর, রক্তচন্দন, জবা, দূর্ব্বা, কাঁচাদুধ দিয়ে ঠাকুর শ্রীসূয্যির (সকলে অমনি জোড়হাতে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম) পূজো করতে লাগ্‌লেন। উম্‌নো-ঝুম্‌নোও পূজো কর্‌লেন। ঠাকুর শ্রীসূয্যি (প্রণাম) নমঃ নমঃ কর্ণে তামাহেন বর্ণে উদয় হয়ে হাতে হাতে পূজো নিতে লাগ্‌লেন। দেবকন্যারা বল্‌লেন "ছুঁড়ীরা পূজোই করছিস্ বর নে।" উম্‌নো বর চাইলেন "আমার বাবার

"আঃ মর্ ছুঁড়ীরা বাপেরই বর নিচ্ছিস্, নিজেদের কিছু নে।" ঝুম্‌নো উঠে বল্‌লেন "দিদির বিয়ে হ'ক রাজার সঙ্গে, আমার বিয়ে হ'ক পাত্তরের সঙ্গে"। ঠাকুর "তথাস্তু" বলে বর দিয়ে গেলেন। দেবকন্যার বল্লেন "আজকে আলো-আলুনো খেতে হয়, হবিষ্যি কর্‌তে হয়, এই ঘট রোজ পূজো করিস্, তোদের দুঃখদশা থাক্‌বে না, এখন বিমুখ হ আমরা স্বর্গে যাই"। তাঁরা বিমুখ হলেন, স্বর্গের কন্যারা স্বর্গে গেলেন। উম্‌নো বল্‌লেন "কেন বা বিমুখ হ'লাম, রথের চাকাখানা ধরে যেতাম তাও যেতাম"। ঝুম্‌নো বল্‌লেন "তাঁরা দেবতা আমরা নর, আমরা তা কি যেতে পারি! চল এখন আলো-আলুনো হবিষ্যি কি করে হয় তার উপায় দেখি"। দুজনে খানিকদূর গিয়ে দেখেন ক্যাঁচরা-কলমার শাক হয়ে রয়েছে। দুজনে তাই সেদ্ধ করে খাবেন বলে শাক তুল্‌তে তুল্‌তে দেখেন ঠাকুর শ্রীসূয্যি নমঃনমঃ কর্ণে তামাহেন বর্ণে উদয় হয়ে সোণার একটা "ঘাড়মোড়া" (টিবি) ফেলে দিয়েছেন। ঝুম্‌নো বল্‌লে "চল্ এইটে নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেব"। উম্‌নো বল্‌লে "হ্যাঃ, বাবা বল্‌বে কার চুরী করে এনেছিস্, কার ডাকাতি করে এনেছিস্"! "ঠাকুর দিয়েছেন, নেব না কেন, নেব"। শাক চাপা দিয়ে সেটা সঙ্গে নিলেন। এখন শাক কিসে সেদ্ধ হয়? "চল্ দুজনে লোকালয়ের দিকে যাই"। দুজনে বন থেকে বেরিয়ে একপা-একপা করে' লোকালয়ে এক কুমোরবাড়ী গিয়ে বল্‌লেন "আমাদের একখান খোলা দিতে পার"? "কে রে অলক্ষুণে ছুঁড়ীরা, একপঁইশাল্ হাঁড়ী, এখনো একটা নামেনি, তোরা খোলার নাম কর্‌লি! ছুঁড়ীদের ঢেকাচোকা দিয়ে বের্ কর্"। তাঁদের ঢেকাচোকা দিয়ে বের কল্লে। সোণাপোড়া হাঁড়ী ছিল, কাঁচ পোড়া হয়ে গেল, একপঁইশাল্ হাঁড়ী চট্ পট্ করে ফুটে গেল। দেখ্‌তে কারা

আন্‌লে। "মাসকল হাঁড়ী নাও"। "আমাদের একটা দাও"। "একটা কেন নেবে পাঁচটা নাও।" তাঁরা একটা হাঁড়ী নিয়ে গেলেন। কুমোরদের আবার যেমন হাঁড়ী ছিল তেমনি হ'ল।

এদিকে দরিদ্রব্রাহ্মণের ঠাকুরের বরে দুঃখুদশা গিয়ে সুখসম্পত্তি হয়েছে। ঔরিচৌরী ঘরদুয়োর, দাসদাসী, খেতখামারের অভাব নেই। বাম্‌ণী মেয়েদুটীর জন্যে সদাই কাঁদে, ভয়ে বামুণকে কিছু বল্‌তে পারে না। একদিন যে প্রতিবাসীতে ডেকে বল্‌লে ও উম্‌নো-ঝুম্‌নোর মা! ঐ দেখ তোমার উম্‌নো-ঝুম্‌নো এসেছে। "আঃ আমার পোড়া কপাল! তারা কি আর আছে, বাঘ-ভালুকে খেয়ে ফেলেছে। একটু পিটে একটু পরমান্নর জন্যে বাছাসকল আমার বনে গিয়েছে, এখন কত পিটে কত পরমান্ন আমার দাসদাসীতে খাচ্চে"। "না গো বেরিয়ে দেখ্‌ তারাই এসেছে। একপা-একপা করে বেরিয়ে দেখেন্ সত্যিই উম্‌নো-ঝুম্‌নো। এক দুয়োর দিয়ে নিলেন, নাপিত ডাকিয়ে নখ্‌ কাটালেন, নারাণতেল-বিষ্ণুতেল মাখালেন, কাপুড়ে ডাকিয়ে কাপড় দিলেন, শ্যাক্‌রা ডাকিয়ে গহনা দিলেন, অতি যত্নে লুকিয়ে রাখেন। বামুণ একদিন মুখ ধুতেধুতে মেয়েদের দেখ্‌তে পেলেন। আবার সেই আলক্ষ্মী ছার দুটোকে এনেছিস্? ওরা গিয়েই আমার সুখসম্পত্তি হয়েছে।" "বাবা গাল দিওনা, তাড়িয়ে দিওনা, আমরা বর্ত্ত করেছি তাই তোমার সুখ-সম্পত্তি হয়েছে। এই দেখ তোমার জন্যে সোণার ঘাড়মোড়া এনেছি।" বামুণ তখন আর মেয়েদের কিছু বল্‌লেন না।

এদিকে রাজ্যের রাজার মতৃশ্রাদ্ধ, সমস্ত গাঁ-খুঁজে বামুণ পায়নি। ডাক্ দরিদ্রব্রাহ্মণকে। দুজন বরকন্দাজ বামুণকে ডাক্‌তে এল। বামুণ বল্লে "ঐ দেখ্‌ তোরা কার চুরীডাকাতি করে এনেছিস্, তাই আমায় ধরতে এসেছে, নইলে আমি মুখ্যুব্রাহ্মণ আমায় কেন ডাক্‌বে?" "বাবা

এসেছে, এ ত ভাগ্যির কথা, বামুণপণ্ডিতকেই ডেকে থাকে। ধূতীচাদর পর, "চর্‌ক ফোঁটা" কর। আমরা বর্ত্ত কর্‌তে বস্‌ছি। ঠাকুরের বরে তোমার এক বল্‌তে একশ বাক্যি মুখ দিয়ে বেরুবে।" দুজনে বাপকে গরম জল করে স্নান করালেন, ফোঁটা কেটে দিলেন। পাঁজীপুঁথী হাতে দিয়ে শ্রাদ্ধ করাতে পাঠিয়ে নিজেরা ব্রত কর্‌তে বস্‌লেন। চুল কেটে চামর কর্‌লেন, জিহ্বা কেটে প্রদীপ কর্‌লেন, আঙ্গুল কেটে শল্‌তে কর্‌লেন, বুক ঠুক্‌রে ধূপ কল্লেন, ওড়ের ফুল, কাম সিঁদুর, রক্তচন্দন, জবা দিয়ে ঠাকুরের পূজো কর্‌তে লাগ্‌লেন। "ঠাকুর আর বনে বনে ফির্‌তে পারিনে, আর কষ্ট দিও না। বাবার যেন রাজসভায় যশ হয়।" ঠাকুর "তথাস্তু" বলে বর দিলেন। ওদিকে রাজসভায় দরিদ্রব্রাহ্মণের ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল, এক বল্‌তে একশ বাক্যি তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতে লাগ্‌ল। দরিদ্রব্রাহ্মণ এমন পণ্ডিত এ কে জানত! শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল। রাণী ভাব্‌লেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাকে আর কি দেব? এক কপ্‌টে আলোচাল এক কপ্‌টে মটরডাল দিলেন। বামুণ তাই দেখে আপনার বাড়ীর পেছনে ফেলে দিয়ে বাড়ী গেলেন। বাম্‌ণী কুলো-ডালা ধুয়ে রেখেছে, বামুণকে বল্লে "ও বামুণ, রাজার বাড়ীর কাজে গেলে কি আন্‌লে?" "দেখ্‌গে, বাড়ীর পেছনে পড়ে আছে" বলে' বামুণ রাজবাড়ী চলে গেল। বাম্‌ণী গিয়ে দেখেন দু কপ্‌টে সোণা পড়ে আছে। আবাগে বামুণের এত গিদের হয়েছে দু কপ্‌টে সোণা মনে ধরে না" বলে ঘরে তুল্লেন। ওদিকে রাজা বামুণকে বল্লেন "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, রাণী তোমায় কি দিলেন?" ব্রাহ্মণের কণ্ঠে অম্‌নি সরস্বতীর আবির্ভাব হ'ল। বামুণ বল্লেন "রাজার ভাণ্ডারে ধনের অভাব কি! রাণীমা এত-ধন দিয়েছেন, কতকাল বসে খাব।" রাজা সন্তুষ্ট হ'য়ে অন্দরে গিয়ে বল্লেন "হ্যাঁ রাণী, দরিদ্রব্রাহ্মণকে কি দিয়েছো? বামুণ যে সভার

কেবল ছ'কপ্‌টে চাল-ডাল দিয়েছি”। রাজা বল্লেন “ব্রাহ্মণ সভার মধ্যে আমার ত বড় মুখ রেখেছে! ডাক্ দরিদ্রব্রাহ্মণকে”। ব্রাহ্মণকে ডাকিয়ে রাজা ধন দিলেন, জন দিলেন, হাতী-ঘোড়া, দাসদাসী ভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেন। দরিদ্রব্রাহ্মণের সুখসম্পত্তির আর সীমা রইল না।

এদিকে এক যে দেশের রাজা আর পাত্তর মৃগয়া কর্ত্তে বেরিয়েছে, সঙ্গে হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর। তেপান্তর মাঠে তেষ্টায় সব অস্থির হয়ে পড়্‌ল। রাজা বল্‌লেন “যে জল দেবে তাকে সর্ব্বস্ব দেব, দেখ্ কোথায় জল পাওয়া যায়।” একজন গাছে উঠে দেখ্‌লে দরিদ্রব্রাহ্মণের ঔরিচৌরী ঘর দেখা যাচ্চে। সেইখানে তারা ছুটে গিয়ে ডেকে বল্‌লে “ওগো, কে আছ, আমাদের রাজা-পাত্তর জল না পেয়ে মারা যান্, একটু জল দাও”। উম্‌নো-ঝুম্‌নো বেরিয়ে বল্লে “রাজা হ'ক্ পাত্তর হ'ক্, এইখেনে এসে জল খেতে বল্, নইলে আমরা জল দেবনা”। তারা রাজার কাছে ফিরে গেল। “হাঁরে জল কই”? “মহারাজ ভয় করে কব না নির্ভয় করে কব”? “ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও”। “বাড়ী থেকে ছুটো কন্যে বেরিয়ে বড় নিষ্ঠুর কথা বল্‌লে, বল্‌লে “রাজা হ'ক্ পাত্তর হ'ক্ এইখানে এসে জল খেতে বল, নইলে জল দেব না”। রাজা শুনে বল্লেন “বটে! জল খাওয়া থাক্, চল্ কন্যে ছুটোকে আগে হাড়-গোহাড়ে এক জায়গায় করি।” তাঁরা লোক-লস্কর নিয়ে বামুণের বাড়ীর সম্মুখে গিয়েই দেখেন ছুগাড়ু জল রয়েছে। জল দেখে তেষ্টায় আগে তাঁরা জলই খেয়ে ফেল্লেন। উম্‌নো যে সোণার গাড়ুতে জল দিয়েছিল রাজা খেলে, রাজার লোকলস্কর খেলে, হাতী খেলে, ঘোড়া খেলে যেমন একগাড়ু জল তেমনি রইল। ঝুম্‌নো যে রূপোর গাড়ুতে জল দিয়েছিল পাত্তর খেলে, পাত্তরের লোকলস্কর হাতী ঘোড়া খেলে যেমন একগাড়ু জল তেমনি রইল। “দেখ ত গাড়ুর মধ্যে কি আছে”? সেইখান

কন্যের কত রূপ! তোরা এইখানেই তাঁবু-কানাত ফেল্”। রাজা-পাত্তরের সমান করে তাবু-কানাত পড়্‌ল। অর্দ্ধেক রাত পোয়াতে না পোয়াতে ডাক্ দরিদ্রব্রাহ্মণকে। “ব্রাহ্মণ, এ কন্যেদুটী কার” ? “আমার”। “বিবাহিতা না অবিবাহিতা” ? “অবিবাহিতা”। “পাত্র পেলে বিবাহ দাও” ? “দিই”। “একটি দাও আমার সঙ্গে, একটি দাও আমার পাত্তরের সঙ্গে”। “এর চেয়ে আর ভাগ্যের কথা কি আছে” ? দিনক্ষণ ঠিক কর্‌লেন। শুভলগ্নে উম্‌নোকে রাজার সঙ্গে বিয়ে দিলেন, ঝুম্‌নোকে পাত্তরের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। রাজা-পাত্তর বিয়ে করে তাদের নিয়ে সেইখানেই মনের সুখে থাকেন। বারবছর কেটে গেল। একদিন রাজা প্রভাতে মুখ ধুতে বসে দেখ্‌লেন এপারে বাছুর ওপারে গাই হাম্বা হাম্বা কর্‌ছে—রাগিণী (নদী) তোলপাড় কর্‌ছে। রাজা গিয়ে রোষাগারে খিল দিলেন। উম্‌নো এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে ঘর-বার কর্‌ছে। “একি! স্নান ছেড়ে শয়নে মন, ভোজন ছেড়ে ঘুমে মন, ওঠ, স্নান-পূজো কর, খাও”। “আর নাব’না, আর খাবনা, এপারে বাছুর ওপারে গাই হাম্বা হাম্বা কর্‌ছে! আমরা বনে এসে বনকন্যে বিয়ে করে রয়েছি। আমাদের মা অমনি করছে”। “তার জন্যে আর দুঃখ কি! ওঠ, নাও খাও, বাবাকে বল, বলে আমাদেরও নিয়ে চল, আমরাও কখন শ্বশুরবাড়ী দেখিনি। এর বাড়া আর ভাগ্যির কথা কি আছে?” রাজা তখন উঠে স্নান-পূজো করে খেয়ে দেয়ে ব্রাহ্মণকে বল্লেন “এদের নিয়ে যাব”। ব্রাহ্মণ বল্লেন “তোমাদের জিনিষ তোমরা নিয়ে যাবে এতে আর কথা কি” ? যাত্রার সব উদ্যোগ হ’ল। উম্‌নো উঠ্‌ল চতুর্দ্দোলে, ঝুম্‌নো উঠ্‌লো মহাপায়ায়”। উম্‌নো চতুর্দ্দোলে উঠে বল্‌লে “এখন রাজার রাণী হয়েছি, দুধের ক্ষীর পেটে সবেনা পানের শির পেটে সবেনা। কি বর্ত্ত কর্‌ব, কথা শুন্‌বো, বিড়্‌বিড়ু্‌ব, কে বল্‌বে ডানমন্তর পড়্‌ছে,” বলে ঠাকুরের ঘট ফেলে দিল।

ঝুম্‌নো অমনি "ষাঠ্‌ ষাঠ্‌ বলে দুটী ঘট বারানসীর আঁচলে বেঁধে নিল। যত কিছু "নাবোন্‌ ভোবন্‌" সব এই ঘটের প্রসাদে! সেই ঘট ফেল, তোমার এত "গিদের"! যেদিক দিয়ে উম্‌নোর চতুর্দ্দোল যায় "মড়া মরে", "ষষ্ঠী হরে" ঘরে আগুন লাগে, রক্তবৃষ্টি হয়। "কোন্‌ আবাগী যাচ্চে, কোন্‌ পোড়াকপালী যাচ্চে, কোন্‌ সর্ব্বনাশী যাচ্চে"। ঝুম্‌নো যেদিক দিয়ে যায় দোল হয়, দুর্গোৎসব হয়, বিয়ে পৈতে চূড়াকরণ হয়, পুষ্পবৃষ্টি হয়।" কে যাচ্চেন, কোন্‌ লক্ষ্মী যাচ্চেন্‌, মা যাচ্চেন"। রাজ্যে সাড়া পড়্‌ল রাজা বিয়ে করে বাড়ী আস্‌ছেন। রাজার মা রূপোর থালে সোণার অলঙ্কার বের কর্‌লেন, উম্‌নোর দৃষ্টিতে লোহা হয়ে গেল। পাত্তরের মা কাঁসার থালায় রূপোর গহনা বের কর্‌লেন ঝুম্‌নোর দৃষ্টিতে তা সোণা হয়ে গেল। ক্রমশ রাজার হাতীশালে হাতী মরে, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে, অনাবৃষ্টি-অজন্মায় প্রজা মরে, ডাকাতে রাজ্য লোটে, রাজার দুর্দ্দশার সীমা রইল না। পাত্তরের ঘরে লক্ষ্মী উথ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। একদিন রাজা মাকে বল্‌লেন "মা পিটে-পরমান্ন খেতে সাধ গিয়েছে।" "আঃ কপাল! সুকালে পেটে সয়নি, আকালে খেতে সাধ হয়েছে।" মা পিটে-পরমান্ন তৈরী কর্‌লেন। সেদিন পাত্তরের মার শ্রাদ্ধে ফুলবড়ী দিতে রাজার মাকে ডাক্‌তে এসেছে। রাজার মা বল্‌লেন "বউমা, পিটে-পরমান্ন ঢাকা দেওয়া থাক্‌ল, ছেলে খেতে চাইলে খেতে দিও" বলে তিনি পাত্তরের বাড়ী গেলেন। রাজাতে রাণীতে পাশা খেল্‌তে বসেছেন। ঢুড়্‌ ঢুড়্‌ করে রক্তবৃষ্টি হয়ে গেল, রাণী এমন করে হাই ছাড়লেন রাজার গোঁফদাড়ী পুড়ে গেল। দর্পণ দিয়ে মুখ দেখে রাজা পরম দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লেন "রাণী! মা পিটে পরমান্ন রেখে গেছেন দাও।" রাণী ঢাকা খুলে দেখেন বাটীভরা রক্ত, থালাভরা ছাই। রাজা বল্লেন "মা আমায় প্রবঞ্চনা করেছেন"। মা ফিরে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "হ্যাঁ বাবা! খেয়েছ?" রাজা বল্লেন

"কি খাব? ছাই খাব? রক্ত খাব?" "হ্যাঁ বাবা, সেকি! চল দেখি, দেখিগে"। গিয়ে ঢাকা খুলে দেখেন যেমন পিটে-পরমান্ন তেমনি রয়েছে। রাজা বল্লেন "আর কিছুনা ঐ কন্যেটাই অলক্ষ্মী! ডাক্ পাত্তরকে"! "হ্যাঁ পাত্তর! তুমিও বনে গিয়ে বনকন্যে বিয়ে কর্‌লে, আমিও বনে গিয়ে বনকন্যে বিবাহ কর্‌লাম, তোমারই বা কেন সুখ-সম্পত্তি হ'ল, আমারই বা কেন দুঃখদশা হয়? এই স্ত্রী কেটে আমায় রক্ত দর্শন করাও, নইলে তোমাকে আর তোমার স্ত্রীকে কেটে একগাড়ে কর্‌ব।" পাত্র গিয়ে মনের দুঃখে রোষাগারে খিল দিলেন। ঝুম্‌নো যে এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে ঘর-বার কর্‌ছে। একি, স্নান ছেড়ে শয়নে মন, ভোজন ছেড়ে ঘুমে মন, ওঠ, স্নান-পুজা কর, খাও। "আর না'ব না আর খাব না, তোমরা যা খাবার তা খাওগে, যা বিলোবার তা বিলোওগে। এখনি একগাড়ে হ'তে হবে, নইলে স্ত্রীহত্যে কর্‌তে হয়"। ঝুম্‌নো শুনে বল্‌লে "তা বুঝেছি, দিদি ঠাকুরের কোপে পড়েছে। এক কাজ কর, তাকে এনে বনে ছেড়ে দিয়ে এস, রাজাকে কুকুর-শেয়াল কেটে রক্ত দেখাও"। পাত্তর তাই কর্‌লেন।

উম্‌নো তখন পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। বনে বনে পাঁচমাস বেড়িয়ে এক গেরস্তর বাড়ার ঢেঁকীশালে কুলো আড়াল দিয়ে ছেলে হ'ল। একদিন গেরস্তর বউ রোদ্দুরে পিট দিয়ে বসে রাঙাশাকের অম্বল দিয়ে ভাত খাচ্চে, দেখে উম্‌নো নিশ্বেস ফেল্‌লে। "সুকালে আমরাও খেয়েছি"। গিন্নী বল্লেন "আমার একটি বেটা একটি বউ, তুই মাগী নিশ্বেস ফেল্‌লি। এই চাল নে, শাক নে রাঁধ"। তিনি তাই কল্লেন, আর বাসী করে থুলেন। রাত্রে ঠাকুর শ্রীসূয্যি নমঃ নমঃ কর্ণে তামাহেন বনে উদয় হয়ে লোহার ডাঙ্গসের বাড়ি দিয়ে হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন "ইতুনিন্দুনি, তুই খাবি বাসী ভাতব্যঞ্জন!" সকালে উঠে রোয়ারায় করে কাঁদ্‌ছেন। গিন্নী বল্লে "মর্ মাগী, তোর

কি কেউ নেই" ? "থাক্‌বে না কেন ? এই রাজ্যের পাত্তর আমার বোনাই, পাত্রের বৌ আমার বুন"। স্বামীর কথা আর কোন্ লজ্জায় বলেন। "তাঁর আস্তাকুঁড় ঝাঁট দিয়ে খাস্ সেও ভাল সেখানে যেতে পারিস্‌নে" ? "আমিত' যাব না, আমার ছেলেকে পাঠাব"। দুঃখরাজকে কোলে করে নদীর ধারে গিয়ে বস্‌লেন। ঝুম্‌নোর একশ' দাসীতে একশ' কলসী জল ভরছে। "হ্যাঁরে তোরা কার জল ভরিস্" ? "আমরা ঝুম্‌নোঠাকরুণের জল ভরি।" "তাকে জিজ্ঞাসা করিস্ দেখি তার নাকি বুন-বুনপো আছে ?" "আচ্ছা।" সেদিন তাদের জিজ্ঞাসা কর্‌তে মনে হ'লনা। পরদিন উম্‌নো বল্‌লেন "হ্যাঁরে তোরা জিজ্ঞাসা করেছিলি ?" "কে জানে আমাদের মনে ছিল না।" উম্‌নো কলসীর মধ্যে লোহার অঙ্গুরী ফেলে দিলেন। ঝুম্‌নোর মাথায় দাসীরা যখন সেই জল ঢাল্‌ছে তার মাথায় ঠেকে তা সোণা হয়ে ঠিকরে পড়্‌ল। "হ্যাঁরে তোরা আমার সঙ্গে বিদ্রূপ কর্‌ছিস্ ?" "না মা বিদ্রূপ করিনি, তোমার নাকি বুন-বুনপো আছে ?" "আছে, কেমন দেখ্‌লি ?" "এক ভার লোহা-গায়ে নদীর ধারে বসে ছেলেকে খুদ খাওয়াচ্চে।" "তাকে আস্‌তে বলিস্।" তারা উম্‌নোকে গিয়ে বল্‌লে। উম্‌নো "বল্‌লে আমি ত' যাব না, আমার ছেলেকে নিয়ে যা।" তারা ছেলে নিয়ে গেল। ঝুম্‌নো দুঃখরাজকে এক দুয়োর দিয়ে নিলেন, নারাণতেল-বিষ্ণুতেল মাখালেন, স্যাকরা ডাকিয়ে গহনা দিলেন, অতি যত্নে আদরে রাখেন। রাত্রে ঠাকুর শ্রীসূর্য্যি নমঃনমঃ কর্ণে তামাহেন বর্ণে উদয় হয়ে লোহার ডাঙ্গসের বাড়ি দিয়ে ছেলেকে প্রহার করেন "ইতুনিন্দুনীর বেটা, তুমি আমার ঝুম্‌নোর ধন খেতে এসেছ ?" রোজ এমনি হয়। ঝুম্‌নো বলেন "বাবা আপন ছেলের চেয়ে তোমায় বেশী যত্ন করি, তুমি কেন এমন হচ্চ ?" "মাসী, রাত্রে একটা বুড়ো বামুণ আমায় বড্ড

মারে।” “বুঝিছি তোমরা ঠাকুরের কোপে পড়েছ। বাবা, তুমি মায়ের ছেলে মার কাছে যাও”। খেতে বিস্তর বইতে অল্প এমন ধন দিলেন, সঙ্গে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলে খানিক দূর গিয়ে ভাবলে মাসীর আমার এত বৈভব আর মা আমার গেরস্তর বাটীর ঢেঁকীশালে থাকে, এরা যদি দেখে যায় তাতে মাসীর আমার গঞ্জনা হবে।” চাকরদের বল্লে “দেখ্ ঐ যে একখান ভুঁয়ে সাতখান লাঙ্গল ঐ আমার বাবার, ঐ যে ওঁরিচৌরি ঘর ঐ আমার বাবার, আমার বাবা রাজার সমান। তোরা জিনিষপত্র এইখেনে রেখে যা, আমার লোকজন এনে তুলে নেব।” চাকর ব্যাগার জাত ফেল্‌লেই বাঁচে তারা সেই খেনে সব ফেলে চলে গেল। ঠাকুর শ্রীসূয্যি নমঃনমঃ কর্ণে তামাহেন বর্ণে উদয় হয়ে সমস্ত ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে ছেলেকে লোহার ডাঙ্গসের বাড়ি মেরে কাদাবনে ফেলে থুয়ে গেলেন। “ইতুনিন্দুনীর ব্যাটা, তুমি আমার ঝুমনোর ধন খেতে এসেছ?” ঝুম্‌নোর ভাণ্ডারের ধন ঝন্ ঝন্ করে ভাণ্ডারে পড়্‌ল। ঝুম্‌নো কেঁদে বল্‌লে “ঐ ঠাকুর সব কেড়ে আন্‌লেন।” উম্‌নোকে কে বল্‌লে “ওরে মাগী, ঐ দেখ্ তোর বোন কিছু না দিয়ে তোর ছেলেকে কাদাবনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। উম্‌নো ষাঠ্ ষাঠ্ ক’রে গিয়ে ছেলে কোলে নিলেন। “আবাগী বুন, পোড়া-কপালী বুন, আমার ছেলের এত “খোয়ার” করেছে।” “মা, মাসীকে গাল দিও না, মাসী এত ধন দিয়েছিল কত কাল ব’সে খেতে। ডাকাত এসে সব কেড়ে নিয়ে গেল।” সবাই বল্লে “মর্ মাগী, নিজে গেলেই পারিস্”। “তাই যাব” মনে করে আবার নদীর ধারে গিয়ে বস্‌লেন। দাসীদের কলসীতে আংটি ফেলে দিলেন। আংটি দেখে ঝুম্‌নো আবার তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এইবার ছেলে নিয়ে উম্‌নো বুনের কাছে গেলেন। ঝুম্‌নো তাঁকে এক দুয়োর দিয়ে ঘরে নিলেন, নারাণতেল-বিষ্ণুতেল মাখালেন, শ্যাক্‌রা ডেকে গহনা দিলেন, কাপুড়ে

ডেকে কাপড় দিলেন। অতি যত্নে রাখেন। রবিবার এল "বুন, এস বর্ত্ত করি, কথা শুনি" "কি বর্ত্ত কর্‌ব, কি কথা শুন্‌ব, ছেলেদের ক্ষীর খাওয়াতে গিয়েছিলাম তাই একটু খাচ্চি।" ফিরে-রবিবারে 'বুন এস বর্ত্ত করি কথা শুনি"। "কি বর্ত্ত কর্‌ব, ঘোড়ার দানা বের করে দিতে গিয়ে তাই একটা চিবুচ্চি।" "আঃ কপাল! তুমি নিতান্ত ইতুনিন্দুনী হয়ে পড়েছ।" ফিরে শনিবারের দিন রাত্রে উমনোকে লোহার ডোল চাপা দিয়ে রাখ্‌লেন। ঠাকুর শ্রীসূর্য্যি নমঃ নমঃ কর্ণে তামাহেন বর্ণে উদয় হয়ে তার মধ্যে একটা লোহার কলাই ফেলে দিলেন। সকালে ঝুম্‌নো ডাক্‌লেন "বুন এস বর্ত্ত করি।" "কি বর্ত্ত কর্‌ব, লোহার একটা কলাই পেয়েছি তাই চিবুচ্ছি।" "তুমি একেবারে অধঃপাতে গেছ।" ফিরে শনিবারে বুনকে আঁচলে আঁচলে চুলে চুলে বেঁধে নিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে শুয়ে থাক্‌লেন। ভোরে দাসীরা একশ' কলসী জলে দুজনকে স্নান করালে, পূজুরিতে পূজোর জায়গা করে দিয়ে গেল, দুজনে বর্ত্ত কর্‌তে বস্‌লেন। চুল কেটে চামর কল্লেন, জিহ্বা কেটে প্রদীপ কর্‌লেন, আঙ্গুল কেটে শল্‌তে কর্‌লেন, বুক ঠুক্‌রে ধূপ জ্বাল্লেন, ওড়ের ফুল কামসিন্দুর রক্ত-চন্দন জবা দিয়ে ঠাকুর শ্রীসূর্য্যির পূজো কর্‌তে লাগলেন। ঝুম্‌নো যে ফুল দেয় ঠাকুর হাতে হাতে নেন্, উম্‌নো যে ফুল দেয় গোহাড় গোরক্ত হয়, ঠাকুর মাথানেড়ে ফেলে দেন্। "ঠাকুর দিদির পূজো নাও।" "ও বড় পাপিষ্ঠ, ওর পূজো নেব না।" "না নিলে আমি তোমার পায়ে 'হত্যে' হব।" ঝুম্‌নো পরমভক্ত, সে "হত্যে" হবে ঠাকুর তখন পূজো নিলেন। "ঠাকুর দিদিকে বর দাও, অস্মরণ রাজার স্মরণ হোক্, একগুণ গিয়েছে চারগুণ হোক, শরীরের কান্তিপুষ্টি হোক, স্ত্রীপুত্র বলে মনে পড়ুক।" ঠাকুর কি কল্লেন বরও দিলেন।

স্ত্রীপুত্র বলে মনে পড়্‌ল। "ডাক্ পাত্তরকে।" "হ্যাঁ পাত্তর, তুমিও বনে গিয়ে বনকন্যে বিয়ে কর্‌লে আমিও বনে গিয়ে বনকন্যে বিয়ে কর্‌লেম। সে দুঃখদশা গিয়ে আবার আমার সুখসম্পত্তি ফির্‌ল, এখন আমার স্ত্রীপুত্র এনে দেবেত' দাও, নইলে তোমার স্ত্রীপুত্র কেটে একগাড়ে কর্‌ব।" পাত্র মনোকষ্টে রোষাগারে খিল দিলেন। ঝুম্‌নো যে এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে ঘর-বার কর্‌ছে। একি, স্নান ছেড়ে শয়নে মন, ভোজন ছেড়ে ঘুমে মন, ওঠ, স্নানপুজো কর, খাও।" পাত্র সব বলে বল্লেন "এখন আমি তাদের কোথায় পাব?" ঝুম্‌নো বল্লে "তার জন্যে ভাবনা কি; ঠাকুরের বরে আমার বুন-বুনপো আমার ঘরে আছে। রাজা সভায় সভা করে বসে আছেন তুমি এক মুঠো পান খেতে খেতে এক মুঠো পান ফেল্‌তে গিয়ে পেছন দিকে নমস্কার কর। রাজা বল্‌বেন "নির্ব্বুদ্ধি পাত্তর! পেছন দিকে নমস্কার করে।" তুমি বল্‌বে "নির্ব্বুদ্ধি রাজা! একবার বলে কেটে দিতে একবার বলে এনে দিতে; আমার বাড়ী তোমার নেমন্তন্ন।" পাত্তর তাই কল্লেন। রাজা মহাসন্তুষ্ট হলেন, পাত্তর ত' তাঁর বড় মুখ রেখেছে! রাজার বাড়ী পাত্তরের বাড়ী সমান ক'রে তাম্বু-কানাত পড়্‌ল, লোক-লস্কর নিয়ে রাজা খেতে এলেন। রাজা খেতে বসে বল্‌লেন "কই পাত্তর, কি ব'লে নিয়ে এলে?" পাত্তর বল্লেন "তোমার ছেলে তোমার ডা'নে বসেছে, আমার ছেলে আমার ডা'নে বসেছে, তোমার স্ত্রী তোমাকে পরিবেশন কর্‌ছে, আমার স্ত্রী আমাকে পরিবেশন কর্‌ছে।" দর্পণে পিতা পুত্রের মুখ এক রকম দেখ্‌লেন, স্ত্রীপুত্র পেয়ে রাজা মহা সন্তুষ্ট। বল্লেন "এদের নিয়ে যাব।" "এর চেয়ে আর ভাগ্যির কথা কি আছে?" উম্‌নো যখন চতুর্দ্দোলে ওঠে ঝুম্‌নো ইতুর ঘটটি তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন "এই ঘট ফেলে তোমার এত দুর্দ্দশা! এই ঘট ফেলতঃ

আঁচলে সোণার ঝুম্‌ঝুমি বেঁধে দিলেন। রাজা স্ত্রীপুত্র ঘরে নিয়ে গেলেন সকালে রাণী উঠোনে বেড়াচ্চেন রাজা একদৃষ্টে তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন বহুদিন দেখেন নি। হঠাৎ দেখ্‌লেন রাণীর পায়ের আঙ্গুল কেটে রক্ত পড়ছে। "একি, আস্‌তে আস্‌তে আবার একি অলক্ষণ!" "কি জানি সাতহাড়ীরা কি ক'রে উঠোন চেঁচেছে! দুর্ব্বোয় "পাগুলী" বেধে আঙ্গুল কেটে গিয়েছে।" রাজা তক্ষুনি নিয়ে হাড়ীদের স্বহস্তে কেটে এলেন। এসে বল্লেন "রাণী, মা মরে গিয়েছেন, দুর্দ্দিনে ভাল ক'রে ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হয়নি, কিছু রন্ধন করতে পার?" "এ আর শক্ত কি? জোগাড় করাও।" লোকজন তখনি চারদিকে ছুট্‌ল—বিল ছেঁকে মাছ এল, গাঁ ছেঁকে দুধ এল, দশখানা গ্রাম নিমন্ত্রণ হ'ল। ঠাকুরের বরে চারদিকে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হ'ল, দশখানা গ্রামের লোক খেয়ে ধন্য ধন্য ক'রে গেল। দাসদাসী লোকজন সকলকে খাইয়ে রাণী নিজের ভাত বেড়ে যেমন আঁচলে হাত মুছ্‌ছেন, অমনি সোণার ঝুম্‌ঝুমি বেজে উঠ্‌ল। "কি সর্ব্বনাশ! আজ যে রবিবার; আজ যে ইতুপূজো। ডাক রাজাকে!" "রাজা আবার আমার দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আস্‌ছিল, আজ ইতু। এখন 'আ-নাওনি,' 'আ-খাওনি' লোক যেখানে পাও, এনে দাও।" "সে কি রাণী! আজ আমার মাতৃশ্রাদ্ধে দশখানা গ্রামের লোক খেয়ে গেল, পিঁপড়েটা ছ' মাস খাবে এত ভাতব্যঞ্জন ব'য়ে নিয়ে গেল, এখন অনাহারী লোক কোথায় পাব?" "তা বল্লেও হবেনা কইলেও হবে না, দেখ।" খোঁজ! খোঁজ! কে বল্লে হাড়িনী এখনো নায়-খায়নি। রাজা তার স্বামী পুত্তুর কেটেছেন, সে পড়ে আছে। ডাক হাড়িনীকে!" হাড়িনী বলে পাঠাল' "রাণী একবার এসে রাজার রাজপাট খেয়েছিল, এবার এসে হাড়নীর স্বামী পুত্তুর খেয়েছে; রাজা আর আমার কি করবে? হাড়িনী যাবে না।" রাজা গিয়ে হাড়িনীকে

রাণী সেই ফুল-চন্দন নিয়ে হাড়িনীকে দিয়ে বল্লেন "সাতহাড়ীর মুণ্ডু জোড়া দিয়ে এই ফুল-জল স্কন্ধে স্কন্ধে দেগে' তারা বেঁচে উঠ্বে।" হাড়িনী তাই কর্‌লে। হাড়ীরা বেঁচে উঠে চোখ রগ্‌ড়িয়ে বল্‌লে "মা, কি ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম, এতক্ষণ ডাকিস্‌নি কেন?" "বাবা, তোমরা কি ছিলে? রাজা নিজে কেটে ফেলেছিলেন। রাণীমা কি বিড়্ বিড়্ করে ডান্‌মন্তর প'ড়ে এই ফুল-জল দিলেন, তাতেই তোমরা বাঁচ্‌লে।" "মা আমাদের যে খিদে পেয়েছে।" হাড়িনী গিয়ে বল্লে "রাণী, সাত হাড়ীর যে খিদে পেয়েছে।" রাণী সাতখানা পাতা, সাত হাঁড়ী ভাত, সাত হাঁড়ী ডাল, সাত কড়াই তরকারী দিলেন। সকালে আবার হাড়ীরা চন্দনের ছড়া দিয়ে রূপোর ঝাঁটায় উঠোন পরিষ্কার কর্‌ছে, রাজা মুখ ধুতে বসে তাদের দেখে বল্লেন "হাঁরে, তোরা কি করে বাঁচ্‌লি?" "আজ্ঞে আমাদের মা জানে।" "হাঁা হাড়িনী তুমি কি জান?" "আমি কিছু জানিনে মহারাজ রাণীমা জানেন।" "হাঁা রাণী, মড়া বেঁচেছে, তুমি কি জান?" "আমি কিছু জানিনে আমার ঠাকুর জানেন।" "আচ্ছা দেখ্‌ব তোমার কেমন ঠাকুর, আমার সাত নৌক ধন ডুবেছিল, রাজঘণ্টা দুয়োরে আপনি বাজত, রাজহস্তী দুয়োরে নৃত্য কর্‌ত, তাই যদি আবার হয় বুঝ্‌ব তোমার ঠাকুর।" রাণী বর্ত্ত কর্‌লেন। "ঠাকুর, পরের বেটার কাছে তোমার দাসী অপমান হবে! আর বনে বনে ঘুর্‌তে পারিনে, রাজা যা বল্‌ছে তাই যেন হয়।" ঠাকুর "তথাস্তু" বলে বর দিলেন। রাজাতে রাণীতে পাশা খেল্‌তে বসেছেন, দ্বারী এসে খবর দিলে রাজঘণ্টা দুয়োরে বাজ্‌ছে, রাজহস্তী দুয়োরে নৃত্য কর্‌ছে, সাত নৌক ডুবো ধন এসে ঘাটে লেগেছে।" রাজা বেরিয়ে দেখ্‌লেন। "ডাক পাত্তরকে।" "হাঁা পাত্তর, যাদের এমন ঠাকুর সত্যি তাদের আর মর্ত্ত্যে থাকায় কাজ কি; চল আমরা স্বর্গে যাই।" পাত্তর বল্লেন "রাণী অনেক দুঃখ পেয়েছেন, কিছুদিন মর্ত্তের

সুখ ভোগ করুন।” তাঁরা আরও কিছুকাল সুখ ভোগ কর্‌লেন। দুঃখরাজ সুখরাজ বড় হ'ল, তাদের বিয়ে দিয়ে রাজা-পাত্তর ক'রে তখন সকলে ঠাকুরের পূজো কর্‌তে বস্‌লেন। উম্‌নো-ঝুম্‌নো চুল কেটে চামর কর্‌লেন, জিহ্বা কেটে প্রদীপ কর্‌লেন, আঙ্গুল কেটে সল্‌তে কর্‌লেন, বুক ঠুক্‌রে ধূপ কর্‌লেন, ওড়ের ফুল কামসিন্দুর রক্তচন্দন জবা দূর্ব্বা আলোচাল কাঁচাদুধ দিয়ে ঠাকুরকে অর্ঘ্য দিতে লাগ্‌লেন। ঠাকুর নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'য়ে হাতে হাতে পূজো নিতে লাগ্‌লেন; পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল, চন্দনের ছড়া পড়্‌তে লাগ্‌ল, স্বর্গ থেকে রথ নেমে এল, উম্‌নো-ঝুম্‌নো রাজা-পাত্তর স্বর্গে গেলেন। হাড়িনী রথের চাকাখানা ধরে গেল।”

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সুহৃদ্‌-বিচার।

প্রথম পত্র।

সুহৃদ্বরেষু—

ভাই শ্রীশ, কার্ত্তিক মাসের “ভারতী”তে “বন্দে মাতরম্‌” শীর্ষক তোমার একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রবন্ধ পড়িয়া আমি মোটেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। এই প্রবন্ধে তুমি নূতন আদর্শের লোক বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিয়াও নূতন দলের মুখপত্রকে যথাসাধ্য তিরস্কার করিয়াছ দেখিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। প্রবন্ধের একস্থলে দেখিলাম “সম্প্রতি কলিকাতা হইতে—Babu Bipin Chandra Pal—Editor-in-Chief নাম দিয়া

এই পবিত্র নামকে কলুষিত করিয়াছে। ঐক্যবন্ধনের মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্" বিরোধের মহামন্ত্র হইয়াছে। বঙ্গ-বিভাগ যে কুফল ফলাইতে পারে নাই, ইহা তাহাই প্রসব করিতেছে। 'ওল্ড পার্টি' এবং 'নিউ পার্টি' দুই বিরোধী দল সৃষ্টি করিয়া দেশের এই দুর্দ্দিনে দলাদলি উপস্থিত করিয়াছে।" কোন ইংরেজী দৈনিক পত্রের নাম "বন্দে মাতরম্" হইলেই আমাদের হৃদয়ের মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" কলুষিত হইয়া যায় নাকি, তাহা তোমার কথায় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি এই 'বন্দে মাতরম্'কে ঐক্যবন্ধনের ঘোর অন্তরায় এবং বঙ্গবিভাগের কুফল প্রসব অপেক্ষাও সমধিক সাংঘাতিক মনে করিতেছ। আর 'নিউ পার্টি' এবং 'ওল্ড পার্টি' প্রকাশ্যতঃ দুইটী দল দেখিয়া দেশের অকল্যাণচিন্তায় অধীর হইয়াছ। মতবিরোধ জাতীয় জীবনে সজীবতার লক্ষণ। সকলের চিন্তাপ্রণালী কখনও এক হইতে পারে না এবং সকলেই একপক্ষাবলম্বী হইবে এরূপ আশাও বিড়ম্বনা। এক কোন পক্ষাঘাতগ্রস্থ চিন্তাশক্তিবর্জ্জিত জাতির মতবিরোধ নাই। অথবা কোন সার্ব্বভৌমিক স্বেচ্ছাচারীর প্রবল হস্ত-তাড়নায় মতবিরোধ বা চিন্তাশক্তির বিকাশ স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। এই মতবিরোধেই দলাদলির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাহাই হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" সংবাদপত্র নূতন ও পুরাতন দুইটী দল সৃষ্টি করিয়া তুলে নাই বরং সাধারণের মানসিক ক্রিয়ার ফলেই দুই দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং "বন্দে মাতরম্" সংবাদপত্র একদলের মুখপত্রস্বরূপ জন্মলাভ করিয়াছে। প্রকাশ্যতঃ, এইরূপ দুইটী দল হওয়ায় দেশের অসাধারণ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। তুমিও বোধ হয় মনে মনে এইরূপ দলাদলির আবশ্যক উপলব্ধি করিয়াছ তাই তুমি ইংলণ্ডের দলাদলির

সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে, তখন তাহারা সকলেই একমত। যখন পকেটে হাত পড়ে, তখন উদারনৈতিকে ও রক্ষণশীলে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।" ইতিমধ্যে আমাদের এই দুইটী দলের নিকটেও যখন সর্ব্বজনীন স্বার্থসম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে তখন তাঁহারা সকল বিরোধ ভুলিয়া এক হইতে পারিয়াছেন—যথা নৌরজীর নির্ব্বাচন, স্বদেশী রক্ষা। সুতরাং দুইটী দল হওয়াতে আমাদের সর্ব্বনাশের কোন কারণ দেখি না।

তারপর তুমি "বন্দে মাতরম্"এর গালাগালির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীযুত সুরেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুত গোখলের সম্বন্ধে "বন্দে মাতরম্"এর ব্যবহার উল্লেখ করিয়াছ এবং বিপিনবাবুর প্রতি তোমার স্বাভাবিক শ্রদ্ধার সহিত সবিনয়ে এ বিষয়ে প্রতীকারপ্রার্থী হইয়াছ। "বন্দে মাতরম্" এক উদীয়মান সমর্থশালী সম্প্রদায়ের মুখপত্র। তাহাকে মেছোহাটার নদ্দামায় রেখাবদ্ধ না করিয়া শীলতা ও শিষ্টাচারের অগুরুগন্ধে এবং সভ্যতা, সদাচার এবং সংযমালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া অবশ্যই তুলিতে হইবে। কোন স্থানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে শ্রদ্ধেয় বিপিনবাবুর সতর্কতার সহিত সংশোধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু গালাগালি সর্ব্বত্রই একেবারে অপরিহার্য্য নহে। জরাগ্রস্ত স্থবিরের ন্যায় আমাদের জাতীয়-জীবন যতদিন ক্রিয়াশূন্য ছিল, ততদিন যে-কেহ আমাদের আপদে-বিপদে দরখাস্ত হাতে লইয়া রাজদরবারে মোটা মোটা গলায় কথা কহিতে পারিত, আমরা তাহাকেই নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতাম। এবং এই সকল জয়মাল্যভূষিত লোকেরা রাজদরবারের যাদুমন্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে, এটা আমাদের Constitutional Government এবং তাঁহাদের কথায় এই Constitutional Government-এর

হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের জেতা ও বিজেতার সম্পর্ক। Constitution মিথ্যাকথা ও যাদুযন্ত্র। তোমারই এক পত্রে জানিয়াছিলাম যে, নির্লজ্জ গবর্ণমেণ্ট লাহোরে প্রকাশ্য রাজপথে দাম্ভিকতার প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "Will you be governed by sword or pen?" আর প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া নেতৃগণ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন—আমাদের Constitutional Government, এই গবর্ণমেণ্টে আমরা নিরাপদে সফলকাম হইব। সক্ষম অথচ সভ্যতাড়ষ্ট নেতৃগণের উহা যে নিতান্তই মিথ্যা আশ্বাস তাহা আমরা খুব বুঝিয়াছি, এবং আরও বুঝিয়াছি এই তুবড়ীবাজির মোহমন্ত্রে সর্ষপবিক্ষেপ নষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের বিরাট শক্তি জাগ্রত হইতে পারে এবং আমাদের যখন যজ্ঞের পূতহবিগ্রহণের সামর্থ্য রহিয়াছে তখন উচ্ছিষ্টপত্রলেহনের জন্য বার বার কেহ ডাকিলে বিরক্তি ও তিরস্কার স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। এই নেতৃগণ রাজদরবারের প্রসাদভিক্ষাকেই জাতীয়-জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন পদে পদে ঠেকিয়া ভুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমাদের জাতীয়জীবনের আদর্শ হইয়াছে অন্যরূপ। অথচ সেই নূতন আদর্শ গ্রহণের পরিবর্ত্তে যদি প্রসাদভিক্ষাই এখনও তাঁহারা উপজীব্য করিয়া রাখেন এবং তাঁহাদের নেতৃত্বের উপর যাহারা নির্ভর করিতেছে তাহাদিগকে সেই পথেই পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হন, তবে কঠোরতার সহিত তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা হইলে আক্ষেপের বিষয় কি? প্রবীণ ও পুরাতন সেবক বলিয়া লোকে ইহাঁদের উপর অটল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মান্য প্রদান করিতেছে, অথচ ইহাঁরা যদি এখন সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত

বাধাইয়া দেন, তবে তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয় এবং তাঁহাদের এরূপ কার্য্য তাঁহাদের ভক্তদের পুরাতন শ্রদ্ধা নষ্ট করার জন্যও অন্ততঃ স্পষ্ট কথায় প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা "বন্দে মাতরম্"এর কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইল বলিয়া মনে করিব। "বন্দে মাতরম্"মন্ত্র কেবল স্বদেশসেবককেই ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবে, কিন্তু দেশদ্রোহীকে অবশ্যই পৃথক করিয়া দিবে। হিমালয়ের পথ জিজ্ঞাসা করিলে, যদি কেহ দার্জ্জিলিং, মশুরী কিম্বা সিমলার পথ বলিয়া দেয় তবে অবশ্যই আপত্তি নাই, কিন্তু যদি কেহ চিল্কাহ্রদের পথ বলিয়া দেয় তবে তাহার সহিত বিরোধ করিব না কেন?

"Mr. Bande Mataram" লেখা অবশ্য অসঙ্গত এবং ভরসা করি "বন্দে মাতরম্"-পরিচালকগণ আর সেরূপ ভুল হইতে দিবেন না। কিন্তু বিলাতফেরতের দল যদি হ্যাট্-কোটের পরিবর্ত্তে ধুতি-চাদর পরিয়া "বন্দে মাতরম্"এর টীকা মাথায় ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা ত আনন্দেরই কথা। তোমার নিকট হইতে শীঘ্র উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—

বিশরপাশা,
বাঙ্গালা।

তোমার
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।

দ্বিতীয় পত্র।

সুহৃদ্বরেষু—

ভাই জিতেন্, তোমার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম, কার্ত্তিকমাসের 'ভারতী'তে "বন্দে মাতরম্"পত্রিকাসম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার সব স্থলে তুমি আমাকে ঠিক ধরিতে পার নাই। আমি ...

১। কোন ইংরেজী দৈনিক পত্রের নাম "বন্দে মাতরম্" হইলেই অবশ্যম্ভাবিরূপে হৃদয়ের মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" কলুষিত হইয়া যায় না বটে; কিন্তু যাইতেও পারে। আমি বলিয়াছি, সমগ্র-জাতি ইহাকে ঐক্যের মহামন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু বিপিন বাবুর দল ইহাকে বিরোধের ট্রেডমার্ক-স্বরূপ দাঁড় করাইতেছেন; সুতরাং শব্দের ব্যবহারের ভেদের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রক্রিয়ায় উহার অর্থভেদও কেননা দাঁড়াইয়া যাইবে! পঞ্জাবেই দেখিতে পাইতেছি, পূর্ব্বে "The Bande Mataram Spirit" এই কথাটা পাঞ্জাবীরা একভাবে ব্যবহার করিতেন, আজকাল ইহা অন্যভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উহাতে বুঝাইত বাঙ্গালীর একীভূত সংহতশক্তি, এখন বুঝায় দ্বিধাবিভক্ত একটা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। তবে অবশ্য আমাদের আশার স্থল এই যে, একটা জাতির অপেক্ষা একটা দল বড় নহে। সমস্ত বাঙ্গালীজাতি যদি 'বন্দে মাতরম্'কে ঐক্যের মন্ত্র করিয়াই হৃদয়ে জপিতে থাকেন, তবে বিপিনবাবুর দল শতভ্রান্ত-উদ্যমেও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না।

২। তুমি লিখিয়াছ, দেশের লোকের মধ্যে দলাদলি সজীবতার লক্ষণ। দলাদলিই যদি সজীবতার প্রধান লক্ষণ হয়, তবে আমাদের সজীবত্বের অভাব কোনকালেই ছিল না। বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক জেলার পল্লীসমাজে প্রত্যেক ছোটখাট কাজকর্ম্মে যত দলাদলি, সহরের প্রত্যেক কমিটিসভাসমিতিতে যত দলাদলি, তাহাতে আমাদের মাতৃভূমির 'সুজলা সুফলা' প্রভৃতি বিশেষণের উপর আর একটি বিশেষণ জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে 'সুদলা'। তুমি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে যে, দলাদলি সাধারণতঃ তিনটী কারণ হইতে উৎপন্ন হয়—(ক) মতবিরোধ, (খ) ব্যক্তিগত

মত কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা নাই—সেটা অবশ্য জাতীয় অসাড়তার চিহ্ন। ব্যক্তিগত হিংসা অর্থাৎ হনন-ইচ্ছা রহিয়াছে অথচ সে ইচ্ছানুযায়ী উত্তম নাই—সেটা অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের নির্জ্জীবতার লক্ষণ। গীতার শিক্ষা এই যে, নিষ্ক্রিয় হওয়ার অপেক্ষা কুক্রিয়াশীল হওয়াও ভাল, কিন্তু তাহা ক্রিয়াশীলতার অধম স্তর। আমাদের হইতে হইবে ক্রিয়াশীল, কিন্তু তাহার উত্তম সোপানে আরূঢ় হইয়া। নূতন বঙ্গের নূতন আদর্শের অন্যতম শিক্ষাগুরু কবি রবিঠাকুর—যিনি বিপিনপালীয়দিগেরও গুরুর গুরু—বিশ বৎসর হইতে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—

"আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে বহে নতশির।
* * *
দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলেনাক কিছু।"
* * *

কিন্তু তিনি দুন্দুভিঘোষে এ কথাও বলিতেছেন—

"ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পড়ব না ভাই, পাঁকের পরে পড়ব না"।

"বন্দেমাতরম্" পত্রিকা এই গালাগালি ও দলাদলির সহজ পথে চলিতে গিয়া ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম ও শীলতার পথ বর্জ্জন করিয়া এই পাঁকের পথে পড়িতেছেন। বিপিনবাবুকৃত দলাদলি, সম্ভবতঃ, প্রথমতঃ মত-বিরোধ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমশঃ ব্যক্তিগত হিংসা মিলিত

হিংসাটাই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এখানে একটা ছোটখাট উদাহরণ দেই। সেদিন 'বন্দে মাতরম্'পত্রিকায় দেখিলাম, একজন পত্রলেখক লিখিয়াছেন যে, নূতন দলের অনেক লোক এবার কংগ্রেসের সময় মহামতি তিলকাদিকে দেখিতে আসিবেন, তাঁহাদের জন্য যেন সম্মুখবর্ত্তী স্পেশেল ছিট্ রাখা হয়। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত কিন্তু লেখক এইটুকু বলিতে গিয়াও সুরেন্দ্রবাবুর উপর একটু ঝাঁল না ঝাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। নিতান্ত অনাবশ্যকসত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন—"গতবার বেনারস-কংগ্রেসে সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার দলবল লইয়া সম্মুখের ছিট্গুলি দখল করিয়া বসিয়াছিলেন বলিয়া তিলকাদি মহোদয়দিগকে পিছনের ছিটে বসিতে হইয়াছিল। সেজন্য গতবার তাঁহাদিগকে কেহ দেখিতে পান নাই।" এরূপ অসংলগ্ন কথা কোন পত্রলেখক লিখিতে পারেন, কিন্তু এরূপ কথা পত্রস্থ করা সম্পাদক ও পরিচালকগণের কি সঙ্গত?

৩। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজীর নির্ব্বাচনে যে উভয়দলেই একমত হইয়াছেন ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আশা করি দেশের মঙ্গলার্থে এরূপ কাজে তাঁহারা সর্ব্বদাই একমত হইবেন। কিন্তু এই ঘটনাটী আমার প্রবন্ধ লেখার অনেক পরে ঘটিয়াছে।

৪। তুমিও স্বীকার করিয়াছ—"বন্দে মাতরম্" এক উদীয়মান সম্প্রদায়ের মুখপত্র; তাহাকে মেছোহাটার নর্দ্দমায় রেখাবদ্ধ না করিয়া শীলতা ও শিষ্টাচারের অগুরুগন্ধে এবং সভ্যতা, সদাচার এবং সংযমালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া অবশ্যই তুলিতে হইবে। কোন স্থানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে শ্রদ্ধেয় বিপিনবাবুর সতর্কতার সহিত তাহার সংশোধন করা একান্ত কর্ত্তব্য।" পুরাতন দলের সঙ্গে বিপিনবাবুর মতবিরোধ ত অনেক দিন যাবৎ চলিতেছে। এতদিন বিপিনবাবু তাঁহার সম্পাদিত

প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'এর সৃষ্টি হইয়া অবধি সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ইহাই পরিতাপের বিষয়।

৫। জাতীয়-জীবনের যে নূতন আদর্শ রবীন্দ্রপ্রমুখ আদিগুরুরা আমাদের সম্মুখে অনেক দিন হইতে ধরিয়া আসিতেছিলেন আজ বিপিন বাবুর উদ্যমে তাহা বহুলোকের গ্রাহ্য হইয়াছে। যাঁহারা দেশের পুরাতন সেবক বলিয়া আজও নেতৃত্বপদারূঢ় আছেন, জাতীয় আদর্শের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াও যদি তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তবে তাঁহাদের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা নষ্ট করিতে চেষ্টা করা "বন্দে মাতরম্"এর অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি সদসৎ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে না? ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যতটুকু পারা যায় তাহাই করা উচিত। ইহাতে অধিক সময় লাগুক তাহাতে ক্ষতি নাই। এতকালের পুরাতন শ্রদ্ধা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া একদিনে তাড়াতাড়ি নষ্ট করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে। কারণ, কোন কিছুই অন্যায়ের উপর অধিক দিন অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। সময়ে সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িলেই সেই অন্যায়কারীদের উপর লোকের আস্থা কমিয়া যাইতে থাকে।

৬। তুমি লিখিতেছ, কেহ বারবার কোন অন্যায় অনুরোধ করিলে বিরক্তি ও তিরস্কার স্বভাবতই আসিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু স্বভাবকে কি সর্ব্বদাই আমল দিতে হইবে? স্বভাবতঃ যাহা আসিয়া পড়ে তাহাতে কি আর সংযম-অসংযমের বিচার করিতে হয় না? স্বভাবকেই যদি সর্ব্বদা এরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাজ করিতে দেওয়া হয় তবে আর মানবহৃদয়ে বিবেকের আবশ্যকতা কি? "বন্দে মাতরম্"পত্রিকা "বেঙ্গলী" প্রভৃতি পত্রিকার খুঁৎ ধরিতে, তাহাদের অন্যায়পরতা দেখাইয়া দিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। বিপিনবাবুর সম্বন্ধে কোন কিছু প্রতিকূল সংবাদের প্রতিবাদ 'বেঙ্গলী'তে প্রকাশ হয় কি না হয়, ধৈর্য্য-

সহকারে দেখিয়া-শুনিয়া তবে তাহা 'বন্দে মাতরম্'এ সন্নিবদ্ধ হয়—এরূপ মর্ম্মের নোটও "বন্দে মাতরম্"এ দেখিয়াছি। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'—"Do unto others what you wish they should do unto you"—এ উক্তির পক্ষপাতী নিশ্চয়ই নহেন। কারণ, নিজের প্রতি যে ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণের আকাঙ্ক্ষা রাখেন, পরের প্রতি তাহা দানে একেবারেই বিমুখ। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার কতকগুলি কারখানা আমি তোমাদের জানাইব, যাহা শুনিলে তোমরা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, তোমাদের একটি ভক্তিগত স্থানের মূলে গিয়া লাগিবে, যাহা শুনিলে শুধু তোমরা নহ, নূতন বঙ্গের প্রত্যেক জেলার সহস্রাধিক সেবকের হৃদয় ক্ষোভে ও ঘৃণায় আলোড়িত হইবে এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য প্রতীকারবিমুখ সম্পাদকপদস্থ বিপিনবাবু ও তাঁহার দল-বলের প্রতি বিশুদ্ধ অবজ্ঞার ভাব ছাড়া আর কিছুই মনে আসিবে না।*

৭। বিলাতফেরতের দল যদি সত্যসত্যই আন্তরিকতার সহিত সর্ব্বতোভাবে স্বদেশী হইবার জন্য হ্যাট্-কোটের পরিবর্ত্তে ধুতি-চাদর পরিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন তবে এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যদি এই ধুতি-চাদর-পরাটা কেবল ভণ্ডামির জন্য হয় তবে এর মধ্যে কতটা হীনতা ও হাস্যকরতা আছে। 'বন্দে মাতরম্' পুরাতন দলের সোশ্যাল রিফরমের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করেন। এ বিষয়ে 'বন্দে মাতরম্' বাঙ্গালাদেশে বোম্বের তিলকের স্থান অধিকার করিতে চাহেন। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, সকলের মুখে সব কথা শোভা পায় না। গোঁড়াহিন্দু মহামতি তিলকের মুখে যাহা শোভা পায়, ইহাঁদের মুখে তাহা শোভা পায় না। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় যাহা শোভা পায়,

* এখানে লেখক তাঁহার পত্রে যে সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ কারণ বশতঃ "ভারতী"তে প্রকাশ হইতে পারে না।—ভাঃ সং

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় তাহা শোভা পায় না। 'বন্দে মাতরম্'এর সম্পাদক, পরিচালক এবং অংশীদারগণের মধ্যে অনেকেই যেমন-তেমন সংস্কারক নহেন, তাঁহারা সংস্কারকেরও সংস্কারক। তাঁহারা অহিন্দুজনোচিত সব কাজই করিয়া থাকেন—অখাদ্য খান, 'ছোঁয়া-আছোঁয়া' বিচার রাখেন না, জাতিভেদ মানেন না, বিধবা-বিবাহ অনুমোদন ও কার্য্যতঃ করেন, কন্যা ও ভগিনীদের উত্তম শিক্ষা দান করিয়া প্রাপ্ত বয়সে পাত্রস্থ করেন, কিম্বা চিরকুমারী রাখেন, তার উপর যাহা অন্য সংস্কারকেরাও করেন না বরঞ্চ যার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন, এমন কাজও সমাজে প্রবর্ত্তন করেন এবং বিপিনবাবু যুক্তি, তর্ক ও ফিলজফির সাহায্যে এবং আর্টের দোহাইয়ে তাহার ঘোরতর সমর্থনও করেন। গত পূর্ব্ববৎসর একদল ব্রাহ্ম ও বিলাতফেরত মহিলাদের ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ প্রকাশ্য থিয়েটারমধ্যে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয়ের সাপক্ষে যে বিপিনবাবু 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকায় কি সোশ্যাল রিফরমের উপর প্রহসন শোভা পায়? ইহা কি নিতান্তই অসদৃশ নয়? তুমি বলিবে, বিপিনবাবু ও তাঁহার সাহায্যকারীদের সমাজসংস্কারসম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত ও আচরণ যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় আর-একদলের মুখপত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—যাহারা সোশ্যাল রিফরমের বিরোধী—সুতরাং বিপিনবাবুর দ্বারা সম্পাদিত হইলেও 'বন্দে মাতরম্'এ সোশ্যাল রিফরমের বিরুদ্ধে হাসি-টিট্‌কারী অসঙ্গত নহে। এ কথা যদি বল, তবে একদিন তোমার মুখে হয়ত ইহাও শুনিব যে, কোন উদারহৃদয় মুসলমান কোন হিন্দুমঠের মোহান্ত হইলেও অসঙ্গত হয় না। সব বিষয়েই অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে। পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আজ এইখানে শেষ করি। ইতি—

মিয়ানমীর,
পঞ্জাব।

তোমাদের
শ্রীশ্রীশচন্দ্র ধর।

শেষ পত্র।

সুহৃদ্বরেষু—

ভাই শ্রীশ,

তোমার সুদীর্ঘ ও সুযুক্তিপূর্ণ পত্রে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আমি এখন তোমার সহিত সম্পূর্ণভাবে একমত হইলাম। * * ইতি—

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।

গড়জরিপাদুর্গ ও শাহকামালের দরগা।

(আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।)

ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমা, সেরপুর থানা ও পরগণার অন্তর্গত গড়জরিপানামক গ্রামে একটী অতিপ্রাচীন দুর্গ আছে। এই দুর্গের চতুর্দ্দিক 'কালীদহ'নামক শতাধিক হস্ত পরিসর গাঙ্গিনা দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণদিকে একটীমাত্র দ্বার। গাঙ্গিনার পরই ইষ্টকনির্ম্মিত অতি মজবুত প্রাচীর। এখন কালের আবর্ত্তনে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই দুর্গ দৈর্ঘ্যে অনুমান এক মাইল, প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল হইবে। আজকাল গাঙ্গিনার মধ্যস্থানে একখানি সুবৃহৎ গ্রাম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অনেক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএনথ্‌সঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং যোগিনীতন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান সেরপুরপরগণা অর্থাৎ পুরাতন ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বপার তখন কামরূপরাজ্যের অধীন ছিল। কামরূপ তখন একটী শক্তিশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে ইক্তার উদ্দিন উজবেগ তুগ্রল খাঁ কামরূপ

রাজ্য আক্রমণ করেন। কামরূপরাজ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। রাজ্যও ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। এই সুযোগে গারোপর্ব্বতের দক্ষিণভাগে জঙ্গলবাড়ী, খালিয়াজুড়ি, মদনপুর, সুসঙ্গ, বোকাইনগর, গড়দলিপা (গড়জরিপা) প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। অতঃপর পলায়নমাণ কামরূপাধিপতি তুগ্রলখাঁকে হত্যা করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করতঃ পরলোক গমন করিলে পর, তদীয় পুত্র রাজকুমার ভাস্কর বর্ম্মা রাজ্যাধিপতি হইলেন বটে, কিন্তু দুর্ভেদ্য গারোপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ আর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না। কোচ, ম্যাচ, গারো, হাজং প্রভৃতি ভুঞাঁরাজগণ সীমাবদ্ধরূপে পৃথক পৃথক স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। গড়দলিপায় বা জরিপায় কোচরাজ দলিপসামন্ত একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন

মোগলশাসন আরম্ভের পূর্ব্বে ফিরোজশাহার রাজত্বসময়ে তদীয় অনুচর মজলিসখাঁ হুমায়ুন কোচরাজ দলিপসামন্তকে নিহত করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। এই অবধি দশকাহনিয়া পরগণা মুসলমান-শাসনাধীন হয়। এই সময়ে দুর্গটীর নূতনভাবে সংস্কার হয়। মজলিসখাঁ হুমায়ুনের গড়জরিপাতেই মৃত্যু হইয়াছিল। এই দুর্গের অভ্যন্তরেই তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার সমাধিস্তম্ভের আরবী ভাষায় লিখিত প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছিল। সেরপুর ॥/০ আনীর বিদ্যোৎসাহী জমিদার স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়া ১২৭১ বঙ্গাব্দে তাহা এসিয়াটিক সোসাইটীকে প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক জার্ণেলের অধ্যাপক, চৌধুরিমহাশয়কে ধন্যবাদের সহিত তাঁহার প্রেরিত প্রস্তরলিপির অনুবাদ প্রচার করেন। অনেক স্থলে অক্ষর অস্পষ্ট থাকায় অনুবাদ অসম্পূর্ণ ...

"In the name of God the merciful the clement ! There is no God but Allah,—Mahammad is Allah's prophet * * * There is no God but Allah * * Mahammad is Allah's prophet * *

God bless Mahammad the pure Hasan Hossain * built * * * The king of the age and the period Saibuddan ya uddin Abbul Muzaffar Feroz Shah the King may God perpetuate Kingdom and his rule !

This (Vault) was completed in blessed Ramjn 8 * "

অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুর্গ ও রাজ্য স্বাধীন নরপতি দেওয়ান ঈশাখাঁ মসনদ আলির করায়ত্ত হয়। ঈশাখাঁ তদীয় অনুচর সের আলি গাজিকে এই রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। তাহারই নামানুসারে পরগণার নাম সেরপুর হইয়াছে। পূর্ব্বে 'দশ-কাহনিয়া' নাম পরিচিত ছিল। ঈশাখাঁর সময়ে এই দুর্গের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সেরপুর ৵০ আনীর জমিদার রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী এই দুর্গস্থিত গড়জরিপা গ্রামের মালিক।

অত্র জেলাস্থিত জামালপুর মহকুমা ও থানার এলাকাধীন দুরমোট নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহকামালের দরগা বর্ত্তমান আছে। এই দরগায় উল্লেখযোগ্য তেমন কোন প্রাচীন কীর্ত্তি না থাকিলেও গ্রামটী অতি প্রাচীন এবং এই দরগাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি এইরূপ যে, শাহকামাল বঙ্গাধিপতি সেকান্দর শাহার পুত্র এবং প্রসিদ্ধ গয়েসউদ্দিনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ফকির গাজিশাহা ও কালুর সমসাময়িক লোক ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, শাহকামাল খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দুরমোট আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। একটী অট্টালি-

কার ভিতরে শাহকামাল ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর সমাধি বর্ত্তমান আছে। সমাধির এক পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী গর্ত্ত আছে, তাহাতে লাল বর্ণের বৃহৎ দুইটী সর্প বাস করে। মাসে মাসে একবার এই রক্তবর্ণ অহিদ্বয় গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। দরগার সেবকগণ প্রত্যহ এই গর্ত্তে দুই সের করিয়া দুগ্ধ দিয়া থাকে। লোকে বলে শাহকামাল এই দুইটী সর্পের ছানা পালন করিয়াছিলেন। দরগার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় পনরহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি, মুর্শিদাবাদের নবাবের সময় হইতে, মাত্র বারটাকা খাজনায় শাহকামালের উত্তরাধিকারিগণ ভোগ করিতেছেন। সৈয়দ রশিদজ্জমান ও সৈয়দ কোমরজ্জমান এবং টিকাজানীনিবাসী মৌলবী মহফুজল হক্‌ সাহেবের পত্নী বর্ত্তমান সময়ে এই সম্পত্তি উত্তরাধিকারিরূপে ভোগ করিতেছেন। সৈয়দ রশিদজ্জমান-সাহেবের নিকট শাহকামালের পায়ের কয়েকখানি কাষ্টপাদুকা আজিও বর্ত্তমান আছে। তাহা দীর্ঘে এক হাত চারি অঙ্গুলী লম্বা।

গারোপর্ব্বত শাহকামালের সাধনার স্থান। তথায় পর্ব্বতোপরি একটী উপাসনামন্দির ও দুইশত হস্ত দৈর্ঘ্য এবং একশত হস্ত প্রস্থ একটী দীর্ঘিকা, সুবৃহৎ একখানি কোদালী ও অনেকগুলি গোলাকার শ্বেতপ্রস্তর, একটী প্রস্তরনির্ম্মিত কূপ বর্ত্তমান আছে। পুকুরের জল একটু নাড়াচাড়া করিলেই অসংখ্য শ্বেত ও কাল বর্ণের কুম্ভীর ভাসিয়া উঠে। গারোপর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে দীর্ঘিকা ও কূপ খনন ও তাহাতে শ্বেত ও কালবর্ণের কুম্ভীর থাকা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। আবার ঐ পুকুরেই লালবর্ণের একপ্রকার সোলমৎস্য দেখা যায়, ইহাও অতি আশ্চর্য্য। এই সমস্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—কোনরূপ জনশ্রুতি নহে।

কথিত আছে, শাহকামাল দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্ত আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গারোপর্ব্বতের নির্জ্জনগহ্বরে ঈশ্বর-আরাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া-

পরমতত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হন। ঐশীশক্তিতে বলীয়ান হইয়া শাহ-কামাল পর্ব্বরগহ্বর হইতে বাহির হওতঃ বর্ত্তমান দরগার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একজন যোগী পর্ব্বতশৃঙ্গে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেছেন। শাহকামাল তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া গোলকবিহারী শ্রীহরির সজীব মুর্ত্তি দেখাইলে পর ঐ যোগিপ্রবর শাহকামালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বীয় মন্দির গুরুদেবকে প্রদান করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। ঐ মন্দির আজিও বর্ত্তমান আছে। এই মন্দিরটী দেখিলেই অনুমান করা যায় যে, ইহা নিশ্চয়ই হিন্দুর উপাসনামন্দির। কারণ, মন্দিরের দ্বার দক্ষিণদিকে এবং ভিতরের দিকে মন্দিরের গাত্রে "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ" ও "সদাশিব", "দুর্গা" প্রভৃত নাম বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত আছে। মুসলমানের উপাসনামন্দির হইলে ইহা দক্ষিণদ্বারী না হইয়া পূর্ব্বদ্বারী হইত এবং হিন্দু দেবদেবীর নাম লেখা থাকিত না।

গারোপর্ব্বত হইতে শাহকামাল দুরমোটগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন দুরমোটগ্রাম একটা ভীষণ অরণ্য ছিল। শাহকামাল সেই অরণ্যে একখানি তৃণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বর উপাসনা করিতে থাকেন। একদা নিকটবর্ত্তী সরোলিয়াগ্রামের জনৈক বারুইজাতীয় হিন্দু তালুকদারের বাটীতে ৺শারদীয়া পূজা হইতেছিল। শাহকামাল পাগলের ন্যায় বরাবর ঐ মণ্ডপগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুসলমান ফকির মণ্ডপগৃহে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া সকলে তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। শাহকামাল সান্ত্বনাবাক্যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন—"তোমরা প্রতিমার সম্মুখে এতগুলি উপাদেয় খাদ্য দ্বারা ভোগ সাজাইয়া দিয়াছ। কৈ দেবী ত তাহা খাইতেছেন না, কারণ কি?" পুরোহিত এবং সকলে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "ফকির! আমরা ত খাওয়াইতে পারিলাম না, তুমি খাওয়াইতে পার কি?" শাহকামাল

বলিলেন, "খাওয়াইতে পারিলে দিবে কি ?" গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "যাহা চাহিবে তাহাই দিব। এতদ্শ্রবণে শাহকামাল ৺শারদীয়া প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "দেবী ! এই গৃহস্বামী আপনার সন্তুষ্টির জন্য প্রচুরপরিমাণে আহারের আয়োজন করিয়াছে, অতএব আপনি এই সমস্ত ভক্ষণ করিলে গৃহস্বামী ও আমি পরম কৃতার্থ হইব।" শাহ-কামাল এই কথা বলা মাত্র তৃণ ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত ৺দুর্গামূর্ত্তি দশভুজ প্রসারণ করিয়া সমস্ত আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টে সকলের বুদ্ধিবলুপ্তি ঘটিল এবং ভক্তিরসাপ্লুত-চিত্তে পদবিলুণ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বকৃত অবজ্ঞার দরুণ ক্ষমা প্রার্থনা করিল। উদারহৃদয় শাহকামাল তাহাদের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করতঃ গৃহস্বামীকে বলিলেন, "আমি আমার প্রতিশ্রুত বিষয় সর্ব্বজনসম্মুখে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিলাম, এখন তুমিও তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর।" গৃহস্বামী বলিলেন, "মহর্ষে, কোন্ দ্রব্য দিলে আপনি সন্তোষ হন ?" শাহকামাল বলিলেন "যে বস্তুটী তোমার প্রকৃত স্নেহের বস্তু সেইটী আমাকে দাও, সেইটীই আমার অভিলষিত।" গৃহস্বামী বলিলেন "আমি সরলান্তঃকরণে বলিতেছি, এ সংসারে আমার আদরের বস্তু তেমন কিছু নাই। তবে একমাত্র কন্যারত্নকে জীবনের জীবন বলিয়া জানি।" শাহকামাল বলিলেন তবে তোমার ঐ কন্যাটীকেই আমাকে দান কর। গৃহস্বামী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভক্তিভাবে তখনি কন্যাটী শাহ-কামালের পদে উৎসর্গ করিলেন, শাহকামালও ধর্ম্মপত্নীরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাঁর নামই বারুইবিবি, ইনিও পরম তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থা হইয়াছিলেন এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়া লোকের পুজনীয়া হইয়াছিলেন। শাহকামাল চারি বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বারুইবিবিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বিদুষী ও শিক্ষিতারমণী বলিয়া পরিচিতা হইয়াছিলেন। দুরমোটের পশ্চিমদিকে সরোলিয়া-

গ্রামে বারুইবিবির সমাধি আজিও বর্ত্তমান আছে, লোকে তাহাতে 'মান্নৎ' আদায় করিয়া থাকে।

এই সমস্ত কারণপরম্পরায় শাহকামালের ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। তিনি হিন্দু কি মুসলমান মতাবলম্বী ফকির ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। হিন্দু-মুসলমান উভয়জাতিই শাহকামালের শিষ্য ছিল। শাহকামালের প্রিয়হিন্দুশিষ্যগণ আজ পর্য্যন্তও শাহ-কামালের প্রদত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছে এবং বৎসর বৎসর শাহ-কামালবাবাজির নির্দ্দেশিত মান্নৎ আদায় করিতেছে। জফসাহী সেরপুর, পাতিলদহ, সুসঙ্গ, গারোহিল প্রভৃতি পরগণার প্রাচীন জমীদারগণ শাহকামালের নিতান্ত ভক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কারণ ঐ সমস্ত পরগণায় শাহকামালের অনেক নিষ্কর পিরোত্তর ভূমি বর্ত্তমান আছে। শাহকামাল এরূপ একজন শক্তিশালী তাপস বলিয়াও সংসারবিরাগী ছিলেন না। দারা-পুত্র, সহায়-সম্পত্তিতে ষোলকলাই তাঁহার পূর্ণ ছিল। কিন্তু তিনি সংসারী হইয়াও শ্মশানবাসী, বিবাহিত হইয়াও সংসারে সদাই নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত। ইহলোক ও পরলোককে, জন্ম ও মৃত্যুকে, সাংসারিক মায়া ও সাংসারিক বৈরাগ্যকে, সুখের সংসারস্থল ও বৈরাগ্যের শ্মশানক্ষেত্র, এই উভয়কে একাধারে তিনি তাঁহার নিজের জীবনে দেখাইয়া দিতেছেন। সদা উদাসীন হইয়াও এই বিবাহিত মহাপুরুষ সহধর্ম্মিণীর প্রতি অমনোযোগী নহেন; ধুলা-মাটি-সমাযুক্ত, কালকম্বলপরিহিতি, এবং সংসারলোভে নির্লিপ্ত হইয়াও ইনি নারীজাতির মর্য্যাদা, সতীত্ব বা লজ্জাশীলতার সংরক্ষণে উদাসীন নহেন। তৈল ও জল একত্রে রাখিলে যেরূপ পরস্পর সংমিশ্রিত হয় না, পদ্মপত্রে বারি অবস্থান করিলেও যেমন তাহা পত্রে সমাযুক্ত হয় না,

অবস্থান করিয়াও ইনি সংসারের কল্যাণে বীতস্পৃহ নহেন, নিজে ক্রিয়াতীত হইয়াও নিষ্ক্রিয় নহেন। এত গুণ, এত সামর্থ্য, এত প্রেম না থাকিলে কি কখনও একজন সাধ্বী হিন্দুরমণী ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতেন? ইঁহার প্রেমে পার্ব্বতীয় সর্পকুল বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, নদীর কুম্ভীরগণ নদী পরিত্যাগ করিয়া শাহকামালের ক্ষুদ্র পুকুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, শার্দ্দূল, বৃষভ, এবং মৃগ একত্র সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, পার্ব্বতীয় ভূত, প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, দানবগণ দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, জলদেবতা তাঁহার কোদালী শাহকামালের চরণে উৎসর্গ করিয়াছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যদিও অনেক পাঠকের এই সমস্ত গাঁজাখোরী গল্প নিতান্ত অরুচিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে, তথাপিও ধর্ম্মভীরু এবং বিশ্বাসী লোকের নিকট নিতান্ত অনাদরণীয় হইবে না বলিয়া আমার ধারণা। শাহকামালের উত্তরাধিকারী স্বর্গীয় সৈয়দ সৈয়দজ্জমান মিঞা সবরেজিষ্টার সাহেবের নিকট যে সমস্ত কাগজ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা হইতে ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট শুনিয়া এবং নিজে দুরমোট ও গারোপর্ব্বতের দরগাদ্বয় দর্শন করিয়া, শাহসাহেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে সমর্থ হইয়াছি।

সৈয়দনূরুল হোসেন

শিরী-ফরীদ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শৈলশিখর।

জক্সর্ত্তিস নদীর একদিকে বিশাল সমতল প্রান্তর। এই প্রান্তরে পারস্যসম্রাট বিপুল সৈন্যের শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। অপরদিকে হিন্দুকুশপর্ব্বত। তাহারই এক মনোরম উপত্যকায় তাতারনগরী প্রতিষ্ঠিত। উভয় প্রান্তেই বিশাল গিরি দিকচক্রবালে আপনার মনোরম দেহটী আবৃত করিয়াছিল। ধরিত্রী যেন মৃণাল-বাহুলতায়, একটী প্রফুল্লপদ্মের ন্যায়, নগরীটীকে ধরিয়া বুকে করিয়া বসিয়াছিল। একটী বিচিত্র শৈল নদীবক্ষ হইতে সরলভাবে উঠিয়া উত্তরতীরস্থ ভূমিখণ্ড হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত। শৈলের হিমানী-মণ্ডিত শৃঙ্গে কোথা হইতে আলোক পড়িয়া প্রতিফলিত হইতেছিল। তজ্জন্য শৈলটী অন্ধকারেও দীপদণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। র ছাড়িয়া, নগর ছাড়িয়া, শিরী দীন রমণীর বেশে সেই শৈলের পর উঠিল। উঠিয়া দেখিল, এক অর্দ্ধনির্ব্বাপিত ধুনীর পার্শ্বে এক নারম পাদপীঠে একটী রমণীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। সেই মূর্ত্তিটী ন্ন, আর কোনও জীবের চিহ্ন সেখানে লক্ষিত হইল না। শিরী পদসঞ্চারে পাদপীঠপার্শ্বে উপস্থিত হইল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ল, মূর্ত্তি কোনও সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি। মুখে-চোখে যেন জীবনের ,, কিন্তু শিরী তাহাতে কোনও স্পন্দনানুভব করিল না। এ রূপ সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি কাহার? শিরী বুঝিল, প্রাণহীন না হইলে,

তাহার রূপের পরীক্ষা আরম্ভ করিল। পরীক্ষা করিতে করিতে সহসা কি যেন একটা স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই স্মৃতির বিষম প্রহারে দেখতে দেখতে রাণী আত্মহারা হইয়া উঠিল। সে বুঝিল এ প্রতিমূর্ত্তি আমার। তাহার অজ্ঞাতসারে একটা অদম্য ঈর্ষা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। প্রতিমূর্ত্তির স্মিতাঙ্কিত মুখের পানে চাহিয়া শিরী বলিল :—

প্রতিমূর্ত্তি এই কি আমার! কে রচেছে?
কেমন বিধাতা? গর্ব্ব আঁকিবারে বুঝি
বর্ণ নাই তাহার দরিদ্র ঘরে! বুঝি,
সে স্বর্গে ফোটেনা কভু প্রভাকর ফুল,
মাথা বুঝি তোলেনা অচল! কাদম্বিনী
বুঝি, পরেনাকো ওষ্ঠাধরে সৌদামিনী হাসি!
আরে ছিছি! কি লজ্জা, কি ঘৃণা! রূপরাগে
এমন লাঞ্ছনা! ছিছি! শিরীরূপে এত
অপমান! শিরীর গর্ব্বিত মুখে এত
দীন হাসি! এত ঘন আকাঙ্ক্ষার রাশি
ললিত ভ্রূকুটী মাখা মদির লোচনে!
কি লজ্জা, কি ঘৃণা! একি হাসি সর্ব্বনাশী!
এ যে শুধু সলিলের আবদ্ধ প্রপাত,
মুখে রাশীকৃত ফেনের উচ্ছ্বাস। গেছে
প্রাণ, হয়েছো পাষাণী—শুকাইয়া গেছে
প্রস্রবণ, তাই বুঝি এ দশা তোমার!
আরে স্বর্গকলঙ্কিনী! আজন্ম বিধির
পার্শ্বে থেকে—দেখেও কি জন্মিলনা জ্ঞান,
শ্রেষ্ঠরূপগঠনের গর্ব্বই প্রধান

উপাদান। সে গর্ব্বে জন্মেছি আমি; শুধু
তুচ্ছ করা স্বভাব আমার। ধরণীর
সহস্র সুন্দর, শতশত রাজপুত্র,
হাজার সম্রাট, লাখো লাখো ওমরাও
ভিক্ষুবেশে আমার দুয়ারে। সেই আমি
তাতার-ঈশ্বরী—রূপে বিশ্ববিমোহিনী,
তেজে প্রজ্বলন্ত শিখাস্বরূপিনী—সেই
আমি, তার মূর্ত্তি তুই! কি লজ্জা, কি ঘৃণা!
কি করিব? এই মুখ দাঁড়ায়ে দেখিব!
আকাঙ্ক্ষায় বদ্ধ এই নিলাজ বদন,
যে দেখিবে, সেইত ভাবিবে, শিরী বুঝি
সাধিছে তাহারে। খঞ্জ কুব্জ নাসাহীন,
মর্কট-মূরতি কদাকার, যে দেখিবে,
সে বুঝিবে, হেরে তারে শিরী পাগলিনী।
তীব্র লাগে স্মরণে জীবন। তীব্র লাগে
পাপিনীর মিষ্টমুখে মধু আবাহন।
প্রতিবিম্বে একদিন এরূপে আমার
দীন ভাব নিরখিয়া, ভাঙ্গিয়া দর্পণ
দীন বিম্বে চূর্ণ করে দিছি। সেই আমি
এমন গর্ব্বিণী—হেন কঠিন সমষ্টি
দীনতার, দাঁড়াইয়া করিব দর্শন?
কি করিব? পাপিষ্ঠারে মুখ ফিরাইয়া
চলে যাব?—চলে যাব!—কেন? আমি রাণী,
অপরাধে শাস্তিপ্রদায়িনী। জালকারী
অদণ্ড্যা রহিবে! আমার নগরীবক্ষে

এ রম্য অচলশিরে, প্রতি প্রভাতের
নবোদিত রবিকরে চুম্বিত হইয়া,
দিগন্তে আমার মৃত্যুগাথা ছড়াইবে—
আর আমি হেঁটমুণ্ডে, অপরাধী মত
স্থান ত্যজি চলে যাব মুখ লুকাইয়া ?
বল্ বিধি কি করিব ?　এই কি করিব ?

(মূর্ত্তিকে দুই হাতে ধরিল।)

আর কেন ?　যদি তীব্র আকাঙ্ক্ষার টানে
বিধাতার বাঁধন ছিঁড়িয়া, পশে প্রাণ
এ পোড়া পাষাণে !　সে বড় যাতনা।　যদি
কোনমতে ভেঙে যায় কথার ভাণ্ডার—
আঁখিভেদি জ্বালাময়ী ছোটে নির্ঝরিণী,
ফরীদে দেখিয়া জাগে যাচিকার প্রাণ !
যদি সাধে, যদি বলে দাসী—"এস বঁধু
এস মোর পাশে।　এ মুক্ত হৃদয়দ্বার,—
পশহে, সে দেশে শুধু তব অধিকার—
এসে লও, বসে রও, বেঁধে লও তার—
আমি যন্ত্র তুমি তার গান, আমি মূর্ত্তি
তুমি তার প্রাণ।" পাষাণীর ছলকথা—
ফরীদ যদ্যপি শুনে ?　সে বড় যাতনা !
গর্ব্ব যাবে মর্ম্ম যাবে—রবে কি আমার ?
তবে আর কেন ?　চলে যালো পোড়ামুখী—
জগতের সর্ব্বনিম্নস্তরে, অগ্নিময়
অন্ধকার মাঝে, থাক্ ডুবে, তাই তব
উপযুক্ত স্থান।

(শিরী মূর্ত্তি নিক্ষেপ করিল। স্থানভ্রষ্ট পাষাণপ্রতিমা, পর্ব্বতের পাদমূলে গড়াইয়া চলিল। শিরী দেখিল মূর্ত্তি যেন সমস্ত পথটা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে।)

জীবন গোপন ক'রে
পাদপীঠে দাঁড়ায়ে কি ছিল ছলময়ী!
সমীর ভরিয়া গেল আকুল ক্রন্দনে!
নিবিবার পূর্ব্বক্ষণে তৈলহীন দীপ
যেই মত পূর্ণরাগে দীপ্তি ধরি মুখে
মরণে রহস্য করে জীবন উচ্ছ্বাসে,
তাই কি দেখায়ে মোরে চলিল পাষাণী!

নেপথ্যে। রক্তস্রোত!

শিরী। রক্তস্রোত! কোথা রক্তস্রোত?
পাষাণে ধমনী ছিল, রক্তস্রোত ছিল
তার মাঝে? তুষার-শীতল শিলা-বুকে
ছিল কিরে দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসপীড়ন?
কি করিনু, প্রাণদণ্ড তুলে দিয়ে দেশে,
অবশেষে নিজহস্তে রমণী বধিনু!
দুই শিরী ছিল কি ধরায়? বিধাতার
কল্পনাসাগরে, দুটী বিম্ব সমরূপী
তবে কিরে উঠেছিল ফুটে? পরস্পরে
কোন তীব্র ঈর্ষা-আকর্ষণে মাটী ছেড়ে
অতি ঊর্দ্ধে বিধির প্রাঙ্গণে, দণ্ড তরে
দুটী বিম্ব পাশাপাশি হ'ল! সংঘর্ষণে
একটী ভাঙ্গিল তার! এক শিরী গেল!
কে গেল, রহিল কেবা—আমি, না পাষাণী?

পাষাণী যদ্যপি রয়, হউক জীবন-
ময়, যদি তার স্বপ্নস্রোত বহে। আমি
যদি রই—স্বপ্নহীন জাগ্রত জীবন,
হে বিধি যদ্যপি পার দিতে, তবে রই—
স্বপ্নভার কোমলাঙ্গে বহিতে না পারি।
স্বপ্নভয়ে মৃত্যু আকিঞ্চন—হে বিধাতঃ
মরি যদি দিয়োনাকো স্বপ্নের শয়ন।

নেপথ্যে। অসহ্য অসহ্য।

শিরী। তবে আয়লো পাষাণী
অচলের পদতল হ'তে স্বপ্নভরা
প্রাণ নিতে শীঘ্র ছুটে আয়। অপরাধে
দণ্ড দিতে আত্মবলিদান, তোর বুকে
ঢেলে দিনু তাতারের প্রাণ। এই আমি
তাতার-ঈশ্বরী, তোরে করিতে অমরী
পাষাণ প্রতিমা হ'য়ে মৃত্যুরে দিলাম
আলিঙ্গন।

(পাদপীঠের উপর দাঁড়াইল।)

(মুস্তাফার প্রবেশ।)

মুস্তাফা। অসহ্য দর্শনজ্বালা। আরে
রক্তস্রোত! রক্তস্রোতে সোণার তাতার
ভেসে যাবে! বিশ্বনাশী অস্ত্র মোর হাতে—
তা থাকিতে ক্ষণজীবী পারস্যসম্রাট
তাতারে মরণ না চাইবে! কি বলিব?
বৃদ্ধ আমি দৃষ্টিশক্তিহীন—অস্থিসনে
কম্পন গাঁথিয়া গেছে। নতুবা তুলিকা-
অঙ্গে জীবন মাখিয়া, সহস্র শিরীকে

চক্ষের পলকে আমি দিতাম স্বজিয়া,
সহস্র সম্রাটমুণ্ড পাড়িতাম ভূমে।

শিরী। কিমূর্ত্তি সুন্দর! বার্দ্ধক্যে জ্ঞানের ভার!
পুঞ্জীকৃত প্রীতিরাশি, হৃদয় ভরিয়া
ঢালিতে আমার শিরে, যেন কোথা হ'তে
আসিতেছে চিরপ্রিয় আত্মীয় আমার।
এস পিতা এস গুরু! প্রীতিপুষ্পভারে
ঢাকিয়া আমারে, শীত-উষ্ণ দুঃখ-সুখ
কর আচ্ছাদন, সব নিপীড়িয়া পিতা
কন্যারে নিথর কর পাষাণীর মত।

মুস্তাফা। এ যে বড় অপমান! আরে সর্ব্বনাশী!
এখনও দে-না ভেঙ্গে অধরোষ্ঠবাঁধ!
সাধিনা আমার তরে। যাচিনা জননী
ফরীদে ফিরাতে তোর দৃষ্টি-আকর্ষণে।
একবার বল্ পিতা। বল্ মা সত্বর!
এ বাৎসল্যে চাহিনা মা আমার জীবন।
মৃত্যু এসে কাণে কথা কয়। সে মধুর
স্বর, দূর ক'রে দিয়াছে মা বয়সের
বধিরতা-ব্যাধি। নাচে সে চোখের কাছে,
সে বুঝি মা তো হ'তে সুন্দর! তাই দেখে
ধরণীর পরমাণু দে'খ যে মহান্।
নিমীলিত-প্রায় চক্ষে যুবার দর্শন।
একি অঘটন! মান কি ছাড়িলি রাণী?
দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি, আজ তোর চোখে
ফুটেছে কথার খেলা। পাষাণ পলকে
কি মধুর প্রীতিরঙ্গ, কম্প কি সুন্দর!

মা, মা, পিতা গুরু আমি, তবু তুই রাণী—
গৌরবে সবার কাছে নমস্যা জননী!
করজোড়ে সাধি মা তোমায়, চক্ষুমুদে
রসনায় কথাগুলা দে-না গড়াইয়া।
অধরোষ্ঠে ঝরিল কম্পন, ছেড়ে দে মা—
ধরণীর প্রেম-উৎস ও হৃদয় হ'তে,
উল্লাসে ছুটিয়া যাক্ বাণী-নিঝরিণী।
এ আদরে আমি না বাঁচিতে চাই। বড়
অপমান। সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তান আমার।
মাটী পেলে রবিশশী গড়িতে সে পারে,
সে ফরীদ পিতা ব'লে আমারে সম্ভাষে।
তার তুই, তোর রাজ্যে রাজার উৎপাত!
যতক্ষণ আছে অভিমান, ততক্ষণ
এ বিষম দৃশ্য আমি দেখিতে না পারি।
একবার পিতা বল্; আমি না বাঁচিতে
চাই, তাতারে বাঁচাই। লক্ষসৈন্যসনে
পারস্যসম্রাটে তোর পায়ে দিই ধরে।

শিরী। পিতা!

মুস্তাফা। শিরী, শিরী! ফের বল্ মা আমার!

শিরী। পিতা!

মুস্তাফা। আবার আবার। অতৃপ্ত বাসনা—
অনন্ত সুধার স্রোতে, কলকণ্ঠে ফের
বল্ পিতা!

শিরী। পিতা, গুরু!

মুস্তাফা। ফরীদ! ফরীদ!

(মূর্চ্ছা।)

শিরী। (পাদপীঠ হইতে অবরোহণ করিয়া, মুস্তাফার পদ ধরিয়া) নিদ্রাভঙ্গে উঠ পিতা, নন্দিনী বসিয়া পদতলে।

মুস্তাফা।
কোথা নিদ্রা ! স্বপ্নে-জাগরণে
যা ছিল মোহের ব্যবধান, মা,মা—শিরী !
তোর মধুবাক্যস্রোতে প্রবল বন্যায়
সে বাঁধ টুটিয়া গেছে। স্থল-জল-ব্যোম
একাকার একসিন্ধু বিশাল মহান।
চক্ষুমুদে চেয়ে দেখি নীলিমতরঙ্গে
ফুটে আছে শিরীরূপা কমলে কামিনী।
(উঠিয়া) বৃদ্ধের জীবনদাত্রী ! একি মা, কেন মা ?
দীনবেশে কেন পদতলে ?

শিরী।
চল পিতা
কুটীরে ফিরিয়া যাই।

মুস্তফা।
আর না কুটীর।
সেখানে ফরীদ নাই। বিশাল সংসার
গৃহরূপে করিয়া রচনা, তার মাঝে
সে আছে এখন। হেথা আছি, আমি তার
ঘরে। এ ঘরে আনিয়া তোরে এ আনন্দ
মোর—সম্রাট লোটায় তোর পায়, তোর
এ বিরাট গৃহে, সমগ্র মানব, মাগো,
আদরার্থী ক্রীড়াশীল শিশু—কি অভাগ্য
তুই কেন লুকাবি কুটীরে ! আয় দেখি
তিলোত্তমা ! তুই-অস্ত্রে আমি অস্ত্রধারী,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে সবাহিনী পারস্যসম্রাটে—
আয় দেখি একবার করি আবাহন।

(প্রস্থান।)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

মহীশূরভ্রমণ।

পরদিন আমরা শিবসমুদ্রনামক স্থানে কাবেরীনদীর বিখ্যাত ও তৎসংলগ্ন বৈদ্যুতিক কারখানা দেখ্‌তে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌তে লাগলাম। কাবেরীর জলপ্রপাত ব্যাঙ্গালোর হ'তে খুব অধিক দূর নয়। তবে বরাবর ট্রেণে যাওয়া যায় না বলে' কিছু অসুবিধা মনে হয়। শিবসমুদ্র যেতে হ'লে মাড্ডার পর্য্যন্ত বরাবর ট্রেণে এসে সেখান হ'তে প্রায় ২৪ মাইল গাড়িতে যেতে হয়। দুই ঘোড়া-ওয়ালা মেলটঙ্গা আছে, তাছাড়া ঝিট্‌কা ও গরুরগাড়িও পাওয়া যায়। প্রথমে আমরা টঙ্গা করে' যাওয়াই ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এই টঙ্গা আমাদের ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে দাঁড়াবে না শুনে, শেষে ঝিট্‌কায় যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। মিঃ সি, কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমাদের সঙ্গে আস্‌তে পারলেন না।

আমি ও বন্ধুবর পরদিন রাত ১টার ট্রেণে সাউথ-মারহাট্টা-রেলওয়ের মাড্ডারষ্টেশনে যাত্রা করলাম। ব্যাঙ্গালোর হ'তে মাড্ডার ৫০ মাইলের অধিক হবে না। রাত প্রায় ২॥০টার সময় ট্রেণের গার্ড মাড্ডারষ্টেশনে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিল! আমরা চোখ মুছতে মুছতে গাড়ি হ'তে নামলাম। ষ্টেশনের বিশ্রামঘরে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করবার মানসে বিছানাপত্র নিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলাম। কর্ত্তব্যপরায়ণ মহীশূরী ষ্টেশনমাষ্টারমহাশয়টি এসে আমাদিগকে জানালেন যে, ষ্টেশনে নিদ্রা যাওয়াটা অতীব আইনবিরুদ্ধ কাজ এবং তিনি কিছুতেই আমাদিগকে তা করতে দিবেন না। আমরা তাঁকে বুঝায়ে বল্লাম যে আমাদের কার্য্যটি রেলওয়ে আইনবিরুদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু necessity has no law এই বিশ্বজনীন আইন-বিরুদ্ধ

নয়; সুতরাং এত রাত্রে এই অজানিত স্থানে কোন মাঠের মধ্যে নিদ্রা যাওয়াটা একটু অসুবিধাজনক হবে মনে করে' যেনতেনপ্রকারেণ ষ্টেশনের বিশ্রামাগারেই নিদ্রা যাবার জন্য আমরা দৃঢ়সংকল্প হয়েছি। তাছাড়া বন্ধুবর ষ্টেশনমাষ্টারটির পারলৌকিক সদগতির জন্য তাঁকে বুঝাতে লাগলেন যে, দুজন ব্রাহ্মণের এরূপ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মালে অভিশপ্ত হ'য়ে পরলোকে তাঁকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হতে হবে। এই সকল কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে তাঁকে আমাদের নাম-ধাম লেখা দুখানা কার্ড দিলাম এবং আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করার জন্য যা-কিছু কর্ত্তব্য প্রাতে সমাপন করতে উপদেশ দিয়ে উপস্থিত নিদ্রাতুর মনুষ্যদুটিকে বিরক্ত করতে নিষেধ করলাম। অনেক বাদানুবাদের পর পরলোকে নিরয়গামী হবার ভয়েই হোক বা অন্যকোন কারণেই হোক ষ্টেশনমাষ্টারটি কার্ড দুখানি আমাদিগকে ফিরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অসন্তোষের সঙ্গে আমাদিগকে সেই ঘরে নিদ্রা যাবার অনুমতি দিলেন। ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়ের হাত এড়ালাম বটে, কিন্তু সেই গৃহমধ্যস্থিত বেত্রনির্ম্মিত কোচের ছারপোকাগুলির হাত কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। নিদ্রাবিহীন হ'য়ে কোনরকমে রাত্রিযাপন করলাম। মাড্ডারষ্টেশনটি দেখ্‌লাম বেশ বড় ষ্টেশন। ষ্টেশনে আমাদের জিনিসপত্র সমস্ত রেখে একমাত্র ক্ষুদ্র টিফিনবাক্স সঙ্গে নিয়ে বেলা ৮৷৷টার মধ্যে অপূর্ব্ব ঝিটকারোহণে যাত্রা করলাম। এই ঝিটকার ছোট ছোট ঘোড়াগুলি বেশ ক্ষিপ্রগামী। ৮।১০ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলাবার আস্তাবল আছে। এই পাহাড়ে রাস্তাটি বরাবর উঁচুনীচু হলেও এই ছোট ছোট ঘোড়াগুলি ঘণ্টায় ৮।৯ মাইল যায়। মাড্ডার হ'তে শিবসমুদ্র পর্য্যন্ত রাস্তাটি বেশ সুন্দরভাবে রক্ষিত। আমরা ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে শিবসমুদ্রের বৈদ্যুতিক কারখানায় পৌঁছিলাম। বৈদ্যুতিক কারখানাটী

খাল কেটে জল নিয়ে গিয়ে কিয়দ্দূরে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা পূর্ণ করা হয়, তৎপরে সেই চৌবাচ্চার জল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার নলের ভিতর দিয়ে একটি নিম্নতর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে এই পাইপস্থ জলের চাপের (pressure) দ্বারা কল চালিত হয়। বৈদ্যুতিক কারখানার বড়সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালুম যে, আমরা সমস্ত কারখানাটি দেখতে ইচ্ছা করি। সাহেবটি অতীব ভদ্রতাসহকারে তৎক্ষণাৎ সমস্ত দেখবার অনুমতি প্রদান করলেন ও একটি ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীকে আমাদের সঙ্গে থেকে সমস্ত দেখাবার জন্য আদেশ করলেন। জলপ্রপাতের শক্তিদ্বারা চালিত বৈদ্যুতিক কারখানা, শুনলাম, এইটি ছাড়া নাকি সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। বৈদ্যুতিক কারখানাটী ভাল করে' দেখা শেষ হ'লে আমরা সাহেবটিকে ধন্যবাদ দিয়ে কারখানার নিকটবর্ত্তী কাবেরীর সেই ভুবনবিখ্যাত জলপ্রপাতটি দেখতে যাত্রা করলাম। অল্পসময়ের মধ্যেই এক অপূর্ব্ব ঝর ঝর শব্দ আমাদিগকে জানিয়ে দিলে যে, আমরা প্রপাতের সমীপবর্ত্তী হয়েছি। কিয়দ্দূর গিয়েই আমাদিগকে ঝিট্‌কা হ'তে নামতে হ'ল, কেননা সে বনপথের মধ্যে গাড়ি চলবার আর রাস্তা ছিল না। অল্পদূর অগ্রসর হয়েই আমরা বনান্তরাল হতে বেরুলাম। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি সেই বিশাল জলপ্রপাত অকস্মাৎ আমাদিগের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হ'ল। দেখলাম, কাবেরী এইখানে দ্বিধাভিন্ন হয়ে দুইটি প্রপাত সৃষ্টি করেছে। জলপ্রপাতের সেই মহান গর্জ্জন, অতিশুভ্র-সফেন জলরাশি, উৎক্ষিপ্ত জলকণা ও নির্জ্জন নিবিড়ারণ্যময় শীকরশীতল সেই পর্ব্বতটি, আমাদের চক্ষে স্বপ্নরাজ্যের এক অত্যদ্ভুত দৃশ্যের ন্যায় প্রতিভাত হ'ল। আমরা মুগ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হ'য়ে রইলাম, এমন দৃশ্য পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই। ফেনময়ী কাবেরী উদ্দামযৌবনা হয়ে

চতুর্দ্দিকস্থ নিবিড় অরণ্যটি এই বিশাল জলপ্রপাতের অতুলনীয় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত করেছে। প্রপাতনিঃসৃত জলবিন্দু, বাষ্পাকারে উত্থিত হয়ে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলিকে মধ্যে মধ্যে যেন একটি ক্ষীণ অবগুণ্ঠনাবৃত করে ফেলে। মনে হয়, বিধাতা যেন কোন বিস্মৃত কবির কল্পনাবহুল কাব্যকে আকার দিয়ে এইখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রপাতদ্বয়ের বিচিত্রসৌন্দর্য্য সত্যসত্যই বর্ণনাতীত। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখলাম, এবং আরও দেখবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনে ফিরলাম। শুনলাম, এই প্রপাতদ্বয় প্রত্যেকটি ২০০ ফুট উঁচু। বন্ধুবরের নিকট হতে প্রজাপতিনন্দিনী কাবেরীর মাহাত্ম্যবর্ণন শুনতে শুনতে আমরা সন্ধ্যার মধ্যে মাড্ডারষ্টেশনে পৌঁছলাম। উত্তরভারতে যেমন গঙ্গা, দক্ষিণভারতে তেমনি কাবেরী পূতসলিলা ও সর্ব্বপাপ-সংহারিণী বলে' পূজিতা। কাবেরীর অন্যতম নাম দক্ষিণগঙ্গা। কাবেরী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে আমার এই তর্কপ্রিয় স্বদেশ-প্রেমিক বন্ধুটি ভাগীরথী অপেক্ষা কাবেরীর শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণের শ্লোকাদি উদ্ধৃত করে' একটি তর্ক বাধাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা-কমণ্ডলু-নিঃসৃতা, বিষ্ণু-পাদার্ঘ-সম্ভূতা, মহেশ্বর-জটা-বিহারিণী গঙ্গা যে কাবেরী অপেক্ষা পবিত্রতায় কোন অংশে ন্যূন এ কথাটা স্বীকার করবার আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্কন্দপুরাণে নিজের কোন দখল না থাকায় এবং সমস্ত দিনের পরিভ্রমণের পর তর্ক করতে একান্ত বীতস্পৃহ হওয়ায়, কোনরূপ গোলযোগ না করে' কাবেরীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নিলাম। যাহোক, রাত্রে ষ্টেশনে ফিরে এসে স্নান ও আহারাদি করে আমরা স্নিগ্ধ হলাম। কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে বন্ধুবরকে এখান হ'তে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যেতে হ'ল। আমি রাত্রের ট্রেনে একাকী মহীশূর যাত্রা করলাম। বন্ধুবরের কোন বিশেষ

আত্মীয় মহীশূরসহরে রাজসরকারে এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁকে আমাদের মহীশূর পৌঁছবার নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময় জানিয়ে বন্ধুবর পূর্ব্বে পত্র লিখেছিলেন।

পরদিন প্রাতে মহীশূরে পৌঁছিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোকটি আমাদের জন্য তাঁর একখানি গাড়ি ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ষ্টেশন হ'তে তাঁর বাড়ি পৌঁছিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ সন্তুষ্ট হ'লাম। ভদ্রলোকটি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় হ'লেও, বেশ মিশুক বলে, আমি যে-কয়দিন তাঁর ওখানে ছিলাম, সঙ্গী অভাবে সে কয়দিন কোনরূপ অসুবিধা বোধ করি নাই।

প্রাতে কফি পানান্তে রাজবাড়ির একখানি গাড়ি করে' আমরা সহরভ্রমণে বেরুলাম। শুনলাম, এখানে ব্যাঙ্গালোরের মত ভাড়া-গাড়ি পাওয়া যায় না। মহীশূরসহরটা ব্যাঙ্গালোর অপেক্ষা অনেক ছোট; এখানকার লোকসংখ্যাও, শুনলাম, ব্যাঙ্গালোর অপেক্ষা কম। পূর্ব্বে মহীশূরসহরটা নাকি অত্যন্ত হীন ছিল, ইহার যা-কিছু উন্নতি, সমস্তই সম্প্রতি হয়েছে। ভূতপূর্ব্ব মহারাজের নামে সহরের নূতন অংশের নামকরণ হয়েছে—শ্যামরাজপুরা। মহীশূরসহরটি ব্যাঙ্গালোরের মত সুশ্রী না হ'লেও সম্প্রতি কতকগুলি প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় সহরের সৌন্দর্য্যটা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সহরের দক্ষিণে অত্যুন্নত চামুণ্ডিপাহাড়টি বড়ই সুন্দর ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড়টি শুনলাম ৩৫০০ ফুট উঁচু। উহার শিখরদেশে রক্তলোলুপা চামুণ্ডাদেবীর একটি বহুপ্রাচীন মন্দির আছে। শুনলাম, এই স্থানে পূর্ব্বে নরবলি হ'ত। মহাবীর হায়দার নাকি তাঁহার শাসনকালে এই বীভৎস প্রথাটি রহিত করে দেন। এই পাহাড়টির শিখরদেশে উঠ্‌বার জন্য প্রস্তরখোদিত বরাবর একটি সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ির অর্দ্ধপথের

অতীব প্রকাণ্ড, প্রায় ১৬৷১৭ ফুট উঁচু হবে। আমার সঙ্গের ভদ্রলোকটির নিকট শুনলাম, এই ষণ্ডটি শিব-বাহন নন্দীর মূর্ত্তি। নন্দী যে ভগবান্ মহেশ্বরের বাহন এই খবরটা পূর্ব্বে আমার জানা ছিল না। কালিদাসবর্ণিত যোগারূঢ় বৃষভধ্বজের লতাগৃহরক্ষক হেমবেত্রহস্ত মহাশক্তিশালী নন্দীর কথা মনে পড়ল—দেশ, কাল ও পাত্রের কঠোর শাসনে বেচারাকে মহীশূরে ঘণ্টা-পরা ষাঁড় হ'তে হয়েছে দেখে একটু কষ্ট বোধ হ'ল। পুরাণাদিতে নিজের কোন দখল না থাকায় ও বিষয় উচ্চবাচ্য করতে সাহস হল না। ভদ্রলোকটি আমাকে বুঝালেন যে, এই ষণ্ডমূর্ত্তিটিতে নাকি ভাস্করবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করা হয়েছে। মূর্ত্তিটি খুব প্রকাণ্ড ও উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মোটামুটি বেশ মানানসই হ'লেও, কোথায় যে ভাস্করবিদ্যার বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে, সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হ'বে, সেটা আমি ভাল বুঝতে পারি নাই। শুনলাম, ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের কোন স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুরাজার সময়ে উহা নির্ম্মিত হয়। আমরা চামুণ্ডিপর্ব্বতের উপর উঠে মন্দিরাদি দেখ্‌লাম। পর্ব্বতের উপর হ'তে সমস্ত মহীশূরসহরটির দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আমরা সেখান হ'তে বাড়ি ফিরে স্নানাহার শেষ করলাম। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করে অপরাহ্ণে আমরা মহারাজের অশ্বশালা ও গোশালা দেখতে গেলাম। আমরা অশ্বশালায় উপস্থিত হ'লে তথাকার মহীশূরদেশীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অতীব ভদ্রতাসহকারে আমাদের সঙ্গে থেকে ঘোড়াগুলি দেখাতে লাগলেন। চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক ঘোড়ার আস্তাবল মাঝখানে অতি প্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণ। প্রত্যেক ঘরের দরজার উপর ঘোড়ার নাম, উহার দৈনিক দানার পরিমাণ ইত্যাদি একখানি কার্ডে লেখা আছে। আস্তাবলও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহারাজের পোলো-পনিগুলি বড়

নাই। আস্তাবলের সর্ব্বশেষ ঘরের অতি ক্ষুদ্র ঘোড়াটির নাম Dot অর্থাৎ তিনি যেন আস্তাবলের শেষসীমার Fullstop-রূপে বিরাজিত। ঘোড়াটা এত ছোট যে দেখ্‌লে হাসি পায়। শুন্‌লাম ইনি নাকি মহারাজের বড় প্রিয়। অধিকাংশ ঘোড়াই Waler ও Australian তাছাড়া অনেকগুলি Arab ও আছে। কতকগুলি অতি সুশ্রী মহীশূর Bred ঘোড়াও দেখলাম। কিউনিগলনামক স্থানে মহীশূরগভর্ণমেণ্টের ঘোড়া Breed করবার একটি আড্ডা আছে। শুন্‌লাম, এগুলি সেখানকার ঘোড়া। মহারাজের এই আস্তাবলটি একজন দেশীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধারণে থাকলেও এত সুন্দররূপে রক্ষিত যে, উহার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তত্ত্বাবধারক ইংরাজ না হ'লে ভালরূপ আস্তাবলের তত্ত্বাবধারণ হয় না, বঙ্গদেশের যে সমস্ত রাজামহারাজাদের এই দুশ্চিকিৎস্য ধারণা আছে, মহীশূরপতির এই আস্তাবলটি দেখলে তাঁহাদের মতের অনেকটা স্বাস্থ্যকর পরিবর্ত্তন ঘটে ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। আস্তাবলের পরই গাড়ির ঘর। আধুনিক সেল্‌ফ্‌ড্রাইভিং রবারটায়ার দুচাকার গাড়ি হ'তে আরম্ভ ক'রে পৌরাণিক অতি প্রকাণ্ড ছয় চাকার হাতীর গাড়ি পর্য্যন্ত নানারকমের অনেকগুলি গাড়ি রয়েছে, ভিক্টোরিয়া ও ল্যাণ্ডোর সংখ্যাই অধিক। হাতীর গাড়িটি এত প্রকাণ্ড যে, একটি হাতীতে উহা টানতে পারে না। উহার ছাতের উপরে বেশ একটি ছোটখাট মজলিস বসিতে পারে। ঘোড়ায় টানা মহারাজের ষ্টেট্‌-ক্যারেজটি বড় সুন্দর। পার্শ্বেই সাজের ঘর ষ্টেট্‌ক্যারেজের ঘোড়ার সোণাবসান, কিংখাপমণ্ডিত সাজগুলি দেখলাম—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রুচির এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি। সাজের ঘরের কিছু দূরেই মহারাজের মোটরকারের আস্তাবল। শুনলাম, বর্ত্তমান মহারাজা নিজে নাকি একজন ভারি Motorist। সেখান

একটি দেখ্‌বার জিনিষ। মহীশূরে যেরকম গরুর Breed হয়, সমস্ত ভারতবর্ষে আর কোথাও সে রকম হয় কিনা সন্দেহ। মহীশূরে 'অমৃত্‌ মহল' breed গরুগুলির খ্যাতি ভারতের ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এই বলদগুলি এরূপ বলিষ্ঠ, ক্ষিপ্রগামী ও শ্রমসহিষ্ণু যে, মহীশূর-শার্দ্দূল হায়দার যুদ্ধের সময় কামানাদি টানবার ও মোট বইবার জন্য এদের নিযুক্ত করেই নাকি এত দুর্জ্জেয় হয়েছিলেন। এদের সাহায্যেই তিনি আড়াই দিনে একশত মাইল মার্চ্চ করে চিদামভরমে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। বিপক্ষের নিকট পরাজিত হলেও তাদের সম্মুখ হ'তে হায়দার নিজের কামানাদি এই বলদের সাহায্যেই অতিদ্রুত সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হ'তেন। বোনাপার্ট-বৈরী ওয়েলিংটন যে ক্ষিপ্রগামিতা দেখায়ে য়ুরোপীয় রণবিশারদগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করেছিলেন, তাহাও নাকি এই মহীশূরীয় অমৃত্‌মহল-বলদের কল্যাণে। Marshal Soult এর বিপক্ষে স্পেনে যুদ্ধ করবার সময় এই বলদের অভাব যে তিনি পদে-পদে অনুভব করতেন. তার উল্লেখ তাঁর তৎসময়ের চিঠিপত্রাদিতে দেখতে পাওয়া যায়। এই অমৃত্‌মহল-গরুগুলির বিশেষত্ব তাহাদের আকার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সন্ধ্যার সময় আমরা বাড়ি ফিরলাম। মহীশূর-সহরে এখনও বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত হয় নাই। শুন্‌লাম কাবেরীজলপ্রপাতের electric works হতে তড়িৎ আনায়ে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তার মত এখানেও শীঘ্র বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হ'বে। বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে সেই ভদ্রলোকটির নিকট হায়দার ও টিপু সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনতে লাগলাম। ভদ্রলোকটি দেখিলাম বেশ বাগ্মিয় ও তিনি একটি ছোটখাট প্রত্নতত্ত্ববিৎও বটেন। কোথায় কবে কি ঐতিহাসিক পাথরের টুকরা খুঁড়ে পাওয়া গেছে, কোন ভাঙ্গা

হয়েও কিজন্য গোঁফদাড়ি আর ভ্রূ ও চক্ষের পাতার লোম পর্য্যন্ত ক্ষৌরী করতেন ইত্যাদি নানাবিষয়ে দেখিলাম তাঁর যথেষ্ট অনুসন্ধান আছে এবং সে সম্বন্ধে নানাবিধ সম্ভব ও অসম্ভব গবেষণারও অভাব নাই। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে প্রত্নতত্ত্বে আমার কোনরূপ দখল না থাকায় তাঁহার মতগুলি আমার বড় ভাল লাগতে লাগল। ভদ্রলোকটি বর্ত্তমান মহীশূররাজ্যটাকে মহাভারতোল্লিখিত বভ্রুবাহনের দেশ বলিয়া প্রমাণ করতে বিশেষ ব্যস্ত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া যে এই মহীশূররাজ্যে এসেছিল, তার নাকি যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অনেকে যে পূর্ব্ববাঙ্গলার মণিপুররাজ্যটাকে বভ্রুবাহনের দেশ বলে থাকেন, তার বিপক্ষেও দেখলাম ভদ্রলোকটি নানারূপ প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। অশ্বমেধের ঘোড়াটি উন্মুক্ত হয়ে যে দক্ষিণদিকে গিয়েছিল এবং ফিরবার সময় উত্তরদিক দিয়ে ফিরেছিল মহাভারতে নাকি তার উল্লেখ আছে। সুতরাং বঙ্গদেশ অপেক্ষা মহীশূররাজ্যটাকেই বভ্রুবাহনের দেশ বলা তাঁর মতে অধিক সঙ্গত। মহাভারতের সভাপর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞোপলক্ষে সহদেবের মহিষমতি দেশে নীলরাজের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ আছে। সেই মহিষমতিই যে বর্ত্তমান মহীশূররাজ্য এই ভদ্রলোকটি তাহাও নাকি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া রামায়ণোল্লিখিত পম্পানদী তাঁর মতে মহীশূরের তুঙ্গভদ্রা এবং মহীশূরের কাদুর ডিষ্ট্রীক্টে তুঙ্গভদ্রার তীরেই যে কপিবর সুগ্রীবের সহিত সীতাবিরহকাতর ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, ইহাও ভদ্রলোকটির স্থির বিশ্বাস।

মহারাজের প্রাসাদ দেখতে গেলাম। প্রাসাদটি পুরাতন কেল্লার মধ্যে অবস্থিত। প্রাসাদগমনকালীন দেখলাম, প্রভাতে নগরের হিন্দু-পল্লিগুলি বড় সুন্দরভাব ধারণ করে। প্রতিগৃহে পবিত্রবসনা সুন্দরীরা

মঙ্গলালেপন করতে ব্যস্ত। সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলি শ্বেত আলেপন-লেপিত হয়ে এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। প্রত্যেক গৃহদ্বার মঙ্গলসূচক চূতপত্রে শোভিত হয়। মনে হয় যেন নগরলক্ষ্মীর বহুদিবসাকাঙ্ক্ষিত শুভাগমন-দিনে সমস্ত পল্লিটি মঙ্গলচিহ্ন ধারণ করেছে। আমরা প্রাসাদে উপস্থিত হ'লে একটি মহীশূরদেশীয় কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে করে প্রাসাদটি দেখাতে লাগলেন। প্রাসাদের সম্মুখভাগটা শুনলাম ১৮৯৭ সালে আগুন লেগে নষ্ট হয়ে গিয়াছিল। উহা এখন পুনর্নির্ম্মিত হচ্ছে। এই প্রাসাদটিতে বিলাতী অনুকরণের নামগন্ধও নাই। প্রাসাদটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। ইহার ভিতর পাথরের ও কাঠের খোদাই কাজের ছড়াছড়ি। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি প্রস্তরে ও কাষ্ঠে খোদিত হয়ে (in relief) দরজার মাথায় খিলানের উপর সর্ব্বত্রই বিরাজ করছে। মূর্ত্তিগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি এত সুন্দর ও মানানসই যে, তথাকার ভাস্করবিদ্যার নিপুণতার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কাঠের উপর এত ভাল খোদাই-কার্য্য আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। প্রাসাদটি দেখে বিশেষ প্রীত হলাম। মহারাজা তখন সেখানে ছিলেন বলে কতকটা অংশ দেখতে পেলাম না। প্রাসাদের চারিদিকে কিন্তু কোন compound না থাকায় উহার সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট হয়েছে। সেখান হতে আমরা 'জগন্মোহন মহল' নামক মহারাজের অপর একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখতে গেলাম। মহারাজ মধ্যে মধ্যে এখানেও বাস করেন। এই প্রাসাদটি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। তবে এইমাত্র উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রাসাদের উপরের তলের ঘরের দেওয়ালের paintingগুলির মত হাস্যজনক painting আমি কখনও দেখি নাই। একটি ছবিতে মহারাজের ব্যাঘ্রশিকার চিত্রিত হয়েছে—ছবিটাতে হাতী, মানুষ, বাঘ, সবগুলার

পটের মত। সেখান হতে আমরা পুরাতন resedencyটি দেখতে গেলাম। বাড়িটী বেশ সুশ্রী। শুনলাম, Prince of Wales মহীশূরে এসে এই বাটিতে বাস করেন। দেখলাম, বাড়িটাকে মেরামত করা, রং করা ও সাফকরার একটা হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে। আমার সঙ্গের ভদ্রলোকটি, যুবরাজ আসিয়া কোন্ খাটে শয়ন করিবেন, কোন্ আয়নায় মুখ দেখবেন ও কোন আল্‌নায় টুপি রাখবেন ইত্যাদি আমাকে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে দেখাতে লাগলেন; আমিও দেখে কৃতার্থ হলাম। এই বাড়িটির পশ্চিমদিকে আর একটি ছোট বাড়ি আছে সেটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, সেটি Duke of Wellington (তখন General Wellesly) নির্ম্মাণ করায়েছিলেন ও কিছুদিন সেই বাটিতে বাস করেছিলেন। ওয়েলিংটনের পুণ্যপদরেণুতে পবিত্রীকৃত সেই মহীশূর-সহরে অবস্থিত বলে, আমার সঙ্গের ভদ্রলোকটি দেখলাম তাঁর স্বদেশকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করেন। তাছাড়া ওয়াটারলুর যুদ্ধের পূর্ব্বে ওয়েলিংটন যে এই পর্ব্বতবন্ধুর মহীশূর দেশে যুদ্ধবিগ্রহ করেই রণবিশারদ হয়েছিলেন, তাঁর মতে ইহাও নাকি মহীশূরের সামান্য গৌরবের কথা নহে। যা হোক্ তাঁর নিকট মহীশূরের এই অপূর্ব্ব গৌরবকাহিনী শুনতে শুনতে বাড়ি ফিরিলাম নূতন একটি রাস্তার মোড়ে ভূতপূর্ব্ব মহারাজের ঘোড়ায়চড়া একটি বিলাতি Statue দেখলাম। Statueটি দেখিতে এত খারাপ যে, উহা দেখে হাস্যসম্বরণ করা কঠিন। শুনলাম, শীঘ্রই উহা উঠায়ে ফেলা হবে।

পরদিন আমরা শ্রীরঙ্গপত্তন (Seringapatam) দেখতে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। মহীশূরসহর হতে শ্রীরঙ্গপত্তন ৯।১০ মাইলের অধিক নয় বলে, আমারা বরাবর ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া ঠিক করলাম। প্রাতে কফিপানান্তে আমরা রাজবাটির একখানি গাড়ি করে শ্রীরঙ্গপত্তন যাত্রা

রক্ষিত। সহর ছাড়ালেই চতুর্দ্দিকে 'রাগি' ক্ষেত। 'রাগি' মহীশূরের প্রধান শস্য। শুনলাম, চা'ল অপেক্ষা রাগি অনেক পুষ্টিকর ও বলকারক। অনেকের মতে মহীশূরদেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 'রাগি' ভক্ষণ করে বলেই নাকি উহারা বিশেষ কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ আমার সঙ্গীটি রাগিসম্বন্ধেও নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন। মহীশূরে রাগিশস্য না থাকলে হায়দার নাকি কিছুতেই অত দুর্দ্ধর্ষ হ'তে পারতেন না। রাগি প্রথমতঃ বিশেষ বলকারক, দ্বিতীয়তঃ উহাকে যেখানে-সেখানে পুতে রাখা যায়, এমন কি, মৃত্তিকাতলে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত অযত্নে থাকলেও উহা নষ্ট হয় না। হায়দার নাকি সর্ব্বত্রই মৃত্তিকাতলে এইরূপ গুপ্তরসদের সঞ্চয় রাখতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় রসদসরবরাহের এমন সুন্দর ব্যবস্থা করতেন যে, শত্রুপক্ষের নিকট উহা প্রহেলিকার মত বোধ হ'ত। আমরা ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে কাবেরীর প্রাচীন পুল পার হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনে পৌঁছিলাম। কাবেরী নদী শ্রীরঙ্গপত্তনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। যে যে স্থানে কাবেরী এইরূপ দ্বীপ সৃষ্টি করছে, সেই সেই স্থান পুণ্যতীর্থ বলে প্রসিদ্ধ। রামানুজাচার্য্য এই শ্রীরঙ্গপত্তনেই নাকি তাঁর ধর্ম্মগ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। টিপু-নির্ম্মিত শ্রীরঙ্গপত্তনের ঐতিহাসিক কেল্লাটি সমস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত ও অতীব প্রকাণ্ড। ইহার দুইদিক কাবেরীর দ্বারা বেষ্টিত। অনেক য়ুরোপীয় রণবিশারদদিগের মতে এই কেল্লাটি দুর্ভেদ্যতায় ভারতের অন্যান্য কেল্লা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেল্লাটি এখন ব্যবহৃত না হলেও গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয়েছে। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটি এই কেল্লার মধ্যে অবস্থিত। হিন্দুদ্বেষী টিপু কেন যে, এই মন্দিরটি ধ্বংস করেন নাই, তা বলা কঠিন। এদেশে এসম্বন্ধে অনেক অসম্ভব গল্প প্রচলিত আছে। হায়দার

পাছে মোল্লাগণ ও তাঁর মুসলমান অনুচরগণ রুষ্ট হয়, এজন্য তিনি প্রকাশ্যে পূজাদি না করে গোপনে পূজা করতেন এবং তিনিই নাকি টিপুকে এই মন্দিরটি নষ্ট করতে বিশেষরূপ নিষেধ করে যান। এই কেল্লার ভিতর মাটির নীচে অন্ধকারময় কতকগুলি ঘর আছে। শুনলাম, টিপুর সময় ইংরাজবন্দিগণকে এইস্থানে কারারুদ্ধ রাখা হ'ত। যুদ্ধের সময় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে এই কেল্লার ভিতর টিপুর মৃত্যু হয়। যে স্থানে টিপুর পতন হয় এবং নাতিগভীর কাবেরী পদব্রজে পার হয়ে যে স্থান ভেদ করে General Baird এই দুর্গে প্রবেশ করেন, সে সকল দেখে আমরা টিপুর 'দরিয়া দৌলত বাগ' দেখতে গেলাম। এটি টিপুসুলতানের গ্রীষ্মনিবাস ছিল। নামটি খুব জাঁকাল হলেও এই গ্রীষ্মনিবাসটি যে খুব বড় তাহা নহে। দেখলাম, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক ইহাও খুব যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত। চতুর্দ্দিকে দেয়ালের চাকচিক্যময় paintingগুলি পুরাদস্তুর প্রাচ্যরুচির পরিচায়ক। হায়দার-কর্ত্তৃক Colonel Baillee পরাজয়ের ছবি সম্মুখের দেয়ালটাতে চিত্রিত হয়েছে। ছবিটা দেখলে আমাদের দেশের দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রের কথা মনে পড়ে। এই চিত্রের এক স্থানে একটি শূকরমূর্ত্তি চিত্রিত দেখলাম। ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করায় নিজামকে উদ্দেশ্য করেই নাকি এই অপবিত্র জীবটি কল্পিত হয়েছে। আমরা সেখান হতে সহরের ভিতর দিয়ে হায়দারের কবর দেখতে গেলাম। কেল্লা হতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে উহা অবস্থিত। টিপুসুলতানের সময় শ্রীরঙ্গপত্তন একটি প্রকাণ্ড এবং বর্দ্ধিষ্ণু সহর ছিল। প্রায় দেড়লক্ষ লোকের বাস ছিল। এখন উহা হতশ্রী এবং ধ্বংসপথে অগ্রসর। পথে বেশী লোকজন নাই। এখন সহরের যা কিছু সম্পত্তি—খোলা দিয়ে ছাওয়া সামান্য কতকগুলা একতলা বাড়ী।

বেমেরামতে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সমস্ত সহরে দশ বার হাজারের বেশী লোক হবে না। সহরটিকে দেখলেই মনে হয়, যেন উহা কোন দেবতার নিদারুণ অভিশাপে লুপ্তশ্রী হয়েছে।

আমরা সেই tombএর নিকটবর্ত্তী উপস্থিত হ'লে একটি মুসলমান গাইড্ আমাদিগকে সঙ্গে করে লয়ে চলিল। ভিতরে প্রবেশ করবার সময় বাহিরে জুতা রেখে যেতে হয়। এই tombএর সংলগ্ন বাগানটি দেখলাম, বেশ সুন্দররূপে রক্ষিত। গম্বুজ ও চূড়াদি বিশিষ্ট একটি ইমারতের ভিতর কবর স্থাপিত। হস্তিদন্তনির্ম্মিত একটি দরজা খুলে প্রদর্শকটি আমাদিগকে ভিতরে লয়ে গেল। দেখলাম, পাশাপাশি তিনটি কবর রয়েছে। শুনলাম, হায়দার, টিপু ও তাঁর মাতা এইখানে শায়িত। কবরতিনটি দেখে মনে যেন কেমন একটা ভাবের উদয় হ'ল। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাগুলি যেন মনশ্চক্ষে দেখতে লাগলাম। অসংখ্য ষড়যন্ত্রকারী, অমানুষিক উদ্যমশীল, দুর্দ্ধর্ষ হায়দার যিনি কুমারিকা হতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত স্বীয় বাহুবলে আলোড়িত করেছিলেন, আবাল্য যাঁর জীবন অশান্ত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যয়িত হইয়া মাতৃভাষার অক্ষরপরিচয়েরও অবসর পায় নাই, তাঁর এই চিরশান্তিময় নিদ্রা আমার নিকট যেন অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হ'তে লাগল। আমাদের প্রদর্শকটি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে আমাদিগকে দেখায়ে দিল 'ইনি হায়দার আর ইনি সুলতান টিপু'। এই সামান্য উদ্যানরক্ষক যখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে তুচ্ছদ্রব্যের মত দেখাইল যে, এ একটি সাম্রাজ্য গড়েছে আর এ একটি সাম্রাজ্য ভেঙ্গেছে, তখন 'Death is a mighty leveller' কথাটার সার্থকতা যেন তীব্রভাবে অনুভব করলাম। এই বাগানের মধ্যেই শুনলাম, টিপুসুলতানের প্রাসাদ ছিল। এখন তার চিহ্নমাত্র নাই।

একটি বাড়ীতে পূর্ব্ব হতে আমাদের জন্য আহারাদির বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছিল। আমরা সেখানে আহারাদি করে বিশ্রাম করতে লাগলাম। শুনলাম, এ বাড়ীতে মহারাজা কখন এসে বাস করেন না। শ্রীরঙ্গপত্তনের জলবায়ু এত অস্বাস্থ্যকর ও এখানে ম্যালেরিয়ার এত প্রাদুর্ভাব যে, নিরাপদে এখানে দুএকদিন বাস করাও অসম্ভব। টিপুর মৃত্যুর পর সহরটি হতশ্রী হওয়ার ম্যালেরিয়াও একটি অন্যতম কারণ। বিশ্রামান্তে আমরা মহীশূরে ফিরলাম—রাত ৮ টার মধ্যে বাড়ী পৌঁছিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত আলস্য বোধ হতে লাগল সুতরাং বাড়ী হতে আর কোথাও বাহির হলাম না। মহীশূরদেশীয় আচার-ব্যবহারসম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প শুনে সকালটা কাটালাম। শুনিলাম, মহীশূরব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনটি প্রধান সম্প্রদায় আছে—স্মার্ত্ত, মাধব ও শ্রীবৈষ্ণব। সমস্ত ব্রাহ্মণই এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন-না-কোন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত। শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য এই তিন মহাপুরুষ এই তিন সম্প্রদায়ের আদিগুরু। এই সম্প্রদায়-ত্রয়ের মধ্যে পরস্পরে বিবাহাদি প্রচলন নাই। গোঁড়ারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত অনেক সময় স্বগোত্র হইলেও, এমন কি, একত্রে আহারাদি করিতেও আপত্তি করেন। এঁদের পরস্পরের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অহঙ্কার ও তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করবার তীব্র বাসনা আমার নিকট বেশ কৌতুককর বোধ হ'ত। এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে শুনলাম শ্রীবৈষ্ণবদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা কম এবং তাঁদের জাত্যভিমান দেখলাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই শ্রীবৈষ্ণবরাই মহীশূরী আয়েঙ্গার নামে পরিচিত। ইঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর উপাসক। স্মার্ত্তব্রাহ্মণেরা শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদী। এঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সকলেরই উপাসক বটেন, তবে মহেশ্বরের

দিকে কিছু অধিক টান বলে এঁদের শৈব বলা যেতে পারে। এঁদের সংখ্যাই শুনলাম মহীশূরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাডুর ডিষ্ট্রিক্টে তুঙ্গনদীর তীরে শৃঙ্গেরীগ্রামে এই স্মার্ত্তব্রাহ্মণদিগের প্রধান গুরুর মঠ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নাকি কাশ্মীর হ'তে এক সরস্বতীমূর্ত্তি আনিয়া এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন হতেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই মঠাধিকারী মোহান্তগণ স্মার্ত্তব্রাহ্মণদিগের প্রধান গুরু বলে পরিচিত হয়ে আসছেন। বর্ত্তমান শৃঙ্গেরীস্বামী শঙ্কর হতে গণনা করে ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) স্বামী। শুনলাম ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। এই মঠের ষ্টেটটির বাৎসরিক আয় প্রায় ৬৫ হাজার টাকা। তাছাড়া শৃঙ্গেরীস্বামীরা প্রায়ই চাঁদা আদায়ের জন্য বহুদিনব্যাপী tourএ বহির্গত হন এবং তদ্দ্বারাও যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করেন। এই প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েও শৃঙ্গেরীস্বামীরা নাকি সত্যসত্যই পরম পবিত্র স্বভাব ও পণ্ডিত। সমস্ত অর্থই শুনলাম ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত হয়। এই স্মার্ত্তব্রাহ্মণদিগের মতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শৃঙ্গেরী গ্রামেই দেহত্যাগ করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শঙ্কর হিমালয়পর্ব্বতে কেদারনাথে দেহত্যাগ করেন, আমার নিকট এ কথা শুনে এখানে অনেকে আশ্চর্য্য হয়েছিলেন এবং গোঁড়ারা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে সম্মানসূচক হস্তীমূর্খ উপাধি দিয়া নানারূপ গালি পাড়িতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মাধবসম্প্রদায় শুনলাম দ্বৈত ও বিষ্ণু উপাসক।

মহীশূরে দর্শনীয় কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির আছে। তন্মধ্যে সোমনাথপুর, হালাবিড ও বেলুরের মন্দিরই প্রধান। তাছাড়া শ্রাবনবেলগোলাতে জৈন-নির্ম্মিত গোমতেশ্বরের প্রায় ৬০ ফুট উঁচু প্রস্তরখোদিত এক অতিকায় Statue আছে, উহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য। মন্দিরগুলিতে কারুকার্য্য ও ভাস্করবিদ্যার নাকি চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। ফার্গুশনসাহেব অসমাপ্ত হালেবিডমন্দিরটির যেরূপ শতমুখে প্রশংসা করেছেন, তাতে আমার মন্দিরগুলি সমস্ত দেখবার বিশেষ ইচ্ছা জন্মেছিল, কিন্তু সময়াভাবে সমস্ত দেখা ঘটে উঠে নাই। মন্দিরগুলির মধ্যে কোনটাই রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে নহে। হিসাব করে দেখলাম সবগুলি দেখতে হলে ১০।১১ দিন সময়

লাগবে ও প্রায় ২৫০ মাইল গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে এদেশি গরুর গাড়ীতে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে; সুতরাং সে বাসনা ত্যাগ করলাম। সোমনাথপুরের মন্দির নঞ্জনগুড্ ষ্টেশন হ'তে ২১৷২২ মাইলের অধিক হবে না শুনে উহা দেখবার বন্দোবস্ত করলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে একটি mixed trainএ একাকী নঞ্জনগুড্ যাত্রা করলাম। বেলা ৮ টার মধ্যে সেখানে পৌঁছিলাম। পূর্ব্ব হ'ত ঝিটকার বন্দোবস্ত ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সোমনাথপুরে যাত্রা করলাম। প্রায় ১১ টার সময় কাবেরী পার হ'য়ে সোসিলগ্রামে পৌঁছিলাম। এখানে কাবেরীর উপর কোন পুল নাই, এবং প্রস্তরময়, ক্ষীণ, অগভীর কাবেরীতে এখানে নৌকা চলে না, সুতরাং কিরূপে আমার ঐ পুণ্যতোয়া নদীটি পার হ'তে হয়েছিল তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে বাকি থাকবে না। বেলা ১টার মধ্যে আমি সোমনাথপুরের মন্দিরে পৌঁছিলাম। মন্দিরটি দেখে মোহিত হ'লাম ও ইহা দেখতে আসবার পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের স্বার্থকতা অনুভব করলাম। মেদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের মত প্রকাণ্ড না হলেও এত সুন্দর ও অসংখ্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট মন্দির পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই। পাথরে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য কি করে' যে সম্ভব হয়েছে তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারি নাই। মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবতের ঘটনাগুলি পরে পরে চতুর্দ্দিকে খোদিত। মন্দিরটি কতকগুলা খোদাই করা পুরাণের সমষ্টি বল্লেও হয়। উহার কারুকার্য্য বর্ণনা করিয়া বুঝাতে চেষ্টা করা নিষ্ফল। এ মন্দিরটি দেখলেই ইহাকে সমগ্র হিন্দুজাতির একটি গৌরবের জিনিষ বলে মনে হয়। মন্দিরটা ৩ ভাগে বিভক্ত। মধ্য স্থানে শুনলাম শন্নকেশব অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ অংশে জনার্দ্দন ও গোপাল অবস্থিত। শুনা যায় মন্দিরটি সাত কি আট শত বৎসর পূর্ব্বে মহীশূরীয় হয়সালা রাজাদের আমলে প্রস্তুত হয়। মন্দির দেখে নঞ্জনগুড্ ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ট্রেণেরও বেশী সময় ছিল না। রাত্রি প্রায় ৯॥ টার সময় মহীশূরে ফিরে এলাম।

শ্রীযতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

শ্মশানকালী।*

আজি মাগো, খুলি রাখ মণিময় হার,
গলে পর নরমুণ্ডমালা।
ভয়ঙ্করী নীল ঘোরা শ্যামাঙ্গিনী কালী
সাজ তুমি কপালকুণ্ডলা!
করে লহ ক্ষিপ্ত অসি ফেলি হেমবাঁশী,
দৈত্য বধি' রক্তপান কর মাগো আসি।
শুভদে, বরদে, শ্যামা, শুভঙ্করী কালী
সন্তানের শিরে তুলি কলঙ্কের ডালি,
কেমনে মা, সহি' আছ এতদিন সুখে—
দানবের পদাঘাত শতশেল বুকে?
তুচ্ছ মোর এ শোণিত দিতেছি হে ঢালি'
আজি মাগো সাজ তুমি শ্মশানের কালী।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

* শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর আবেদনপত্রে প্রকাশ স্বদেশী মোকদ্দমায় শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল সাহার কারাদণ্ডান্তে মুক্তির দিন তাহার অভ্যর্থনার্থ যে সকল বালক ও ভদ্রলোকগণ জেলের ফটকের নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন, মৈমন-সিংহের পুলিশসাহেব তাঁহাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া ১০।১২ জন কনেষ্টেবলের দ্বারা এক একজন নিরস্ত্র বালককে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ইংরেজরাজের কলঙ্কের একশেষ করিয়াছে। তাঁহার আবেদনপত্রের শেষাংশ এই :—"আমাদের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে তন্নিমিত্ত আমি স্বদেশবাসিগণের নিকট আবেদন করিতেছি। প্রার্থনা করি—আমি ব্রাহ্মণ, আমার অপমান হিন্দুসমাজ কখনই সহ্য করিবেন না; প্রার্থনা করি, বাঙ্গালীশিশুদের এই নিষ্ঠুর নির্য্যাতন কখনই বাঙ্গালীরা ভুলিবেন না; প্রার্থনা করি, সমগ্র ভারতের লোক ভারতবাসীর এই লাঞ্ছনা কখনই ক্ষমা করিবেন না; প্রার্থনা করি, তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হইবেন। ভগবান্ আততায়ীর বাহুতে যে শক্তি দিয়াছেন, আত্মরক্ষাকারীর বাহুতে তদপেক্ষা অধিক শক্তি দিয়াছেন। আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া ভগবানের বিধি

সমসাময়িক ভারত।

মুসলমান-বিপক্ষতা।

(১)

ভারত একটা জগৎ বলিলেই হয়। হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত প্রসারিত এই বিশাল প্রায়দ্বীপটিতে, ১২৫টা ভাষা কিংবা উপভাষা প্রচলিত। ত্বকের বর্ণ-বৈচিত্র্যও অসীম। উত্তরে বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণে যতই নামিয়া যাওয়া যায়, ততই লোকের গায়ের রং ঘোর-ঘোর হইয়া আসে, গাঢ় হইয়া আসে, শ্যামল হইয়া আসে, তাম্রবর্ণ হইয়া আসে, ক্রমে প্রায় মধ্য-আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণে পর্য্যবসিত হয়। এখানকার বড় বড় বিশ্বজনিক (cosmopolitan) সহরগুলির জনতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর,—দেখিবে কতপ্রকার মুখশ্রী, জাতিতত্ত্বের হিসাবে কত বিভিন্ন ছাঁচের লোক!—এই সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা দিশাহারা হইয়া যান। তথাপি ইহার মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে;—সেই ঐক্যসূত্রটি এই:—ভারত ব্রাহ্মণ্যপ্রধান দেশ। শ্বেতবর্ণ কোন বৃহৎ মানবকুলের একটি শাখা,—আর্য্যনামীয় কতকগুলি জেতৃজাতি আসিয়া ভারতকে তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রদান করে। ভারতের আদিমবাসীদিগের রক্তের সহিত আর্য্যরক্ত বড় একটা মেশে নাই বটে, কিন্তু উন্নততর সভ্যতা আনয়ন-প্রযুক্ত আর্য্যদিগের প্রভাব উহাদের উপর বিশেষরূপে প্রকটিত হয়। আসলে ভারত আর্য্য নহে। বরং এইরূপ বলিলে ঠিক্ কথা বলা হয়,—ভারতে আর্য্যেরা সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করে।

তাছাড়া, ভারতের জনসংখ্যা হইতে ৬ কোটি মুসলমানকে বাদ

সমাজের বাহিরে অবস্থিত ; বর্ত্তমান সময়ে ভারতে, এই মুসলমান-সমস্যাটি উপস্থিত হইয়াছে। একটা প্রবল জাতীয় স্রোতের টানে সমস্ত দেশের লোক একতার দিকে অগ্রসর হইতেছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত জাতীয় বিদ্বেষ, জাতীয় দলাদলি, এখনি 'ক্রুস-মন্ত্রের চোটে' মুহূর্ত্তের মধ্যেই যে অন্তর্হিত হইবে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু হায়! কে জানিত যে, এই হিন্দুর নবোদিত জাতীয়ভাব হইতেই, মুসলমান-জাতীয়তার উদ্রেক হইবে ; এবং 'খুঁৎখুতে' ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া, মুসলমানদিগের এই জাতীয়ভাব ক্রমে বিদ্বেষ ও বৈরিতায় পরিণত হইবে ? এ সমস্যাটি কি ভিন্নজাতিত্বের সমস্যা ?—না, তাহা নহে। কেননা, ভারতবাসীর স্বত্বাধিকারসমর্থনে, ধনশালী পার্শিরা ত অগ্রণী দলের অগ্রাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পুরাতন বিদ্বেষ পুরাতন অবিশ্বাস ত ছিলই, তাহার উপর হালের 'মনকষাকষি' ও মান-অভিমান,—সর্ব্বোপরি বর্ত্তমানের ক্ষণিক ও আপেক্ষিক স্বার্থাদির ভিন্নদিকে গতি—এই সমস্ত কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের খাত্‌টা আরো বাড়িয়া গিয়াছে ; আমার ধ্রুব বিশ্বাস, রাষ্ট্র সাধারণ-স্বার্থ ও স্থায়ী স্বার্থের অনুভূতি মুসলমানদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠিলে, এই পার্থক্যের খাত্‌টি আপনা-আপনি পূরিয়া আসিবে। সে যাই হোক্—আজিকার দিনে, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে, মুসলমান-প্রতিপক্ষেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উহারা কোন মাঝামাঝি পথে থামে নাই ; উহারা ইংরাজদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আগ্রহের সহিত দুই বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে। পুরাকালের বদ্ধ শত্রু, ১৮৫৮সালের রাষ্ট্রবিপ্লবের স্রষ্টা ও ফলভোগী—সেই মুসলমানেরাই এখন হ্বাইস্‌-রয়ের শরীররক্ষী।

হিন্দুরা যখন স্বত্বাধিকারের দাবীদাওয়া করে, তখন ইংরাজেরা

মুসলমানের তলোয়ার ঝুলিতেছে। এইরূপ ভয়প্রদর্শনেরও আবশ্যক নাই। জাতীয়ভাবে দৃঢ় হইয়া ভারতবাসীরা যখন লণ্ডন ও ভারতে সমকালিক পরীক্ষার দাবী করে, ওষ্ঠ সংকুচিত করিয়া তখন তাহাদিগকে সহজেই বলা হয়ঃ—"প্রথমে আপনাদের মধ্যে তোমরা বোঝাপড়া করিয়া লও, মুসলমানদিগকে তোমাদের মতে আনো"। মুসলমান-প্রতিকূলতা বেশ একটা ওজর হইয়াছে। ঠিক্ জেনো, ইহা হইতে ইংরাজ আপনার কাজ বেশ আদায় করিয়া লইবেন।

সুশিক্ষা পাইয়া যদি কখনো মুসলমানদিগের চোখ্ খুলিয়া যায়, তখন ইংরাজেরা একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিবেন। কেননা, এই মুসলমানেরাই ইংরাজের বল-ভরসা, এই মুসলমানের সান্-বাধানো দৃঢ় রাস্তার উপর দিয়াই ইঙ্গভারতীয় নীতিচক্র সহজে গড়াইয়া যাইতেছে।

অষ্টাদশশতাব্দির প্রারম্ভে, য়ুরোপের ন্যায় এসিয়াতেও, মুসলমানের বিরাট উদ্যমের অবসান হয়। তৎপূর্ব্বে, পৃথিবীর এমন কোন স্থান ছিল না, যেথানে লুণ্ঠন কিংবা দেশজয়সূত্রে তাহারা প্রবেশ লাভ করে নাই। তাহারা চীনদেশেও প্রবেশ করিয়াছিল। একদিন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, ক্যাম্বোজাদেশে একটা জঘন্য মাদুরের উপর কতকগুলি লোক সাষ্টাঙ্গপ্রণত হইয়া "আল্লা হো আল্লা মহম্মদ রসুল্ আল্লা" এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করিতেছে। ভারতের উপর সকলেরই লোভ, তাই দ্বাদশশতাব্দিতে প্রথমে পাঠানকর্তৃক, পরে মোগলকর্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়; মোগলেরা পারস্য ও খোরাসান হইতে আগমন করে এবং উহাদের শাসনাধীনে ভারত অশ্রুতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও গৌরব লাভ করে। মহানুভব আক্‌বর রাজপুত-রাজকুমারীদিগের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন; দেশের লড়াকা সর্দ্দারদিগের

করেন। ইহাই ত বিজ্ঞজনোচিত রাজনীতি,—যে রাজনীতি, দেশীয় লোককে স্বকীয় বৈধ অধিকার প্রদান করে! ইহাই মোগল-সাম্রাজ্যভিত্তির কৌণিক-প্রস্তর ছিল। কিন্তু পরে এই রাজনীতি আর অনুসৃত হইল না। ধর্ম্মান্ধ ধর্ম্মোন্মত্ত আওরংজেব, তাঁহার সমস্ত প্রজাবর্গকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিবেন মনে করিলেন। তিনি বারাণসীতে, পবিত্র শৈলের উপর একটা মস্‌জিদ্ উঠাইলেন; সেই মস্‌জিদ্ এখনো হিন্দুমন্দিরগুলিকে অবমাননা করিতেছে। এই-সব অবিমৃষ্যকারিতার ফল ফলিল। আওরংজেবের পর হইতেই মোগল-রাজ্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল: পরিশেষে রাজপুত ও মারাঠাকর্ত্তৃক মোগলরাজ্য বিধ্বস্ত হইল। য়ুরোপীয়েরা আসিয়া দেখিল, মোগল-সাম্রাজ্য আর নাই, চারিদিকেই স্বাধীন সামন্ত-রাজ্য,—অরাজকতার একশেষ।

এখনকার মুসলমানেরা, মোগল-পাঠানদিগের পতিত ও হৃত-গৌরব বংশধর; অন্ততঃ উহারা মোগল-পাঠানদিগের বংশধর বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। কেননা, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, সেই বিজেতাদের শোণিত আজ কয়জন মুসলমানের ধমনীতে প্রবাহিত? তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। G. Campbell বলেন,—পঞ্চাশ লক্ষ। এই পঞ্চাশলক্ষ মুসলমান মোগল-দরবারের কর্ত্তৃপুরুষ ও রাজ-কর্ম্মচারীদিগের প্রামাণিক বংশধর। অবশিষ্ট পাঁচ কোটি মুসলমান, কিংবা ততোধিক—জাতিতে হিন্দু;—তাহারা তলোয়ারের জোরে স্বার্থের খাতিরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে—স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। এক এক গ্রামে সমস্ত লোকের বলপূর্ব্বক ত্বকচ্ছেদ করা হয়। ভারতের মত দেশে, এইরূপ জোর করিয়া ভিন্নধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেও, উহার মূল ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না—উহা "ভাসা-ভাসা"ভাবেই থাকিয়া যায়। যখন কোন হিন্দু মুসলমানধর্ম্মে

নূতন দেবতাকে সে তালিকাভুক্ত করিয়া লয়। আল্লা কি এমনি পক্ষপাতী যে, বহুপুরাকালের আরাধ্য দেবতাদিগকে তিনি জলাঞ্জলি দিতে বলিবেন, তাহা হইলে যে দেবতাদিগের আক্রোশে পড়িতে হইবে! পঞ্জাবপ্রদেশের ১৮৮১ সালের আদম-সুমারির রিপোর্টে Ibbetson এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—"যে সকল গ্রাম সম্পূর্ণরূপে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী, সেখানেও সিদ্ধপুরুষ ও স্থানীয় দেবতাদের মন্দির এখনো রহিয়াছে; এবং অধিকাংশ লোক এখনো নিয়মমত তাহাদের পূজা-অর্চ্চনা করিয়া থাকে,—যদিও এই পূজা-অর্চ্চনা আজকাল একটু কমিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে মুসলমানরমণীরাই এই পথের পথিক। কোন মুসলমান-জননী যদি শীতলাদেবীর নিকট বলি দিতে অবহেলা করে, তখন তাহার শিশুসন্তানের প্রাণ সংকটাপন্ন হইবে, এইরূপ তাহার ভয় হয়, মুসলমান পুরোহিতদিগের পাশাপাশি ব্রাহ্মণেরাও বিবাহ-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের কাজ করিয়া থাকে। উপধর্ম্মের বিশ্বাসগুলি ঠিক্ সমানই রহিয়া গিয়াছে। একজন রাজকর্ম্মচারী আমার নিকট গল্প করিতেছিলেন,—তিনি একদিন হিসারগ্রামের একটা পান্থশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পান্থশালার মালিকগণ একটা বিগ্রহের গায়ে তৈল মাখাইতেছে এবং একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করিতেছে। তাহাদের এই কার্য্য আমি দেখিতে পাইয়াছি জানিয়া, তাহারা যেন একটু লজ্জিত হইল, এবং আমাকে এইরূপ বলিল:—"শেষবার যখন মোল্লা এখানে আসিয়াছিলেন, এই বিগ্রহটি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ইহাকে সরাইয়া ফেলিতে আদেশ করেন। কিন্তু মোল্লা এখন চলিয়া গিয়াছেন। পাছে এই দেবতা আমাদের কোন অমঙ্গল করেন, সেইজন্য পূর্ব্বকৃত রূঢ় ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমরা এই অনুষ্ঠান করিতেছি।"

জাতি নহে। দেখিতে পাও নাকি, ধার্ম্মিক মুসলমানদিগের ন্যায় কত হিন্দু নিষ্ঠার সহিত, মুসলমানদিগের উৎসব-যাত্রায় সহযাত্রী হইয়া গমন করে এবং মোহরম-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? এ অতি মধুর আচরণ সন্দেহ নাই এবং লোকে যে ধর্ম্মান্ধতার কথা,—বদ্ধমূল বিদ্বেষের কথা বলে, তাহা অত্যন্ত ভুল। কোন গ্রামে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু-মুসলমান বেশ সদ্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। প্রায়ই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়,—শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় এত প্রকার নিষেধ-প্রতিষেধের বিধি আছে যে, হিন্দুর শরীর ও হিন্দুর আবাসগৃহ কেহ স্পর্শ করিতেও সাহস করে না। একটা সামান্য অঙ্গভঙ্গী হইতেও হয়ত এইরূপ কোন একটা গুরুতর বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে! যাহাই হউক, হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে যদি কোন অত্যাচার না করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুর ন্যায় পরধর্ম্ম-সহিষ্ণু জাতি আর দ্বিতীয় নাই।

কিন্তু খাঁটি মুসলমান—ধর্ম্মান্ধ ও ধর্ম্মোন্মত্ত। খাঁটি মুসলমান পছন্দ করিয়া যে সহরে বাস করে, সেখানে অনৈক্যের ভাব স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তাও বলি, এইসব কলহ-বিবাদ যাহা এক এক সময়ে তুমুল কাণ্ডে পরিণত হয়—এ সমস্ত কতকটা 'ঘটাইয়া-তোলা' কৃত্রিম ব্যাপার। নগরবাসী লোকের মধ্যে, মুসলমানেরা একটা বৃহৎ অংশ। বিশেষতঃ ভারতের উত্তরপশ্চিমে, উত্তরে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় উহারা পুঞ্জীভূত। বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে, পঞ্জাবে—মোগল-আমলে যে সকল সহর খুব গুলজার ছিল, যে সকল লস্কর-ছাউনি গড়বদ্ধ ছিল,—সেই আগ্রা, দিল্লি, ও লাহোরে বহুসংখ্যক মুসলমানের বসতি। উহাদের পিতৃপিতামহ সেই সব বাদশাহী সহরে, আমীর-ওমরাওর উচ্চপদের রাজকর্ম্মচারীর কিংবা

ঐ সব স্থানের ধূসর-লোহিত দুর্গ ও শ্বেতমার্ব্বেলের মসজিদাদির সুশোভন গম্বুজ এখনো নীল-গগণ-পটে অঙ্কিত দেখা যায়, কিন্তু এক্ষণে সেই মোগল-বাদশাদিগের ও মোগল-দরবারের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট। যাঁহারা একশতাব্দিকাল ভারতকে সুসমৃদ্ধ ও দীপ্তমহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা এখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত। হিন্দুদিগের অপেক্ষা তাহাদের বেশী ক্ষতি হইয়াছে; কেননা, তাহারা প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং নূতন অবস্থার সহিত কিরূপে বনিবনাও করিয়া চলিতে হয়, সে জ্ঞানও তাহাদের নাই।

এই প্রকার অধঃপতনে কতকটা মনোবেদনা ও পরিতাপ যে উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সুযোগে ইংরাজসরকার নিপুণতার সহিত মুসলমানের নামে আপনাদের কাজ আদায় করিয়া লইতেছেন। আন্দোলনকারীরা যখন স্বত্বাধিকার দাবী করে, তখন তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের চির-শত্রুতার উল্লেখ করিয়া আপনাদের সুবিধা করিয়া লন। এই শত্রুতা তাঁহারাই কিয়ৎপরিমাণে উস্কাইয়া দেন; এবং এমন করিয়া বলেন যে, মনে হয়, তাঁহারা উচিত কথাই বলিতেছেন:—"আমরা এখান হইতে প্রস্থান করিলে, আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে; তাই বিধাতা আমাদিগকে যে পদে স্থাপন করিয়াছেন, সেই পদেই আমাদের থাকিতে হইবে। কেননা, আমরা যেদিন প্রস্থান করিব, সেই দিনই ভারতে গৃহবিবাদের ঢাক বাজিয়া উঠিবে। তোমরা বেশ বুঝিয়া দেখ, মুসলমানেরা বাঙ্গালীর শাসনাধীনে থাকিতে কখনই সম্মত হইবে না।" তাহার পর আবার বাঙ্গালীর দিকে ফিরিয়া বাঙ্গালীকে এইরূপ বলেন:—

"আমাদের এখানে থাকায় তোমাদের বাঁচোয়া; কেননা, তোমরা বেশ জেনো, আমরা যেই চলিয়া যাইব, অমনি মুসলমানেরা তোমা-

তাঁহারা স্বপদে অবস্থিতি করিতেছেন শুধু এই জন্য পাছে ভীষণ বিপ্লবানল প্রজ্জ্বলিত হয়! কিন্তু বাস্তবিকই কি গৃহবিবাদের আশঙ্কা আছে? আমার মতে ইহা একটা মিথ্যা বিভীষিকা মাত্র। প্রথমতঃ, গ্রামপল্লির মধ্যে অনৈক্যের ভাব এত কম পরিস্ফুট যে, দুই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়াই বুঝা যায় না। কিন্তু সহরে, শুনিতে পাই সেরূপ নহে;—একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া উঠিবার আশঙ্কা সর্ব্বদাই থাকে। বেশী দিনের কথা নহে,—১৮৯৩ সালে বোম্বাইনগরের রাজপথে রক্তের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা দাঙ্গা হয়, তাহাতে ২৫ জন মৃত ও শত শত লোক আহত হয়। এবং সেই একই বৎসরে,—যেখানকার সহরে লোক প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান,—সেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, এইরূপ ধর্ম্মোন্মাদজনিত দাঙ্গাহাঙ্গামা আরও অনেক ঘটিয়াছে; কেবল একজনের দৃঢ়হস্তই এই সকল দাঙ্গাহাঙ্গামা থামাইয়া রাখিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত উপদ্রব অতীব বিরল, এবং তেমন নিরঙ্কুশও নহে। আমি জানি, য়ুরোপের অমুক দেশে—যেখানকার লোকেরা—ধর্ম্মঘটিত কারণে নহে, পরন্তু অন্যকারণে উত্তেজিত হইয়া,—সৈন্যের উপস্থিতিসত্ত্বেও এমন তুমুলকাণ্ড করিয়া তুলে, যাহা এখানকার অপেক্ষা আরও গুরুতর। তাছাড়া এইরূপ হ্যাঙ্গামা সেখানে আরও ঘনঘন হইয়া থাকে।

সে দেশের লোকসংখ্যা, ভারতের লোকসংখ্যার ৩২ ভাগের এক ভাগ, কিংবা আরো একটু বেশী। না—যদি বাস্তবিকই মুসলমানদের ধর্ম্মজনিত বিদ্বেষ তেমন প্রবল হইত—(তাতে যখন আবার স্বার্থপর লোকেরা ইহা বাড়াইয়া তুলিবার জন্য ও উস্কাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত) তাহা হইলে আরও ঘোরতররূপে আগুন জ্বলিয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

তত সহজে উহা নিবাইয়া দিতে চেষ্টা করিত কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এখানে-সেখানে কখন কখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—এবং সেই সংঘর্ষ হইতে কিয়ৎপরিমাণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গও বাহির হইয়া থাকে। অমনি একদল লোক বলিয়া উঠে :—"দেখ, ইহাতে কতটা বিপদের সম্ভাবনা"। না, আমি ইহাতে কোন বিপদ দেখিনা। ভারত বারুদের ঘর নহে। ভারতের অধিকাংশ লোকই শান্তিপ্রিয়। পর-ধর্ম্মসহিষ্ণুতার জন্য ভারতের আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন নাই। পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ভারতের আছে। বোম্বাইবিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী-ভাষার একজন অধ্যাপক এই কথা আমাদের বলিয়াছিলেন :—"এখানে ব্রাহ্মণ, মৌলবী, পার্শিপুরোহিত, এমন কি, খৃষ্টানপাদ্রি এক টেবিলে বসেন,—তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব নাই।" ইহা এখানকার হাওয়ার গুণ। যে হ্যাঙ্গামার কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সকল দাঙ্গাহ্যাঙ্গামা কাহারা উস্কাইয়া দেয় জান? সেই সব অত্যুৎসাহী উন্মাদগ্রস্ত লোক যাহারা পিঁজ্‌রাপোলের পশু-আশ্রম ও গোরক্ষণীসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বোম্বাই নগরে রুগ্ন ও দুর্ব্বল পশুদের জন্য একটা পিঁজ্‌রাপোল-আশ্রম আছে। এই সকল অতিকোমলহৃদয় লোকদের দোষেই সেখানে রক্তপাত হয়। দুরাগ্রহী গোঁড়াহিন্দুর নিকট গোহত্যা অতীব নিন্দনীয়। যে গোহত্যা করিবে তাহার মৃত্যু-দণ্ড হইবে, এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়া কাশ্মীরের রাজা, কিয়ৎকালপূর্ব্বে, তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। আমি স্বীকার করি, এই নিয়ম ইংরাজদিগের পক্ষে একটু কঠোর। এদিকে আবার মুসলমানেরা শূকরের মাংস খায় না। পরস্পরের উপর শোধ তুলিবার এই একটা খুব সুযোগ!

হিন্দুরা যদি দুষ্টামি করিয়া দিল্লির জুম্মামস্‌জিদে একখণ্ড শূকরের মাংস ফেলাইয়া দেয়, অমনি মুসলমানেরা তখনি তাহার প্রত্যুত্তর

স্বরূপ কোন মন্দিরের মধ্যে গোহত্যা করিয়া সেই রক্তে মন্দিরের বিগ্রহদিগকে পরিপ্লাবিত করে...ব্যথা-উপশমের ইহা একটা মন্দ ঔষধ নহে। স্বাধীনমতের হিন্দুরাও একসময়ে তাহাদের আপন ধর্ম্মভাইদের প্রতি এইরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। যাই হোক্—তবুও হিন্দু আসলে নিয়মের ব্যভিচার-স্থলগুলি বাদ দিলে—পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার আদর্শ।

কিন্তু ইংরাজেরা যখন হিন্দুদিগকে মুসলমান-জুজুর ভয় দেখান, তখন তাঁহারা ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হন। সত্যই কি মুসলমানেরা এত ভীষণ,—এত পরাক্রান্ত? কিন্তু তাহাত বোধ হয় না; কেননা, অষ্টাদশশতাব্দিতে এই হিন্দুরাই ত—মারাঠা, রাজপুত ও শিখ্—পাথরের পর পাথর খসাইয়া প্রকাণ্ড মুসলমান-ইমারৎটি—টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল; তাহাতে ইংরাজেরই যার-পর-নাই সুবিধা হয়।

আসল কথা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ কালক্রমে কমিয়া আসিতেছিল, শমিত হইয়া আসিতেছিল। ১৮৫৮ সালের বিদ্রোহে, সাধারণ শত্রু ছিল ইংরাজ। সেই বিদ্রোহে মুসলমানেরা খুব উন্মত্তভাবে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু ত্রিশবৎসর যাবৎ সে সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন হিন্দুই মুসলমান ও ইংরাজের সাধারণ শত্রু; হিন্দুর সকল চেষ্টার বিরুদ্ধেই ইংরাজ ও মুসলমান জোট্‌বদ্ধ। আশ্চর্য্যব্যাপার, এখন মুসলমানের ভাব সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া গিয়াছে। কোন একব্যক্তি—স্বধর্ম্মীদের মধ্যে যাঁহার বিশেষ প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল, তিনি জাতীয়গর্ব্ব ও স্বার্থভাব তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার জন্য ব্রতী হইলেন। ভারতে তাঁহাকে সকলেই জানে: তাঁহার নাম, সৈয়দ আহমেদ। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অপ্রকাশ্য মিত্রের সাহায্য লাভ করাই ইংরাজের রাষ্ট্র-নৈতিক দাবা-খেলার একটা প্রধান চাল হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজ

তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া মুসলমানের পুনরুত্থানের সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট করিলেন; শুধু তাহা নহে—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ আরো ঘনীভূত করিয়া দিয়া এরূপ সুকৌশলে অনৈক্যের বীজ তাহাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন যে, শীঘ্রই মুসলমানদিগের একটা স্বতন্ত্র দল সংগঠিত হইল, এবং এই দলকে হস্তগত করিয়া হ্বাইস্‌-রয়গণ উহাদিগকে হিন্দুদিগের দাবীদাওয়ার প্রতিকূলে দাঁড় করাইলেন।

এই দলটি কি এখন আর নাই? যে আন্দোলন আরম্ভে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতে পারে, তাহা আসলে বিপুল ব্যাপার। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আলীগড়-কালেজ স্থাপন করিয়া এই আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়। ইহার সংস্থাপক একজন গুহ্যধর্ম্মসম্প্রদায়ের (mystic) মুসলমান—যদিও ফকির ও "মাহ্‌দী"দিগের সহিত তাঁহার কোনরূপ সাধারণ ঐক্যস্থল ছিল না। এই মাহ্‌দিসম্প্রদায়, যাহাদিগকে ভক্তেরা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানে, তাহারা মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হয় ও ভক্তদের উৎসন্ন করিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও এইরূপ কত মাহদির আবির্ভাব হইয়াছে। মুসলমান-জগতে মাহ্‌দিধর্ম্ম পুরাতনরোগের ন্যায় স্থায়ী। এই মাহদিধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তকের নাম আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহার পদবী সৈয়দ, অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী। নবদীক্ষিত মুসলমানসম্বন্ধে পঞ্জাবে যে একটা প্রবচন প্রচলিত আছে, তাহা এই :—

গতবর্ষ ছিনু তাঁতী, এই বর্ষে শেক্‌
আগামীতে আকাল হ'লে হইব সৈয়েদ্‌।

অন্যকথায় যদি ব্যক্ত করিতে হয়—মহম্মদের সাক্ষাৎ-উত্তরাধিকারী হইতে হইলে, ধনাঢ্য হওয়া ছাড়া আর কিছুই আবশ্যক করে না।

* সৈয়দ আহমেদের অন্য উপাধি ছিল। মহম্মদের উত্তরাধিকারী না

মুসলমান। ইংরাজসরকার ইহাঁকে জজিয়াতিপদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহিবিদ্রোহের সময় স্বধর্ম্মীদিগকে আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য সৈয়দ-আহমেদ প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ যে অতীব কঠোরভাবে দমন করা হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা সহজ। সৈয়দ-আহমেদ এই কঠোর দমন-ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাই পুনর্ব্বার যাহাতে এইরূপ দারুণ কাণ্ড না ঘটে, তাহারই তিনি উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি তাঁহার জীবনপথে নূতন যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ১৯০১ সালে আমি আলীগড়-কালেজের প্রধান-অধ্যক্ষ Morrisonএর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন, এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—"বিশেষতঃ আমার পূর্ব্ববর্ত্তী Theodore Beckএর উপর সৈয়দ-আহমেদ তাঁহার সমস্ত বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার সংকল্পের সমস্ত কথা তাঁহার নিকট খুলিয়া বলিয়াছিলেন। শিক্ষাকার্য্যের খুঁটিনাটি ও কালেজের পাঠ্যসম্বন্ধে সৈয়দ্ নিজে কিছুই দেখিতেন না। সে সমস্ত ভার বেকের উপর। সৈয়দ্ অতীব কষ্টে ইংরাজি বলিতেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালন-কার্য্যে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। কালেজস্থাপনের কল্পনা কিরূপে তাঁহার মনে প্রথম উদয় হয়, তিনি নিজমুখে অনেকবার আমাকে বলিয়াছেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহিবিদ্রোহের ভীষণস্মৃতি তাঁহার মনে জাগরুক ছিল, ভবিষ্যতের জন্য তাই তাঁহার নানাবিধ শঙ্কা হইত। তাঁহার দেশস্থলোকের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দোষীদিগের জন্য কত নির্দ্দোষীকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে—এই কল্পনাটি তাঁহার মনকে অনবরত উদ্বেজিত করিত। এইরূপ আর একটা বিদ্রোহ যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত মুসলমানসমাজ উৎসন্ন হইবে। কিন্তু এইসব

করিয়া তাহা নিবারণ করা যায়? তাঁহার মতে, ইংরাজ ও মুসলমান-সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করাই সে উপায়। এখন এই উভয় সমাজ পরস্পরের সহিত পরিচিত নহে, পরস্পরকে ভুল বুঝিয়া থাকে এবং অন্তরের সহিত পরস্পরের সর্ব্বনাশ কামনা করে। এই শত্রুতার কি কোন প্রকৃত হেতু আছে? বাস্তবপক্ষে বলিতে গেলে, ইহার কোন হেতুই নাই। ইহা কেবল বুঝিবার ভুল। তাই সৈয়দ্ ইংরাজের সহিত মৈত্রীবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইংরাজের সহিত একত্র পানাহার করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার নিন্দা রটিল, মিলনের কাজ বড় একটা অগ্রসর হইল না। সৈয়দ-আহমেদ দৈবদর্শী ছিলেন। কোরাণপাঠকালে কোরাণের কতকগুলি বচন তাঁহার খুব মনে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, মহম্মদ স্বয়ং যেন এই কথাগুলি তাঁহাকে বলিতেছেন; মহম্মদের আদেশবাণী দিন দিন যেন তাঁহার নিকট স্পষ্টতর হইয়া উঠিল "আমার লোকদিগের নিকট তুই যা, তাহাদিগের কতদূর অবনতি হইয়াছে তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বল্, আবার তাহাদিগকে উন্নত কর্"। এই উদ্দেশ্যসাধনকল্পে বিদ্যালয়স্থাপনই একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি স্থির করিলেন। য়ুরোপীয়দের সম্বন্ধে মুসলমানদের যে অন্ধসংস্কার তাহা বেশীর ভাগ অজ্ঞতাজনিত। দেখ, এইরূপ ভাবিয়াই তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ও সম্পত্তি আলীগড়-কালেজের প্রতিষ্ঠায় সমর্পণ করেন। আমি তোমাকে সেই কালেজ দেখাইবার জন্য একদিন লইয়া যাইব। এই কালেজটি যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীতে উন্নীত হয়, তাহাই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা"।

নানাপ্রকার পরীক্ষা-চেষ্টার পর, কালেজস্থাপনের কল্পনাটি সৈয়দের মনে উদয় হয়। প্রথমে তিনি, ১৮৫৭ সালের সিপাহি-বিদ্রোহের হেতুসম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হিন্দিভাষায় লেখেন;

Colvinএর নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তিকার সারমর্ম্ম এই ;—অসৎ অভিপ্রায়ে নহে, পরন্তু বুঝিবার ভুলেই এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। একই মৃত্তিকার উপর ইংরাজ ও ভারতবাসী একত্র বাস করিতেছে, অথচ তাহারা পরস্পরকে জানে না—জানিতে চেষ্টাও করে না। পরস্পরকে বুঝিবার জন্য একপাও অগ্রসর হয় না। আমি এইখানে আর একটু বেশী করিয়া বলি ;—১৮৫৭ সালে যাহা ছিল, আজ তাহা আরও বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে : ইংরাজ ভারতবাসীর নিকট যায় না ; পর্ব্বত স্বস্থান হইতে নড়ে না ; কিন্তু পর্ব্বত না আসুক, পর্ব্বতের নিকট মোহম্মদ গিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবাসী পর্ব্বতের নিকট যাইতে চাহে না। সৈয়দ্ বলেন, এই কষ্টকর অবস্থার একমাত্র প্রতীকার—এই দুইজাতিকে পরস্পরের নিকটে আনা। যেদিন উহারা পরস্পরকে জানিবে, সেইদিনই উহারা পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখিবে—অন্ততঃ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে ; এইরূপে ভারতের শাসনকার্য্য খুব সহজ হইয়া আসিবে। তিনি বলেন,—ব্যবস্থাপক সভা, ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত কর। যাহাতে দেশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপ্রণয়নে সুপরামর্শ দিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কি আছে। ১৮৫৭ সাল হইতে সৈয়দ যে কল্পনাটি কথায় ব্যক্ত করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা যখন কার্য্যে কতকটা পরিণত হইল, তখন যে তাহাই আবার সৈয়দের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ হইবে, তাহা কে জানিত। ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয়দিগের প্রবেশলাভের জন্য যখন কংগ্রেস্ জিদ্ করিতে লাগিলেন, তখন ইহার প্রতিবাদে কাহার কণ্ঠস্বর সর্ব্বপ্রথমে উত্থিত হইল ?—সৈয়দ্ আহমেদের। ১৮৫৮ সালের আমূল-সংস্কারনৈতিকেরা গলবস্ত্র হইয়া

সংস্কার তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাই আবার অন্যের দ্বারা কার্য্যে পরিণত হইল। ১৮৯২ সালে, ঐ সংস্কারটি সংসাধিত হইল। এই সময়ে, "হিন্দুবিভীষিকার" ভয়ে সৈয়দ্ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। Sir Aukland Colvin বলেন,—সৈয়দ্ যখন চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তখন এই প্রস্তাবটি তাঁহার নিকট দুঃসাহসী ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। যাহাদের মধ্যে কোন একটা সাধারণ নীতিসূত্র নাই, যাহাদের ভাষা এক নহে—সেই সকল বিভিন্নজাতীয় লোক কি করিয়া মন্ত্রণা-সভায় একত্র উপবেশন করিবে? ইহাতে কেবল মনোভাবের ও ভাষার একটা বিষম গোলমাল বাধিয়া উঠিবে। পরস্পরের কথা কেহই বুঝিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, সভাস্থলে কেজোরকমের বাদানুবাদ হওয়া যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সেই সব দেশীয় সদস্য ইংরাজিধরণে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারে, স্বাধীনভাবে বাদানুবাদ করিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। স্থানীয় অন্ধসংস্কার হইতে,—স্বমতান্ধ অসহিষ্ণুতা হইতে যাহাতে তাহারা বিমুক্ত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। এই কারণেই, তাড়াতাড়ি নূতন কিছু পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক।

ইহা অবশ্য সুবিবেচনার কথা। এইরূপ পুনরালোচনা সৈয়দের মনে কেন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা তত কঠিন নহে। স্বকীয় প্রস্তাবের ফলাফল ভাবিয়া সৈয়দ্ ভীত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা সুবক্তা,—একটু বেশী বাচাল,—তাহারা খুব চমক্লাগাইয়া দেশীয় স্বত্বাধিকারের পক্ষসমর্থন করিবে, আর মূক মুসলমানেরা, সভার বাদানুবাদ অতি কষ্টে বুঝিতে পারিবে। ইহাই তিনি দিব্যচক্ষে

ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রভাবপ্রতিপত্তির বৈধ অংশলাভে যদি তাহারা বঞ্চিত হয়, সে তাহাদের নিজের দোষ ;—তাহারা অজ্ঞ বলিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র না দেখাইতে পারিলে, সরকার কাহাকে কাজ দেন না। কিন্তু এবিষয়ে মুসলমানেরা রিক্তহস্ত। সৈয়দ্ বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজসরকারের সাহায্যব্যতীত তিনি শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন না। এই কারণেই, ইংরাজ-মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিশেষ আবশ্যক। তাই সৈয়দ্ তাঁহার রাজভক্তি, তাঁহার সেবা-নিষ্ঠা, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বধর্ম্মিগণ পৃথক্ হইয়া একান্তে বসিয়া আছে, ইংরাজিবিদ্যালয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, ভারতে যে ইংরাজসরকার অধিষ্ঠিত, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন তাহারা জানে না—ইহাই তাঁহার মতে দুর্ভাগ্যের বিষয়। মুসলমানদিগের এই ভাবটা নির্ব্বোধ খুঁতখুঁতে শিশুর মত ; তাহাদের মূক প্রতিবাদ নিষ্ফল ; তাহাতে প্রতিবাদকারীর অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই হয় না। তাই বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানাদির কাজে যোগ দিবার জন্য সৈয়দ্ মুসলমানদিগকে ক্রমাগত উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কি কারণে তিনি হিন্দু-আন্দোলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন ? বোধ হয় তাঁহার বিশ্বাস, এই আন্দোলন রাজবিদ্বেষদুষ্ট ;—ইহাতে অনেক বিপদ-বিভ্রাটের সম্ভাবনা আছে ; তাছাড়া ইহাও তাঁহার বিশ্বাস, হিন্দুর বেশী উন্নতি হইলে, মুসলমানের স্বার্থহানি সুনিশ্চিত।

সৈয়দের রাষ্ট্রনীতিমন্ত্র এই তিনকথায় পরিব্যক্ত হইতে পারে :—শিক্ষা, রাজভক্তি, হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা।

[ক্রমশঃ]

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গালী মুসলমানদের সামাজিক আচার।

মুসলমানদিগকে সাধারণতঃ চারিবর্ণে বিভক্ত করা হয়। যথা, শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান। কিন্তু এই বর্ণবিভাগের সঙ্গে বাঙ্গালীমুসলমানদের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে আরববাসী বা তাহাদের বংশধরেরাই শেখ, এবং মহম্মদের জামাতা আলির বংশধরেরা সৈয়দ নামের অধিকারী। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের সৈয়দ ও শেখদের মধ্যে, বিশেষতঃ শেখদের মধ্যে হিন্দুধর্মত্যাগী বঙ্গদেশজাত অনেক স্থানীয় মুসলমান প্রবেশ করিয়াছে। "শেখ" বলিলে, বঙ্গদেশে বিদেশী আরববাসীর বংশধর না বুঝাইয়া স্বদেশী কোন জাতি হইতে উৎপন্ন মুসলমান বলিয়া মনে করিতে হয়।

নিজ মুসলমানেরা বাঙ্গালাদেশে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকে। যথা—অশ্রাফ্ বা শরীফ্ এবং অজলাফ্ বা আত্রাপ। অশ্রাফ্ বা শরীফ্ অর্থ উচ্চবংশীয়। ভারতবর্ষের বহির্ভূত দেশ হইতে আগত মুসলমানদের বংশধরেরা, এবং হিন্দুদের উচ্চবংশ হইতে উদ্ভূত মুসলমানেরা এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্ভিন্ন অপর সকল মুসলমানই অজ্‌লাফ্-শ্রেণীর অন্তর্গত। 'অজ্‌লাফ্' শব্দের অর্থ 'নিম্ন,' নীচ, অধম। ইহাদিগকে কখন কখন "কামিনা" বা "ইতর"ও বলা হইয়া থাকে। মগধ ও মিথিলায় "নোয়া মুস্‌লেম," বারেন্দ্রের "নস্ত" এবং পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গের অধিকাংশ শেখই—অজ্‌লাফ্ শ্রেণীভুক্ত। জোলা (জোলাহা), ধুনিয়া, কুঞ্জ, কুঞ্জ্ড়া, হাজাম, দর্‌জি এবং এতাদৃশ ব্যবসায়িগণ সকলেই এই

* পেটিয়াহারের সেনসাস অনুসারে লিখিত।

শ্রেণীমধ্যে গণ্য। একজন অষ্রাফের নিকট জোলা, ধুনিয়া, চাষা সকলেই সমান, সকলেই অজ্‌লাফ্। হিন্দুদিগকে মনু যেমন প্রথমতঃ দ্বিজ এবং একজ দুই মৌলিকবর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালী-মুসলমানদের অষ্‌রাফ্ ও অজ্‌লাফ্ তদনুরূপ। বিদেশাগত আর্য্যেরা দ্বিজ, আর বিদেশগত মুসলমানেরা অষ্‌রাফ্। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যেমন কাহারো শ্ববৃত্তি (menial service) গ্রহণ বা স্বহস্তে হল-চালনা করেন না। অষ্‌রাফ্‌দের ব্যবহারও তদনুরূপ। ব্রাহ্মণের ন্যায় সৈয়দদের জাতি-ব্যবসায় পৌরোহিত্য আর ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মোগল ও পাঠানদের জাতি-ব্যবসায় দেশরক্ষা ও দেশশাসন।

কোন কোন স্থানে মুসলমানেরা এক তৃতীয় শ্রেণীর নাম করে। যথা, অর্জাল, ইহার অর্থ অধমের অধম। হলাল্‌খোর, লাল্‌বেগী, আব্‌দাল ও বেদিয়া ইহারা অর্জাল। ইহারা মস্‌জিদে বা কবরস্থানে প্রবেশ করিতে পায় না, এবং অন্যান্য মুসলমানেরা ইহাদের সঙ্গে কোন প্রকার আচারব্যবহার করে না। হিন্দু নমঃশূদ্রাদির ন্যায় ইহাদের অবস্থা।

যে সকল মুসলমানেরা বংশানুযায়ী কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া চলিতেছে, তাহাদের সমাজবন্ধন অন্যান্য মুসলমান হইতে স্বতন্ত্র। জোলা, কুঞ্জ্‌া, কুলু, দাই, দরজি, ধুনিয়া প্রভৃতির বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের প্রত্যেক জাতিতে সমাজশাসন জন্য একটী পঞ্চায়ৎ আছে। বাঙ্গালাদেশে পুলিশের পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হওয়া অবধি অন্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। ঢাকাতে ইহার নাম "মাত্‌বর" (মুতাবর শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ "বিশ্বাসের যোগ্য"), যশোহরে "প্রধান", এবং মুর্শিদাবাদ ও ২৪-পরগণায় "মণ্ডল"। দুই হইতে পাঁচজন পর্য্যন্ত পঞ্চায়তের সভ্যসংখ্যা। কখন কখন গ্রামবাসীরা পঞ্চায়ৎ নির্ব্বাচন করে; কখন বা বিদ্যা-অর্থাদি-প্রভাবে অনেকে পঞ্চায়ৎ হইয়া পড়ে

কখন বা জমিদারেরা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করেন। পঞ্চায়ৎ হওয়া সকলেই গৌরবের বিষয় মনে করে। যে স্থানে নির্ব্বাচন করিবার নিয়ম আছে, পঞ্চায়ৎ নূতন নির্ব্বাচিত হইলে সকলকে ভোজ দিয়া থাকে। মুরশিদাবাদজিলার পার্শ্ববর্ত্তী মৌজাসমূহের মণ্ডলদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একএকটী পাগ্‌ড়ি দিয়া তাহাদের আদর করা হয়।

স্বজাতীয়দের ধর্ম্মগত ও ব্যবসায়গত যে কোন ত্রুটী হয়, পঞ্চায়তগণই তাহার বিচারকর্ত্তা। যে সকল কাজ নীচ বলিয়া মনে করা হয়, জাতিভুক্ত কোন ব্যক্তি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না। জোলারা জুতাসেলাই করিবে না। কুলুরা কাপড় কাচিবে না। ধুনিয়ারা দাইর কাজ করিবে না।

কোন কোন জাতিতে আবার তদপেক্ষা উচ্চতর জাতির ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে পারে না। অল্পতর বেতনগ্রহণে অথবা অন্য কোন প্রকারে কোন জাত্‌-ভায়ার জীবিকা বা চাকুরি কাড়িয়ালওয়া কুকার্য্য বলিয়া পরিগণিত। এই সকল বিষয়ে পঞ্চায়তগণ বিচারকর্ত্তা। কখন্ জাত-ভায়ারা সকলে মিলিয়া ব্যবসায় ছাড়িয়া (strike) দিবে, পঞ্চায়তগণ তাহা নিরূপণ করিয়া থাকে। অখাদ্যভোজন, ব্যভিচার, বিনাকারণে স্ত্রীত্যাগ বা স্বামিত্যাগ, কাহারও স্ত্রী বা কন্যা-ভুলান, কোন জাত-ভায়ার নামে মিথ্যাপবাদ বা মিথ্যা অভিযোগ, অজাতি-বিবাহ, অন্যজাতির হুঁকায় তামাকুসেবন—ইত্যাদি অপরাধ পঞ্চায়ৎগণের বিচার্য্য বিষয়। বিবাহে বা অন্যান্য কৌলিক ক্রিয়ায় কাহার কত ব্যয় করিতে হইবে পঞ্চায়ৎগণ তাহাও নির্দ্ধারণ করে। দেওয়ানী আদালতের যোগ্য অতি সামান্য সামান্য বিরোধও তাহারাই নিষ্পত্তি করে। কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, পঞ্চায়ৎগণমধ্যে যে জ্যেষ্ঠব্যক্তি তাহারই গৃহে সকলে সমবেত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া তাহার ব্যবহারসম্বন্ধে

পাওয়ার কথা শুনিয়া অভিযোগের মীমাংসা হয়। পঞ্চায়তের মীমাংসা প্রায়ই ন্যায়সঙ্গত হয়। যদি কেহ পঞ্চায়তের মীমাংসায় অসন্তুষ্ট হইয়া আদালতের আশ্রয়গ্রহণ করে, তবে সকলেই পঞ্চায়তের মীমাংসা প্রবল রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

যে সকল মুসলমানেরা কোন একটা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া চলে, তাহাদের মধ্যেই এই পঞ্চায়ৎ-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের ন্যায় ইহাদেরও অজাতি বা অসবর্ণেবিবাহ নিষিদ্ধ। কেহ জন্মগত জাতি ছাড়িয়া অন্য কোন জাতিতে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। ময়মনসিংহের জনৈক জমিদার শ্রীযুক্ত আবু গজনভী সাহেব বলেন যে, অনেক জোলা কসাইকার্য্য করিতেছে, কিন্তু কসাইরা তাহাদিগকে জোলা বলিয়াই মনে করিয়া থাকে।

অপরন্তু, অষ্‌রাফ্‌ এবং শেখনামধারী কৃষকদের মধ্যে এইপ্রকার কোন পঞ্চায়েৎপ্রথা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সমাজস্থ লোকেরা অতি অল্প দোষেরই বিচার করিয়া থাকে; সকলেই অনেকটা স্ব স্ব প্রধান। প্রতিবাসীর নিকট তাহাদের দায়িত্ব অতি সামান্য। বিবাহসম্বন্ধেও ইহাদের অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। মহম্মদীয় ধর্ম্মানুসারে প্রতিলোম অর্থাৎ উচ্চতর জাতির কন্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ। এতদ্‌ভিন্ন বিবাহসম্বন্ধে কোন কঠিন নিয়ম নাই। কিন্তু বিদেশগত মুসলমানদের বংশধর-মধ্যে বংশমর্যাদার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি। তাঁহারা পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের বংশাবলী সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং এমন বংশে বিবাহ করেন না, যাহাতে প্রতিবেশীদের চক্ষে হীন হইতে হয়। বিশেষতঃ তাহারা চিরপরম্পরাগত কৌলিক আচারব্যবহারের বড়ই পক্ষপাতী। সুতরাং অধিকাংশ স্থানে সৈয়দ সৈয়দ-কন্যার, পাঠান পাঠান-কন্যার এবং মোগল মোগল-কন্যার পাণিগ্রহণ করে। কখন কখন সৈয়দের

কুলনাশ বা সামাজিক নিন্দা হয় না। কিন্তু সৈয়দকে শেখ-বরে কন্যা প্রদান করিতে দৃষ্ট হয় না। অজ্‌লাফের কন্যাগ্রহণ অষ্‌রাফের পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও, এই প্রথা অষ্‌রাফ্‌সমাজে হীন বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু প্রথমতঃ সবর্ণে বিবাহ করিয়া অষ্‌রাফ নিম্নবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিলে নীচ হয় না। কিন্তু এই নিম্নবর্ণা স্ত্রীর সন্তানেরা মাতৃ-কুলেরই সম্মান পাইয়া থাকে এবং নিম্নবর্ণা স্ত্রীও সবর্ণা স্ত্রীর সমান সম্ভ্রম পায় না।

অষ্‌রাফ্‌বর্ণমধ্যে বিবাহের সাধারণ নিয়ম এই। কিন্তু অষ্‌রাফ্‌-কুলজাত অনেক দরিদ্র ব্যক্তি অর্থলোভে কুলভঙ্গ করিয়া অজ্‌লাফ্‌ কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে অজ্‌লাফ্‌জাতীয় লোকেরা অর্থের প্রভাবে (একবারে না হউক) সমাজের উচ্চবর্ণসঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন "শূদ্রও সাতপুরুষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।" মুসলমানদের প্রথা তাহারই উদাহরণস্বরূপ। মুসলমানদের প্রবাদ আছে যে "গত বৎসর ছিলাম জোলা, এই বৎসর শেখ, টাকার জোর থাকিলে আগামী বৎসর হইব সৈয়দ।" তিন বৎসরের এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইলেও ৩।৪ পুরুষে তাহা সম্ভব হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। "চমুজোলা" অর্থশালী হইলে জোলানাম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ নিজে "চমুমিঞা", পরে চৈমুদ্দিন", পরে "মহম্মদ" চৈমুদ্দিন", এবং অবশেষে "মৌলভী মহম্মদ চৈনাদীন আহম্মদ" নাম ধারণ করে। অর্থব্যয় করিলে প্রথমতঃ দরিদ্র অষ্‌রাফ্‌মধ্যে আত্মীয়তা করিয়া তাহাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। এইপ্রকারে দুই তিন পুরুষে লক্ষ্মী অনুকূল হইলে একজন অজ্‌লাফের অষ্‌রাফ্‌বংশে প্রবেশলাভ ঘটিয়া থাকে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরসমূহে এইপ্রকার বংশোন্নতিলাভ সহজ। কারণ পল্লী-

পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা কোনমতে কৌলিক আচার পরিত্যাগ করিতে চায় না।

অনুলোমবিবাহের নিয়ম থাকাতে নীচবর্ণ মুসলমানও আশা করে যে, এক সময়ে বিদ্বান ও ধনবান হইয়া সমাজের উচ্চবর্ণমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই আশাই মুসলমান-সমাজের একতার কারণ। এই নিয়মসত্বেও অনুলোমবিবাহের সংখ্যা অতি অল্প। অষ্‌রাফ্‌বংশীয়েরা প্রায় সকলেই সবর্ণে আদানপ্রদান করিয়া থাকেন। ব্যবসায়-ভুক্ত মুসলমানেরা সবর্ণ ত্যাগ করিয়া বিবাহ দেয় না। হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী মুসলমানগণের অসবর্ণ-বিবাহে অনিচ্ছা নাই, কিন্তু অষ্‌রাফ্‌ ও ব্যবসায়ী মুসলমানের অনিচ্ছাবশতঃ তাহারা সবর্ণে বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়া থাকে। একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া (পাংক্তেয়তা) সম্বন্ধে সকল প্রদেশে একনিয়ম দৃষ্ট হয় না। মুসলমান-সমাজেই অন্ত মুসলমানের পক্ব আহার গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং সমান বা কিঞ্চিন্ন্যূন অবস্থাপন্ন স্বধর্ম্মীর সহিত একসঙ্গে পানভোজন করে। অষ্‌রাফ্‌ মুসলমানদের এই নিয়ম। কিন্তু ব্যবসায়ী মুসলমানেরা সবর্ণ ভিন্ন অপর কাহাকে পঙ্‌ক্তিমধ্যে স্থান দেয় না। হিন্দুসমাজেও তাহাই দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, এতৎসম্বন্ধে কোন কৈবর্ত্ত-নমঃশূদ্রাদির মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয় না।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

উদ্বোধন।*

(দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ-পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।)

জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসন্তান!
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্ম্মসার;
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয়;
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে?
যে জননী পয়ঃ-সুধা শতনদী-ধারে,
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে;
যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি;
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সন্তান,
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।

* ৩৯ বৎসর পূর্ব্বে লেখকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, চৈত্রসংক্রান্তি শনিবার

ঐ দেখ, মাতা বসি ঘোর কারাগারে
হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি অজ্ঞান-আঁধারে,
ঝরিতেছে অশ্রু-নীর, ঘন বহে শ্বাস,
যাতনায় করিছেন এ-পাশ ও-পাশ।
ঐ দেখ, কাঁদিছেন জননী বিহ্বলা;
(গুমরিয়া কত কাল থাকিবে অবলা ?)
অত্যাচার, অবিচার আদি প্রেতগণ,
সে কারার দ্বার-দেশ করিছে রক্ষণ;
ভীষণ মূরতি সব ভীমদণ্ড করে
দ্বারদেশ আগুলিয়া সদা ঘোরে-ফেরে।
বিলাপের ধ্বনি শুনি যত রক্ষগণ
তটস্থ হইছে সবে, সচকিত-মন।
কেহ বা বুঝায়—কেহ মুখ চেপে ধরে,
"চুপ্ চুপ্" বলি ওঠে সবে এক স্বরে।
কিন্তু শোকোবেগ কভু না মানে বারণ,
সাগর উথলে যদি কে করে শাসন ?
এ সকল দেখি শুনি কার প্রাণে সয় ?
ওহ্‌রে ভারতবাসি! কি ভয়, ভয়!
ওই শোনো, ওই শোনো, কি কহে জননী;
ক্রমশঃ বাড়িছে দেখি ক্রন্দনের ধ্বনি :—
"ওরে নিদারুণ বিধি, বিতরিয়া রূপ-নিধি
কেন মোর সর্ব্বনাশ ঘটালে বলনা ?
তস্করে আনিলে ডাকি, আর কি রাখিলে বাকি,
রাণী হয়ে হ'নু দাসী, ছিছি কি লাঞ্ছনা !

প্রকৃতিজননী মম !   রূপে-গুণে নিরুপম !
তোমার ছিলাম আমি সোহাগের ধন।
কত যত্নে সাজাইতে,   কত বিদ্যা শিখাইতে,
জানিতে কি মম দশা হইবে এমন ?
পৃথ্বী-তলে যত শোভা,   যাহা কিছু মনোলোভা,
সকলি আমার তরে আনিলে হেথায় ;—
পঙ্কজ-শোভন-সর,   গিরি সিন্ধু নদীবর,
কুসুমাভরণ বন—কত কব হায় !
কত করিতাম ক্রীড়া,   জানি নাই কোন পীড়া,
তোমার আঁচল ধরি মনের উল্লাসে ;
কভু হিমাচলশিরে,   কভু মানঃসরোনীরে,
মন সাধে ফিরিতাম আকাশে আকাশে।
এবে বিধি করি আড়ি,   সকলি লইল কাড়ি,
অবশেষে ফেলে মোরে ঘোর কারাগারে।
কারে কহ দুখ-কথা,   কে বুঝিবে মম ব্যথা,
এবে পুত্র করে লাজ মা বলিতে মারে !
থাকিত সে কালিদাস,   আর ভবভূতি, ব্যাস,
বাল্মীকি আদি প্রিয় সন্তান সকল,
কিবা সুমধুর তানে,   কিবা সুললিত গানে,
প্রতপ্তহৃদয় মোর করিত শীতল !
আর কি শুনিবে কাণ,   বীর-পুত্র-যশোগান,
তাদের ছিলাম আমি প্রাণের জননী ;
শুনিলে তাদের কথা,   তবু জুড়াইত ব্যথা,
অপার পাথার মাঝে পেতাম তরণী !

কোথা গেল ভীমার্জ্জুন, অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ,
রামচন্দ্র পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ!
এস এস ফিরি পুন, জননীর কথা শুন!
(কিন্তু হায়, বৃথা আশা—অরণ্যে রোদন)
তোমরা থাকিতে যদি, বহিত কি দুখ-নদী,
সহিতে হ'ত কি ঘোর এত অপমান ?
কোপেতে উঠিতে জ্বলি, দস্যুদলে দিতে বলি,
সঁপিতে আমার তরে ধন মন প্রাণ"।
দেখ! কুহকিনী আশা, পশি কারাগারে
বুঝাইছে নানামতে ভারতমাতারে :—
"শান্ত হলো প্রিয়সখি—মুছ অশ্রু-নীর,
পোহাইবে দুঃখনিশা—হয়ো না অধীর।
তোমার বিলাপ-ধ্বনি ভেদিয়া পাষাণ
পৌঁছিয়াছে শুন সখি সেই দিব্যধাম।
প্রকৃতিজননী তব শোকেতে বিহ্বল,
উঠেছে স্বরগে আজি মহাকোলাহল।
ভীমার্জ্জুন ব্যাস আদি দিব্যবাসিগণ,
মাগিছেন এই বর ব্রহ্মার সদন,
যেন তব গর্ভে করি জনম গ্রহণ,
উজ্জ্বল করেন পুন তোমার বদন।
তোমারে জানাতে ইহা আইলাম হেথা,
শান্ত হও প্রিয়সখি!—কেন কাঁদ বৃথা।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থসমালোচনা।

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী। এই কবিতাগ্রন্থের লেখক সুপণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর রায় মহাশয় অনেকদিন পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। স্বর্গীয় রায়মহাশয় ইংরাজী শিক্ষিত কবি নহেন, এবং তিনি যখন এই দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী রচনা করেন, তখন এখনকার মত কবিতার প্রচলন হয় নাই; সুতরাং তিনি এই পুস্তকের প্রথমে প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের পদানুসরণ করিয়া গুরু-প্রণাম, ব্রাহ্মণ-প্রণাম, গণেশের বন্দনা, সূর্য্যের বন্দনা প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তাহার পরে তিনি ধারাবাহিকভাবে আনুপূর্ব্বিক দুর্গালীলা বর্ণন করিয়াছেন। কলিকাতার সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রে এই দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী প্রকাশিত হইতেছিল; প্রকাশকমহাশয় এই প্রকার প্রকাশে বিলম্বের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও সমগ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন নাই। এইখানি প্রথমখণ্ড মাত্র; ইহাতে দশমতরঙ্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেকালের বাঙ্গালী কবিগণের কবিতার ন্যায় এই দুর্গালীলা-তরঙ্গিণীর কবিতাগুলি বেশ সরল ও প্রাঞ্জল; কোন স্থানে কবিকল্পনার চিহ্নও পাওয়া গেল না। তবে ছন্দ ও গ্রাম্যতাদোষ এসকল কবিতায় একপ্রকার অপরিহার্য্য বলিলেই হয়। প্রকাশকমহাশয় একটু চেষ্টা করিয়া এই সকল গ্রাম্য শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া দিলে অনেকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কবিগণের হস্তলিখিত দপ্তর হইতে উদ্ধার করিয়া মুদ্রাকরের হস্তে গ্রন্থ সমর্পণ করিতে হইলে প্রকাশককে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়; আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি, দুর্গালীলা-তরঙ্গিণীর প্রকাশকমহাশয় এতটুকু আয়াস স্বীকার করিবার অবসরগ্রহণ করেন নাই। আমরা আশা করি, ভবিষ্যৎ-সংস্করণে প্রকাশকমহাশয় এ সমস্ত ক্রটীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

হরিমঙ্গল। প্রথম খণ্ড; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কবিতার সহিত

উপভোগ করিতেছেন। বাণীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া অবশেষে তিনি এই সারসত্যে উপনীত হইয়াছেন—

"হরি বিনা দান মিছে, হরি বিনা ধ্যান মিছে,
হরি বিনা প্রাণ? সে যে জীবনে মরণ।"

ইহা অপেক্ষা সুন্দর কথা আর কি হইতে পারে? কবি দেবেন্দ্রনাথের অনেক প্রেমকবিতা, অনেক রহস্যকবিতা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। হরিমঙ্গলের কবি দেবেন্দ্রনাথ এখন গভীর প্রেমসাগরে নিমগ্ন, তাই তাঁহার সরল সুন্দর কবিতায় এখন হরিনামের স্রোত বহিতেছে।

দেবেন্দ্রবাবু এই কবিতাসংগ্রহের মধ্যে আরও কয়েকজন কবির কয়েকটি কবিতা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কৈফিয়তে লিখিতেছেন "কেবলমাত্র আমার কবিতাগুলি দিলে গ্রন্থখানি উজ্জ্বল হইত না। আমার ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপগুলি মিট্ মিট্ করিয়া এক পার্শ্বে জ্বলিলে ভাল দেখাইত কি? সেইজন্য কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটী electric light-রূপিণী কবিতা দিয়া দেব-মন্দিরটীকে আলোকপূর্ণ করিয়াছি। ছয়টী নবীন কবির কবিতার জ্যোৎস্নালোক চারিধার হইতে আসিয়া পূজার দালানটিকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত ঠাকুরমহাশয়দ্বয়ের এবং ছয়টি নবীন কবির কবিতা এই হরিমঙ্গলে স্থানদানসম্বন্ধে কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপগুলি মিট্ মিট্ করিয়া দেবমন্দিরের একপার্শ্বে জ্বলিলেও পবিত্র দেবভাবে মন্দির পরিপূর্ণ হইত; শত শত ভক্তসাধক ঐ সকল মাটীর প্রদীপে অল্প আলোকিত মন্দিরমধ্যে হরির শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিত, বিদ্যুতের প্রচণ্ড আলোকে আলোকিত করিয়া দেবমন্দিরের শোভাবৃদ্ধির বিশেষ কোন আবশ্যকতা ছিল না। কবিবর অন্যান্য গ্রন্থের কবিগণের যে কয়েকটি কবিতা তুলিয়া দিয়াছেন, সেগুলির নির্ব্বাচনে কোনই ত্রুটী হয় নাই; তাহারা এই হরিমঙ্গলে স্থান পাইবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত।

আমরা এই হরিমঙ্গলের সমস্ত কবিতাগুলি পরম আগ্রহে পাঠ করিয়াছি; পবিত্র গঙ্গাজলের ন্যায় এই পরমভক্তের ভক্তি-স্রোতের সংস্পর্শে সত্যসত্যই ক্ষণকালের

আমরা এই হরিমঙ্গল হইতে একটী কবিতার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ধর্ম্মমন্দিরের তুমি অপূর্ব্ব পূজারি,
হে বিপদ! পার হ'য়ে গিরি, নদী, দরী,
নির্ব্বাসনা-কমণ্ডলু হস্তে করি ধরি,
অপমাণ, ভস্মমাখি, এ তনু উদ্ধারি,
কৌপীন সর্ব্বস্ব করি, নববৃন্দাবনে,
আসিয়াছি!—খোল দ্বার, হে বিপদ-রাধে!
স্নিগ্ধ কর দুটি চক্ষু প্রেমের অঞ্জনে,
আজি গো হরির রূপ হেরিব অবাধে!
প্রীতি-কালিন্দীর নীরে করিয়াছি স্নান,
ভকতি-শিউলিফুল দুটি করে ধরি'
ভাসিতেছি নেত্রনীরে!—মুছাও নয়ান,
দেখা দাও, দেখা দাও হে দয়াল হরি!
বিশ্বপতি! কেন আর এ অগ্নিপরীক্ষা?
দাও দাও ভিখারীরে পরাভক্তিভিক্ষা!

হিন্দু। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি লেখকমহাশয় বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। ১৮৮।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তি। তিনি হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে কতদূর আলোচনা করিয়াছেন, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ভাল বুঝিতে পারা যায় না;—তবে তিনি যে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উপর ভক্তিমান নহেন, তাহা তাঁহার লেখার মধ্যে প্রত্যেক কথাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, বর্ত্তমান হিন্দুমহাশয়েরা মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া, কপটতার সহায়তা করিয়া পবিত্রহিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেছেন। সমাজের এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে তাহাতে ইহার সংস্কার যে সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় এ কথা চিন্তাশীল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু সংস্কার এক কথা—এবং সংহার এক কথা। যাঁহারাই এ বিষয়ে কিছু বলিতে বা লিখিতে চান, তাঁহারাই সংস্কারের পরিবর্ত্তে সংহারের কথাই বলিয়া ফেলেন। বর্ত্তমান লেখকও সংহারেরই পক্ষপাতী। তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উপসংহারের কয়টি কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন "হিন্দুর মধ্যে যদি কিছুমাত্র উদারতা থাকে, যদি স্মার-নিষ্ঠা ও সত্য-

বলুন—চণ্ডাল আমার ভাই, ব্রাহ্মণ আমার ভাই ; আর সকলে এক পংক্তিতে আহার করিয়া হিন্দুর মহত্ত্বের পরিচয় দিন।” লেখকমহাশয় এত গবেষণা এত বাক্‌বিতণ্ডার পর যে, এই সিদ্ধান্তই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায়, সকল জাতি একপংক্তিতে বসিয়া আহার করিলেই এ জাতির উদ্ধার হইবে এবং তাহাই হিন্দুর মহত্বের পরিচায়ক। কোন ধর্ম্ম বা সমাজসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে যতটা ধর্ম্মজ্ঞান, সমাজজ্ঞান থাকা আবশ্যক, আমরা বড়ই দুঃখের সহিত বলিতেছি লেখক তাহা মোটেই দেখাইতে পারেন নাই ; তিনি মনের আবেগে যাহা হয় একটা কথা বলিয়া বসিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের ধারাবাহিক আলোচনা করিয়া যুক্তিতর্কপ্রয়োগে সিদ্ধান্ত করিবার ভাব লেখকের মধ্যে দেখিলাম না ; তিনি সংস্কারের প্রয়াসী নন, একেবারে সংহারের প্রয়াসী। এই ক্ষুদ্র সমালোচনায়, তাঁহার মত ও সিদ্ধান্তের বিচার করা বড়ই অসম্ভব, কিন্তু আমরা এ কথা স্পষ্টবাক্যে বলিতে পারি, সামাজিক প্রশ্নের এভাবে সমাধান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। জাতিভেদের সপক্ষে-বিপক্ষে যত কথা বলিবার থাকে সমস্ত উল্লেখ করিয়া তাহার পর বিশেষ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেই লেখক ভাল করিতেন। তিনি তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় মোটেই বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই।

হিন্দুবিজ্ঞানসূত্র। শ্রীবিশ্বনিন্দুক রায় ওরফে বি, এন, রায় প্রণীত ; মূল্যের কথা বিশেষ কিছু লেখা নাই। লেখকমহাশয়ের দুইটি নাম দেখিলাম ; একটি বিশ্বনিন্দুক রায়, অপরটি বি, এন, রায়। প্রথম নামটি যদি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এ পুস্তকের সমালোচনা না করিলেও চলে। আমরা প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মহাবিভ্রাটেই পড়িয়াছি। এই বিশ্বনিন্দুক রায় বা বি, এন, রায়, কি যে বলিতে চান, কি যে বুঝাইতে চান, তাহাই ভাবিয়া আমরা কূলকিনারা পাইতেছি না। অধুনা বাঙ্গালাদেশে অনেক মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঘরে অর্থ থাকিলে পুস্তক ছাপাইবার আর কোন ভয় নাই। কিন্তু অর্থ থাকিলেই যে এমনভাবে তাহার অপব্যয় করিতে হইবে, ইহা অর্থনীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। লেখক বলিতেছেন, তাঁহার বয়স এখন চুয়ান্ন বৎসর, সুতরাং তিনি বৃদ্ধ মানুষ। এ বুড়াবয়সে ঘরে বসিয়া ভগবানের নাম করিলেই ভাল হয়। দেশের লোককে হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র শিখাইবার ভার রায়মহাশয় স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া যোগ্যতর হস্তে সে ভার সমর্পণ করিয়া এই বৃদ্ধবয়সে সাধনভজনে মনঃসংযোগ করিলে তাঁহার পারত্রিকের মঙ্গল হইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। বুড়ামানুষের সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা আমরা সঙ্গত মনে করিলাম না।

আশীর্ব্বাদ।

সে এক শিশিরসিক্ত স্নিগ্ধকান্তি হেমন্ত নিশায়
তপ্তবক্ষে মোর
আনি দিল অকস্মাৎ ক্ষুদ্র এক শিশুর পরশ
কি শান্তি বিভোর।
হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে কি অপূর্ব্ব স্নেহের নিক্কণ
নবতর তানে
মুহূর্ত্তে উঠিল বাজি, কি উদাস সুখের আবেশ
জাগিল পরাণে।
স্নিগ্ধশান্ত স্বরগের সজীব সে জ্যোতিটি তখন
যেন অকস্মাৎ
উন্মুক্ত করিয়া দিল জীবনের সম্মুখে আমার
নূতন প্রভাত।
উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের দৃঢ়স্থির মন্দিরমাঝারে
আমি তারে ল'য়ে
সংসারের উর্ম্মিময় সিন্ধুবক্ষে চলেছি ভাসিয়ে
শতঘাত সয়ে।
আজি দুইবর্ষশেষে শুভ তার জনমের দিনে
আসুক ভাসিয়া
ঐ দূর স্বর্গ হ'তে শিরে তার দেব-আশীর্ব্বাদ
যাক্ বরষিয়া।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী।

চাকমার ভাগ্যচক্র।

মইচাগিরি বিজয়ের পর আরাকানাধীশ্বর চাক্‌মারাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাঁহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়ে। বলিতে কি, আর উঠিতেই পারিলেন না। নানাবিধ চিকিৎসার ফলে রোগের উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু নিরাময় হইল না। সেই দীর্ণ-জীর্ণ-জীবনে আর বল ফিরিয়া আসিল না! অধিকন্তু দিন দিন শক্তি খর্ব্ব হইতে লাগিল। যাহা হউক, এস্থানে আমাদের আর একটী কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। প্রাগুক্ত বর্ণনায় দেখা গেল, চাক্‌মারাজ ইয়ার্‌জকে অপর এক স্বতন্ত্রজাতিরই আধিপত্য দেওয়া হইয়াছিল। এবং রাজপুত্রগণের মধ্যে চোফু এবং চতু বিজাতীয় রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। সুতরাং কেবল যুবরাজ চতুর হস্তেই দলিতাবশেষ চাক্‌মাদিগের আধিপত্য ছিল; অর্থাৎ ইহাই একমাত্র প্রকৃত চাক্‌মারাজ্য। অপরতঃ এই বিপ্লবে চাক্‌মাজাতি হইতে সহস্র সহস্র লোক দৈংনাকনামে অন্য এক শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তাহারা সময়ে নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহের সহিত বিবাহসম্বন্ধও চালাইয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে আচার-ব্যবহারে চাক্‌মাদিগের সহিত বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিয়াছে।

মূল চাক্‌মারাজ্য।

কিন্তু কালক্রমে চাক্‌মাদিগের এই অবশিষ্ট রাজ্যও রহিল না। কিয়ৎকাল পরে * আরাকানের প্রধান মন্ত্রী পাঙ্গাঙ্গ্য রাজাকে জানাইলেন যে," উচ্চব্রহ্মের চাকমারাজ মংছুই বৌদ্ধধর্ম্মের আচার-

---

* [illegible]

নীতি রক্ষা করিতে চাহেন না ; তিনি তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করেন। সৎলোকের উপদেশমতেও চলেন না, অসৎ লোকের পরামর্শ ধরিয়া কার্য্য করেন। পাপকার্য্যের প্রতিই তাঁহার অনুরাগ বেশী। তাঁহার কোনও ধর্ম্ম নাই। পরন্তু মগরাজার উপর এযাবৎ তদীয় পূর্ব্বপুরুষের নির্য্যাতন-ক্রোধ রহিয়াছে।" এই সংবাদে মগরাজ বিচলিত হইয়া মংজাম্রু হইতে চাক্‌মারাজাকে তাড়াইলেন। তখন তিনি উপায়ান্তরবিহনে প্রজাবর্গসহ আরাকানেরই অন্তঃপাতী কলোদাই নদীকূলে চাক্যেই ধাঁও নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। কিন্তু এখানেও তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কিছুকাল যাইতে না যাইতেই মংছুইর পুত্র মরেক্যজের সহিত আরাকানপতির পুনরায় সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়।

মইচাগিরি হইতে বিতাড়ন।

এই যুদ্ধে মরেক্যজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং তাহাতেই বাধ্য হইয়া তিনি প্রজাবৃন্দসমভিব্যাহারে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন (৭৮০ মগাব্দ, ১৪১৮-১৯ খৃঃ অঃ)। বাঙ্গালার (চট্টগ্রামের) নবাব তাঁহাদিগকে বারখানি গ্রামে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা হীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর ক্রমে এখানেও তাঁহাদের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়।* চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী মাতামুড়ী নদীকূলে "অলিকদম +" নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামে আশ্রয়।

---

* দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদফুং, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

+ 'অলিকদম' অধুনা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের 'শঙ্খ-মাতামুড়ি রিজার্ভ' ভুক্ত

এইখানে আসিয়া অবধি সেই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে আর কোন গোলযোগের নিদর্শন নাই। ষোড়শ শতাব্দির প্রারম্ভে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল (১৫১২ খৃঃ অঃ)। তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও মগ এই জাতিত্রয়ের রুধিরধারায় চট্টগ্রাম রঞ্জিত হয়। ত্রিপুরার মহারাজা ধন্য-মাণিক্যের বিশ্বস্ত সমরনীতিতে সেনাপতি

চট্টগ্রামে শক্তিত্রয়ের সংঘর্ষণ।

মহাবীর রায় চয়চাগ হনুমান-মুর্ত্তিশোভিত, বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ সুলতান সৈয়দবংশীয় আলাউদ্দিন ওয়াদ্দিন আবুল মোজাফর হুসনসাহের * সৈন্যগণ অর্দ্ধচন্দ্র-রঞ্জিত, এবং প্রবলপরাক্রান্ত আরাকানাধিপতি মেং রাজার সৈন্যসমূহ বৃষভ-লাঞ্ছিত পতাকাহস্তে চট্টলের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শেষ ফলে মুসলমান ও মগদিগের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সেনাপতি চয়চাগ চট্টলবক্ষে বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপন করেন। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত হুসনসাহ ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। পুনঃপুনঃ

---

* বাঙ্গালার ইতিহাসে হুসনসাহকে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, আমরা কেবল এখানে তদীয় জীবনীর কয়েকটী বিশেষ কথা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-কারের সংগৃহীত সংবাদ হইতে সংক্ষেপে পাঠকগণকে দেখাইব ;—হুসনসাহ প্রথমে সুবুদ্ধিরায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের সামান্য ভৃত্যমাত্র ছিলেন। একদা কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলাপ্রদর্শন করায় সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন। অনন্তর তিনি রাজসরকারে প্রবেশ করিয়া উজিরীপদ পাইলেন, শেষে ১৪৯৪ খৃঃ অঃ সম্রাট্ মুজাফরসাহ নিহত হইলে গৌড়ের সম্রাট্ হইলেন। তিনি পূর্ব্বে উড়িষ্যার অনেক দেবদেবীমুর্ত্তি ভগ্ন করেন ; কিন্তু পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার-ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার শাসনকার্য্য আকবরের ন্যায় আদরণীয়। অন্ততঃ তিনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। 'পরাগলীভারতের' ভূমিকায় আছে—"নৃপতি হুসন সাহ হ'য়ে মহামতি। পঞ্চম গৌড়েতে যাঁর পরম সুখ্যাতি॥ অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার। কলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ-অবতার॥" শ্রীকর-নন্দী বিরচিত ভারতে আছে "নসরতসাহ (পুত্রের নাম) তাত অতি মহারাজা

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। অপরতঃ ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকানরাজ অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। অনন্তর বৈরনির্য্যাতনমানসে তিনি বলসংগ্রহে তৎপর হইলেন। এ সময়ে অলিকদমের চাকমানরপতিরও উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। অবশেষে ৮৭৯ কি তৎপূর্ব্ব মগাব্দে (১৫১৬-১৭ খৃঃ অঃ) মগরাজার সেনাপতি ছেন্দুইজা চাকমাধীশ্বরকে পরাভূত করেন। তৎকালে চট্টগ্রামসহরে মুরাচিন-নামা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আরাকানাধিপতি ছাদ্দেগ্রী নামক মন্ত্রীর অধীনে ৪০০০ সৈন্য দিয়া স্থলপথে চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়াই মুরাচিন নারায়ণগঞ্জে পলাইয়া যান; সুতরাং চট্টগ্রাম অতি সহজেই ছাদ্দেগ্রীর হস্তগত হইল।* তখন মগরাজা কিছুদিন এই বিজিত রাজ্যে বাস করিলেন। পরে ৮৭৯ মগির ৫ই পৌষ (খৃঃ অঃ ১৫১৭) জিয়োয়াঙ্গানামধেয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঢাকায় গমন করেন। এই সময়ে অন্যদিকে মগাধিপতির পুত্র ইরেমং সন্দিপ, হাতীয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় সৈন্যসামন্তের সহিত নোয়াখালির অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরে গিয়া রহিলেন।

চাক্‌মারাজাকে পুনর্জয়।

১৫ই মাঘ (১৫১৮ খৃঃ অঃ) চাক্‌মারাজ চমুই বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক আরাকানরাজার চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার যোগে দুইটী শ্বেতহস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন।

মগরাজকে উপঢৌকন।

* "রাজমালা" গ্রন্থকারও বলেন "মহারাজা ধন্যমাণিক্য যৎকালে হুসন-সাহের সহিত সমরে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় আরাকানপতি নির্ব্বিবাদে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৬৩৯ শকাব্দে (১৫১৭-১৮ খৃঃ) পর্ত্তুগীজভ্রমণকারী জন, ডি, সেলবেরা আরাকানরাজকর্ত্তৃক আহূত হইয়া চট্টগ্রাম পরিদর্শনপূর্ব্বক মগরাজ্যে গমন

মগরাজ ঢাকায় থাকিয়া ৮৮০ মগাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ধাবাংগ্রীর নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে রাজা ছেন্দুইজাকে ধাবাংগ্রীর কার্য্যে চট্টগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন। ছেন্দুইজা আসিয়া দেখিলেন যে, ধাবাংগ্রীর পত্র সম্পূর্ণ সত্য নহে। চাকমারাজা যে হস্তিদ্বয় উপহার পাঠাইয়াছেন, সেইগুলি বস্তুতঃ শ্বেতহস্তী নয়। কাল হাতারই গায়ে চূণ মাখাইয়া শুভ্রবর্ণ করা হইয়াছে। পরন্তু ঈদৃশ প্রতারণায় ক্রোধান্বিত হইয়া এই উপহারসহ আগত চাকমারাজার মন্ত্রিচতুষ্টয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ধাবাংগ্রী বুঝাইয়া দিলেন 'ইহা চাক্‌মারাজার শঠতা নহে; এদেশে শ্বেতহস্তী পাওয়া যায় না— তাই এই উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, শ্বেতহস্তী না হইলে আরাকানাধীশ্বরের যথোচিত উপঢৌকন হয় না, ইহা চাক্‌মারাজ অবগত আছেন। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জনীয়।' তথাপি ছেন্দুইজার ক্রোধের উপশম হইল না, তিনি মন্ত্রিগণকে ছাড়িলেন না। ক্রমে এ সংবাদ মগরাজার কাণে পৌঁছিল। তিনি ছেন্দুইজাকে ধাবাংগ্রীর হস্তে পুনরায় চট্টগ্রামের শাসনভার রাখিয়া চাক্‌মামন্ত্রিগণ ও হস্তীদুইটিসহ ঢাকায় তৎসমীপে আসিতে আদেশ দিলেন। ছেন্দুইজা ভয়ে এই মন্ত্রীদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে লইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা উভয়পক্ষের বিবরণী শুনিয়া ছেন্দুইজাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,— 'তুমি রাজবংশসম্ভূত হইয়াও, পণ্ডিত ধাবাংগ্রী যাহা বলিলেন, মূর্খের মত, জংলীর মত—অহঙ্কারে হিতাহিত বিচার না করিয়া তাহা শুন নাই। আরও কিছুকাল জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করহ।' অতঃপর একটী উদাহরণ দিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রামের মহাপাঙ্গাগ্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং চাক্‌মারাজার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "কোংরাপ্রু" (মহাশয়) খেতাব ও মন্ত্রিগণকে বাঙ্গালীদিগের

ব্যবহার্য্যানুরূপ বহুমূল্য পোষাকাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ৮৮১ মগাব্দের ১৩ই মাঘ (১৫১০ খৃঃ অঃ) আরাকানপতি ঢাকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে চট্টগ্রামে উপনীত হইলে চাকমারাজ কোংলাপ্রু "ছাজাংইয়ু" নাম্নী তদীয় দুহিতাকে উপহার অর্পণ করিলেন।

১৫২০ খৃঃ অব্দে ধন্যমাণিক্যের কনিষ্ঠপুত্র দেবমাণিক্য ত্রিপুরা-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১৫২২ খৃষ্টাব্দে মগরাজ গজাবাদিকে পরাজিত করত চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে হুসনসাহের উপযুক্ত পুত্র সুলতান নাছিরদ্দিন নছরথসাহ * স্বর্গগত পিতৃদেবের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত সেনাপতি পরাগলখাঁ † এবং তৎপুত্র

নছরথসাহ।

* হুসনসাহেব রাজত্বের ন্যায় তদীয় কৃতী সন্তানের শাসনকালও সর্ব্বত্র প্রসংশনীয়। তিনিও বাঙ্গালাভাষার অতিশয় উৎসাহদাতা ছিলেন। পণ্ডিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর তৎকৃত মহাভারতে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরথ খাঁন।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥"

এই 'ভার•পাঞ্চালী'তেও তিনি সাহিত্য-জগতে পরিচিত থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন চট্টগ্রামে তাঁহার প্রভূত যশঃসৌরভ ছিল। এমন কি, হুসনসাহের পরিচয় দিতে শ্রীকরনন্দী 'নসরথসাহ তাত' লিখিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ আরও বহুকাল ধরিয়া চট্টগ্রামের জনসাধারণ তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে। বৈষ্ণবপদাবলীতেও তাঁহার কথা আছে;—

"সে যে নসিরা সাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে॥"
("সাধনা" শ্রাবণ, ১৩০০।)

† পরগল খাঁ পরলোকগত সুলতানসাহেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন;—

"নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান্ হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥

ছুটিখাঁর * বাহুবলে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। † এসময়ে চাকমারাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী কাহার অঙ্কশায়িনী ছিলেন, ইতিহাসলেখকগণ তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া না গেলেও, ইহা বোধ হয় অভ্রান্ত যে, চট্টগ্রামের সৌভাগ্যনেমির পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই চাকমারাজের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। চট্টগ্রাম অধিকারের পর নছরৎসাহ সেনাপতি পরাগলখাঁকে তাহার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়মাণিক্য রাজা হইয়া পুনর্ব্বার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। পরে ত্রিপুরাধিপতি উদয়মাণিক্যের সহিত মোগলদিগের ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরাসৈন্য এবং মাত্র ৫ হাজার মুসলমানসৈনিক বিনষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম মোগলদিগের অধিকারে

লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলিলেন হরষিত হৈয়া॥
পুত্র, পৌত্র রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি॥"

ইহা "পরাগ্নীভারতের" ভূমিকা হইতেই উদ্ধৃত। পরাগল খাঁর অনুজ্ঞাক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বরনামক জনৈক ব্রাহ্মণ মহর্ষি জৈমিনির 'ভারত সংহিতা' অবলম্বন করতঃ এই মহাভারত প্রণয়ন করেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং পরাগলখাঁর নাম সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। ইহা ছাড়া ফেণীতীরে (চট্টগ্রাম) মিরেশ্বরী থানার অধীন 'পরাগলপুরে' 'পরাগলের দীঘি' ও পরাগলখাঁর প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে যে "লস্করের দীঘি" আছে, তাহাও বোধ হয় এই লস্কর পরাগল খাঁর খনিত।

* "পরাগ্নীভারতে" আছে,—

"তনয় যে ছুটী খাঁন পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল॥"

বাস্তবিক ছুটী খাঁ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। অমিত বাহুবলের ন্যায় বাঙ্গলাসাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অসীম অনুরাগ দেখিতে পাই। পিতার অনুকরণে শ্রীকরনন্দী দ্বারা তিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব অনুবাদ করাইয়া লয়েন।

"শঙ্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটী খান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা।"

কবির আত্মকথা—

"অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারোক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥"

বর্ণনায় কল্পনার অবাধগতি আছে বটে, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বহুমূল্য রত্নবিশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই।

† নছরথসাহার চট্টগ্রাম-বিজয়-কীর্ত্তি অদ্যাপি কেন, আরও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিঘোষিত হইবে। তিনি যেখানে কটক সংস্থাপন করেন তাহা (চট্টগ্রাম সহর হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের জন্মভূমি) "ফতে (য়া) বাদ" অর্থাৎ বিজয়স্থান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তথায় সুলতান এক বৃহৎ দীঘিকা খনন করিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় আধ মাইল এবং প্রস্থও দৈর্ঘ্যের তিন-চতুর্থাংশ হইবে। "পা(হা)ড়"গুলি যথার্থই পাহাড় সদৃশ, শীতকালেও ১২ হাতের অধিক জল থাকে। ইহা নছরথ বাদসার "বড় দীঘি" নামে চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট পরিচিত। এতদ্ভিন্ন দীঘিরই সন্নিকটে তিনি যে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা কালের করালগ্রাসে ভূমিসাৎ হইয়াছিল, কিছুদিন হইল স্থানীয় মুসলমান অধিবাসিবর্গ তাহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, সুলতান নছরথসাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়া বৃদ্ধ মাতৃসমীপে তাঁহার কোন্ সৎকার্য্যে অভিলাষ আছে, জানিতে চাহিলেন। তিনি একটী দীঘিকা খননের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। নছরথসাহ প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি যতদূর পর্য্যন্ত অশ্রান্তভাবে চলিতে পারেন, ততদূর দীর্ঘ দীঘি খনিত হইবে। পুত্রের মহৎ সংকল্পে আশাতীত সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধা জননী চলিতে আরম্ভ করেন। অনেক দূর গেলে, সুলতানের মন্ত্রীর কৌশল-জালে পড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। ততদূর দীঘিকাখনন ও তৎপার্শ্বে প্রাগুক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া নছরথসাহ মস্‌জিদাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক বলিলেন 'আজ হইতে মাতৃঋণ পরিশোধ করিলাম'। ইহা বলিতে না বলিতেই মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পরন্ত নছরথসাহার এই অপমৃত্যু

বায়, কিন্তু তাঁহারাও অধিক দিন ইহা ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানাধীশ্বর মেংফালোং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ত্রিপুরা লুণ্ঠনপূর্ব্বক মেঘনাতীরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন।

এই যুদ্ধের কিছুকাল পরে তোঙুরাজ আরাকানেশ্বরসমীপে বহুবিধ উপঢৌকন দ্রব্যসহ খ্রিদংজা কাহাঙ্গা নামক দুই জন দূতকে পত্র লইয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।* তাহাতে প্রস্তাব ছিল, যদি মগরাজ সাহায্যদানে পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় যুবতী কন্যা ও শ্বেতহস্তী উপহার প্রদান করিবেন। আরাকানপতি ইহাতে সম্মত হইলেন এবং চাকমারাজ কোংলাগ্রু, কুকে, ত্রিপুরা, মুরুং, রোয়াঙ্গা, খিসা প্রভৃতি সামন্তনরপতি ও বাঙ্গালার বার দেশের শাসনকর্ত্তাকে উপযুক্ত লোকের হস্তে কার্য্যভার রাখিয়া রণসজ্জায় তদীয় অনুসরণের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সকলে গিয়া উপস্থিত হইলে চাকমারাজার অধীনে ৩০০০০ সৈন্য ও মগরাজার এক মন্ত্রী থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ৯৬০ মগিতে (খৃষ্টীয় ১৫৯৮-৯৯ সনে) যুদ্ধযাত্রা করিয়া মুগ্ধামানগরের ঈশানকোণে ছারোয়াম্রাঙা খালের পথে কামলপাহাড়ের উপর চাকমারাজ কোংলাগ্রুকে ৩০০০০ সৈন্যসহ রাখিলেন। অতঃপর চাকমারাজার খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়াতে তিনি নিকটবর্ত্তী (শ্যামের রাজধানী) বাঙ্ককরাজার উপরে পতিত হয়েন, এবং রাজার কনিষ্ঠভ্রাতা বাচাময়কে ধৃত করিয়া আরাকানাধীশ্বরের সম্মুখে আনিয়া দিলেন।

চাকমারাজার অধিনায়কত্ব।

অতঃপর এদিকে ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমরমাণিক্য (১৫৯৭ খৃঃ অঃ) সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া (১৬০৯-১০ খৃঃ অঃ)

পুনরায় আরাকানপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাহাতে জারমগ্

অমরমাণিক্য।

বারবার পরাজিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এইবার তাঁহাদের সহায়তায় ত্রিপুরা পরাভূত হয়। অমরমাণিক্য আবার আক্রমণের চেষ্টা করিলে, আরাকানপতি এই বৎসর যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করেন। ত্রিপুর-রাজ ইহাতে সম্মত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি অনতিবিলম্বেই শুনিতে পাইলেন, মগ্‌রাজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। তিনি তিন পুত্রকে বৃহৎ একদল সৈন্যের সহিত পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে, মগ্‌রাজ ভয়ে গজদন্তবিনির্ম্মিত একটী রাজমুকুট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই মুকুট-গ্রহণের নিমিত্ত কুমারগণের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হইল; অন্যদিকে আরাকানাধীশ্বর সেই সংবাদ শ্রবণে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে

পর্ত্তুগীজবীর্য্য।

বুঝিয়া ত্রিপুরসৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করতঃ পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে উদয়পুর লুণ্ঠনপূর্ব্বক ত্রিপুরাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া গেল (১৬০১১ খৃঃ অঃ)। ইহার পর চট্টগ্রাম আর ত্রিপুরার অধীন হয় নাই। অন্ততঃ ১৬১০ খৃষ্টাব্দে অমরমাণিক্যের পৌত্র ত্রিপুরাপতি যশোধরমাণিক্য দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের মোগলসৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত হন।

চট্টগ্রাম মগরাজার কুক্ষিগত হইল * বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্য সবিশেষ বর্দ্ধিত হইল। যে সময়ে মগ্ ও পর্ত্তুগীজেরা চট্টগ্রামবাসীদিগকে জ্বালাতন করিতেছিল, সেই সময়ে

মগ্ ও পর্ত্তুগীজ অত্যাচার।

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইস্‌লামখাঁ মস্‌হোদী ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন।

---

* এই সময় হইতে চট্টগ্রামে [illegible]

সঙ্কটে পড়িয়া তত্রত্য মগ্‌-শাসনকর্ত্তা মুকুটরায় ইস্‌লামখাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মগ্‌রাজ আবার চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। অনন্তর সায়েস্তাখাঁ বাঙ্গালার কর্ত্তৃত্ব পাইয়াই মগ্‌দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্যদর্শনে তাহাদিগকে নানা প্রলোভনে * বঙ্গে আনিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন (১৬৬৬ খৃঃ অঃ)। † এইরূপে আরাকানাধীশ্বরও চিরদিনের নিমিত্ত চট্টগ্রাম হারাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রতম চাক্‌মারাজ্যও মোগল-সম্রাটের অধিকারভুক্ত হইল।

বলা বাহুল্য, "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং"ও অতঃপর চাক্‌মারাজার আর কোন সংবাদ রাখেন নাই। অবশ্য চট্টগ্রামের ইতিহাস তজ্জন্য যাহা কিছু দায়ী! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পার্ব্বতীয়গণের প্রতি প্রাচীন ইতিহাসে কোন সহানুভূতির পরিচয় নাই। কেন যে ইহাদিগকে তাঁহাদের আলোচনা হইতে বাদ রাখিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ দেখি না। সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক অবলম্বন হারাইলাম। তথাপি সম্পুর্ণ আশ্রয়ভ্রষ্ট নহি। ইতিহাস অতীতের প্রায় সীমান্তপ্রদেশে আনিয়া

---

* পরন্তু মর্শিমানের মতে সায়েস্তা খাঁ ধমক দিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে বশীভূত করেন (vide—Marshman's History of Bengal—p. 36)। অপরন্ত পর্য্যটক বার্ণিয়ার স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, সায়েস্তা খাঁ উৎকোচের প্রলোভনে পর্ত্তুগীজদিগকে ভুলাইয়া শেষে কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলে প্রতিশ্রুতিপালনে কুণ্ঠিত হয়েন। (Bernio's travels in the Magul Empire. Vol. I, p. 203)।

† হাণ্টার (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VI—p. 113) প্রমুখ অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মতে নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া "ইস্‌লামাবাদ" আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ইস্‌লাম খাঁ মস্‌হাদ্দী চট্টগ্রাম জয় করিয়া স্বীয় গৌরবচিহ্ন স্মরণীয় রাখিতে এই নামকরণ করিয়াছিলেন(Marshman's History of Bengal)। শেষোক্ত মত গ্রহণ করিতে ঐতিহাসিকদিগের আপত্তি কি, বুঝিলাম না।

ছাড়িয়া পলাইয়াছে! আর কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেই আমাদের লক্ষ্যমন্দিরের শৃঙ্গমণি পরিলক্ষিত হইবে। এই পথটুকু অপরিচিত সত্য, দুর্গম হইতে পারে—কিন্তু অগম্য নহে। বিশেষতঃ সংবাদ পাইয়াছি, আমাদের গন্তব্য পথের স্থানে স্থানে সেই পরিচিত প্রাচীনমন্দিরের ইট, স্তম্ভ, বরগা, কড়িকাঠ প্রভৃতি যথেষ্ট রহিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের সামান্য অবসরে দুরন্ত কাল তাহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারে নাই!

উপরি উক্ত কথাকয়টির বিশদব্যাখ্যাস্বরূপে এস্থলে লিখিতে হয়, পূর্ব্বে আমরা চাক্‌মারাজার রাজধানীস্থাপনের উল্লেখমাত্র করিয়া আসিয়াছি। প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, রাজবর্ত্ম, দীর্ঘিকা, ইত্যাদি অদ্যাপি তাঁহাদের মহতী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। পরন্তু এই সমুদয় প্রাচীন ঐশ্বর্য্য যে অপরের নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক-ভিত্তি ব্যতিরেকে দেশপ্রচলিত জনশ্রুতিও বিশেষরূপে সপ্রমাণ করে।

অলিকদম।

এই সেইদিনও অলিকদমের নিকটবর্ত্তিনী মাতামুড়িনদীজলে চাক্‌মা-বর্ণাঙ্কিত কয়েকটি বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি লামাষ্টেসনের হেড্‌কনষ্টেবল শ্রীযুক্ত নালকমল বড়ুয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর চট্টগ্রামের মানচিত্রখানি খুলিলে চাক্‌মাদিগের গতি-বিস্তৃতির সহজেই সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাস তুচ্ছ করিতে পারে; কারণ ইহাতে কামান-গোলাদির প্রবল সংঘর্ষণ নাই, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তারবিহীন টেলিগ্রামের দ্বারা সংবাদপ্রেরণের সুবিধাও ছিল না। কিন্তু ভূচিত্র তাহা আপনার বক্ষদেশ হইতে মুছিয়া ফেলিতে সাহস করে নাই। "পৃথিবী সর্ব্বংসহা" তাই বুঝি তচ্ছিদ্রগুলিও এ সমুদয় কাঁটাকম্পাসের চিহ্ন যত্নসহকারে জড়াইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। সত্যকথা বলিতে কি, আমাদের দেশের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি এ যাবত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

জানিবার অনেক কথা ফুটিয়া বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে, অথচ সাধারণের গোচরীভূত হইবার উপায় নাই। সংবাদ ও সাময়িকপত্রের দ্বারা সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূর হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও 'যখন-তখন' মাত্র—স্থায়ী নহে। অধুনা বঙ্গের অনেক লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা 'যা-তা' না লিখিয়া এদিকে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন এবং তাঁহাদের যশোভাতিও অধিকতর উজ্জ্বল হইবে—সন্দেহ নাই।

প্রাচীন বাসস্থান।

কক্সবাজারের দক্ষিণে 'জুমিয়াপাড়া' নামে দুইটি গণ্ডগ্রাম আছে। এই দুই জুমিয়াপাড়ার মধ্যস্থলে 'মগ-পাড়া' নামক অপর একটি প্রাচীন গ্রাম দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রামবাসীদিগের নিকট প্রধানতঃ চাক্‌মারাই 'বুঝিয়া' (জুম্যো) নামে পরিচিত। সুতরাং প্রথমোক্ত গ্রামদুইটি—চাক্‌মাগণ এবং শেষগ্রাম যে মগগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম অধ্যুষিত হয়, তাহা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই স্থানগুলি আরাকানের সীমান্তপ্রদেশের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। চাক্‌মারাজ আরাকান হইতে বিতাড়িত হইয়া

মগরাজার পত্র।

চট্টগ্রামের নবাবের কাছে এই সমুদয় গ্রাম লইয়াই বারদেশে বসতিস্থাপনের অনুমতি লাভ করিয়া থাকিবেন। আর সেই সময় কতিপয় মগও যে চাক্‌মাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। ইহার সার্দ্ধতিনশত বৎসর পরেও আরাকানের অবশিষ্ট কোন কোন চাক্‌মা এবং তত্রত্য মগ্‌গণের একযোগে পলায়নসংবাদ পাওয়া যায়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মসম্রাট্ সম্পূর্ণরূপে আরাকান জয় করেন, সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ পাইয়া বহুসংখ্যক আরাকানবাসী

নিরীহগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আরাকানের শাসনকর্ত্তা চট্টগ্রামের সরদার (Chief) কে, সেই সকল দুষ্ট লোকদিগকে প্রত্যর্পণের নিমিত্ত বন্ধুভাবে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এযাবত চট্টগ্রাম কমিশনার আফিসে রক্ষিত আছে। ইহাতে পাওয়া যায়,—

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

* * "ডোমকান চাক্‌মা, কি-কোপা লাইছ, মুরুঙ্গ, এবং অপর কতিপয় আরাকাণবাসী এক্ষণে আপনার সীমান্তপর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে। অধিকন্তু তাহারা নাফ্‌নদীর মোহানায় জনৈক ইংরাজকে হত্যা করিয়া সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, অপহরণ করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া আমি সসৈন্যে তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আপনার সীমায় আসিয়াছি। তাহারা দস্যুতাচরণের দ্বারা সম্রাট্‌কে অমান্য করিয়া, স্বরাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছে।

"ইহাদিগকে এবং যে সকল মগ্ কোন সময়ে দেশ হইতে পলাইয়া আসে—তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে, আপনার রাজ্য হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই আপনার উচিত। তাহা হইলে আমাদিগের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং পথিক ও ব্যবসায়িগণ নিরাপদ হইবে।

"যদি আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া না দেন, তবে আমি আবশ্যকানুরোধে সশস্ত্রসৈন্যদলের সহিত, তাহারা আপনার রাজ্যের যে কোন অংশে থাকুক্—খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হইব।

"মহম্মদ ওয়াহিদ দ্বারা আমি এই পত্র পাঠাইলাম। ইহা পাইয়া হয়ত আপনার রাজ্য হইতে আমার প্রজাগণকে তাড়াইয়া দিবেন, আর যদি

'জুমিয়াপাড়া'র প্রায় ১৭ মাইল উত্তরে 'ধামাইপাড়া' অদ্যাপি বর্ত্তমান। চাক্‌মাদিগের প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় 'ধানাইগোহার' বসতি হইতে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে এবং ইহার কিঞ্চিদুত্তরেই 'ধুর্য্যাদীঘি' 'ধুর্য্যা'বংশের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ধামাইপাড়া ও ধুর্য্যাদীঘির মধ্যভাগে দুইটি 'পাগলাবিল' * বাঘখালী নদীর দক্ষিণে সমুদ্রপ্রান্তে 'পাগলামুড়া' এবং 'গাভুরমুড়ি' নদীর নিকটবর্ত্তী আর একটি 'পাগলাবিল' প্রভৃতি কীর্ত্তিপীঠসমূহ চাক্‌মাদিগের প্রাচীন নরপতি 'পাগলারাজাকে' অমর করিয়া রাখিয়াছে।

চাক্‌মা-আখ্যা।

অলিকদমের নিকটবর্ত্তী নদীত্রয়—'মাতামুড়ি', 'গাভূরমুড়ি' এবং 'বুড়ামুড়ি' নামে প্রখ্যাত। ইহাদের সকলেরই সাধারণ আখ্যা 'মুড়ি' অর্থাৎ 'মুড়া'-(পাহাড়)-নিঃসৃতা। স্রোতোবেগানুসারে মাতা, গাভুর (যুবক) এবং বুড়া (বৃদ্ধ) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। 'গাভুর' শব্দটি চাক্‌মাদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত, এখনও তাহাদের সমাজে (অবিবাহিত) যুবককে নির্দ্দেশ করিতে ইহা ভিন্ন তেমন কোন শব্দ নাই। অপরন্ত, চাক্‌মাগণের মধ্যে দেখা যায়, গুণ বা কার্য্য লইয়া ব্যক্তি বা বংশ প্রভৃতি আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং স্রোতের বেগে মাতা, বুড়া ও গাভূর কল্পনায় বিশেষণ ঠিক্ করিয়া পাহাড় (মুড়া) হইতে প্রবাহিত স্রোতস্বতীর 'মুড়ি' নাম ইহারাই দিয়াছে—নিশ্চিত অনুমান করা যায়। এবং চাক্‌মাগণ যেরূপ অনুকৃতিবাদী তাহাতে, নাকের (নাসিকার) ন্যায় 'টেক' (বাঁক) দেখিয়া বর্ত্তমান "টেকনাকের" † নাম ও ইহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত—সহজে মনে আসে।

---

* মাঠবিশেষ। এদেশে এমন কি চট্টগ্রামেও মাঠকে "বিল" বলা হইয়া থাকে।

এই 'মাতামুড়ি' নদীতে অলিকদমের কিয়দ্দূরে 'তৈলছরী' নাম্নী উপনদী আসিয়া পতিত হইয়াছে। ইহারই তীরভূমিতে মগদিগের (সম্ভবত সেনাপতি হিন্দুইজার) সহিত চাক্‌মা-রাজার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এতৎসম্বন্ধে একটি গান আছে।

প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র।

*   *   *   *

"যুদ্ধ হইল তৈলছরী
মোড়ের মাথায় বে দিলাক
দু'ন রাজার কিল হলাক্॥"

অর্থাৎ তৈলছরীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যখন নদীর মোড়ের মাথায় গর্ভস্থ চর ভাসিয়া উঠিল, তখন—শীতকালে উভয় রাজার মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইল।' এই বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আর এই অলিকদমেরই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত-নিঃসৃতা বাঘখালী নদীর উত্তরপারে "চাক্‌মাকুল" এবং দক্ষিণপারে "রাজকুল" নামে দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। শুনা যায়, মগ্‌রাজার সহিত চাক্‌মাপতির বিবাদ মীমাংসিত হইয়া এই বাঘখালী নদী উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ফলতঃ, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। যতই বিরুদ্ধ প্রমাণ খুঁজিয়াছি, বিশ্বাস ততই দৃঢ়তর হইয়াছে। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, বাঘখালীর উত্তরতীরে 'ওয়াঝাগোহার' প্রাচীন বসতিস্থান 'ওয়াংঝামুড়া' মস্তক উত্তোলন করিয়া অতীতগৌরব ঘোষণা করিতেছে।

সীমানির্দ্দেশ।

অনন্তর মাতা মুড়ি দিয়া ক্রমশ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে নদীতীরের অনতিদূরে 'রাজাবিল' নামে প্রকাণ্ড মাঠ এবং তাহার প্রায় ১৫ মাইল ব্যবধানে 'রাজবাড়ী' অভিধেয় গ্রাম ও এক উপনদীর

'রাজঘাটা' প্রভৃতি পাওয়া যায়। এসকল স্থান এখনও চাকমারাজার অধিকারে রহিয়াছে। পরে শঙ্খনদ পার হইয়া খালবিশেষের দ্বারা কিছুদূর আসিলে শিলকনাম্নী উপনদীর উৎপত্তিস্থলে উপনীত হওয়া যায়। এই শিলকতীরে ভূতপূর্ব্ব চাক্‌মারাজা শুকদেব রায়ের অক্ষয় যশোমন্দির "শুকবিলাস" অবস্থিত। অদ্যাপি তদীয় 'বিলাস'পুরীর ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা, দীঘি, এবং চতুষ্পার্শ্ববেষ্টিত পরিখা ইত্যাদি প্রাচীন রাজমহিমা দর্শকসাধারণকে জানাইতেছে, ইহা এখনও চাক্‌মারাজার শাসনাধীন।

শুকবিলাস।

শিলক যে স্থানে আসিয়া কর্ণফুলিতে * আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে রাঙ্গুনিয়া পরগণা অবস্থিত। সাধারণে ইহাকে "রাউণ্যা" বলে। চাক্‌মাগণ পরিত্যক্ত জুমকে "রাণ্যা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং সহজেই প্রতীত হইতেছে যে, চাক্‌মাদিগের আবাদিত জুমের 'রাণ্যায়' লোকবসতি হইয়াছে। অনুমান ৩০০ তিন শতাব্দী পূর্ব্বে এই পাহাড়-ময়দেশ ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ক্রীড়াস্থল ছিল। এখনও এদেশের সর্ব্বত্র আবাদ হয় নাই, এবং আম-কাঁঠাল-প্রভৃতি গ্রামোপযোগী বৃক্ষাদিও

"রাউণ্যা" বা রাঙ্গুনিয়া।

---

* কর্ণফুলী—লুসাইপর্ব্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহারই উত্তরতীরে প্রায় মোহনাসন্নিধানে চট্টগ্রামনগর অধিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই একস্থলে বলিয়াছি, কর্ণফুলীর কিয়দংশ 'কাইচা' বা 'কাঞ্চী' নামে প্রথিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সমুদয় কর্ণফুলীনদী একমাত্র কাইচা নামে উল্লিখিত আছে। বোধ হয় ইহা দেখিয়াই কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন (A fly on the wheet—p. 184), "ইহার আদি নাম "কাইচা খাল।" কর্ণফুলী নামকরণ সম্বন্ধে তিনি একটি আখ্যান ও বলিয়াছেন। তাহা যথা—'কোন চট্টগ্রামের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তার বেগমের 'কর্ণফুল' (কর্ণাভরণবিশেষ) এই নদীজলে পড়িয়া

তাহা প্রাচীন নহে। অত্রত্য "গোঁয়াইর : বিল" * জঙ্গলাকীর্ণ দেখিয়াছে এমন অনেক লোক অদ্যাপি জীবিত আছে। নূতন আবাদিত জমির ন্যায় রাঙ্গুনিয়ার উর্ব্বরতা চট্টগ্রাম ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ। অন্নক্লিষ্ট অনেক দরিদ্র এখনও আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে। চট্টগ্রামে একটি কথাই রহিয়াছে,—

"হাতে কাঁচি † কোমরে দা
ভাত খাইলে রাউণ্যা যা।"

সারার্থ এই—'যদি স্বচ্ছন্দে উদরনিষ্পত্তি করিবার আশা থাকে, তবে হাতে কাস্তে ও কোমরে দা লইয়া রাঙ্গুনিয়ায় যাও।' এই বাক্যে আরও কিছু সত্য আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কৃষির উপকরণ দা এবং কাস্তে মাত্র সঙ্গে লইবার উপদেশ আছে; এই দুইটী উপকরণ জুমিয়াদের অনন্যোপকরণ। অতএব সহজেই ধরা যায়, কৃষকগণ এদেশে চাক্‌মাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল।

রাঙ্গুনিয়ায় চাক্‌মারাজার বিস্তৃত অধিকার এবং অপরাপর প্রধান প্রধান দেওয়ানগণেরও 'ছোট বড়' অনেক প্রাচীন জমিদারী রহিয়াছে।

রাজকীয় কীর্ত্তি-পীঠ।

এখানে ভূতপূর্ব্ব চাক্‌মারাজা ধরমবক্স খাঁর মহিয়সী মহিষী কালিন্দীরাণীর স্থাপিত (পক্কো) "রাজার হাট" ও "রাণীর হাট"

'কর্ণফুলী' আখ্যা হইয়াছে। কিন্তু এদেশে প্রসিদ্ধি আছে, 'দক্ষযজ্ঞত্যক্তপ্রাণা সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ভোলানাথ যখন ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ভগবতীর কর্ণফুল কেণী (উর্দ্ধকর্ণাভরণবিশেষ) ও শঙ্খ গহণাত্রয় চট্টগ্রামেরই নদীতিনটিতে পতিত হইয়াছিল, সেই হইতে নদীত্রয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

* গোঁয়াইর বিল—একটি প্রকাণ্ড মাঠ। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৫ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৩ মাইল হইবে, এখনও সম্পূর্ণ আবাদ হয় নাই। বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইলে সমুদ্রপ্রায় বোধ হয়।

† এদেশে ও চট্টগ্রামে 'কাস্তে'কে সাধারণ 'কাঁচি' বলা হয়।

এবং 'ধাঁমাই গোহার' কীর্ত্তি-চিহ্ন "ধাঁমাইর হাট" সুদূর ভবিষ্যৎ ধরিয়া চাক্‌মারাজ-প্রভাব ঘোষণা করিবে। সম্ভবতঃ রাজা জানবক্স খাঁ এখানে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর সার্ হেন্‌রী কটনও * ইহা স্বীকার করিয়াছেন। † অনন্তর তিনিই বোধ হয় রাজধানীস্থাপিত গ্রামের নাম "রাজানগর" রাখিয়াছেন। রাজবাড়ী অবশ্য ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে। সম্মুখে "রাজার দীঘি" পরবর্ত্তী রাজা টব্বর খাঁ কর্ত্তৃক খোদিত হইয়াছিল। তৎপার্শ্বে যে অন্য একটি "রাজার হাট" আছে, রাজা জব্বর খাঁর কীর্ত্তি বলিয়াই অনুমত হয়।

বিস্তার।

'জুম' চাক্‌মাদিগের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য। সুতরাং তাহাদিগের আবাসস্থানের স্থিরতা নাই। কেননা, এক বৎসর যেখানে জুম করা হয়, ৫.৬ বৎসর যাবত পতিত না থাকিলে তাহাতে আর জুম করা চলে না। তাই নিয়ত নূতন স্থানে জুমক্ষেত্র অনুসন্ধান আবশ্যক হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আবার জুমের নিমিত্ত পাহাড় প্রয়োজন। এই কারণে চাক্‌মাগণ ক্রমে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পরন্তু রাজধানী বহুকাল ধরিয়া রাজনগরে ছিল, পরে যখন চাক্‌মাগণের প্রায় সকলেই এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ সম্ভবতঃ রাজা জব্বর খাঁ পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের প্রায় মধ্যবর্ত্তী কর্ণফুলী নদী দ্বারা ত্রিপার্শ্ব-বেষ্টিত রাঙ্গামাটিতে ‡ এক অস্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন।

---

* সার হেনরী কটন পরে আসামের চিফ্ কমিশনার হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে স্বদেশে (লণ্ডনে) থাকিয়াও সতত ভারতবাসীর মঙ্গলচেষ্টা করেন।

† Revenue History of Chittagong—p. 189.

‡ কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যপ্রভাবে এই উপনগরী "রঙ্গমতী"

রাজা মধ্যে মধ্যে পরিদর্শনোপলক্ষে আসিয়া এখানে থাকিতেন। এইরূপে রাজা ধরমবক্স খাঁর সময় পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। তদীয় মহিয়সী মহিষী কালিন্দীরাণীর শাসনকালে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের ব্রিটিশপ্রতিনিধির বাসস্থান চন্দ্রঘোণা হইতে গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় অফিসাদি রাঙ্গামাটি উঠিয়া আসে। তখন রাণী বাধ্য হইয়া তদীয় অস্থায়ী আবাসশৈল ইংরাজকর্তৃপক্ষকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; তাহাতে এখনও চাক্‌মাধীশ্বরের যত্নে রোপিত দুইটী কাঁঠাল গাছ রহিয়াছে। রাজবাসস্থানেরই ভিত্তির উপর ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তার সুরম্য "বাংলা" অধিষ্ঠিত হয়। কাপ্তেন লুইন ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে "Barnhouse" (খামার বাড়ী) নামকরণ করিয়াছিলেন। *

রাঙ্গামাটি।

অনন্তর রাণীকালিন্দী কর্ণফুলীর পরপারে অপর এক আবাস স্থান নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজন না ঘটিলে তিনি রাজানগরের বাড়ী পরিত্যাগ করিতেন না।

বর্ত্তমান রাজবাটী।

অনন্তর তাঁহার মৃত্যু হইলে, দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণের প্রস্তাবে বিভাগীয় কমিশনার ইহাও উল্লেখ করেন যে, † "যদি কাহাকেও জাতিবিশেষের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, পদোচিত সম্মান অব্যাহত রাখিতে হইলে তাঁহাকে সেই জাতির মধ্যেই বাস করিতে হইবে, প্রজাগণ যেন সহজেই তাঁহার নিকটে যাইতে পারে। সুতরাং বাবু

আখ্যা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ রাঙ্গামাটিনাম্নী ক্ষুদ্র উপনদী ও কর্ণফুলীনদীর সঙ্গমস্থলেরই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান রাঙ্গামাটি নামে প্রসিদ্ধ। এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের স্থানগুলির নামকরণে এই সাধারণ নিয়ম।

* A Fly on the wheet—p. 373.

হরিশ্চন্দ্র ডেপুটিকমিশনারের শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যেই থাকিবেন। * চট্টগ্রামে তাঁহার কিছু জমিদারী আছে। ডেপুটি কমিশনার বলেন, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছেন। জাতিবিশেষের কর্তৃত্বরূপ গুরুতর ভার হইতে কিঞ্চিন্মুক্ত থাকিতে (?) তিনি (রাঙ্গানগর) 'দেশে' † থাকিতে ইচ্ছা করেন। তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর কমিশনার মহোদয়ের এতাদৃশ প্রস্তাবনায় আদেশ ‡ দিলেন যে, "দেখা যায় পাহাড়ে চাক্‌মাদিগের মধ্যে থাকিয়া রাজকীয় কর্ত্তব্য পালন হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য হইবে। এবং তিনি কালিন্দীর রাণীর ন্যায় বাঙ্গালীগণ দ্বারা (যাহাদিগকে চাক্‌মাগণ বিন্দুমাত্র ভালবাসে না) পরিবেষ্টিত হইয়া 'দেশে' বাস করিতে ইচ্ছা করেন। সেই নিমিত্ত ইহা বলা যায় যে, পর্ব্বতীয়গণের মধ্যে বাস করিবার জন্য তাঁহার সহিত বন্দোবস্তির এক সর্ত্ত থাকিবে, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে জেদ্ করাও হইবে।

সেই হইতে চাক্‌মারাজা রাঙ্গামাটিতে স্থায়িরূপে বাস করিতে আরম্ভ করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পরলোকগত হইলে সম্পত্তি কিছুকাল ম্যানেজারের হস্তে থাকে। অতঃপর বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবধি অত্রত্য রাজধানীর পারিপাট্যসাধনে মনোযোগী হইয়াছেন। পূর্ব্বে এই রাজভবনের অবস্থা অতি সামান্যমাত্র ছিল, যথোপযুক্ত গৃহাদিও ছিল না। এক্ষণে ক্রমশঃ যথাবিধি সংস্কার

রাজা ভুবন-মোহন।

---

* ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর পত্রেও লেপ্টেনাণ্টগভর্ণরবাহাদুরের এইরূপ আদেশ ছিল।

† 'দেশ' বলিলে পার্ব্বত্যপ্রদেশের বহির্ভূত সমতল দেশ (Plain) বুঝিতে হইবে।

হইতেছে। যদিও অদ্যাপি রাজপুরীর সমতুল্য হয় নাই, কিন্তু উন্নত জমিদারবাড়ী অপেক্ষা মন্দ নহে। যাদৃশ আয়োজনের সহিত কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কালে ইহা যে নয়নমনোহারী হইবে—আশা করা যায়। অপরতঃ রাজানগরের বাড়ীতে কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় মহোদয় থাকিয়া তত্রত্য জমিদারী শাসন করিয়া থাকেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

গিলগিট-কাহিনী।

(১)

কাশ্মীর-শ্রীনগরের একশত চৌদ্দ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গিল্‌গিট্ অবস্থিত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে অনেকেই এই স্থানের নাম জানিতেন না, কিন্তু চিত্রল-অভিযানের পর হইতে আর সে কথা বলা যাইতে পারে না।

গিল্‌গিট্ শব্দ সংস্কৃত গিরিট্ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ এই স্থানটিও বড়ই গিরিসঙ্কুল। উহার অধিবাসিবৃন্দ 'গিলিট্' বলিয়া উক্ত স্থানকে অভিহিত করিয়া থাকে।

গিল্‌গিট্ সর্ব্বপ্রথম ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর-মহারাজের অনুজ্ঞায় তদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ নাথি সাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তৎকালে গোহর আমন নামে খুমোয়াক্তিবংশীয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক গিল্‌গিট্ শাসিত হইত। গোহর গিল্‌গিটের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন না; শিকান্দার খাঁ ও তদ্ভ্রাতা করিম খাঁই উহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী

করিম খাঁ সাহায্যের নিমিত্ত কাশ্মীরে পলায়নপর হন এবং পরে নাথি সাহের সেনাপত্যে সৈন্সসামন্ত সহ প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ গোহরকে পরাজিত করেন। গোহর বিনাযুদ্ধেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া যশিন (Yasin) অভিমুখে প্রস্থান করেন। তৎপর শিকান্দর খাঁ ও করিম খাঁ কর্ত্তৃক রাজ্য অধিকৃত হয়। ইহার কিয়দ্দিবস পরই কোনো কারণে কাশ্মীর-রাজ স্বহস্তেই গিল্‌গিট-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তৎপর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তথায় ইংরাজরাজের আধিপত্য (British Agency) স্থাপিত হয়।

গিল্‌গিটের বর্ত্তমান অধিবাসীর বেশির ভাগই শিয়াসম্প্রদায়ের মোসলমান, মুন্সী ও মৌলাইর সংখ্যা অল্প। রোনো, শিন্, জেম্‌কুন, কাশ্মীরী, ক্রামিন, দাম্ এবং গুজার—প্রধানতঃ এই কয়েক জাতির লোকই দৃষ্টিগোচর হয়। মধ্যে আবার বিভাগ আছে ; তাহাদের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষগণের নামানুসারে এই সকল সম্প্রদায় অভিহিত হইয়া থাকে। গিল্‌গিটের পলিটিক্যাল এজেণ্টের আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গোলাম মহম্মদ, গিল্‌গিট্‌বাসীদিগের আচার-ব্যবহার ও তদ্দেশের প্রবাদ-গল্প, প্রভৃতি বিষয়ে একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ গত বৎসর জুলাই মাসে কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীতে পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার মতে ক্রামিনগণই গিল্‌গিটের আদিম অধিবাসী এবং জেম্‌কুন, শিন্ ও রোনো প্রভৃতি যথাক্রমে আগমন করিয়া প্রাচীন অধিবাসিগণকে পরাজিত করে। তিনি আরো বলেন যে, জেমকুনরা সম্ভবতঃ আর্য্যবংশ, মধ্যএসিয়া হইতে হিন্দুকুশ হইয়া তথায় উপস্থিত হয়। আদিম অধিবাসীদের হইতে ইহারা শক্তিশালী হওয়ায়, ইহারা তাহাদিগকে পরাজয় করে এবং পরে 'ক্রামিন' নামকরণ করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় দাসরূপে পরিণত করে। 'ক্রামিন'

শিনগণ আরবীয় বংশসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা সম্ভবতঃ ইহুদী ; পারস্য কিম্বা তুর্কিস্থান হইতে আফগানিস্থান দিয়া আগমন করে। ইহারা স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী পছন্দ করে এবং যেখানেই ইহারা থাক্ না কেন, এই প্রাচীন শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতেই যত্নবান হয়। শিনগণ ইস্লামধর্ম্ম আলিঙ্গন করার পূর্ব্বে হিন্দুদের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত ব্যবহার করিত না, কুক্কুট পালন করিত না এবং এমন কি মৎস্যাহারও পছন্দ করিত না। একজন শিন্জাতীয় পুরুষ যদি দুইটী বিবাহ করে এবং তাহার একটী যদি জেম্কুন জাতীয়া এবং অপরটী যদি স্বজাতীয়া রমণী হয়, তবে প্রথমার গর্ভজাত পুত্র কন্যা জেম্কুন জাতীয় এবং দ্বিতীয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্র কন্যা শিন্জাতীয় বলিয়া অভিহিত হয় ও পরিচিত হইবে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহাদের বংশ মাতৃপক্ষ হইতে গণনা করা হয়।

রোনোগণ কাশ্মীরের অধীন রাজাউরীনামের এক জেলা হইতে আইসে বলিয়া শোনা যায়। ইহারা নাকি তথাকার এক রাজ-পরিবারভুক্ত।

গুজরগণ নবাগত।

এতদ্ব্যতীত তথায় 'রা' নামক তদ্দেশীয় পূর্ব্বতন মোসলমান শাসন-কর্ত্তাগণের বংশসম্ভূত একটী পরিবার আছে। প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারা শতদ্রু হইতে আগমন করতঃ আলেকজাণ্ডার সিগ্রেটের বংশধর বলিয়া প্রচার করে। গিল্গিটের অধিবাসিবৃন্দের ধারণা যে, উহারা পরীবংশসম্ভূত। এবং ইহা হইতেই জনসাধারণের বিশ্বাস যে, তাহাদের শাসকগণ উচ্চজাতীয়, কাজেকাজেই তাহাদিগকে সম্মান এবং তাহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হয়।

গিল্গিটের অধিবাসিবৃন্দ অতি সরল, বিলাসিতাবর্জ্জিত। তাহাদের

যাহা কিছু দরকার তাহা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। মেষের লোমদ্বারা তাহারা যে বস্ত্রবয়ন করে, তদ্বারা পা-জামা, সার্ট ও টুপি প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহাই তাঁহাদের প্রধান পরিচ্ছদ। 'পাব্বু' নামে একপ্রকার চর্ম্মপাদুকা তাহারা পায়ে দেয়। এই পাব্বু সচরাচর গোচর্ম্ম বা মেষচর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত হয়। গিরিশৃঙ্গে আরোহণ-কালে তাহারা পদের উর্দ্ধভাগ—হাঁটু পর্য্যন্ত চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়া থাকে।

তাহাদের প্রধান আমোদ—পোলোক্রীড়া; এবং মাংস ও চর্ম্ম সংগ্রহের নিমিত্ত নানাজন্তুশীকার।

অতিপূর্ব্বে সংস্কৃতই ইহাদের কথিত ভাষা ছিল, কিন্তু এক্ষণে যে ভাষায় তাহারা কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে, তাহাকে 'শিনা' বলে কিন্তু চিত্রলীরা তাহাকে 'ডানগ্রিক্' বলিয়া থাকে। ইহাতে প্রভূত সংস্কৃত ও পারস্য শব্দ মিশিয়া গিয়াছে।

এই সকল জাতি বহুদিন হইতে একত্রে বসবাস করিতেছে। ইহারা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই নানারূপ উৎসব আমোদে অতিবাহিত করিত। কিন্তু জীবনসংগ্রামের কঠোরতা সর্ব্বত্রই ক্রমশঃ অনুভূত হওয়ায় এই গ্রাম্য সরল বিলাসহীন জাতিরাও একটু একটু বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের আর সেরূপ আগেকার মত জাতীয় উৎসব বা আমোদ প্রমোদ নাই। যাহা না করিলে নয়, সংসারাশ্রমে থাকিতে হইলে স্ত্রীপুত্রের ও নিজের মঙ্গলের নিমিত্ত যে সকল ক্রিয়া-কলাপ ও দৈবকার্য্য একান্ত করণীয়, কেবল তাহাই এখন তাহারা করিয়া থাকে মাত্র। আমরা শ্রীযুক্ত গোলাম মহম্মদ মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে, তৎসমুদয়ের বিবরণ 'ভারতীর' পাঠকমহোদয়গণের নিকট পরে উপস্থিত করিব। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমি গিল্‌গিটের ঐতিহাসিক

মূলক উপাখ্যান হইতে দেশের অতীত অবস্থা ও শাসনপ্রণালীবিষয়েও কিছু জ্ঞানলাভ হইবার সম্ভাবনা। এবং আমার বর্ণিত বিষয়গুলি বিচিত্র বলিয়া পাঠকগণের কৌতুককরও বিবেচিত হইবে।

মনুষ্যখাদক শ্রীবদৎ।

কোনো সময়ে গিল্‌গিটে শ্রীবদৎ নামে এক সরদার বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ তাঁহার প্রজাগণের নিকট হইতে একটী করিয়া মেষ উপহার পাইতেন। একদিন ভোজন করিবার সময় তিনি মাংসগুলি অতি মুখরোচক দেখিয়া বিস্মিত হন। তিনি কুল্‌চিনকে (পাকের দারোগা) ডাকিয়া আজকার মেষ কোথা হইতে আনা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন। কুল্‌চিন তখনই কোটালকে তৎবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে যে, বারমাজ গ্রামের একটী রমণী ঐ মেষ প্রদান করিয়াছে। অবিলম্বে হাজির হইবার জন্য রমণীর প্রতি আদেশ হইল। এই অকস্মাৎ তলবের কারণ বুঝিতে না পারিয়া রমণীটি অতিশয় ভীতা হইল। সে সরদারকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দর্শনও করে নাই। কম্পিতপদে রমণী দরবারে হাজির হইল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া সরদার যে প্রশ্ন করিলেন, তচ্ছ্রবণে রমণীর আশঙ্কা বিদূরিত হয়। রমণী উত্তর করিল,—'আপনার মঙ্গল হোক্ গিল্‌গিটের মহান্ অধীশ্বর! এই মেষের জননী প্রসবের অল্পদিন পরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; শাবকটি সুদর্শন হেতু আমার বড়ই প্রিয় ছিল। শাবকটিও মাতার অনুসরণ করে এই আশঙ্কায়, সে যতদিন ঘাস খাইতে না শিখে ততদিন আমি স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা ইহাকে পোষণ করি। কয়েক দিন হইল সেই মেষ-শাবকই হুজুরকে দেওয়া হইয়াছে।" শ্রীবদৎ রমণীর কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া বিদায়

লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, মনুষ্যের বক্ষসুধা কয়েক দিন পান করিয়া যখন মেষশাবকের মাংস এত মিষ্ট হইয়াছে, তখন না-জানি মনুষ্যের মাংস—যাহারা আজন্ম মনুষ্যের দুগ্ধেই বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের মাংস কতমিষ্ট! এইরূপ স্থির করিয়া তিনি আদেশ করিলেন যে, এখন হইতে মেষের পরিবর্ত্তে একটী করিয়া মানবশিশু তাঁহার আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ প্রজাবর্গকে দিতে হইবে। এইভাবে শ্রীবদৎ মনুষ্যখাদক হইয়া উঠেন।

গিল্‌গিট্‌-আক্রমণ।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীবদৎনামক গিল্‌গিটের এক সরদারের রাজত্বকালে আজুর নামে এক শতদ্রু-সরদারের পুত্র—খিস্‌রু, জামসেদ ও শামসেরনামক তিন রাজপুত্র গিল্‌গিটের দুই ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত দানিয়োর-নামক পল্লীতে নাকি উপনীত হন। দানিয়োর গিল্‌গিট্‌ ও হুন্‌জা (Hunza) নদীর সঙ্গমস্থল। ইহাঁরাই নাকি প্রথম মোসলমান সরদার, যাঁহারা শতদ্রু হইতে হুন্‌জা, নাগর, গিল্‌গিট্‌ প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশ জয় করিতে বহির্গত হন। তাঁহারা প্রথম দুইটী প্রদেশ অধিকার করিয়া শেষোক্তটি হস্তগত করিবার উদ্যোগ করিতে থাকেন। লোকে তাঁহাদের গিল্‌গিটে আগমন এবং সেই উর্ব্বর প্রদেশ অধিকার বিষয়ে একটী কৌতুককর গল্প বলিয়া থাকে। অধিবাসীরা বলে যে, রাজপুত্র-ত্রয় পরীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরীরাজ্য সেই অত্যুচ্চ গিরি-শৃঙ্গ হইতে পাখার সাহায্যে আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া দানিয়োরে উপস্থিত হন। একদিন তাঁহারা 'দানিয়োর খোঁ'তে একটী বন্যগোরু বিচরণ করিতে দেখিতে পান। তাঁহারা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে 'দানিয়োর খোঁ' প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটী

নিক্ষেপে ঐ গোরুটিকে বধ করিতে বলেন। জ্যেষ্ঠগণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন হেতু শামসের বলেন যে, তিনি আগে তীর নিক্ষেপ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার এ যুক্তি খাটিল না, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণ শর-নিক্ষেপের জন্য তাহাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কাজেই শামসের ধনুক গ্রহণ করতঃ গোপ্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া এমনি দক্ষতার সহিত শরনিক্ষেপ করিলেন যে, দুই মাইল দূরস্থিত সেই শরাঘাতে সে আহত হইয়া পড়িয়া যায়। দানিঁয়োরবাসিগণ শামসেরের এতাদৃশ নৈপুণ্য অবলোকন করতঃ বিস্মিত হইয়া কোলাহল করিতে করিতে পর্ব্বতের উপর গোরুটি আনিতে যায়। তাহারা তৎসকাশে যাইয়া দেখে যে, তীরটি উহার হৃদয়ে বিদ্ধ হওয়ায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। গোরুটি পল্লীতে আনীত হইলে, রাজপুত্রেরা আহারের নিমিত্ত উহার পিত্ত বাহির করিয়া ভাজিতে বলিলেন। মাংস প্রস্তুত হইলে খিসরু ও জামসেদ বলিলেন যে, যখন শামসেরের দক্ষতাতেই এই শিকার হইয়াছে, তখন এ পিত্তের ভাগ একা শামসেরেরই প্রাপ্য, সুতরাং একাই উহা আহার করিবেন। শামসের তাঁহাদিগকেও আহার করিতে প্রভূত অনুনয়-বিনয় ও অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। এইভাবে বাধ্য হইয়া শামসের একাকী আহার করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দুই তিন বার মুখে দিতে না দিতেই তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় উঠিয়া আকাশে উড়িয়া গেলেন, আর দেখা গেল না। শামসের তাঁহাদের অনুধাবনের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঐ মাংস আহারের ফলে তাঁহার দেহ এমনি ক্রিয়াসম্পন্ন হইল যে, ধরণীবক্ষ হইতে এক ইঞ্চিও উপরে উঠিতে তিনি সক্ষম হইলেন না। ভ্রাতৃগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের নির্দ্দয়তার কথা স্মরণ করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে সেই গ্রামে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিলেন।

দানিয়োর অধিবাসিগণ তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে এবং পরী-বংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহাকে তাহাদের অপেক্ষা উচ্চজাতীয় বলিয়া বিবেচনা করতঃ তৎপ্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। কয়েক মাস পরে শামসের কতিপয় পল্লীবাসীকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, এইমাত্র হাপুকর পর্ব্বতের (Hapukor Mountain) উপর (নোপুর ও নাইকু পল্লীর নিকট) তাহাদের অতিপ্রিয় একটী বৃহৎ মার্‌কর্‌কে (Markhor) ইতস্ততঃ উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতে দেখিলেন; তাঁর ইচ্ছা যে এখনই শরাঘাতে উহাকে বধ করা হোক্‌। গ্রামবাসীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, চার মাইল দূরে থাকিয়া তিনি একটী মার্‌কর (Markhor) দেখিতে পাইয়াছেন। তাহারা যদি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ না করিত এবং তিনি পরীবংশজাত বলিয়া যদি তাহাদের ধারণা না থাকিত, তবে তাঁহার এ কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করিত না। সুতরাং তাহারা সকলেই তাঁহাকে তাহার ইচ্ছা পূরণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শামসের শিকারের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া সর্ব্বশক্তি দ্বারা শরনিক্ষেপ করতঃ চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, মার্‌কর্‌ (Markhor) নিহত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহার সঙ্গে নিহত জন্তুকে আনিতে গমন করিল। তাহারা নোপুর নদীর ধার দিয়া পর্ব্বতে উঠিয়া শামসেরের নির্দ্দিষ্ট সেই স্থানেই উহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইল এবং শামসেরের এই কৃতকার্য্যে হর্ষ প্রকাশ করিল। বেলা দ্বিপ্রহর, গ্রীষ্মও অসহ্য; গ্রামবাসিগণ ক্লান্ত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছাদিত এক নির্ঝর দেখিতে পাইল। তথায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাহারা নিদ্রিত হইল। মাইওখই সোনাই—শ্রীবদতের এক কন্যাও গ্রীষ্ম অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতোপরি ঐ নির্ঝরের

নির্ঝরের নিকট আসিয়া আগন্তুকগণকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াভিভূতা হয় এবং ফিরিয়া যাইয়া তাহার কর্ত্রীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বর্ণন করে। তচ্ছ্রবণে কর্ত্রী অত্যন্ত রোষাবিষ্টা হইয়া তাঁহার সমুদয় দাসীকে আগন্তুকগণকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিতে আদেশ করেন। আদেশ প্রতিপালিত হয়। শামসের রূপবান্ যুবক, তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজকন্যার ক্রোধ দূরীভূত হয়। তিনি তৎকালোপযোগী রূঢ়বাক্যসমূহ বিস্মৃত হইয়া শামসেরকে অতি কোমল ও বিনম্রবাক্যে তাহার স্বাস্থ্য ও পর্ব্বতে আগমনের উদ্দেশ্যবিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাজকন্যা শামসেরের নম্র ব্যবহার ও সুন্দর চেহারায় এমনি বিমুগ্ধা হন যে, তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া ফেলন—

নিশ্চয়ই হইবে তুমি দেবতা মহান্,
পৃথিবীর কোনো কিছু নাই তব সমতুল।

শ্রীবদতের আত্মা।

শামসের বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাজকন্যা তাহা অগ্রাহ্য করতঃ রাত্রিবাসের নিমিত্ত সমাদরে আহ্বান করেন। তাহারা উভয়ে রজনীর অধিকাংশ ভাগ নানারূপ গল্পগুজবে অতিবাহিত করিলেন; রাজকন্যা মায়োথাই রাজপুত্র শামসেরের মুখে তাঁহার অদ্ভুতকীর্ত্তিকাহিনীসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে একবারে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে রাজপুত্র, মায়োর কোমলহৃদয়কন্দরে আসন প্রাপ্ত হইলেন। রাজপুত্রের নিকট এই কথা প্রকাশ হইলে, তিনি রাজদুহিতাকে তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় এক বিদেশীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে রাজার আত্মীয় বন্ধু সকলেরই সমূহ কষ্টের কারণ হইবে। কোমল স্বভাবা নৃপকন্যা এইকথা শুনিবামাত্র অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ

করিলেন এবং রাজপুত্রের চরণতলে পড়িয়া গেলেন। মায়োর এইরূপ ব্যবহারে শামসেরের চিত্তের গতি পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি তাঁহার অবর্ণনীয় মনোদুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা যুবতীকে সমাদরে উত্তোলন করতঃ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরে রাজা শ্রীবদতের হস্তে তাঁহাদের কি দশা হইবে, তাহা আর ভাবিতে পারিলেন না। রাজকন্যা যার-পর-নাই সন্তুষ্টা হইলেন এবং তৎপর তিনি যে সকল কার্য্য করেন, তাহা তাঁহার প্রীতিপ্রফুল্লতারই সাক্ষ্য দেয়। তিনি তাঁহার সমস্ত দাসীগণকে ডাকিয়া তাহাদের সম্মুখে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তিনি শ্রীবদতের কত আদরের ও সোহাগের কন্যা এবং সেই স্নেহের খাতিরেই যে তিনি এ বিবাহে সম্মত হইবেন, তাহাও মায়ো দাসীগণকে জানাইলেন। কিন্তু তাহাদের কেহ যদি অগ্রেই এসংবাদ শ্রীবদতের কর্ণগোচর করে, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণদণ্ড ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। দাসীগণ সকলেই কর্ত্রীর আজ্ঞা শুনিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিল যে, তাঁহার সুখেই তাহাদের সুখ, তিনি যাহাতে সুখী হন তাহাই তাহাদের অভিপ্রেত। তাহারা এই বিবাহের সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং শপথ করিয়া বলিতেছে যে, এসংবাদ অপর কাহাকেও তাহারা দিবে না। সেই রাত্রিতেই গোপনে তাঁহাদের উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। লোকে বলিয়া থাকে যে, মায়োথাইর আসল নাম শাকিনা আবার অপর অনেকের মতে—নুরবকৃত। পরদিন প্রাতঃকালে শামসের তাঁহার অপর সঙ্গীদিগকে স্বগ্রামে যাইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা গোপনে রাখিতে বলিয়া দিলেন। শামসেরের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি গিলগিটের সিংহাসন অধিকারের নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং তদুদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত তিনি পত্নীকে,

দাঁড় করাইবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। শাকিনার কর্ত্তব্যবুদ্ধি একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল; তিনি জনকের প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। শ্রীবদত রাক্ষসবংশধর, তীর বা তরবারির আঘাতে তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে না এবং তাঁহার প্রাণ যে কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কেহই জানিত না। সুতরাং শামসের সর্ব্বপ্রথম এই গুপ্তরহস্য জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদুদ্দেশ্যসাধন মনে রাখিয়া তিনি একদিন পত্নীকে বলিলেন যে, কোনো এক নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের পত্র যেদিন শুষ্ক ও পীতবর্ণ হইবে, সে দিন হইতে শাকিনা, আর তাঁহার পিতাকে দেখিতে পাইবে না। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরেই সেই বৃক্ষের পাতা শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে। তদ্দর্শনে শাকিনা, পিতার মৃত্যু হইয়াছে বিবেচনা করতঃ পর্ব্বত হইতে নামিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পিত্রালয়ে গমন করেন। কিন্তু তথায় উপনীতা হইয়া তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হন। তিনি পিতাকে বলিলেন যে, কিয়দ্দিবস গত হইল এক ফকির তাঁহার নিকট পর্ব্বতোপরি যাইয়া তাঁহাকে বলে যে, একটী নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের পত্র যেদিন পীতাভ ধারণ ও শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিবে, দুর্ভাগ্যক্রমে সে দিন তিনি পিতৃহীনা হইবেন। আজকে সেই বৃক্ষের পত্র পীতবর্ণ হইতে দেখিয়া, তিনি তাহা অমঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করেন এবং পিতৃভক্তির উত্তেজনায় দৌড়াইয়া পিতৃ-সকাশে উপস্থিত হইয়াছেন। বড়ই সুখের বিষয় যে, ফকিরের ভবিষ্যদ্বাণী অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীবদৎ উত্তর করিলেন,— "প্রিয় পুত্রি! পৃথিবীতে কেহই আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে না, যেহেতু কি পদার্থে আমার শরীর গঠিত তাহা কেহই অবগত নহে। যে পর্য্যন্ত এ রহস্য কেহ অবগত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার অনিষ্টের সম্ভাবনা কোথায়? আমার শরীরের অনিষ্ট করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।" শাকিনা বলিলেন যে, তাঁহার ...

জীবনের উপরই নির্ভর করে। পৃথিবীতে তাঁহার সমান প্রিয়পাত্রী আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট তাঁহার জীবন-রহস্য পরিব্যক্ত করিতে তিলমাত্রও ইতস্ততঃ করা বিধেয় নহে। ইহাতে কোনো দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিবেন এবং তাঁহার সদাশয় পিতার নিরাপদের নিমিত্ত তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া পিতৃভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন দেখাইতে পারিবেন। শ্রীবদৎ কিন্তু এই কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে অন্য কথার অবতারণা এবং কথার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনরহস্য গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাৎসল্যস্নেহেরই জয় হইল, তিনি কন্যার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিলেন যে, ঘি (ঘৃত) দ্বারা তাঁহার প্রাণ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং যেদিন প্রাসাদের ও দুর্গের চতুর্দ্দিকে সে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা দেখিতে পাইবে, সেই দিনই যেন বুঝিয়া লয়, তাহার হতভাগ্য পিতা পরলোকের যাত্রী হইলেন। কারণ ঘি অগ্নির উত্তাপেই গলিয়া যায়। শ্রীবদৎ তাঁহার জীবনকাহিনী কন্যার নিকট প্রকাশ করিবার সময় একটুও ভাবেন নাই যে, তিনি নিজকে বিপদাপন্ন করিবার নিমিত্তই ক্রূরহৃদয়া এক রমণীর নিকট তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া দিতেছেন এবং সে রমণী তাঁহার মৃত্যুই কামনা করিতেছে। শাকিনা কিয়দ্দিবস পিতার সহিত একত্রে বাস করিয়া, শৈল-আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তথায় তাঁহার স্বামী উৎকণ্ঠিত হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন। শাকিনা, পিতার নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তাঁহার নিকট তৎসমুদয় ব্যক্ত করিলেন। শ্রীবদতের মৃত্যুবাণ হস্তগত করিয়া শামসের আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িলেন এবং সেই বাণনিক্ষেপের বিলম্বমাত্র করিতে পারিলেন না। শ্রীবদতের মরণ-কাঠি হাতে পাইয়া শামসের স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার মোহন কল্পনা আঁটিতে লাগিলেন। তাঁহার যে সকল সঙ্গী তাঁহার

সহিত সেই পর্ব্বতে আসিয়াছিল, তিনি নাকি গোপনে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনেন। তিনি পরীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বিশ্বাসে, উক্ত সঙ্গিগণ শামসেরকে অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। শ্রীবদতের নিষ্ঠুরতারও পরিসীমা ছিল না। এই নির্দ্দয়তার জন্যই তিনি নরখাদক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গ শিশুপুত্রকন্যাগণের রক্ষার উদ্দেশ্যে এই নিষ্ঠুর নরখাদকের কবল হইতে উদ্ধারের উপায়ও অন্বেষণ করিতেছিল। সুতরাং অচিরেই শামসের তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের সহায়রূপে দানিয়োরবাসিগণের সহায়তা লাভ করিলেন। সঙ্গিগণ শামসেরকে সাহায্য করিতে এবং নিষ্ঠুর রাজার বিরুদ্ধে গ্রামবাসী-দিগকে উত্তেজিত করিতে প্রতিশ্রুত হইল। অধিকাংশ গ্রামবাসী তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলে পর, শামসের শ্রীবদতের দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্রচুর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত একটি দিন স্থির করিলেন। ধার্য্যদিবসে গভীর রজনীতে কার্য্যারম্ভ হইবে, স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনের কিছু পূর্ব্বে শামসের পত্নীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া ঘটনা গোপনে রাখিতে বলিয়া দিলেন এবং আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিতে তিনি নিজে দানিয়োরপল্লীতে গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্টদিনে রজনী তিন ঘটিকার সময়, সমস্ত গ্রামবাসী একটী করিয়া মশাল ও কিছু শুষ্ককাষ্ঠ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। শ্রীবদতের দুর্গ বর্ত্তমান গিল্‌গিটের পোলোক্ষেত্র হইতে দুইশত গজ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। গ্রামবাসিগণ দুর্গের কিয়দ্দূরে থাকিতেই শ্রীবদতের আত্মা অসুস্থ হইয়া উঠিল। তদ্ধেতু তিনি কন্যাকে বাহিরে যাইয়া এইরূপ অসুস্থ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। এই অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসহীনা রমণী, যিনি এই ষড়যন্ত্রের আমূল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, বহির্গত হইলেন এবং লোকজনদিগকে অধিকতর নিকটবর্ত্তী করাইবার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। পরে পিতা

সকাশে ফিরিয়া গিয়া বলিলেন যে, কোথাও কিছু হয় নাই। কিন্তু শ্রীবদৎ ক্রমশঃই বেশি অস্থির ও অসুস্থ হওয়ায় নিজেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময় তিনি বড়ই বিপদাপন্ন হন, কেননা শত্রুপক্ষ ইতিমধ্যে দুর্গ ঘিরিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিল। এই শঙ্কট-সময়ে তিনি ঐ দুষ্টা কন্যাকে শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, লম্ফপ্রদানে আকাশে উত্থিত হইয়া ইক্ষোমান উপত্যকার (Ikshoman valley) ছোতর খাঁ (Chotur khan) নামক তুষারাবৃত স্থান অভিমুখে উড্ডীয়মান হইলেন। কথিত আছে, পথিমধ্যে—গিলগিটের বারো-মাইল পশ্চিমে—যাশপুর (Jushpur) হিনজিল নামক এক মরু-প্রান্তে তিনি বিশ্রামার্থে অবতরণ করিয়া গ্রামবাসীদের নিকট শীতল পানীয় প্রার্থনা করেন। সেই গ্রামে প্রচুরপরিমাণে দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইত, এবং গ্রামবাসীরা তাহা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করিত। শ্রীবদৎ জল প্রার্থনা করিলে, তাহাদের একজন একপাত্র সুরা লইয়া উপস্থিত হয়। শ্রীবদৎ তাহা প্রত্যাখ্যান করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে, তিনি অগ্নির হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মার প্রভূত পরিমাণে অনিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অগ্নিদগ্ধ হইতে হইতে যে ব্যক্তি রক্ষা পাইয়া আসিয়া শীতল পানীয় প্রার্থনা করে, তাহাকে তৎপরিবর্ত্তে সুরা অর্পণ করা নিতান্তই অভদ্রতার পরিচায়ক। কিন্তু কেহই তাঁহাকে পানীয় প্রদান করিল না। শ্রীবদৎ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া গ্রামবাসিগণকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, যে দ্রাক্ষা হইতে তোমরা এই সুরা প্রস্তুত করিয়াছ এখন হইতে সেই দ্রাক্ষা আর এস্থানে উৎপন্ন হইবে না; এই দেশের সমস্ত ভূভাগ একবারে কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইয়া যাইবে। ঘটনাক্রমে পরবৎসর বরফের ধস্ গলিয়া প্রকৃতই তদ্দেশের কৃষিকার্য্য চিরদিনের তরে বিনষ্ট

বরফের ধসের নিম্নে লুকাইত হন। গ্রামবাসিগণের ধারণা তিনি নাকি এখনো তথায় অবস্থান করিতেছেন।

জনপদবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীবদৎ গিল্‌গিটে পুনরাগমন করিয়া বর্দ্ধিত আক্রোশে শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করিবেন। এই আশঙ্কায় তাহারা প্রতিবৎসর নবেম্বর মাসের যে তারিখে শ্রীবদৎ প্রস্থান করেন, সেই দিন রাত্রিতে প্রত্যেকে স্ব স্ব গৃহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া থাকে;—যেন শ্রীবদতের প্রেতাত্মা কিছুতেই পুনরাগমন করিতে না পারে।

টালিনো উৎসব।

এই দিন রজনীতে কেহই নিদ্রাভিভূত হইতে সাহস করে না, অগ্নির পার্শ্বে নৃত্যগীতাদিতে রজনী অতিবাহিত করিয়া থাকে। এই উৎসবকে 'টালিনো' বলে। তথায় 'কুলচিন' (শ্রীবদতের পাচক-পরিবার) নামে এক পরিবার আছে, তাহারা কিন্তু এই উৎসবে যোগদান করে না। কারণ, তাহারা এখনো প্রভুভক্ত ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী এবং শ্রীবদতের পুনরাগমনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। গিল্‌গিটে যত লোক বাস করে তাহাদের মধ্যে এই একমাত্র পরিবার যাহারা শ্রীবদতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। বিপক্ষদলের হস্ত হইতে এই পরিবার যে এপর্য্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই উৎসবের পরদিন অপরাহ্নে প্রতি পরিবার হিসাবে পাঁচটি করিয়া ছাগ কাটা হয়। আর এক বৎসর সেই নিষ্ঠুর সরদারের (শ্রীবদৎ) কবল হইতে রক্ষা পাওয়ায় আনন্দ প্রকাশার্থ এইরূপ ছাগ-বধ হইয়া থাকে।

নিসালো।

এই ছাগ-মাংস শুষ্ক করিয়া পরবর্ত্তী মাসের জন্য রক্ষিত হয়। শুনা যায়, এইদিন যে ছাগ বধ করা হয়, তাহার মাংস একবৎসর রাখিলেও নাকি নষ্ট হয় না। তাহারা এই উৎসবকে

কাটচাটা-সম্প্রদায়।

কোন সময়ে গিল্‌গিটে কাটচাটা নামে এক ধনী পরিবার বাস করিতেন। ইঁহারা পৃথক্ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই বসবাস করিতেন। মিঃ হেওয়ার্ড যে ফলোস্থানে সমাহিত হইয়াছেন, তাহারই সন্নিকট এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। কাটচাটারা এতই শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, গিল্‌গিট্‌সর্দ্দারকে পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতাপে কম্পান্বিত হইতে হয়। তিনি ইহাদের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন এবং তাহাদের প্রত্যেক কার্য্য অবলোকন করিয়াই সন্ত্রাসিত হইতেন। দিবাভাগে প্রকাশ্য সমর-সজ্জায় তাহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না ভাবিয়া, সর্দ্দার গভীর রজনীতে অকস্মাৎ এই বীর কাটচাটাদিগকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। সর্দ্দার এই নৈশ আক্রমণে এমনি কৃতকার্য্য হন যে, একটী গর্ভবতী রমণী ব্যতীত অপর কেহই সেই দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে পারে না। রমণীটি আক্রমণের সময় একটী ক্ষুদ্র জানালা গলাইয়া কারগাহ (kargah) উপত্যকা পর্য্যন্ত পলায়নপর হয়; তথা হইতে দারেলনামক এক নির্জ্জন পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে তাহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কাটচাটাদের অভাবে তাহাদের অধিকৃত কৃষিক্ষেত্র অকর্ষিতভাবে পতিত অবস্থায় থাকায়, রাওসর্দ্দার নিজেই সেই সকল ভূমি আবাদ করিয়া গম বপন করেন। কিন্তু তাহার পরিশ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বৃথা হয়। কারণ কাট-চাটাদের জমির শস্যসমূহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং তাহা ভক্ষণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়। সর্দ্দার ক্রমাগত পাঁচবৎসর ধরিয়া আবাদ করেন, কিন্তু পাঁচবারেই ঐরূপ অবস্থা সংঘটিত হওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া আবাদ হইতে বিরত হন এবং দানিয়ালকে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে আদেশ করেন। ইহারা নিজেদের চিরপ্রথামত চিলি-পত্র দগ্ধ করিয়া কারণ-নির্ণয়ার্থ ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করিল। পরে ঢাকের উপর কর্ণ স্থাপন

কর্ণস্থাপনের উদ্দেশ্য,—তাহারা নাকি এইভাবে ঢাকের কথা শুনিতে পায়, এবং জ্ঞাতব্যবিষয়ের উত্তর এইভাবেই নির্ণীত হয়। যাহা হোক্, ঢাকের নিকট হইতে এ ক্ষেত্রে এইরূপ বিশ্রুত হওয়া যায়,—

"গিল্‌গিটের ভূমির উর্ব্বরতা ও উৎকর্ষতা এবং শস্যের প্রাচুর্য্য কাটচাটাসম্প্রদায়ের সুখস্বচ্ছন্দতা এবং সৌভাগ্যের উপরেই নির্ভর করিত। সর্দ্দারকর্ত্তৃক তাহারা নৃশংসরূপে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় দেশের জমির অবস্থা এইরূপ হইয়াছে। এবং যে পর্য্যন্ত ঐ পরিবারের কোনো ব্যক্তি আসিয়া নিজের বৃষের সাহায্যে এইস্থানের ভূমিকর্ষণ এবং সর্দ্দারের আঙ্গরাথায় করিয়া শস্যবীজ লইয়া বপন না করিবে, সেপর্য্যন্ত এদেশের ভূমির অবস্থা এইভাবেই থাকিবে। অবশ্য এক আধমুঠা বীজ সর্দ্দারকেও বপন করিতে হইবে, কিন্তু অবশিষ্ট সেই কাটচাটাগণ বা তাহাদের অনুচরগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে। অপর কোনো অধিবাসীই যেন কৃষিকার্য্যে কাটচাটাদের অগ্রবর্ত্তী না হয়।" ভূমির অনুর্ব্বরতার এই কারণ জানিতে পারিবামাত্র সর্দ্দার প্রজা-মণ্ডলীকে আদেশ করিলেন, যেখানে হয় সেখান হইতেই কাটচাটা-সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তিকে আনয়ন কর এবং যে আনিতে সক্ষম হইবে, তাহাকে প্রচুরপরিমাণে পুরস্কৃত করা যাইবে। পুরস্কারের লোভে নানাদিকে নানাব্যক্তি ধাবিত হইল। যে ব্যক্তি দারেল ও তানজির অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, সে জানিতে পারিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হয় যে, কাটচাটাপরিবারের একটী রমণী হত্যাকাণ্ডের সময় দারেলে পলাইয়া আসিয়াছে এবং তথায় অবস্থান সময়ে একটী পুত্র প্রসব করিয়াছে। যে তাহার বাসস্থান অন্বেষণ করিয়া বাহির করিল, সে প্রভূত পুরস্কারের প্রলোভন এবং শরীর ও প্রাণের নিরাপদের প্রতিশ্রুতি করিয়া রমণীকে গিল্‌গিটে যাইতে রাজি করিল। এই ব্যক্তিই পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং রমণীটি সমগ্র অধিবাসিবৃন্দকর্ত্তৃক সাদরে

করেন ; সে বৎসর তিনি প্রচুরপরিমাণে শস্য প্রাপ্ত হন। অবশেষে এই কাটচাটার বিবাহ হয় এবং কালে চারিটি পুত্রের পিতা হয়। ইহাদের তিনটী—হুন্‌জা, নাগার এবং যাশিন—সর্দ্দারত্রয়ের অনুরোধে তত্তৎ প্রদেশে প্রেরিত হয়, কারণ ইহারা ঐশীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস হয় ; কেবল একটীমাত্র পুত্র গিল্‌গিটে বাস করিতে থাকে। এই সময় হইতে প্রথা হইয়া গিয়াছে যে, আবাদের সময় সর্ব্বপ্রথম সর্দ্দারের ভূমি কাটচাটাপরিবারের একব্যক্তি দ্বারা কর্ষিত হইবে, তৎপরে অন্যান্য ব্যক্তিরা কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে। হাল-কর্ষণ শেষ হইলে, বীজবপনের পূর্ব্বেই সর্দ্দার একটী প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন করেন। গ্রামের সকলেই এই উপলক্ষে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া খাওয়াদাওয়া আমোদআহ্লাদ ও নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। একজন কাটচাটার মুখে ময়দা মাখাইয়া দিয়া তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তৎপরে সে গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে বৃষের অনুকরণে সর্দ্দারের ক্ষেত্রঅভিমুখে গমন করে, তথায় সর্দ্দার স্বয়ং তাহাকে কিছু আহারীয় প্রদান করেন। এই খাদ্যসামগ্রী সে গ্রহণ করতঃ পশুর ন্যায় ভক্ষণ করে। অতঃপর বপনকার্য্য আরম্ভ হয় ; কাটচাটা মুষ্টিমেয় বীজ সর্দ্দারের আঙ্গরাখায় ফেলিয়া দেয়, সর্দ্দার তাহার সহিত সামান্য স্বর্ণচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ স্বহস্তে নিজের একখানি ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। অবশিষ্ট বীজ কাটচাটারা বপন করে ; তৎপর অন্যান্য সকলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া থাকে। এই দিনকে "চিলি" বলে। এই উপলক্ষে কাটচাটা, সর্দ্দারের নিকট হইতে একমণ ময়দা, পাঁচসের ঘৃত, একটি তাজ এবং একখানি আঙ্গরাখা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

চিলি উৎসব।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

বৈষ্ণব ভিখারীর গান।

জননি ! জনমভূমি ! স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি
নমি তোমা, নমি তোমা আজি শতবার ;
তোমারি পবিত্র নামে স্বর্গ আসে ধরাধামে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধূলায় তোমার !

জননি ! তোমার গেহ জননি ! তোমার স্নেহ
না বুঝিয়া এতদিন ঘুরি' রাজদ্বারে,
পড়ি' রথচক্রতলে আর্ত্তনাদে অশ্রুজলে
ভারত বধির করি দিছি হাহাকারে !
ত্রিশকোটি সহোদর ভেদমন্ত্রে পরস্পর
কলহে কাটায়ে দিছি কত দীর্ঘ দিন !
মোদের হৃদয়গুলি এখনো' মাখিছে ধূলি—
এখনো করিতে চায় তোমায় মলিন !

তোমার আহ্বান !

সকল বেদনা ব্যথা স্বার্থের পঙ্কিল কথা
অভিভবি তুলিয়াছে যেই সামগান—
তাহারি প্রেরণা বলে —অযুত হৃদয় তলে
জননি ! তোমার মূর্ত্তি করেছি স্থাপন !
তব মন্ত্র সাধনায় তোমারি চরণ ছায়
মরিলেও পাব মাতঃ ! অমর জীবন !
যাহা কিছু ভাল মন্দ যাহা কিছু দ্বিধা দ্বন্দ
দিয়েছি ও-পদতলে সব সমর্পিয়া ;
জননী জননা নামে জীর্ণ শত ছিদ্র প্রাণে
এসেছে বৈকুণ্ঠ-বন্যা বাঙ্গালা প্লাবিয়া !
ধন্য মোরা তোমায় পাইয়া !

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

তমালবনের তরু।

সুখময় বসন্তের সুমধুর প্রভাতে সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে করিতে দেখিলাম, প্রকৃতিসুন্দরী নবীন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া অলিরাজকে সমাদরে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক মনোমোহন বন্ধুবরের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। অনতিদূরে শ্যামসলিলা পুণ্যতোয়া যমুনা-তটে তমালের তপোবনে প্রেম ও ভক্তির নিকেতনস্বরূপ বৃন্দাবন-ধামবাসী ভক্তাধিকভক্তগণ, বিমানবিহারী বিহঙ্গবর্গের বিনোদকাকলি শ্রবণ এবং নবফুল্লফুলদলের চিত্তানন্দদায়িনী সুগন্ধি আঘ্রাণ করিতে করিতে, হৃদয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সহিত শ্রীহরির পতিতপাবন নামো-চ্চারণপূর্ব্বক যমুনাকুলকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। তাম্ররসম্বরভিসমতুল্য সুগন্ধিতে দিগদিগন্তামোদিত তমালবনের পার্শ্বে এক প্রবৃদ্ধ তরুবরকে দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যুগের পরে যুগ গত হইয়াছে, ঋতুর পরে ঋতু গত হইয়াছে, মাঘের পর মাঘ, জ্যৈষ্ঠের পর জ্যৈষ্ঠ এবং কত বর্ষার পরে কত অগণ্য বর্ষা বিগত হইয়া গেল, তথাপি এই প্রাচীন তরু ঐ তমালবনের সন্নিকটে অভ্রভেদী অত্যুচ্চাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া যেন অতীত শতাব্দীর পরে অতীত শতাব্দীর পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই প্রবৃদ্ধ তরুরাজ যেন যোগী বা মহাপুরুষের ঔদ্ভিদিক দৃষ্টান্তরূপে যমুনাকূলকে আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, নির্দ্দয় নিদাঘের প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডময়ূখমালার হুতাশনসম প্রভাবে, প্রাবৃটের গুরুগম্ভীর বজ্রনাদে, অথবা অবিরলজলধারায়, শীতের হিমানী, ভাদ্রের বন্যা, জ্যৈষ্ঠের করকাঘাত, কিম্বা গ্রামনগরবিধ্বংসী ঝটিকার

অবস্থিত ছিল যে, সহসা তাহার পতন হয় নাই। একদিবস তরুবর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এই অসীম অখণ্ডল বিশ্বমাঝে, এই অগণ্য প্রাণী, পদার্থ ও তরুলতার মধ্যে, আমি ক্ষুদ্র হইতে কত ক্ষুদ্রতর এবং ক্ষুদ্রতর হইতে কত ক্ষুদ্রতম! এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র, প্রবৃদ্ধ ও সামর্থ্যহীন তরুর আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমার শীর্ষদেশ অনন্ত আকাশকে ভেদ করিয়া এতটা উচ্চতায় উপনীত হইয়াছে যে, বিহঙ্গগণ আর উর্দ্ধশাখায় উপবেশন করিতে সম্মত হয় না; আমি পত্রবিহীন তরু অথবা কেবল শুষ্কপত্র-সমাচ্ছন্ন গাছ মাত্র, সুতরাং পরিশ্রান্ত পথিকেরা আমার ছায়ায় উপবেশন করিয়া শ্রান্তি অপনোদনপূর্ব্বক শান্তিলাভে অসমর্থ। পক্ষী বা পশু আমার তলে চরে না, আমার অঙ্গের বহু অংশ কীটকুলকর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং আর এই শুষ্ক ও অসার দেহভার বহন করিয়া মাতা বসুমতীকে ভারাক্রান্ত করি কেন? আমার দ্বারা কাহারও উপকার হইয়াছে বা হইতেছে, অথবা হইতে পারে, এমন কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার অস্তিত্বে! এই অসার জীবনে কোন ফল দেখি না। অতএব মৃত্যুই এক্ষণে শ্রেয়ঃ। আমি অকারণে অভ্রভেদী অত্যুচ্চ তরু না হইয়া যদি ক্ষুদ্র তৃণ বা শাক হইতাম, তাহা হইলেও পশু, পক্ষী বা কোন ক্ষুধিত দরিদ্র মানবের উপকারে আসিতে পারিতাম। ধিক্ আমার জীবনে; আমার পক্ষে মরণই শ্রেয়বিধি।"

কিছু দিবস পরে, বনস্বামিমহাশয় ভৃত্যগণসহ তমালবনের পার্শ্ব-দেশে আগমন করিয়া আদেশ করিলেন, "এই বৃদ্ধতরুকে ছেদন কর।" সহচর ও সেবকগণ তাহাই করিল; সুতীক্ষ্ণ কুঠারের আঘাতে প্রবৃদ্ধ মহীরুহ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইয়া গেল। পতনের সময়ে

হয়। এতকাল আমি বৃথায় এই ধরাধামের এক ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিতেছিলাম। হায়! এখন সকলই শেষ হইল।”

বৃক্ষের পতন হইলে পর, ব্রজধামের ভিষককুলগণ তরুবরের রাশি রাশি বল্কল লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা এক মহৌষধি প্রস্তুতপূর্ব্বক কতকগুলি দুশ্চিকিৎস্য রোগের দমন করিয়াছিলেন, ইহাতে বহুসংখ্যক হতাশ রোগীর প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তৈলব্যবসায়িগণ বৃক্ষের বীজ দ্বারা তৈল প্রস্তুত করায় ঐ তৈল রাত্রিকালে অগণ্য লেখক, পণ্ডিত, গ্রন্থকার সংবাদপত্র-সম্পাদক, বিদ্যার্থী, শাস্ত্রকার প্রভৃতিকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন রাজপথের লণ্ঠনে প্রয়োগ করিয়া নগরের অন্ধকার দূরীকৃত করা হইয়াছিল। কতকগুলি বীজ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বপন করায় ঐ বীজ পরিণামে অভ্রভেদী অত্যুচ্চ বৃক্ষে পরিণত হইয়া বৃন্দাবনের শোভা-বর্দ্ধন এবং ব্রজধামকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। নগরের বদান্য ও ধনবান লোকেরা বৃক্ষের পত্রে বিবিধ পাত্র প্রস্তুত করিয়া অসংখ্য অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক, দরিদ্র ও ভিক্ষুককে পরিতৃপ্তি-সহকারে ঐ পাত্রসমূহে অন্নাদি ভোজন করাইয়াছিল। সুগন্ধিদ্রব্যের বণিকগণ তরুবরের মূল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কয়েকপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুতপূর্ব্বক তাহা বিক্রয় দ্বারা অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গাছের কাষ্ঠে কত গৃহস্থের অন্নপাক, কত ঋত্বিকের “হোম”ক্রিয়াসমাধান, কত রেলওয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহার এবং কত প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। টেবিল, চেয়ার, নৌকা, আলমায়রা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসায়ীরা বহু অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়াছিল। খাট-পালঙ্গ ইত্যাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক রোগী, বৃদ্ধ, শিশু, রাজা, ধনী ইত্যাদি-

করিয়াছিল। দেশের রাজা গাছের কাষ্ঠরাশিদ্বারা দুইখানি সুবৃহৎ তরণী তৈয়ার করাইয়া রাজ্যের যে পরমোপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহাও এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার যোগ্য। একখানি জাহাজ রণতরীরূপে ব্যবহৃত হইয়া বিদেশীয় শত্রু হইতে রাজ্যকে রক্ষা করিত এবং আর একখানি জাহাজের সহায়তায় স্বদেশ হইতে বিদেশে ও বিদেশ হইতে স্বদেশে অগণ্য বাণিজ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ ও আনয়ন করায় জাতীয় ধনের বৃদ্ধি এবং রাজ্যের সুখস্বচ্ছন্দতার বর্দ্ধন হইয়াছিল। এই পতিত, প্রবৃদ্ধ ও মৃত তরুবর জীবিতাবস্থায় যে ঝটিকার আশঙ্কা করিত, তাহারই কাষ্ঠে নির্ম্মিত উপরি উক্ত দুইখানি তরণী কত বিশাল সাগরের ভয়ঙ্করা ঊর্ম্মিমালা, কত শত্রুসেনার তোপের আক্রমণ, কত জলচর জন্তুর বিকট নিনাদ, কত ঋতুর শৈত্য, উষ্ণতা, করকাঘাত ও প্রবল বর্ষাকে তুচ্ছ করিয়া বীরদাপে গমনাগমন পূর্ব্বক নিজের অসাধারণ সামর্থ্য ঘোষিত করিয়াছে। এখন বুঝিলাম, বৃক্ষ যতদিন জীবিত থাকিয়া কেবল নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখিত, আত্মমর্য্যাদাহীন হইয়া কেবল জীবনকে অসার ও অপদার্থ ভাবিত, এবং স্বকীয় স্বার্থ ব্যতীত অপরের বা পৃথিবীর কোন উপকারেই আসিত না, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার জীবন বাস্তবিক মরণের সমতুল্য ছিল; ততদিন পর্য্যন্ত ইহার জীবন বাস্তবিক স্বার্থে পরিপূর্ণ থাকিয়া অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ইহার মৃত্যুতে ইহার প্রকৃত নবজীবন আরম্ভ হইল; স্বার্থত্যাগ করিয়া আত্মোৎসর্গ দ্বারা ইহার মৃত্যু ধন্যাদপি ধন্য হইয়া উঠিল; মৃত্যুই ইহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে; মৃত্যুই ইহাকে পৃথিবীর লোকের নিকট পরমোপকারী সখা বলিয়া সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে। প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, কিয়দ্দিবসমধ্যে তমালবনের ঐ প্রবৃদ্ধ তরুবরের পরমাত্মা আগমন করিয়া নগরবাসীর শিক্ষা ও চৈতন্য

আরম্ভ"—Self-sacrifice is the beginning of usefulness. অহো! দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, আত্মার মঙ্গলের কারণ মৃত্যু কি সুখকর! কি শান্তিময়! যেখানে আত্মোৎসর্গ, যেখানে মৃত্যুতে ভয়হীনতা, যেখানে পরের কল্যাণ জন্য স্বার্থত্যাগ, সেইখানেই স্বর্গ, সেইখানেই সুখ ও শান্তি। আপনা ভুলিয়া যে ব্যক্তি পরকে ভালবাসিতে না শিখিয়াছে, সে পশু অপেক্ষাও অধম। স্বার্থের বলিদানেই স্বর্গের সুবর্ণদ্বার উন্মুক্ত হয়; ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আইস, আমরা ঐ মৃততরুকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি; উহার পতনক্রিয়া হইতে পরোপকার-নামক পরমধর্ম্মকে শিখিয়া লই। নিষ্কামধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দ্বারা মানব-জীবনকে সার্থক করি। মানবজীবনকে মর্য্যাদাহীন বা প্রয়োজনীয়তা-হীন বলিয়া যেন কখন না ভাবি।

দেখিয়াছ কি, যব গোধূম ইত্যাদি মরিয়া ও পচিয়া না গেলে তাহা অঙ্কুরিত ও গাছরূপে পরিণত হয় না? A barley sprouts when the seeds die and rot. ইহা মহামতি যিশুখৃষ্ট ও মহাসাধু পলের দৈববাণী। মৃত রক্তবীজের দেহস্থ শোণিতের এক একটা বিন্দু হইতে এক একটা রক্তবীজ জন্মগ্রহণ করিত; পুরুভুজকে যত কাটা যায়, ততই পুরুভুজ জন্মে; জীবিতাবস্থায় একটা রক্তবীজ ও একটা পুরুভুজ ভিন্ন অধিক পাওয়া যায় না, সুতরাং মৃত্যুই নবজীবনের সূত্রপাত। যাঁহারা স্বর্গলোক ও নরকলোকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জানা উচিত, মৃত্যু না হইলে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয় না; মৃত্যু না হইলে সারূপ্য, সাযুজ্য, সামীপ্য প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গসুখ ভোগ করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা আত্মোৎসর্গের মন্ত্রঋষি তাঁহাদের পক্ষে ইহকালেও স্বর্গ এবং পরকালেও স্বর্গসুখ বিদ্যমান; এরূপ মহাপুরুষের পবিত্র শ্রীচরণে

প্রস্তুত। এরূপ মহাপুরুষেরা মানবরূপে দেবতা; ইহাঁরা এই দুঃখময় সংসার-অরণ্যে দুই একটি মহাসুন্দর গোলাপকুসুমতুল্য। গোলাপ-ফুল জীবিতাবস্থাতেও জগৎকে সুগন্ধি দ্বারা আমোদিত করে এবং শুকাইয়া গেলেও ইহার সুগন্ধি কমে না বরং অধিকতর মনোমোহন হইয়া উঠে। ইহাকে তরল জলে পরিণত করিলেও "গোলাপ জল" হয়, তাহা আরও মনোহর; তৈলরূপে পরিণত করিলে "আতর" হইয়া উঠে, ইহা রাজাধিরাজের সেব্য; খাদ্যরূপে পরিণত করিলে "গুলকন্দ" হয়, তাহা আরও মূল্যবান এবং সম্রাটসমতুল্য মানবের সুবর্ণপাত্রে ভোজনযোগ্য হইয়া উঠে। যাঁহারা নিষ্কামপরোপকার নামক পরমধর্ম্মকে পালন করেন, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেও মহান্ এবং মরিলেও মহান্ ও মূল্যবান। মহাপুরুষের কি মৃত্যু আছে? নিষ্কাম-ধর্ম্মের নামই মহাপৌরুষত্ব। ইহাঁরা গোপনে কার্য্য করিলেও, অনন্ত আকাশের মধ্যাহ্নদিনমণি তাহা লোকশিক্ষার জন্য পূর্ণালোকে প্রকাশিত করিয়া দেন। পরোপকারীর গৌরব ও সৌরভের বিঘ্ন হইতে পারে এমন সামর্থ্যশালী লোক এখনও পৃথিবীতে জন্মে নাই। যিনি প্রকৃত কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর ও দানবীর, পৃথিবী তাঁহার যতই বৈরী হয়, তিনি ততই উচ্চসীমায় উঠিতে থাকেন, নিন্দাকারী অবশেষে হতাশ হইয়া মরে, কিন্তু সেই চিরজীবী মহাত্মা নিত্য অমররূপে বিদ্যমান থাকেন। পৃথিবীর এতটুকু গৌরব ও পুণ্য না থাকিলে, পৃথিবী এতদিনে শ্মশানভূমি হইয়া রসাতলে ডুবিয়া যাইত। প্রকৃত স্বার্থত্যাগী, প্রকৃত নিষ্কামধর্ম্মপালনকারী কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে বা তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিন্দিত করিতে পারে, এমন সামর্থ্য দেবতারও হয় না, মানুষের পক্ষে হওয়া অসম্ভব হইতেও অসম্ভবতর।

বুঝিলাম, উপনিষদকারগণ যথার্থই কহিয়াছেন "মৃত্যুই অনন্ত জীবন

লাভের উপায়"। না মরিলে মোক্ষ নাই। খৃষ্ট বলিয়াছেন There is no remission without shedding of blood. No salvation except through death." রক্তপাত ভিন্ন পরিত্রাণ নাই। বলিদান ভিন্ন উদ্ধার নাই। জগতের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি, যেখানে মরণ নাই সেখানে জীবন নাই। সম্পূর্ণরূপে পাপে মৃত হইলে অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় পাপ হইতে মুক্ত হইলে, তবে মনুষ্য প্রকৃত পুণ্যবান ও ধার্ম্মিক হয়—One must be exclusively dead to sin before he desires to enter into life eternal—সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপরতায় মৃত (মুক্ত) না হইলে স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত উন্নতিসাধনার্থ কেহই নবজীবন পাইতে পারে না। এইজন্যই য়িহুদীদিগের মন্দিরে বলিদানের সৃষ্টি; এই উদ্দেশ্যেই মুসলমানদের কোর্ব্বাণীপ্রথার উৎপত্তি; এবং এইজন্যই হিন্দুর দেবীমন্দিরে বলি হয় এবং গ্রহাচার্য্যগণকর্তৃক "ফাঁড়া কাটা"-চ্ছলে পশুপক্ষীর বলির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই, সম্পূর্ণরূপে মরিতে শিক্ষা করিতে হইবে, তবে সেই মরণ হইতে জীবনের উৎপাদন সম্ভব। প্রাণের মমতা, স্বার্থের লোভ, সংসারে অনিত্য-সুখের মোহ প্রভৃতি না ছাড়িলে পুণ্য নাই, শান্তি নাই, জীবন নাই, ইহা ধ্রুবসত্য। ম্যাট্‌সিনি, শিবজি, গুরু নানক, মার্টিন লুথর, শ্রীচৈতন্য, গুরু গোবিন্দ, লাফায়েৎ, প্রভৃতি অসংখ্য ভুবনবিখ্যাত কর্ম্মবীর মরিতে শিখিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহাদের পুণ্যময় নামে শুষ্কতরু সজীব হয়, মৃতদেশে জীবনসঞ্চার হয় এবং সুষুপ্তগণ জাগ্রত হইয়া উঠে। তাঁহাদের পবিত্রনামের একএকটা অক্ষর, মন্ত্রের সমতুল্য ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পরিপূর্ণ।

মহাভারতের দধীচিঋষি নিজে আত্মবলিদান দিয়া মৃত্যুর উপ-

দেবতাগণকে (আর্য্যগণকে) প্রাচীনযুগে নির্য্যাতন করিত, যখন তাহাদের অন্যায় অত্যাচারে প্রজার সুখশান্তি, ধর্ম্মের যাজন, ন্যায়ের গৌরব এবং তপস্বীদিগের উপাসনা নষ্ট হইয়া যাইত, তখন ভগবান্ কহিয়াছিলেন "হে আর্য্যগণ! তোমরা দধীচিমুনির পৃষ্ঠদেশস্থ অস্থিতে বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ কর, ঐ যুদ্ধে অনার্য্যগণ পরাজিত হইয়া নিশ্চয়ই পদানত হইবে।" আর্য্যেরা দধীচিকে কহিলেন "হে মহানুভব! আপনার মেরুদণ্ডের অস্থির দ্বারা অস্ত্র নির্ম্মিত না হইলে অসুরের দমন হইবে না, ইহা ব্রহ্মবাক্য।" এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-মুখে ঋষিবর দধীচি বলিলেন "এমন সৌভাগ্য আমার কি হবে! আমার এই জরাজীর্ণ অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধদেহের অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া যদি অসুরের দমন, অত্যাচারের নাশ, ধর্ম্মের রক্ষা এবং পৃথিবীর নির্ভয়ত্ব হয়, তাহা হইলে আমার দেহধারণ এবং জীবনযাপন ধন্য! আহা, আমার মরণ কি সুখকর!" এই বলিয়া সেই জীবিত ঋষি হাসিতে হাসিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অস্থি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিলেন। ঋষির মৃত্যু হইল। কিন্তু সেই মৃত্যু ভারতে নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিয়াছে।

এইরূপে যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, যে বিষয় লইয়াই চিন্তা কর বুঝিতে পারিবে মৃত্যুই নূতন জীবন ও নবীন সামর্থ্যের মহামন্ত্র ও মহামূল। সম্পূর্ণরূপে পাপে মৃত (মুক্ত) হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহার পরে বৈরাগ্য, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, বিলাসবর্জ্জন, কত কষ্ট, কত সহিষ্ণুতা, কত ত্যাগস্বীকার করিলে তবে মানবেরা ধর্ম্মপথে (মোক্ষের পথে) অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। এবম্প্রকারে সকল বিষয়েই মরণের প্রয়োজন। স্বার্থপরতার নাম পতন, স্বার্থবর্জ্জনের নাম উত্থান। প্রাচীন ভারত মরিতে জানিত, মরিতে শিখিয়াছিল; হাসিতে হাসিতে অকাতরে প্রাণ দিতে পারিত বলিয়াই ভারত এখনও বিনষ্ট হয় নাই, এখনও পৃথিবীর মানচিত্র হইতে সে নাম বিলুপ্ত হয় নাই। আইস আমরা নিষ্কামধর্ম্ম পালন করিয়া মরিতে শিখি।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

দৈনিক লিপি।

১। ভোরে বেড়াতে গিয়ে প্রত্যহই সে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখিতাম, সদাই হাসিমাখা মুখ। দেখিতে স্বাস্থ্যের পরাকাষ্ঠা। সুন্দর নিটোল গড়ন, কাল রং, মাথায় বড় একটি পাগড়ি বাঁধা, শুধু পা। আর সর্ব্বক্ষণই তার প্রাণের জিনিস একটি হুঁকা হাতে। মনে আনন্দ থাকিলে যেমন হয়ে থাকে, মুখে একটুও কুঞ্চন বা রেখা নাই। রক্তবর্ণ মাড়ির নীচে সাদা সাদা দাঁতের সারি হাঁসির বশে সর্ব্বদাই বিস্ফারিত।

মনে এত আনন্দ, সবাইকে ডেকে ডেকে গান শুনান। একজন লোক তাঁহার পরিচয় দিয়ে বল্লেন "বৃদ্ধ বড় গাঁজা খায়, আগে সুন্দর বীণ বাজাতো, এখন পাগলের মত।"

যখন আমি সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি "বাঁয়রো" সুরে উন্মত্ত হয়ে' বৃন্দাবনসম্বন্ধে একটি গান গাচ্ছিলেন। "ডাক্তার মশাই আসুন" বলিতেই আমার পা আপনা আপনি সেই দিকে গেল। তখন তিনি এই মর্ম্মে গাহিলেন—"বাঁশীর উচ্চস্বর সে বনের চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হচ্ছিল। আর তার স্বর এত মধুর যে, তা শুনে' সবাই পাগল হয় ও নিজ নিজ কাষ ভুলে সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়। বেদবিৎ বেদ ভুলে যান, আর যমুনাজল উল্টা দিকে বহে।"

ঐরূপ প্রসঙ্গের আর একটি শ্লোক মনে হলো, কিন্তু কোথায় যে পড়েছি তা মনে হলো না।

সে রব রবিত সমীর সমিত
উজানে বহিত যমুনাজল।
হরষে কুমুদী সরসে হাসিত
আকাশে হাসিত তারকাদল॥"

২। তাঁদের বাড়ীটি সহর হইতে অনেক দূরে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। যাবার পথে গাছপালা ও সুন্দর পল্লিদৃশ্য দেখা যায়। সুস্থকায় গ্রাম্য বধূরা স্বাধীনভাবে সেখানে যথা-তথা যাতায়াত করেন।

তাঁদের বাড়ীটি ছোট। মাসিক সাত টাকা মাত্র ভাড়া। সাম্নে একটু বাগান। ঢুকিয়াই দুইখানি একতলা ঘর। তার পাশেই ছোট রাঁধিবার ঘর ও ভাঁড়ার। পিছনেই একটি পানাপুকুর—তাতে হাঁস চরে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সেখানে অনেকরকম পাখী গান করছিল। পুকুরের ও-পাড়ে তেঁতুলগাছে কতকগুলি কাক গম্ভীরস্বরে ডাকছিল। আর ঘুঘু মর্ম্মভেদী সুরে কোথা থেকে যে ডাকছিল খুঁজেও তা কিছু ঠিক করতে পারলাম না। পুকুরের পাড়ে জেলেদের কাল উলঙ্গ ছেলেরা কোকিলকে ভেঙ্গাচ্ছিল।

গৃহস্বামী বৃদ্ধ, ঘাড় ও কোমর বেঁকে গেছে। তার একটিমাত্র ছেলে, সেই সংসার চালায়। আর সেই ছেলেটিরই বড় অসুখ। ঘরে ক্ষীণাঙ্গী মলিনবেশা অথচ পরমসন্তুষ্টি-মাখা মুখ দুইটি স্ত্রীলোক আছেন। একটি তাঁহার স্ত্রী, অপরটি তাঁহার পুত্রবধূ।

অস্ত্রচিকিৎসায় কাতর হয়ে লোকটি যখন চেঁচালে, বৃদ্ধও তখন কাঁদলেন। রুদ্ধদ্বারের ভিতর হইতে রোরুদ্যমান স্ত্রীকণ্ঠও শুনা গেল। একটি প্রতিবাসিনীও চোখের জল ফেলতে লাগলেন। বাটির গরুটিও তাকালে।

কায শেষ হয়ে গেলে আমাদের যা দর্শনী প্রাপ্য গৃহস্বামী তা দিতে পারলেন না। অতি গরীব তাঁহারা এত দিতে কোথা পাবেন।

৩। আর একদিন একটি পিড়ীতা রমণীকে সন্ধ্যাবেলা দেখতে গেলাম। এমন শীর্ণ দেহ কখনও কোথাও দেখি নাই। মলিন বিছানায় ক্ষীণ দীপালোকে একটি বিধবা আত্মীয়া তাঁকে সেবা করচেন। চিরকাল দুর্দ্দান্তস্বভাব স্বামী আজ অনুতপ্তহৃদয়ে, নিত্যগন্তব্যস্থানে না গিয়ে, বিছানার শিয়রে বসে কাঁদকাঁদস্বরে আমাকে বল্লে "বড় ভাল ছিল, এমন ভাল মেয়েমানুষ দেখা যায় না"। সে কথাগুলির এমন একান্ত ভাব যেন স্বর্গের দ্বারে প্রাণ খুলে আপনারই বিরুদ্ধে সত্যকথা বলচে।

পরদিন খুব ভোরে ডাকতে এলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি সে লোকটি পায়ের তলায় পড়ে কাঁদচে—আর কাপড়-ঢাকা সে ক্ষীণ দেহখানি স্থির ও শীতল হয়ে গেছে।

৪। যখন অস্তগিরি হতে ভুবনেশ্বরে ফিরিতেছিলাম, চারিদিকে প্রকৃতির নিরুপম শোভা দেখে মনে কি এক লুকান দারুণ অভাব জেগে উঠলো। কত গাছ, কত ফুল, কি সুন্দর পাখীর গান! উন্মুক্ত-প্রান্তর সুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। অথচ কি ভেবে আমার মনে আনন্দ এলো না।

দেখিলাম, পথের ধারে ম্রিয়মাণ একটি ঘুঘু একাই বসে রয়েচে। মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম "পাখি, সঙ্গী ছাড়া যে, তোমায় একা তো কখনও দেখি নাই?" বলিতে বলিতে একটি সুন্দরকান্তি প্রজাপতি উড়ে এসে বল্লে "পিকবর, আমায় তোমার সাথী করবে?" পাখিটী সে কথা শুনে কাণে আঙ্গুল দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উড়ে গেল।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

সমসাময়িক ভারত।

মুসলমান-বিপক্ষতা।

(২)

বস্তুত, অজ্ঞতাই মুসলমান-ভবিষ্যতের সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার বিষয়। যাহারা প্রাথমিক পাঠশালায় পড়িতে যায়, সেই সকল মুসলমানের সংখ্যা বোধ হয় হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু তাহার পরে,—মাধ্যমিক পাঠশালায়, কালেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র অতীব বিরল। মোট্‌কথা, যেকলের শিক্ষা-সংস্কার মুসলমানদের নিকট পৌঁছে নাই। উহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু ও আর্‌বি ছাড়া—মস্‌জিদের উপদেশ ছাড়া আরো কিছু শিক্ষা করে, ইংরাজি শিক্ষা করে, এবং ইংরাজি শিখিয়া বিলাতি-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। আমি এক্ষণে যাহা বলিতেছি—গতশতাব্দির শেষভাগে মুসলমানদিগের যেরূপ শিক্ষার অবস্থা ছিল সেই সময়কার কথা। সৈয়দের চেষ্টায় তাহার পর অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের প্রথম প্রত্যক্ষ কারণঃ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত লৌকিক শিক্ষা। Sir William Muir ঠিক্‌ই বলিয়াছেন ;—"সরকার যদি ইস্কুল ও কালেজে খৃষ্টধর্ম্মের শিক্ষা দেন, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানেরা তাহাতে আপত্তি করিবে ; সেই একই কারণে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজসরকার হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন না। সাধারণ ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে ইংরাজসরকার উদাসীন নহেন ; কিন্তু সরকারের অভিপ্রায় এই, কোন বিশেষ ধর্ম্মমতের শিক্ষা গৃহে হওয়াই শ্রেয়।" ভারতে ইংরাজ-

অনুকূল-প্রতিকূল কোন পক্ষই গ্রহণ করেন নাই। ইংরাজসরকার নিজ ধর্ম্ম গ্রহণের জন্যও কাহাকে অনুরোধ করেন না। ইংরাজসরকার কেবল ইহাই চান্ যে, সকল ধর্ম্মের লোকেই শান্তিতে থাকে। কিন্তু মুসলমানেরা এই ধর্ম্মবর্জ্জিত লৌকিক শিক্ষা পছন্দ করে না। যাহারা শিক্ষার তত বিদ্বেষী নহে, তাহারাও এইরূপ শিক্ষার প্রতি বিমুখ। কেননা, ভারতীয় শিক্ষার অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি হণ্টর-সাহেব বলেন ;—শুধু এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না যে, গোঁড়া মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, আসল কথা, তাহার পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা। কোরাণই সেই শিক্ষার মূল ও উপাদান-বস্তু। সেই শিক্ষা মস্জিদেই দেওয়া হইয়া থাকে। আমি কেরোনগরে El-Hazar-মস্জিদের বিশাল ঘেরের মধ্যে গিয়া দেখিয়াছি,—আরব-ছাত্রগণ, বয়স্ক যুবকবৃন্দ, গালিচার উপরে বসিয়া আছে ; তাহাদের পুস্তকগুলা চতুষ্পার্শ্বে ছড়ান রহিয়াছে ; একটা ঘড়ার মধ্যে মক্কার রুটি রহিয়াছে ; এবং উহারা গা দোলাইতে দোলাইতে কোরাণের বচন উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছে। আসলে এই শিক্ষার মূল্য কি ? আমি শুনিয়াছি, ভারতে মুসলমানছাত্রেরা কোরাণ যেমন বুঝে মৌলবীরাও তেমনি বুঝে ; অর্থাৎ কেহই ভাল বুঝে না। এক্ষণে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রকৃত মত কুসংস্কার-জালে আচ্ছন্ন। ইহাই সৈয়দ-আহমদের মত। যখন কোন মুসলমান-যুবক এইরূপ শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকে, তখন অন্য শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার রুচিও থাকে না, সময়ও থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্রাহ্মণযুবকদিগের এসম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ নাই, কোন কুসংস্কার নাই। 'ঈশ্বরহীন' বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে তাহাদের কোন দ্বিধা হয় না। Hunter আর এক কারণের উল্লেখ করেন : অধিকাংশ মুসলমানপরিবারই অতীব দরিদ্র, তাহারা তাহাদের সন্তান-দিগকে দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে রাখিতে পারে না।

মুসলমানদিগকে আকর্ষণ করিতে হইলে, প্রথমে, এই দুইটি সমস্যার মীমাংসা করা আবশ্যক ; প্রথমতঃ—বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত মস্‌জিদের শিক্ষা যোগ করিয়া দেওয়া, একই কালেজে পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞানের সহিত কোরাণকে বাঁধিয়া দেওয়া : দ্বিতীয়তঃ—যতদুর সম্ভব সস্তায় শিক্ষা দেওয়া। মুসলমান-মণ্ডলী ছাড়া এরূপ কালেজ আর কাহারও কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইতে পারে না। তাই, সৈয়দ-আহমেদ বদান্য লোকের নিকট চাঁদার প্রার্থী হইলেন, ভারতসরকারের নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিলেন।

ইহার সঙ্গেসঙ্গে আর একটা কথা উঠিল। মস্‌জিদের সহিত ইংরাজি পাঠশালার যোগ হইবে—এই কথাটায় সৈয়দের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও ভীত হইয়া উঠিলেন। তীক্ষ্ণদর্শী রক্ষণশীল মুসলমানেরা স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় মস্‌জিদের জয় হইবে না; তাঁহাদের ভয় হইল পাছে তাঁহাদের ঐতিহ্য, তাঁহাদের জাতীয়ভাব, এই পরীক্ষায় ম্লানভাব ধারণ করে। সৈয়দ্, একপক্ষের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে এবং অপরপক্ষের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দশবৎসর ধরিয়া যুঝাযুঝি করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস উচ্চ ও অটল ছিল :—বাইবেলের রসাস্বাদনে কোরাণ তাঁহাকে বাধা দিল না। এমন কি, তিনি বাইবেল ও কোরাণের মধ্যে মিল করিয়া দিবারও কল্পনা করিয়াছিলেন। সে যাই হোক্, তিনি মনে করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে মস্‌জিদের ক্ষতি হওয়া দূরে থাক্, বরং লাভ হইবারই কথা। তাই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন—রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে মুস্‌লমানকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। তাঁহার মতে, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি—এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোককে তিনি ভয় করিতেন না। তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস—

মুসলমানধর্ম্মের কোন অনিষ্ট-আশঙ্কা নাই ; বরং ইহাই তাঁহার জ্বলন্ত আশা ছিল,—কোরাণকে ভাল করিয়া মানিলে, ভাল করিয়া বুঝিলে, মুসলমানদিগকে পুনর্ব্বার সেই বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের দিকে ফিরাইয়া আনা যাইবে, যাহা এক্ষণে ভারতসুলভ জঙ্গলতৃণের ন্যায়, পৌত্তলিকতার পত্র-গাছায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহাই হউক, যদি ভারতসরকার সৈয়দকে সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইত সন্দেহ নাই। ভারত-সরকার কালেজকে অর্থসাহায্য করিলেন, এবং একটু জমিও দান করিলেন। মুসলমান আমীর ওমরাও, মুসলমান নবাবেরা এবং সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হৈদ্রাবাদের নিজাম মুক্তহস্তে চাঁদা-স্বাক্ষর করিলেন। পরে হিন্দুরাজারাও—বিশেষত কাশীর রাজা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। আমরা দেখিতে পাই, সৈয়দের পার্শ্বে থাকিয়া এই কাশীর রাজাই পরে ন্যাশানাল-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। লোকের সন্দেহভঞ্জন করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। সবেমাত্র ১৮৮৩ সালে, কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ Theodore Beckএর পরিচালনাধীনে কালেজটি মুসলমানগৃহরূপে পরিণত হয়। তৎপূর্ব্বে ১৮৭৫ সালে উহার প্রাথমিক 'ক্লাস্'গুলি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। লর্ডলিটন কালেজ-ভিত্তির প্রথম প্রস্তর স্থাপন করেন। তাহার পর দলেদলে ছাত্র আসিতে লাগিল, শুধু পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে নহে—ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতেই—এমন কি, সুদূর দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ হইতেও ছাত্র আসিতে লাগিল। আলীগড়ে আসিয়া, শিয়া ও সুন্নি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল হইয়া গেল। শুধু ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য প্রতিদিন অর্দ্ধঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট হইল। সৈয়দ-আহমেদ ও বেক্—এই দুইজনের পরিশ্রম ও সহযোগিতায় কালেজটি সফলতা লাভ করিল। সৈয়দ

সেই প্রভুত্ববলে, কালেজকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিলেন। তিনি অনবরত ছাত্র জুটাইতে লাগিলেন, এবং বেক্ আভ্যন্তরিক কার্য্য-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। অধুনা আলীগড়ই অধিকাংশ মুসলমানপরীক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকে। ১৯০০ সালে, আলাহাবাদে যে ৩০ জন পরীক্ষার্থী আসিয়াছিল, তন্মধ্যে ২১ জন আলীগড়ের ছাত্র। সৈয়দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া, মুসলমানেরা এক্ষণে হিন্দুদিগের সহিত 'টক্কর' দিতে সমর্থ হইল। তাহা অপেক্ষা আরো ভাল,—আলীগড়-কালেজ আদর্শগৃহ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিল। "আলীগড়ের পুরাতন ছাত্র"—ইহা একটা সম্মানের কথা। শ্রেষ্ঠবংশীয় মুসলমানেরা স্বীয় সন্তানদিগকে আলীগড়ে পাঠাইতে লাগিলেন।

১৯০১ সালে যখন আমি কালেজ দেখিতে গিয়াছিলাম, যে দুই ব্যক্তির অদম্য চেষ্টায় কালেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহারা স্বল্পকাল অগ্রপশ্চাতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়েন। কিন্তু সেই সংস্থাপকদ্বয়ের অবর্ত্তমানেও, কালেজের কাজ চলিতে লাগিল। কালেজের নূতন প্রধানাধ্যক্ষ Th. Morrisonএর কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি আমার নিকট কালেজ-ইতিহাসের তন্ন তন্ন বিবরণ ও মুসলমান-মণ্ডলীর বন্দোবস্তের কথা বিবৃত করিতেছিলেন, এমন সময়ে, শ্রীমতী মরিসন্ একটা দ্বার খুলিয়া, শুধু এই কথাগুলি বলিলেনঃ—"রাণীর মৃত্যু হইয়াছে"। এই সংবাদে সকলে যেরূপ চমকাইয়া উঠিল, ঘরের মধ্যে বজ্র পড়িলেও সেরূপ হইত না। প্রধানাধ্যক্ষমহাশয় তাঁহার পত্নীর কথাটা আর শেষ করিতে দিলেন না। এই রাষ্ট্র-সাধারণ শোকের সময়ে নিস্তব্ধ থাকাই শ্রেয় ভাবিয়া তিনি একজন মুসলমান ছাত্রের হাতে আমাকে সঁপিয়া দিলেন। সেই ছাত্রটি, কালেজের

কেননা, এই সংবাদে সকল অধ্যাপকই আসন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কালেজের কোঠাগুলি কতকটা ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। প্রত্যেক ছাত্রেরই একএকটি পৃথক কাম্‌রা আছে, স্নানের ঘর আছে (যাহা নৈলে এদেশে চলে না); শুধু তাহা নহে, পাঠাভ্যাসের জন্যও এক একটি স্বতন্ত্র ঘর আছে; সেই ঘরে প্রয়োজনীয় পুস্তকসকল, 'এন্‌গ্রেভিং'-চিত্রসমূহ,—রাণী ভিক্টোরিয়ার চিত্র, তাহার পাশেই মহামন্ত্রী চেম্বার্লেনের চিত্র,—বাজার হইতে খরিদ-করা টুকিটাকি জিনিস্‌ রক্ষিত হইয়াছে; সেই ঘরের সংলগ্ন একটা বারাণ্ডাও আছে। এই ঘরে ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে পাঠাভ্যাসের জন্য খুব খাটিতেও পারে, আবার ইচ্ছা করিলে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বেশ আরামেও থাকিতে পারে। এই ছাত্রনিবাসগুলি আমাদের দেশের মত নহে;—ছাত্রেরা নিজ গৃহের ন্যায় এখানে স্বাধীনভাবে থাকিতে পায়। আমার প্রদর্শক যুবকটি আমাকে বিস্তীর্ণ 'ক্রিকেট্‌'-ভূমির উপর দিয়া লইয়া গেল, এবং পৌরুষিক উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া আমাকে বলিল "হিন্দুস্থানের মধ্যে আমরাই সর্ব্বপ্রথম ক্রিকেটের দল"। যুবকটি এই বিষয়েই গর্ব্বিত। ইংরাজের এই একটা কাজ দেখ। Beck, সকল ছাত্রকেই ব্যায়ামচর্চ্চা করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করেন। এলাহাবাদের একজন জজ্‌ আলীগড়ের ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য যে সম্ভাষণ করেন, তাহাতে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"বিচারশক্তি, বিচারনিষ্পত্তি করিবার শক্তি যদি কিছু আমার থাকে, তাহা আমি ব্যায়ামচর্চ্চা হইতেই পাইয়াছি।"

কি বিষম পরিবর্ত্তন! কেরোর মস্‌জিদের সহিত এই কালেজের তুলনা কর, কিংবা কাশীর সেই টোলের সহিত তুলনা কর—যেখানে শুষ্কশীর্ণ অর্দ্ধ-নগ্ন দরিদ্র অধ্যাপকেরা আসনপিঁড়ি হইয়া মাদুরের উপর বসিয়া, নিশ্চল যোগীর মত, অস্পষ্টস্থিরদৃষ্টিসহকারে ত্রি-মার্গের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃভাব।

মাতৃভাব অতিশয় উচ্চভাব। এক মা নামে যে কত মধু আছে, কত শক্তি আছে, কত সুখ ও শান্তি আছে, তাহা বলা যায় না। মানব যদি আপনার সৃষ্টির কথা ভাবে, যদি ইহসংসারে আবির্ভাবের বিষয় চিন্তা করে; তাহা হইলে দেখে যে, শাস্ত্রে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ নহেন, অনুমেয় ও আপ্তবাক্যপ্রতিপাদ্য। কিন্তু জীবের গর্ভে সঞ্চার, তথায় পোষণ, যথাকালে ইহসংসারে আবির্ভাবকরণ প্রভৃতি সৃষ্টিক্রিয়াব্যাপারে গর্ভধারিণী মাতাই কর্ত্রী। তাঁহার স্তন্যপানে পালন, পোষণ, রক্ষণ, স্বার্থত্যাগ করিয়া সন্তানের অর্থসাধন প্রভৃতি জীবসৃষ্টির দ্বিতীয় কাণ্ডেও মাতাই প্রধানা কর্ত্রী। সুতরাং মাতাই প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্ত্রী। এই কারণেই শ্রীচণ্ডীতে দেবগণ আদ্যাশক্তিকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছেন "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।" যে দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। বাস্তবিকই সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি মাতৃরূপে জগতে প্রকটিতা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে সকল দার্শনিকেরা অপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না, অথচ অবশ্যস্বীকার্য্য কার্য্যকারণসম্বন্ধের অনুরোধে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা মাতাকেই প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্ত্রী স্বীকার করিয়া মাতৃদেব হয়েন। পশুপক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যে মাতৃশক্তি বিজৃম্ভিত দেখা যায়, তাহা বাস্তবিকই সৃষ্টিসংরক্ষণী শক্তি, তাহা অতীব মনোহর, বিশুদ্ধ ও স্বর্গীয়।

আমরা যে নামে জননীকে সম্বোধন করি তাহা অতি কোমল ও সহজ উচ্চার্য্য। ...

মা নামটি অতি মধুর নাম। তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায়, ইহা বিন্দুহীন বৈষ্ণবী শক্তির বীজমন্ত্র। কি সুন্দর সমাবেশ! শাস্ত্র যাঁহাকে সর্ব্বভূতে আদ্যা-শক্তিরূপে বর্ত্তমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণবী শক্তির বীজ-মন্ত্রেই তাঁহার সম্বোধন হয়। যখন বাকাস্ফূর্ত্তি হয় তখন আমরা প্রথমে মা মা বলিয়া ডাকিতে শিখি, তখন হইতেই শক্তিসাধনের প্রারম্ভ হয়। লোকে দুঃখে পড়িয়া, কষ্টে পড়িয়া, পীড়িত হইয়া, মা মা বলিয়া শান্তিলাভ করে, পায়ে হোঁচট লাগিলে মা বলিয়া চীৎকার করে। ইহাতেও কিছু ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়। গুরুভয়ে, ও আকস্মিক মহৎভয়ে লোকে প্রায়ই বাপ্-রে বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে, কষ্টে পড়িয়া অনেকে বাপ্-রে মা-রে করিয়া আর্ত্তনাদ করে, কেহবা কেবল পিতার নাম, কেহবা কেবল মাতার নাম গ্রহণ করে। ইহা দেখিয়া এই বুঝা যায় যে, পিতা রক্ষক ও শক্তিমান বলিয়া বিবেচিত হন, আর জননী স্নেহের আধার, সান্ত্বনার প্রস্রবণ, আনন্দের খনি ও শান্তির নিকেতন বলিয়া বিবেচিত হন। আকস্মিক মহৎ ভয় উপস্থিত হইলে লোকে যে বাপ্-রে বলিয়া চীৎকার করে, সে কেবল অভ্যাসবশতঃ। বাল্য হইতে দেখা যায় যে, পিতাই সকল বিপদ-আপদে রক্ষা করেন, তাই কোন আকস্মিক ভয় উপস্থিত হইলে, লোকে অভ্যাসবশতঃ সেই ভয়তারক নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। বাল্য হইতে দেখিয়াছি, মাতা ক্ষুধায় অন্ন দিয়াছেন, পীড়ায় শুশ্রূষা করিয়াছেন, আপন হৃদয় হইতে অমৃতধারা মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন, ব্যথার ব্যথী হইয়া ব্যথা দূর করিয়া-ছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন। তাই কষ্টে পড়িয়া লোকে অভ্যাসবশতঃ সেই শান্তিদায়িনীর শান্তিময় নাম উচ্চারণ করিয়া শান্তি লাভ করে।

অন্য কারণেও এরূপ ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। যাহারা অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া থাকে, তাহারা আর্ত্তিকালে মাতৃনামই উচ্চারণ

করিয়া থাকে। যাহারা মাতা অপেক্ষা পিতার সহিত অধিক সংসৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহারা প্রায়ই পিতৃনামই উচ্চারণ করে। কিন্তু বিস্ময় বা আকস্মিক ভয়ে পিতৃনাম এবং পীড়ায় ও যন্ত্রণায় মাতৃনাম উচ্চারিত হয়। লোকে শৈশবে অসহায় অবস্থায় মাতাকেই সর্ব্ববিষয়েই অবলম্বন করিয়া থাকে, পীড়ায় ও যন্ত্রণায় যখন মানুষ অসহায় ও অক্ষম হইয়া পড়ে, তখন স্বভাবতঃই সেই অসহায়ের সহায়, আর্ত্তের সান্ত্বনা-কারিণী জননীর দিকে চিত্ত আকৃষ্ট এবং সেই নাম স্বতঃ মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। যে মাতা সন্তানকে প্রহার বা তাড়না করিলে সন্তান মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মাতাকেই জড়াইয়া ধরে, যাঁহার ক্রোড়ে বা সন্নিধানে থাকিয়া সন্তান আপনাকে যমের ও অপ্রধৃষ্য বলিয়া মনে করে, যাঁহাকে সন্তান কল্পতরু বলিয়া জানে, যে মা মা শব্দ উচ্চারিত হইলে মাতৃমূর্ত্তি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সন্তানের দুঃখ, কষ্ট অভাব দূর করেন, সে নাম আপদে-বিপদে, দুঃখে-কষ্টে, আর্ত্তিকালে স্বতঃ উচ্চারিত হয়। তাহা শান্তি দান করে, সুখ দান করে, আশা-ভরসা দেয়।

এই মাতৃভাবের মহত্ত্ব, গুরুত্ব ও দেবত্ব আমাদের দেশে যেরূপ প্রকটিত হইয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম-রাজ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন, তাঁহারাই এই মাতৃভাবের মহত্ত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতবর্ষেই শাস্ত্রকারগণ পিতামাতাকে দেবপদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেবা ও তুষ্টিসাধনই সন্তানের পরম তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ভারতের শাস্ত্রকারই জননীকে নারীমূর্ত্তিধারিণী আদ্যাশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভারতের মহাজনবাক্যই জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অল্পদিন স্থায়ী। মাতা অপেক্ষা পিতার সহিত সম্বন্ধ আরও অল্পদিন স্থায়ী, অনেক স্থলে পিতার সহিত কোন সম্পর্কই থাকে না। আবার অনেক স্থলে রক্ষা করা দূরে থাকুক, পিতা বরঞ্চ পুংজাতীয় সন্তানের বিনাশসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু মাতাকে প্রায় সর্ব্বত্রই সৃজন ও পালনকার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যাপৃত দেখা যায়। যতক্ষণ মাতা এই সৃজন ও পালন কার্যে ব্যাপৃতা থাকেন, ততক্ষণ আপনাকে ভুলিয়া আপন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সন্তানের রক্ষা, পালন ও পোষণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে সন্তান যতদিন অসহায় অবস্থায় থাকে, যতদিন সন্তানের রক্ষা ও পালন-পোষণার্থে মাতৃস্নেহ ও মাতৃযত্নের প্রয়োজন হয়, ততদিনই এই মাতৃভাব প্রবল থাকে। তাহার পর অন্তর্হিত হয়। জীবজগতে এই মাতৃভাব উচ্চতম মনুষ্যস্তরে সম্পূর্ণ বিস্পষ্ট ও বহুদিনস্থায়ী হইয়া ক্রমে স্তরানুসারে দুর্ব্বল ও অল্পদিন স্থায়ী হইতে হইতে নিম্নস্তরে গিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই মাতৃভাবের মহত্ত্ব, গুরুত্ব ও দেবত্বের অনুভূতি সূক্ষ্মধর্ম্মবুদ্ধিসাপেক্ষ। স্বার্থত্যাগ মাতৃভাবের বিশেষত্ব, সুতরাং স্বার্থ প্রবল হইলে, মানব স্বার্থপর হইলে, এই স্বার্থত্যাগের মহত্ত্ব ও দেবত্ব অনুভব করিতে পারে না, তাই মাতৃদেবও হইতে পারে না। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, জগতে সকলেই স্বার্থপর। তবে সেই স্বার্থের সীমা যতই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে থাকে, ততই তাহা নিন্দনীয় হয়, ক্রমে যখন তাহা কেবল ব্যক্তিগতমাত্র হইয়া পড়ে, তখন তাহাই সাধারণতঃ হেয়স্বার্থপরতাপদবাচ্য হয়। এরূপ অবস্থায় লোক আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখে না, আর কাহারও জন্য ভাবে না। তাহার ধর্ম্মে বা ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস সম্ভবে না, সুতরাং তাহার নিকট হইতে মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি বা দেশভক্তি আশা করা যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আকারগত বা বুদ্ধিগত পার্থক্য থাকিলেও মনুষ্য

পশুপক্ষী অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। বর্ত্তমান সময়ে যে ব্যাপারটী সভ্যতানামে অভিহিত হইয়া থাকে, ঘোর স্বার্থপরতাই তাহার বিশেষত্ব বলিয়া বোধ হয়। কারণ, এই সভ্যজগতে মানব, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে দূরে যাইয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে মাতৃভাবের অবনতির বিষয় পুস্তকাদিতে যেরূপ পাঠ করা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, যাহাকে সভ্যতানামে অভিহিত করা হয়, তাহা আদিম পশুভাবের প্রত্যাবর্ত্তনমাত্র। চিন্তাশীল হার্‌বার্‌ট্ স্পেন্‌সার বর্ত্তমানকালে সভ্যজগতের ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে (Rebarbarisation) পুনঃ-অসভ্যাবস্থাপ্রাপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেকে এ কথা বলিয়া থাকেন যে, আত্মনির্ভরতার বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে মাতৃভাবের দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়। ইঁহারা যাহাকে আত্মনির্ভরতা বলেন, তাহা বাস্তবিকই স্বার্থপরতা অর্থাৎ স্বার্থপরতার সীমা সঙ্কুচিত হইয়া ব্যক্তিগত হইয়া থাকা। তাহা না হইলে যাহাকে আত্মনির্ভরতা বলে তাহা একটী মহৎগুণ। যে আপনাকে চিনিয়াছে, যে আত্মশক্তি অনুভব করিয়াছে, যে আপনার হৃদয়কে ভগবৎমন্দির বলিয়া বুঝিয়াছে এবং সেই মন্দিরমধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে মোহনাসনে বসাইয়া তাঁহার বলে বলীয়ান ও তাঁহার ভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহারই প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মনির্ভরতা হইয়া থাকে। তাঁহার স্বার্থের সীমা দিন দিন বিস্তীর্ণ হইয়া ক্রমে জগৎ ব্যাপিয়া পড়ে। তিনি জ্ঞানী, মানী, ধার্ম্মিক হয়েন, তাঁহার পিতৃমাতৃ-ভক্তি গুরু-ভক্তি ও স্বদেশ-ভক্তি অপরের আদর্শ হইয়া থাকে। আপন স্বার্থের সীমা যতই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে, ততই লোক নিঃস্বার্থনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, শাস্ত্রকার, পিতা ও মাতাকে যে উচ্চস্থান দিয়াছেন, তাহা আর কোন জাতিতে বা কোন ধর্ম্মে দেই হয় না।

পিতামাতা আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের সেবা ও তুষ্টিসাধনই সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সন্তানের পরম তপস্যা। সেই তপস্যাসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সন্তানের সমস্ত তপস্যাসাধনের ফললাভ হয়। এসম্বন্ধে নানা আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকার সন্তানের হৃদয়ে এই প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি ভক্তি দৃঢ় করিয়া যে ধর্ম্মভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা অটুট। কারণ প্রত্যক্ষ দেবতায় ভক্তি না থাকিলে অপ্রত্যক্ষ দেবতায় ভক্তি কিছুতেই দৃঢ় হওয়া সম্ভব নহে। "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" এরূপ বচন ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যাহাদের পিতৃভক্তি-মাতৃভক্তি (উদ্ধৃত শ্লোকে পিতৃশব্দ পিতামাতা উভয়ার্থবোধক) দুর্ব্বলা বা নাই, তাহাদের ভগবৎভক্তি বা ধর্ম্মবিশ্বাস বলবান্ বা দৃঢ় হইতে পারে না, তাহাদের স্বদেশভক্তি বা স্বদেশানুরাগ সম্ভবই নহে, যদিও বা থাকে তাহা ভিত্তিহীন ও অসার।

আজ দেশ ব্যাপিয়া বন্দে মাতরম্ সাগ্রহে উচ্চারিত হইয়া দিক্ নিনাদিত করিতেছে, কত লোকের হৃদয় কম্পিত করিতেছে, কত লোকের হৃদয়ে কত আশঙ্কার সঞ্চার করিতেছে। নারায়ণের নাম অসুর হিরণ্যকশিপুর নিকট অসহ্য ও ভয়াবহ হইয়াছিল, এই বন্দে মাতরম্ও সেইরূপ অনেকের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দৃঢ়ভক্তি প্রহ্লাদের মুখে সেই নারায়ণনাম উচ্চারিত হওয়ায় হিরণ্যকশিপু সেই সুকুমারমতি স্বীয় ঔরসজাত সন্তানের কতই নির্য্যাতন করিয়াছে। আমাদের রাজপুরুষেরাও সুকুমারমতি বালকের মুখে বন্দে মাতরম্ নাম শ্রবণ করিয়া, ভয়েই হউক, বিরক্তিতেই হউক, তাহাদের নির্য্যাতনে

ভক্ত-পুত্রকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। পুত্র অগ্নিপরীক্ষা হইতে কষিত নির্ম্মল কাঞ্চনবৎ বহির্গত হইয়া আসিল, আর দুর্ব্বুদ্ধি হিরণ্যকশিপু নিধনপ্রাপ্ত হইল।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহাবাক্য, পুণ্যভূমি-ভারত-পবিত্র বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ মহাজনের মুখনিঃসৃত। জন্মভূমিতে মাতৃভাবের আবেশ করা হইয়াছে। এ অতি উচ্চভাব। যে দেশে এই মহাবাক্য সর্ব্বত্রই শ্রুত হয়, সে দেশের লোকের মাতৃভূমির উপর ভক্তি কেন দুর্ব্বল হইয়া গেল? কেন ভারতসন্তান মাতৃভক্তি-বর্জ্জিত হইয়া অশেষবিধ দুঃখভাগী হইল? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, যে উচ্চভাবে ভাবান্বিত হইয়া একদিন ভারতবাসী মনঃপ্রাণ মিশাইয়া মহা উৎসাহে মহা উল্লাসে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া গর্ব্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন, সেই ভাবের অভাব হইয়াছে, সেই মাতৃভাবের মহত্ত্ব, দেবত্ব ও গুরুত্ব, মলিন সঙ্কুচিত স্বার্থপরতাপূর্ণ হৃদয়ে আর স্থান পায় না। পুত্রের মাতাকে, গর্ভধারিণী জননীকে, দেবীরূপে, অভীষ্টদেবতারূপে, সাক্ষাৎ সৃষ্টিস্থিতি-কারিণী আদ্যাশক্তিরূপে দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে, সুতরাং মাতৃভূমিতে মতৃভাব সন্নিবেশিত করিতে অক্ষম হইয়াছে। তাই মাতৃভূমির এ দুর্দ্দশা, মহাগুরুর অনাদর ও অভক্তির পাপে তাই সন্তানের এত দুর্দ্দশা। আজ বালকেরা পরিহাসচ্ছলে কখন-বা চাপল্যবশতঃ যে বন্দে মারতম্ ধ্বনি উচ্চারণ করে, যুবকগণ সমবেত হইয়া যে "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করি তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়তন্ত্রী কি বাজিয়া উঠে? তাহা শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া কি তাহার অলস হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া দেয়? এ সকল প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? যাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করা হইল, তাঁহারাই আত্ম-

মন্ত্রসাধনের রহস্য এই যে, মন্ত্র-উচ্চারণের সঙ্গে হৃদয়তন্ত্রী বাজিবে, সুর মিলাইয়া যখন জমিয়া যাইবে তখন সাধক আত্মহারা হইবে, আপনিও আত্মহারা হইবে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলকে আত্মহারা করিবে, তবে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, অন্যথা চীৎকারমাত্র সার, কেবল অযথা পরিশ্রম ও ক্লেশমাত্র লাভ।

জন্মভূমিকে মা বলিয়া সম্বোধন করত "তাঁহার বন্দনা করি" বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। এক্ষণে প্রথম প্রশ্ন—এই মা নামে যাহা বুঝায়, যে নারীমূর্ত্তিধারিণী দেবীকে বুঝায়, তাঁহার প্রতি তোমার হৃদয়ের ভাব কি, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি সেখানে কোন ব্যত্যয় লক্ষিত হয়, তাহা হইলে অজস্রচীৎকারসত্ত্বেও মাতৃভূমিবিষয়ে অধিকতর ব্যত্যয় লক্ষিত হইবে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অন্যদেশে যাহাকে patriotism বলে, তাহা স্বদেশানুরাগ, তাহার ভিত্তি গর্ব্ব বা অহঙ্কার। আর আমাদের যে patriotism "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বাক্যে প্রকাশিত, তাহা স্বদেশভক্তি তাহার ভিত্তি ধর্ম্ম। অপর দেশের লোকে মাতৃভূমি আমার বলিয়া মমতা করে, সে মমতা অন্যবস্তুতেও হইয়া থাকে, সেই মমতার আধিক্য তাহাদিগকে মাতৃভূমির জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে উদ্যত ও প্রস্তুত করে। আর আমাদের মাতৃভূমিতে কেবল মমতা নহে, মাতৃভূমি মাতা, গর্ভধারিণী জননীর সাক্ষাৎ আদর্শ-শক্তির পার্শ্বের আসনে উপবিষ্টা, তিনি আমাদের অপর প্রত্যক্ষ দেবতা সুতরাং স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমাদের স্বদেশভক্তি ধর্ম্মভিত্তিক বলিয়াই ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা ও গ্লানির সহিত তাহারও দুর্ব্বলতা ও গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্মের গ্লানির সহিত মাতাতে দেবীভাব অপসৃত হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমিতে মাতৃভাব ও দেবীভাবও অদৃশ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে শাস্ত্রকার ভারতবাসীর

ও গ্লানির সহিত সেই সকল বৃত্তি ও ব্যাপারেরও অভ্যুদয় ও গ্লানি ঘটিয়া থাকে।

বন্দে মাতরম্—এটী বীজমন্ত্র, মাতৃপূজার বীজমন্ত্র, মাতৃভূমির পূজার বীজমন্ত্র। শুভদিনে শুভক্ষণে মহাত্মা বঙ্কিম ঋষি হইয়া এই মন্ত্র প্রচার করেন। আজ আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে এই মন্ত্র। ইহার শক্তি-সম্বন্ধে বোধ হয় আর কাহারই সন্দেহ নাই। কারণ, ইহা পাত্রান্তরে প্রতিঘাত উৎপন্ন করিতেছে, মন্ত্রসাধনের রহস্য পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ভারতবাসীই প্রথমে ভগবান্‌কে বা ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র ভগবানের এই মাতৃভাবের উপাসনার প্রবর্ত্তক সেই ভারতের মহাপুরুষেরাই জন্মভূমিকে মাতৃভাবে সেবা করিতে বলিতেছেন। স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া তাঁহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতম স্থান দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সাধক নাই, সাধনাও নাই! এ মহত্ত্ব, এ দেবত্ব অনুভব করিবার উপযোগী হৃদয়ের ভাব নাই। তাই দেবতা ও মন্ত্রসত্ত্বেও সাধনাভাবে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে।

মাতা, ভগিনী, দুহিতা ও বনিতার দুঃখ বা অপমান লোকের অবিসহ্য হয়। তাহাদের বিপদে লোক আকুল হইয়া উঠে, উন্মত্ত হইয়া যায় এবং প্রাণ দিতেও সঙ্কুচিত হয় না। ইহাদের উদ্দেশে কেহ কোন অসম্মানের কথা বলিলে, কোন ভদ্রলোকে তাহা সহ্য করিতে পারেন না। ইঁহাদের মধ্যে মাতাই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। যাহারা মাতাকে দুর্গতিগ্রস্থ বা অবমানিত দেখিয়াও আপনারা হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইতে পারে, সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করে না, তাহারা নরাকার পশুমাত্র। শব্দ উচ্চারিত হইলে শব্দপ্রতিপাদ্য বস্তু বা ব্যক্তির মূর্ত্তি মনশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রতিফলিত হয়। কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে করিতে যদি চিত্ত কৃষ্ণ-ময় না হয়, যদি শ্রীকৃষ্ণের মোহনমূর্ত্তি চিত্তফলকে প্রতিফলিত না হয়,

চিত্তফলকে প্রতিফলিত না হয়, তবে তাহা বলাই বৃথা। ভক্তি, স্নেহ ও মমতা, দর্শন, মিলন ও সঙ্গ সাপেক্ষ। মায়ের মূর্ত্তি চিত্তফলকে প্রতিফলিত হইলে, যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ও শান্তির ভাবের উদয় হয়, তাহা হয় কি না দেখা চাই। যদি না হয়, তৎবিপরীত বা মিশ্রত ভাবের আবেশ হইবেই। সাধকপ্রবর তুলসীদাস সপরিবার রামচন্দ্রকে দেখিতে চাহেন, মহাবীর তাঁহাকে ভগবানের বলরামবেশ দেখান, তথাচ সাধকশ্রেষ্ঠ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন "আমি ও-রূপ দেখিব না, ও যে হৃদয়বিদারক রূপ, আমি ভগবানের রাজরাজেশ্বর বেশ দেখিব।" তখন মহাবীর সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

মা মা বলিয়া ডাকিলে যদি মায়ের মূর্ত্তি বা মাতা স্বয়ং আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, তখন কি বিমল সুখ, কি বিমল আনন্দ, কি বিমল শান্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু রাজরাজেশ্বরীর পুত্র যদি মাতাকে রাজরাজেশ্বরী না দেখিয়া দীনা, হীনা, মলিনা, অন্নহীনা, জীর্ণাশীর্ণা দেখেন, তখন তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, লজ্জায় মস্তক অবনত হয়। তথাচ যদি সন্তান মাকে রাজরাজেশ্বরীবেশে বিভূষিতা দেখিবার জন্য তুলসীদাসবৎ আকুল না হয়, এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে যত্নবান্ না হয়, তবে সন্তান নহে কুলাঙ্গার, মনুষ্য নহে পিশাচ।

মহাবীর রাণা প্রতাপ রাজরাজেশ্বরী মাতার দীনহীন মলিন বেশ দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। জননীকে পুনশ্চ রাজরাজেশ্বরীবেশে সজ্জিত করিয়া রাজসিংহাসনে পুনশ্চ বসাইবার এক কঠোর ব্রতের অবলম্বন করেন, এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উপযুক্ত উত্তর-সাধকের অভাবে তিনি সে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে, সে যজ্ঞের উদ্-যাপন করিতে পারেন নাই। আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার পূর্ণাহুতি দান করিয়াছিলেন। মাতার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া কৃষক গ্যারিবল্ডীর

প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি মাতার চক্ষুজলমোচন ও দুর্দ্দশানাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেন। উপযুক্ত উত্তরসাধকের সাহায্যে তিনি সে ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মাতৃযজ্ঞ অতি মধুরও বটে, অতি কঠোরও বটে। ইহার প্রধান সাধন স্বার্থত্যাগ, মিলন ও একান্তপ্রাণে কার্য্য করা। ইহা একাকী সিদ্ধ হয় না, উত্তরসাধকের সাহায্য সম্পূর্ণ প্রয়োজন।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

ফিরিঙ্গির বাণিজ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

History, ancient or modern, records no achievement of armed commerce so rapid, so brilliant, and so fraught with lasting results.

W. W. Hunter.

ফিরিঙ্গির বাণিজ্যনীতির সহিত ইতিহাস আমাদিগকে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। ভিক্ষাভাণ্ড-করে দীনভিক্ষুকের ন্যায় তাহারা রত্নাকরের পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইয়া, অবশেষে কৃপাণে কামানে ও শোণিত-প্রবাহে স্বমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ভাস্ক-ডা-গামা কম্পিতহৃদয়ে ভারতবর্ষের উপকূলে আসিয়া তাঁহার অর্ণবপোত ভিড়াইয়াছিলেন, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সামুরিরাজের মহাসমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন, রাজার অধিক সম্মান লাভ করিয়া পরম পুলকিত হইয়াছিলেন—কিন্তু স্বদেশপ্রত্যাগমনকালে আপনার প্রকৃত

পর্ত্তুগালরাজ ডন্ স্যামুয়েল "জেহাদ" বলিয়া যে যুদ্ধাভিযানের নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রুশের অন্তরালে থাকিয়া কৃপাণের সাহায্যে বাণিজ্য-বিস্তারের কৌশল বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ফিরিঙ্গি চতুর জাতি—ভাস্ক-ডা-গামা ফিরিঙ্গির শিরোমণি; তিনি অনায়াসেই বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের আন্তর্জাতিক বিবাদই একদিন তাঁহার চরমসিদ্ধির পথ মুক্ত করিয়া দিবে—নরপতি ইমান্যুয়েলও এ কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই পণ্যপূর্ণ বাণিজ্যতরণীমধ্যে কামান, বারুদ, গোলা প্রভৃতিও ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল! ফিরিঙ্গির ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাদিগের বাণিজ্য বিজয়বৈজয়ন্তীর অনুসরণ করিয়াছিল না—বিজয়বৈজয়ন্তীই বাণিজ্যের পশ্চাতে পশ্চাতে নিতান্ত চোরের ন্যায়, নিতান্ত অক্ষমের মত, নিতান্ত দুর্ব্বলের ন্যায়, ভারতে আসিয়াছিল। পরে ভারতবর্ষের শক্তিহীনতা, স্বার্থনিন্দন ও আত্মকলহের আশ্রয়ে প্রতিদিন পরিপুষ্ট হইয়া উহা অবশেষে সগৌরবে স্বাধিকার সংস্থাপন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ভারতের লাঞ্ছিত, প্রতারিত, রণাহত রাজশক্তি নিঃশেষে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল!

১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ভাস্ক-ডা-গামার ভারত পরিত্যাগের পর ফিরিঙ্গির বাণিজ্যনীতিকে মূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ স্থির ছিল যে, এক একখানি বাণিজ্যপোতই এক একটী সচল কুঠি স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া ভারতবর্ষের মসলাদি ক্রয় করিবে এবং লিস্বনের বাজারে পৌছাইয়া দিবে। এই সকল ভাসমান কুঠিই অর্থলোলুপ ফিরিঙ্গি বণিকদিগের আশ্রয়স্থল হইয়া ভারতসাগরে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইবে। কিন্তু অল্পকাল পরই এই সরল সহজনীতি পরিহারপূর্ব্বক পর্ত্তুগাল স্থির করিল যে, ভাসমান কুঠিতে কোন ফল নাই, সমুদ্রতীরে

হইবে। ক্যাব্রেল এই নীতির অনুসরণ করিলেন। ইহাতেও সুবিধা হইল না; শক্তিসঞ্চয় যে নিতান্ত প্রয়োজন ফিরিঙ্গিগণ তাহা বুঝিতে পারিল। দ্বিতীয় অভিযানকালে ভাস্ক-ডা-গামা বলসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইলেন; ফিরিঙ্গির বাণিজ্য সমুদ্রতীরে প্রসর লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও তিনি ভারতবাসীর চরিত্রে কথঞ্চিৎ সন্দিহান ছিলেন—তাহাদিগের শক্তির উপর একেবারে অবিশ্বাস করিতে তখনও তাঁহার সাহসে কুলাইতেছিল না: এতবড় বিরাট বিশাল সাম্রাজ্য যদি একবার নড়িয়া উঠে, যদি একবার জাগিয়া উঠে, যদি একবার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আত্ম-কর্ত্তব্যপালনে বদ্ধ পরিকর হয়, তবেই ত সর্ব্বনাশ ঘটিবে—মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গিবীরগণ যে তাহা হইলে মুহূর্ত্তে অনন্ত জলধিমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে! তাই ভাস্ক-ডা-গামা যুদ্ধোপকরণাদি ভূমিতলে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন—সর্ব্বলোচনসমক্ষে রক্ষা করিতে সাহস করেন নাই—সুপ্তিসুখমগ্ন সিংহকে কে সাধ করিয়া জাগাইয়াতুলে!

কিন্তু ফিরিঙ্গি-সর্দ্দার আল্‌বুকার্ক আসিয়া দেখিলেন যে, সব ভ্রান্তি, ঘোর আত্মপ্রবঞ্চনা! এ সিংহ আর নড়িবে না—আর জাগিবে না—ইহা মৃতবৎ সুপ্ত। তিনি তখন ভূপ্রোথিত অস্ত্রশস্ত্রগুলি একে একে বাহির করিলেন। যে সকল সুরক্ষিত স্থানগুলিকে ভাস্ক-ডা-গামা এতদিন বাণিজ্য-ক্ষেত্র বা কুঠি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, আল্‌বুকার্ক এখন স্বচ্ছন্দচিত্তে নির্ভয়ে ঘোষণা করিলেন যে, সেগুলি কুঠি নহে ফিরিঙ্গির দুর্গ! সেই সকল দুর্গমধ্যে তখন ফিরিঙ্গিসেনানায়কদিগের অধীনে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সমরব্যবসায়িগণ যুদ্ধশিক্ষা করিতে লাগিল। আল্‌বুকার্কের শিষ্য সাল্‌ধানা তখন নিঃশঙ্কচিত্তে লোহিতসাগরের প্রবেশমুখ অবরোধ করিয়া বসিলেন। আরব-বণিকগণ সুপ্তোত্থিতের মত চাহিয়া দেখিল যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে—তাহাদিগের জীর্ণ পর্ণশালায়

তার পর আসিলেন পাকিও এবং সোয়ারেজ। এতদিনের শিক্ষা ইঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন না। অবিলম্বে আরব বণিকদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিধাতার অনলগর্ভ বজ্রের ন্যায় সে আক্রমণ দক্ষিণভারতের মুসুলমান-বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ধ্বংস করিয়া দিল। পারস্য উপসাগর তখন একমাত্র ভরসা থাকিল। কিন্তু কতদিন! অবশেষে তাহাও গেল—দেখিতে না দেখিতে ফিরিঙ্গিগণ মালাবার-তীরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। ১৪৯৯ হইতে ১৫০৫ এই সামান্য কয়েক বৎসরেই ফিরিঙ্গিবাণিজ্য যেরূপ বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আধুনিক অথবা প্রাচীন কোন ইতিহাসেই তাহার তুলনা মিলে না।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষের একজন স্থায়ী ফিরিঙ্গিশাসনকর্ত্তার অভাবে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল বলিয়া আল্‌মিদা বিপুলা বাহিণী সমভিব্যাহারে ভারতের সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টান শাসনকর্ত্তাস্বরূপ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গির বাণিজ্য-তরণীসমূহ তখন তথা হইতে যাত্রা করিয়া ভারতসাগরে একাধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকিত। মোম্বাসা করতলগত করিয়া কুইলোয়ায় একটী দুর্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক আল্‌মিদা মালাবার-বিজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তখনও আরব-বণিকগণ মালাবারে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক ছিল। শুধু মালাবারের সর্ব্বনাশসাধনই যে আল্‌মিদার একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল, তাহা নহে। যাহাতে মুসুলমান নৌশক্তি চিরদিনের জন্য ভারতমহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায় তাহাও সুসম্পন্ন করা আলমিদার কর্ত্তব্য ছিল। পর্ত্তুগালনৃপতি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এখন মালাবারকূলে আরব-বণিকদিগকে উৎখাত করিবার

অধীনে আনিতে হইবে, সেজন্য ইস্‌লামে ও ক্রুশে যে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, পর্ত্তুগালরাজ তাহার জন্যও প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই বিপুল সমরপ্রাঙ্গণের কেন্দ্রভূমিতে—পেলেস্তাই ও বাইজান্‌সিয়ম সাম্রাজ্যে—মুসলমানশক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। বহুশতবর্ষের সমরেও সে শক্তি হীনগর্ব্ব হইয়াছিল না, কিন্তু সমরাঙ্গণের পশ্চিমপ্রান্তে স্পেন এবং পর্ত্তুগালে খ্রীস্তান-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। সেই সমরক্ষেত্র এখন প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যে আসিয়া দাঁড়াইল! নৃপতি ইমানুয়েলের ন্যায় মুসলমানগণও এ কথা বুঝিতে পারিয়াছিল।

ফিরিঙ্গি আল্‌মিদার শোচনীয় পরিণাম আমরা পূর্ব্বাধ্যায়েই দেখিয়াছি। কিন্তু ভারত-প্রবাসকালে তিনি কোনদিনই কর্ত্তব্যবিমুখ ছিলেন না। তাঁহার অগণিত সৈন্যদল নানা উপায়ে মালাবার ধ্বংস করিয়াছিল—মুসলমান-বাণিজ্যকেও পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল।

আল্‌মিদা স্থির করিয়াছিলেন যে, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, তিনি ভারতবর্ষে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ভারাক্রান্ত হইবেন না। তাই তিনি তাঁহার নৃপতির নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন—

"এদেশে দুর্গের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি করা হইবে, পর্ত্তুগালের শক্তিও ততই এদেশে হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে। আমাদের সমুদয় বল সমুদ্র-জলে বিচরণ করুক। আমরা যদি সমুদ্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে সমস্তই বৃথা।...আমাদিগের নৌশক্তি যতদিন প্রবল থাকিবে, ভারতবর্ষও ততদিন আমাদেরই, আর কাহারও নহে। নৌবলের অভাব থাকিলে ভারতবর্ষে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কোন ফল নাই।"

কিন্তু পর্ত্তুগালরাজ তখন আশার আলোক সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

ছিল না। তিনি তখন জলপথ ও স্থলপথ এতদুভয়েরই কর্ত্তা হইয়া ভারতবর্ষের প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথম ভারতবর্ষের অভিযানে ফিরিঙ্গিগণ মালাবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; তাহাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই। তার পর চারি বৎসরে আল্‌মিদার কৌশল ও কার্য্যকুশলতা ফিরিঙ্গিবণিকদিগকে ভারতসমুদ্রের একছত্র কর্ত্তা করিয়া তুলিয়াছিল। আল্‌মিদার পর আল্‌বুকার্ক যখন ভারতের ফিরিঙ্গিসর্দ্দার হইলেন, তখন ফিরিঙ্গির বিজয়বৈজয়ন্তী ভারতসাম্রাজ্যলাভের জন্য অগ্রসর হইতেছিল। নৃপতি ইমান্যুয়েল ১৪৯৫ হইতে ১৫২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ শাসনসময়ে তিনিই প্রথমে ভাস্ক-ডা-গামাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবার তিনিই ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গিরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, ফিরিঙ্গির রাজধানীকে প্রাকারে-প্রাসাদে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। পর্ত্তুগালের ইতিহাসে তাই ইমান্যুয়েল সদা-পূজিত। তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী ফলকাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

আল্‌মিদা যখন ম্লানমুখে স্বদেশে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুবর্গও তাঁহার সহিত ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, যে আল্‌বুকার্কের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহারা আল্‌মিদার অভিষ্টসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হইয়াছিলেন, সেই আল্‌বুকার্কই এখন ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গির কর্ত্তা হইলেন। সুতরাং আপনাদিগকে আর নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া তাঁহারা স্থানত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

আল্‌বুকার্কের অতি তীক্ষ্ণ দূরদর্শী দৃষ্টি ছিল। তিনি গৃহবিবাদের দিকে মনোযোগ দিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ফিরিঙ্গিগণ এতকাল শুধু কয়েকজন সামন্তনৃপতির সহিত যুদ্ধ-কলহে ব্যাপৃত ছিল,

সমুদ্রপথের অধিপতি হইবে। এখন বিপুল মুসলমান-শক্তির সহিত মুষ্টিমেয় খৃষ্টানের সমর—হীনশক্তি কয়েকজন সামন্তরাজের সহিত নহে। "ওই রুম আসিল—ওই বুঝি রুমী সৈন্য দেখা দিয়াছে।" এই ভয়ে আলবুকার্ক তখন সদা চিন্তিত ও কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিসে পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠা ও বিপক্ষের পরাজয় হইবে, আল্‌বুকার্ক তখন সেই চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

আল্‌বুকার্ক যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, সে সমুদয় কথা এখন স্মরণ হইলে আমাদিগের মনে হয় যে, মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে—উহা আরব্য উপন্যাসের কল্পনাময় অলৌকিকী কাহিনীরই উপযুক্ত। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, নীলনদীর গতি প্রতিরোধ করিয়া উহাকে লোহিতসাগরে আনিয়া ফেলিবেন। উহার শাখা-প্রশাখা যাহাতে মিসরের অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া তদ্দেশের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার অপর কল্পনা আরও ভয়াবহ! তিনি মুসলমানের উপর এতই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে, মনে করিয়াছিলেন, মক্কানগরী বজ্রদীর্ণ করিয়া হজরত মহম্মদের সমাহিত দেহ উঠাইয়া আনিবেন এবং অবশেষে পৃথিবী সমক্ষে সেই শবদেহের অগ্নিক্রিয়া করিয়া মুসলমানদিগকে স্তম্ভিত করিবেন!*

আল্‌বুকার্কের কল্পনাময় উপন্যাসে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও রাজ্যবিস্তৃতির কৌশলই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন পারস্য উপসাগর এবং লোহিতসাগরের প্রবেশমুখ অবরোধ করিয়া নীল

---

* To carry away from Mecca the bones of the abominable Mafoma [Mahommad], that, there being reduced publicly to ashes, the votaries of so foub a sect might be confounded.—D. Alboquerque's Commentaries, I. p. XLI, as quoted by W. W. Hunter.

এবং ইউফ্রেটিস্ নদীতরে মুসুলমান-বাণিজ্যের ধ্বংসসাধন করিবেন। এই কার্য্যে তিনি আংশিক সফলকামও হইয়াছিলেন। হরমুজের সুদৃঢ় দুর্গ, আদেন অবরোধ এবং দক্ষিণ হইতে মিসর আক্রমণের জন্য আবিশিনিয়ার খ্রীষ্টানশক্তিকে উত্তেজনাই তাহার প্রমাণ।

আলবুকার্কের দ্বিতীয় কার্য্য মালাবারের মুসলমান-বাণিজ্য ধ্বংসকরণ। গোয়া অধিকার করিয়া আল্‌বুকার্ক তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গোয়ার উপনিবেশই ফিরিঙ্গিবণিকের কাল হইয়াছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে এতদিন ধরিয়া যে ফিরিঙ্গি নৌশক্তি প্রবল পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত ছিল, গোয়াতেই তাহার পতন হইয়াছিল। আল্‌বুকার্ক মালাবারের মুসুলমানবাণিজ্য বিনষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন না। সুদূর প্রাচ্যের কোনস্থানেই যাহাতে এদেশীয় বাণিজ্য জীবিত থাকিতে না পারে, তিনি তাহারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। আল্‌বুকার্ক তাই মালাক্কা অধিকার করিয়া তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গির শাসন শতবর্ষ ধরিয়া মালাক্কাপ্রদেশে অব্যাহত ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

The stratagic design for converting the Indian Ocean from a Moslem to a Christian trade-route was complete. It only remained for his successors to fill in the details.

W. W. Hunter.

আল্‌বুকার্ক যখন ভারতবর্ষে পর্ত্তুগালের সর্ব্বপ্রধান পোতাধ্যক্ষ এবং শাসনকর্ত্তারূপে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময়েই সামরীরাজের শক্তি নষ্ট করিবার জন্য তিনি যথাবিহিত আয়োজন করিতে লাগিলেন। আলবুকার্ক কহিয়াছিলেন যে, কালিকাটের সর্ব্বনাশ

পতিও এদিকে কালিকাটের সকল অবস্থা জানিবার জন্য দুই জন ব্রাহ্মণ গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন ; তাহারা সর্ব্বদা সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল।* শুধু ইহা করিয়াই যদি কোচিনরাজ নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলেও হইত ! কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরদিন কলঙ্ক-মলিন। আত্মকলহ এবং "ঘরভেদি-বিভীষণ-নীতি"ই চিরদিন ভারতবর্ষের পতনপথ কণ্টকমুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাই স্বার্থান্ধ ভবিষ্যৎদৃষ্টিবিহীন কোচিনরাজ কয়েকজন সামন্তনৃপতিকে লিখিয়া জানাইলেন যে, তাহারা যেন জামোরিণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া তাঁহার কালিকাটের বল অন্যস্থানে টানিয়া লয় !* আল্‌বুকার্কও কোচিনের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন না। এদিকে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজা কালিকাটে নাই, তাঁহার সমস্ত সৈন্যসামন্তও স্থানান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত আছে সুতরাং রাজধানী আক্রমণের ইহাই সুযোগ।

গুপ্তচরের মুখে সংবাদ শুনিয়া ফিরিঙ্গির সমরসভা বসিল। সভায় স্থির হইল যে, ইহাই সুযোগ, রাজধানী আক্রমণ করাই সিদ্ধ। যাহাতে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত না হয় সেই জন্য প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া আল্‌বুকার্ক ঘোষণা করিলেন যে, তিনি গোয়ার যুদ্ধাভিযান করিতেছেন।

এদিকে কোচিন হইতে ফিরিঙ্গির রণতরীসমূহ কালিকাট ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিল, ২০০০ ফিরিঙ্গিসৈন্য বিজয়নিনাদে অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ একদিন কালিকাটে যাইয়া উপনীত হইল ; তখন নগর অরক্ষিত, সামরীরাজ অনুপস্থিত, নাগরিকগণ নিশ্চেষ্ট এবং সন্দেহশূন্য হইয়া কালাতিপাত করিতেছিল। ফিরিঙ্গিসৈন্য অবিলম্বে বিনাবাধায় সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল—মুসলমানের মস্‌জিদ্

Portuguese in India, D…

অনলসংযোগে হু হু জ্বলিয়া উঠিল, শেষে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। তখনও ভারতবর্ষে বীর ছিল, তখনও তাহারা দুর্ব্বল-হস্তে অসিধারণ করিত না। সেই বীর নায়ারগণ যদিও মুষ্টিমেয় ছিল, কিন্তু অমিত বিক্রমে যুঝিতে লাগিল—সেই আহবে স্বয়ং মার্চ্চাল এবং তাঁহার সহকারী ও আরও অনেক প্রধান প্রধান ফিরিঙ্গিযোদ্ধা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল—আল্‌বুকার্কও দুইটী আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। নায়ারসৈন্যের বীরপণার সম্মুখে সেদিন ফিরিঙ্গিসৈন্য একান্ত পর্য্যুদস্ত হইয়া পলায়ন করিল। আন্‌টোনিও এবং রাবেলনামক দুইজন পর্ত্তুগীজ কাপ্তেন সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত না হইলে, বোধ হয়, ফিরিঙ্গির পরাজয় আরও ভীষণ হইত—হয়ত পরাজয়বার্ত্তা বহন করিয়া পলায়ন করিতেও কেহ থাকিত না!

ভারতবর্ষে জয়চাঁদ বা মীরজাফর সংখ্যাতীত ছিল। তাই বিজয়-নগরের রাজা নরসিংহরাজ ফিরিঙ্গিদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রতিদানস্বরূপ আল্‌বুকার্ক কহিলেন—"এখন হইতে" হরমুজ হইতে আনীত অশ্বের বাণিজ্য আপনার দেশেই হইবে—দাক্ষিণাত্য সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল!

রুমীসৈন্যের নামে সেকালে ফিরিঙ্গিগণ একান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই দ্বিতীয়বার যুদ্ধাভিযানের ব্যবস্থা করিতে না করিতেই আল্‌বুকার্ক যখন শুনিলেন যে, রুমী তুর্কেরা গোয়ায় একান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগের সাহায্যের জন্য সুলতানের সৈন্যও আসিতেছে এবং রুমীকারিকরগণ গোয়ায় বসিয়া অতি উৎকৃষ্ট জাহাজাদি নির্ম্মাণ করিতেছে, তখন তিনি আর সুস্থির রহিলেন না। অল্পকালমধ্যেই ফিরিঙ্গিসৈন্য পাঞ্জমদুর্গ জয় করিয়া উহার অগ্নিসংকার করিল এবং দুর্গস্থিত অস্ত্রাদি লুণ্ঠন করিয়া জাহাজে প্রস্থান করিল।

নাগরিকগণ অবশেষে অল্পকালমধ্যেই পর্ত্তুগীজনৃপতির আনুগত্য স্বীকার করিয়া অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল।

বিজয়োৎফুল্ল আল্‌বুকার্ক অবশেষে সসৈন্যে গোয়ার দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যুদ্ধ পর্য্যন্তও ঘটিল না—গোয়ার সেনাপতি কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করিল। গোয়ার দুর্গে রণসজ্জার অভাব ছিল না—কামান, গুলি, গোলা, ও বারুদের অভাব ছিল না—অভাব ছিল সাহসী রণদক্ষ সেনাপতির। সেই অভাবেই গোয়া ফিরিঙ্গির হস্তগত হইল। চল্লিশখানি বাণিজ্যপোতপূর্ণ পণ্যদ্রব্য এবং বহুতর অশ্বাদি ফিরিঙ্গিগণ লুঠিয়া লইল। রুমী ও তুর্কদিগের স্ত্রীপুত্রকন্যাদিও ফিরিঙ্গিসর্দ্দারের হস্তে বন্দীকৃত হইয়া রহিল। গোয়ার সেনাপতি শরণাগতদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্গস্থিত নানাবিধ দ্রব্য গ্রহণ করিলেন এবং পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়া যশস্বী হইলেন! পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র দুর্গাদিতে যে সমুদয় তুর্ক ও রুমীগণ বাস করিতেছিল, তাহারাও অবিলম্বে বিতাড়িত হইল।

মালাবার এবং গুজরাটের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গোয়া অধিকার করিয়াই আল্‌বুকার্ক দক্ষিণ এবং উত্তর বোম্বাইকূলের বাণিজ্য করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্যাম্বে উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কুমারীকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গির বাণিজ্য-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। শেষে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, যে মুসলমান বাণিজ্যতরণী একদিন নির্ব্বিবাদে মালাবার উপকূলে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত, ফিরিঙ্গির ছাড়পত্র ভিন্ন সে সমুদয়ের গতি এককালে রোধ হইয়াছিল!

আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি শুনিলেন যে, আদিলশাহ ফিরিঙ্গিদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিতেছেন এবং শম্বেশ্বরের রাজা

বলোজী, সুবার সেনাপতি রোশল খাঁ ও করপত্তনরাজ মালিক রাব্বল্, আদিলশাহকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া ফিরিঙ্গিগণ চিন্তিত হইয়া উঠিল।

আদিলশাহ বিজয়পুরের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নরসিংহরাজ একান্ত মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিস্মৃত না হইয়া তিনি ফিরিঙ্গির সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে চাহিলেন।* তিনি বুঝিলেন না যে, গোয়ানগর হইতে ফিরিঙ্গিবণিকদিগকে বিদূরিত করিতে পারিলে ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে। হিন্দু এবং মুসলমানের এই বিদ্বেষই যে ভারতবর্ষের অবনতির মূলকারণ, ইতিহাস আমাদিগকে চিরদিনই সেই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছে।

যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল; আল্‌বুকার্ক গোয়ানগর-প্রবেশের সমুদয় পথঘাট সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে গোয়া-নিবাসী মুরবণিকগণ আদিলশাহের নিকট কোন পত্রাদি প্রেরণ করিতে না পারে, তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আশ্রয়ের জন্য এবং পলায়নের জন্য নৌকাগুলিও সজ্জিত রহিল। আদিলশাহ সৈন্যসামন্ত লইয়া বালেস্‌টারিমে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং আল্‌বুকার্কের নিকট দুই জন দূত প্রেরণ করিলেন। দূতদ্বয় আসিয়া জানাইল যে, গোয়ানগরের পরিবর্ত্তে আদিলশাহ সমুদ্রতীরবর্ত্তী অন্য একটী স্থান প্রদান করিতে সম্মত আছেন। কিন্তু আল্‌বুকার্ক সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। দূতদ্বয় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

---

* The king of Narsinga had, however, replied that *forty years ago* the Moors of the Deccan had taken the kingdom of Goa from him, and he was not now sorry to see it in the possession of the king of Portugal, and that his intention was to assist the Portuguese in defending the place.—Danver, vol. I.

অবশেষে মে মাসের এক অতি অন্ধকার নিশিতে মুসলমানগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া গোয়া আক্রমণের চেষ্টা করিল। পূর্ব্ববর্ত্তী দলমধ্যে তিন জন ভিন্ন সকলেই ফিরিঙ্গির অস্ত্রাঘাতে নিহত হইল। পরবর্ত্তী দল বীরবিক্রমে অগ্রসর হইয়া দুয়ার্ত্তে-দা-সুসাকে সসৈন্যে নিহত করিল। বিজয়ী মুসলমানসৈন্য পথ প্রাপ্ত হইয়া বন্যার স্রোতের মত গোয়ানগরমধ্যে প্রবেশ করিল, আল্‌বুকার্ক তখন তরণীসংযোগে পলায়ন করিয়া জাহাজে প্রস্থান করিলেন। ফিরিঙ্গির রাক্ষসতুল্য স্বভাব কখনই গুপ্ত থাকিবার ছিল না, তাই পলায়নকালেও অল্‌বুকার্ক আদেশ করিলেন যে, দুর্গস্থিত ১৫০ শত প্রধান মুর বণিকের ছিন্নমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত কর, অশ্বশালার অশ্বগুলির জঙ্ঘার মাংস কাটিয়া লইয়া উহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দাও এবং অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ কর।*

নানারূপে বিধ্বস্ত হইয়া আল্‌বুকার্ক অবশেষে কোচিনে আসিয়া এক সমরসভা আহ্বান করিলেন। তিনি ফিরিঙ্গিসেনানায়কদিগকে কহিলেন যে, গোয়া অধিকার করা একান্ত প্রয়োজন। গোয়া হইতে বিতাড়িত হইলে ভারতবর্ষ হইতে ফিরিঙ্গিবণিকের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। শেষে যুদ্ধ করাই স্থির হইল। আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগালনৃপতিকে লিখিলেন—"গোয়া যদি করতলগত থাকে তাহা হইলে আমরা দক্ষিণভারত অনায়াসে জয় করিতে পারিব। যুদ্ধজাহাজই আমাদিগের ভরসা। গোয়ার অধিবাসিগণ সেই সকল রণতরী নির্ম্মাণে সুপটু। য়ুরোপীয় কারিকরগণ এদেশে আসিয়া অল্পকালমধ্যেই

* "...... So he ordered Gasper de Paiva to proceed to the fortress and direct his men to cut off the heads of Melique Cufecondal and of 150 principal Moors of the city, to hamstring all the horses that were in the stables, and to set fire to the arsenals. Danver, vol. I.

অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে—তাহারা শেষে মনুষ্যেরও বাহির হইয়া যায়, কিন্তু গোয়ার মিস্ত্রিগণ চিরকালই সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। গোয়া মুসলমানের অধিকারে থাকিলে, তাহারা অনায়াসে অসংখ্য রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া আমাদিগকে একান্ত বিধ্বস্ত করিয়া দিবে। কিন্তু আমরা যদি গোয়ার কর্ত্তা হই তাহা হইলে দাক্ষিণাত্য-বিজয় অনায়াসসাধ্য হইবে—কারণ অন্তর্ব্বিবাদে সে প্রদেশ এখন একান্ত শক্তিহীন !"* আল্‌বুকার্ক বিদেশী হইয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন, আমাদিগের দেশীয় নৃপতিগণ স্বার্থের অন্ধকারতলে থাকিয়া তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাই কথায় বলে, যাহার গৃহে প্রথমে অনল জ্বলিয়া উঠে সে গৃহস্থ তখন তাহা জানিতে পায় না। ভারতবর্ষের উপকূলে তখন ধীরে ধীরে যে অনল জ্বলিয়া উঠিতেছিল তাহা তদ্দেশবাসী নৃপতিবৃন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। তাঁহারা তখন আত্মকলহ লইয়া ব্যস্ত থাকিলেন এবং ফিরিঙ্গির স্তোত্রবাক্যে ভুলিয়া দেশের কল্যাণ কামনা হইতে বিরত থাকিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

সমালোচনা।

কৃষিভাণ্ডার—শ্রীসতীশচন্দ্র কবিভূষণ-কর্তৃক সম্পাদিত। এই পুস্তকখানি কৃষি ভাণ্ডারের দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য এক টাকা, ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা, বঙ্গলক্ষ্মী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কবিভূষণ নিশ্চয়ই সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, তিনি দেশের এই দুর্দ্দিনে এজন্য একখানি সুন্দর কৃষিবিষয়ক পুস্তক সম্পাদিত করিয়াছেন, ইহা আমরা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করি। দেশের লোকের মতিগতি কোন্ পথে, তাহা কবিভূষণমহাশয়ের এই কার্য্য হইতেই বুঝিতে পারিতেছি। পুস্তকখানি কৃষিবিষয়ক মাসিকপত্র, বঙ্গলক্ষ্মীর উপহাররূপে প্রদত্ত হইতেছে। বঙ্গলক্ষ্মীর ন্যায় কৃষিবিষয়ক মাসিকপত্রের এরূপ উপহার গ্রাহকগণের পক্ষে যথেষ্ট হিতকর হইয়াছে সন্দেহ নাই। বঙ্গলক্ষ্মীর প্রচারক বাবু হেমচন্দ্র মিত্র একজন বহুদর্শী কৃষিবিৎ। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি কৃষি ও কৃষকসম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "সমাজের প্রাণ ও মেরুদণ্ডস্বরূপ পরম উপকারী কৃষকগুলিকে 'চাষা' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া বাহাদুরী লইবার দিন আর নাই। পরপদলেহন করিয়া, পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া পরের দাসত্ব করিব, তথাপি স্বাধীনবৃত্তি কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দিব না, এ ভাব ধীরে ধীরে অপনোদিত হইতেছে।"

আমাদের দেশে কৃষকের সংখ্যাই অধিক, কৃষি ভারতের অর্থাগমের ও উন্নতির প্রধান উপায়, অল্প চেষ্টায় এদেশে শস্য উৎপাদন হয়, সুজন্মার বৎসরে কেহ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে না; কিন্তু নানা কারণে আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। এই অবনতির কারণ দূর করিতে হইলে কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু কৃষিও যে একটা বিদ্যা, এবং অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ইহা আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা অনেকে জানেন না। দেশের লোক প্রায় সকলের একটু বাগবাগিচা বা শাকসবজি উৎপাদনের ক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত পরিমাণ আয় করিতে হইলে, কৃষিবিষয়ক কার্য্যে বিশেষ দক্ষতার আবশ্যক; কৃষিভাণ্ডারনামক পুস্তকখানিতে সে অভাব আংশিকরূপে পূর্ণ হইবে, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি; এই পুস্তকে শাক-সবজি, ফুল-ফল প্রভৃতি উৎপন্ন করিবার উপায়সম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে। কৃষিকার্য্যে যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহারা এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন।

শিল্পভাণ্ডার বা স্বাধীন জীবিকা—মূল্য ছয় আনা। এ পুস্তকখানি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কবিরত্ন-কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই কবিরত্নমহাশয় কৃষিভাণ্ডারের সম্পাদক কবিভূষণ সতীশচন্দ্র কিনা, বলিতে পারিনা, তবে ইহাও বঙ্গলক্ষ্মীর উপহার; এবং বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ইহার প্রকাশক। এই পুস্তকে নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য, কালি, সিরাপ, আচার, রঙ্গ, আবির, সাবান, বাতি, বার্ণিশ, রঙ্গমশাল ও আতসবাজি প্রভৃতি প্রস্তুতের প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল জিনিস প্রস্তুত করিয়া অল্পলাভে বিক্রয় করিলে কুড়ি পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরীর জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় না ইহা নিশ্চয়; কিন্তু পুস্তকখানি তেমন সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই—গঙ্গাতুবড়ীনামক আতসবাজি প্রস্তুত করিতে যাহা যাহা লাগে তাহার ভাগ আছে, কিন্তু কিরূপে তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এরারুটবিস্কুট প্রস্তুতের নিয়মে লিখিত আছে—"একপোয়া এরারুট, একছটাক চিনি ও একছটাক মাখন, তিনিগারে মাখিয়া পয়সা বা আধুলির আকারে ছোট ছোট নেচি পাকাইয়া অগ্নিতে ভাজিতে হয়।" প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষে এইটুকুমাত্র উপদেশে বিস্কুট প্রস্তুত যে কত কঠিন, তাহা ভুক্তভোগীর অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। স্বাধীনজীবিকার উপায়শিক্ষার জন্য হাতেকলমে শিক্ষা একান্ত আবশ্যক, এ ক্ষেত্রে পুঁথিগত বিদ্যা তেমন ফলপ্রদ হয় না।

গৃহস্থালী—(দ্বিতীয় ভাগ) মূল্য ছয় আনা। ইহাও উক্ত পণ্ডিত কবিরত্নের সম্পাদিত, এবং বঙ্গলক্ষ্মীর উপহার। কবিরত্নমহাশয় দেখিতেছি সর্ববিদ্যা-বিশারদ। প্রথমেই চিকিৎসার উপদেশ—কিরূপে নাড়ী দেখে, তাহার পর বিবিধ রোগের পাঁচন। অনন্তর কতকগুলি অব্যর্থ মুষ্টিযোগের নাম। সেকালে গৃহিণীগণ অনেকপ্রকার মুষ্টিযোগ জানিতেন। পরিবারস্থ লোকের, এমন কি, প্রতিবেশিগণেরও তাহাতে বহু উপকার হইত। এখন মুষ্টিযোগের স্থান বঙ্গান্তঃপুরে নাটক-নভেলে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে, সুতরাং এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সকল মুষ্টিযোগের কথা সাবধানে লিপিবদ্ধ হয় নাই; যথা—"বাসি ধনিয়া-জল কিঞ্চিৎ চিনির জলের সহিত পান করিলে অন্তর্দ্দাহ নিবারিত হয়।"—কাহার কি পরিমাণ, তাহা লিপিবদ্ধ দেখিতেছি না, বাসি ধনিয়া-জল বলিলে কি বুঝায় তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত ছিল, এবং রোগটির ব্যাখ্যা না করিলে কেহই বুঝিতে পারিবে না, অন্তর্দ্দাহ রোগটি কি। আমরা ত জানি অন্তর্দ্দাহের বাহ্যিক কোন ঔষধ নাই। ইহা দেহের ব্যাধি নহে, মনের ব্যাধি।

মধুসংযুক্ত পিপুলচূর্ণ অথবা চিনির সহিত পাতিলেবুর রস সন্ধ্যাকালে পান করিলে অম্লপিত্ত আরাম হয়।—কতখানি চিনি, কতটুকু লেবুর রস তাহা নির্দিষ্ট করিয়া লেখা উচিত ছিল। যে সকল দ্রব্য ঔষধরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার পরিমাণবিষয়ে কদাচ উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে।

ধবলরোগের মুষ্টিযোগসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"দোক্তাতামাক, তৈল, ঘোল, জামীরের রসে শোধন করিয়া সমভাবে গন্ধক দিয়া অন্তধূমে গুঁড়া করিয়া খাইলে ভাল হয়।"—জামীর অর্থ লেবু কিন্তু কোন্ জাতীয় লেবু তাহা উল্লেখ নাই, সকল লেবুর রসের গুণ একপ্রকার নহে। 'জামীরের রসে' কিরূপে শোধন করিতে হয় তাহার প্রক্রিয়া লিখিত নাই; তৈল নানাপ্রকার আছে, কোন্ জাতীয় তৈল এ ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য তাহার উল্লেখ নাই। দোক্তাতামাক, তৈল, ঘোল প্রভৃতি পদার্থের পরিমাণ লিখিত হয় নাই, কাঁচা গন্ধক বিষ, তাহার পরিমাণ উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক ছিল, অন্তধূমে গুঁড়া করিয়া খাইবার অর্থ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এই পুস্তকে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যপ্রস্তুতের প্রণালীও লিখিত হইয়াছে। এক অংশে জ্ঞাতব্য জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিদ্যারও পরিচয় আছে। কিন্তু বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও এত সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে একটা বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না, যৎসামান্য প্রাথমিক জ্ঞানও লাভ হয় না। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার ক্রীড়া, গোরক্ষণ ও গোপালন প্রভৃতির নিয়মও বর্ণিত হইয়াছে। এ কালে মানুষেরই জাতিরক্ষা হইতেছে, বৃষের জাতিনির্ণয় করিয়া বিশেষ কোন ফল দেখি না, বিপ্রজাতীয়, ক্ষত্রিয়জাতীয় প্রভৃতি বৃষের লক্ষণ পাঠ করিয়া আমরা আমোদিত হইয়াছি, কিন্তু ইহাতে কোন উপকার নাই। তবে গোপালন ও গো-রোগ-চিকিৎসা-সম্বন্ধে যে সকল বিষয় পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারণের কাজে লাগিবে।

সচিত্র বয়নবিদ্যা বা তাঁতশিক্ষা—শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন সম্পাদিত। মূল্য বার আনা। এখানিও বঙ্গলক্ষ্মীর উপহার, এবং বাবু হেমচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়া দেশের লোকের দৃষ্টি দেশী তাঁতের কাপড়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় এই পুস্তকখানি তাঁতশিক্ষার্থিগণের কাজে লাগিবে, এরূপ আমাদের বিশ্বাস আছে। বিদ্যারত্নমহাশয় বোধ হয় হাতেকলমে

তাঁতশিক্ষা করেন নাই, পুঁথিগত বিদ্যা হইতে তাঁতশিক্ষার উপদেশ দিলে তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি ইহাতে যে পাঠকগণের তাঁতসম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লেখকমহাশয় প্রথমেই বস্ত্রের ইতিহাস দিয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম "যখন বস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তখন দেব, দানব, মানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকলকেই বৃক্ষবল্কল ও পশুচর্ম্মে লজ্জানিবারণ করিতে হইত।" প্রাচীন লেখক মহাশয় দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরদের বাদ দিয়া কেবল মানুষের কথা আলোচনা করিলে কোন ক্ষতি ছিল না। বিশেষতঃ বিষ্ণুলোকে নারায়ণের ভবনে প্রীতিভোজের আয়োজনটা নিতান্তই ঠাকুরদাদার উপকথা। যাহা হউক, কতকগুলি অসার বাক্‌বাহুল্যসত্ত্বেও এ পুস্তকখানি তাঁতশিক্ষাসম্বন্ধে—তুলার চাষ হইতে তাঁতবোনা পর্য্যন্ত অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। বক্তব্যবিষয় পরিপুষ্ট করিবার জন্য পুস্তকে কয়েকখানি চিত্রও সংযুক্ত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বিশেষজ্ঞ-কর্ত্তৃক লিখিত হইলেই অধিক আদরের যোগ্য হয়।

গৃহসুখ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত, মূল্য দুই আনা। গ্রন্থকারমহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও তৎসংশ্রবে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ও স্থূল বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা এই পুস্তক-প্রকাশের উদ্দেশ্য। পুস্তকখানির উদ্দেশ্য ভাল। গ্রন্থকার পুস্তকখানি তাঁহার কোন বন্ধুকে পরিণয়-উপহার দান করিয়াছেন, এবং নববিবাহিত বন্ধুকে দাম্পত্যজীবন সুখময় করিবার উপদেশ দান করিয়াছেন। কিন্তু ১১ পৃষ্ঠার পুস্তকে এত উপদেশ দান যেন ঠিক মুখের ভিতর হাতী পোরা।

যুগলাঞ্জলি—শ্রীস্নেহলতা সেন ও শ্রীললিতা গুপ্ত প্রণীত। ভগিনীদ্বয় দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহা তাঁহাদের স্বর্গীয়া জননীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন, এই জন্যই ইহা যুগলাঞ্জলি। উৎসর্গপত্রখানি সুন্দর, মাতৃভক্তিতে উচ্ছ্বসিত সরল হৃদয়ের কোমলতা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

যুগলাঞ্জলির যে অংশ শ্রীমতী স্নেহলতার রচনা সেই অংশটি একুশটি গল্পে ও দুই একটি প্রবন্ধে পূর্ণ। এই অংশটির নাম বিচিত্রগল্প। শ্রীমতী ললিতা যে অংশটি রচনা করিয়াছেন তাহার নাম "A Garland of Fancies"—চতুর্দ্দশটি ছোট ছোট ইংরাজী কবিতায় ইহা পূর্ণ।

বিচিত্রগল্পের কয়েকটি গল্প ইংরাজী হইতে গৃহীত কয়েকটি ইংরাজীর অনুকরণে রচিত। গল্পগুলি পাঠ করিলে ইংরাজীভাষায় লেখিকার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। রঘুনাথের মনুষ্যসৃষ্টি, নেহাল ওস্তাদ, সাচ্চাগিনি ও ঝুটাগিনি প্রভৃতি কয়েকটি গল্প যথার্থই বিচিত্র। টেলিগ্রাফের রোমান্স ও বাড়ীভাড়ার বিড়ম্বনা গল্পদুটি বেশ কৌতুকাবহ।—নেহাল ওস্তাদ, যাদুকর, প্রবালবলয় প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে সম্মোহনবিদ্যার প্রভাবের পরিচয় আছে। সম্মোহনবিদ্যা আজকাল ইংরাজী-সাহিত্যে অনেক গল্পের উপাদান। বঙ্গসাহিত্যের গল্পেও ক্রমে ইহার প্রভাব দেখা যাইতেছে।

লেখিকার গল্প লিখিবার শক্তি আছে। ইঁহার কল্পনা বৈচিত্র্যময় এবং বর্ণনা সরল মাধুরীপূর্ণ। কিন্তু বঙ্গভাষার উপর ইঁহার দখল কিছু কম আছে। অভ্যাস রাখিলে শ্রীমতী স্নেহলতা একজন সুনিপুণা বঙ্গলেখিকা হইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীমতী ললিতা গুপ্তার ইংরাজী কবিতাগুলি Garland of Fancies নামে অভিহিত হইয়াছে। এ মালা শুদ্ধ, সুকোমল, তৃপ্তিদায়ক। কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ভাষার ঝঙ্কার প্রশংসনীয়,—কবির কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার ভাষাতেই বলিতে ইচ্ছা হয় ;—

"And lo ! it opens like a flower."

পুস্তকখানির মূল্য লেখা নাই, দ্বিতীয়তঃ ইহা কোন্ প্রেসে কাহার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত তাহারও উল্লেখ নাই।

রুক্মিণী—শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত, মূল্য দশ আনা। রুক্মিণী একখানি কাব্য। কবির পক্ষ হইতে প্রকাশকমহাশয় ভূমিকা লিখিয়া নিবেদন করিয়াছেন, "ভাগবতোক্ত বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীর সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানই এই কাব্যের ভিত্তি।" ষোড়শ সর্গে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। প্রথম সর্গে কেবল কাব্যের আভাস। দ্বিতীয় সর্গে উষার অরুণরাগে রুক্মিণীর যে শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভক্তিতে সমুজ্জল লজ্জারক্তিম চিত্রখানি পরিস্ফুট দেখিলাম, তাহা বড়ই সুন্দর। তৃতীয় সর্গে যুবর জদম্পতির আলাপ, কৃষ্ণের প্রতি রুক্মের বিদ্বেষ। চতুর্থ সর্গে সন্ধ্যায়, সহচরীর নিকট রুক্মিণীর মনোভাব প্রকাশ।—এইভাবে কাব্য-বর্ণিত কাহিনী অগ্রসর হইয়া ষোড়শ সর্গে রুক্মিণীর দ্বারকাযাত্রা— সাগরের সহিত নদীর মিলন।

মিলন। এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া লেখিকার রচনাশক্তির প্রশংসা করিতে হয়। গ্রন্থের রুচি মার্জ্জিত, রচনাভঙ্গী মধুর ও ভাষা প্রাঞ্জল। ময়মনসিংহজেলায় মহিলা-সমাজে এমন কাব্যরচনার উপযুক্ত প্রতিভা বর্ত্তমান আছে—তাহা আমাদের জানা ছিল না। পুস্তকখানিতে যেখানে নারী-হৃদয়ের বিশ্লেষণ আছে—সেই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া আমাদের মনে হয়। রমণীর হৃদয়রহস্যভেদে রমণীর ন্যায় চিত্রকর পুরুষসমাজে দুর্লভ। লেখিকা বর্ণনীয় বিষয় পরিপাটী করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ অতি সুন্দর। বিষয় সম্পূর্ণ উপযোগী।

লেখা—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রণীত. মূল্য দেড় টাকা। লেখা একখানি কবিতাপু ক। ছোট বড় ৬৪টি কবিতায় পুস্তকখানি পূর্ণ। এই পুস্তকের লেখক নবীন লেখক, কিন্তু তিনি কবিতালক্ষ্মীর ভক্ত উপাসক, তাঁহার বীণার ঝঙ্কারে অস্পষ্টতা আছে, জড়তা আছে, বর্ণনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটীর অভাব নাই, কিন্তু তাঁহার বীণা সুমিষ্ট, শিশুর কোমলকণ্ঠের গানের মত অনেক স্থান দুর্ব্বোধ্য হইলেও মিষ্ট। তাঁহার বন্দনা কবিতাটিতে তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি বঙ্গের প্রিয়কবি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য। শিষ্য যদি কেবল শব্দানুকরণের দিকেই তাঁহার সকল চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত না করেন—ভাবের গম্ভীরতার প্রতি যদি তাঁহার অধিকতর লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তিনি সিদ্ধিলাভে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন। "ছাতা" শীর্ষক কবিতাটিতে পাঠ করিলাম—

"পুষ্পাঘাত বিনিময়ে বজ্র শিরে লয়
সুবিদ্যা লভিয়া কিবা বুদ্ধি পরিচয়।"

ছাতা বেচারার প্রতি এমন সম্ভাষণ আর কোথাও শুনি নাই। কিন্তু এশ্রেণীর কবিতা সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভের যোগ্য নহে। বাল্যস্মৃতি কবিতাটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। বঙ্গমাতা কবিতাটিও বড় মিষ্ট হইয়াছে। নবীন কবির লেখনীর উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইহার মূল্য অতিরিক্ত হইয়াছে।

আবির্ভাব।

দেখরে দেখরে জননী এসেছে
দৈত্যদলনী বেশে,
দক্ষিণকরে খর-করবাল
খেলিছে বিশ্ব ত্রাসে,
বামেতে ছিন্ন অসুরের শির
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে রুধির,
রক্ত-বসন দৃঢ়বন্ধনে
বেষ্টিত কটী-দেশে।
জননী এসেছে রক্ষিতে সুতে
দৈত্য-দলনী বেশে।

ওই শোন শোন ভীম হুঙ্কার
গিরির বক্ষ দীর্ণ,
পড়িছে যেথায় অক্ষি অগ্নি
ভস্ম হতেছে তূর্ণ,
তাণ্ডবতালে দুলিছে মেদিনী,
প্রলয়ের পথে ধায় বা অবনী,
বন্ধন ছিঁড়ি সৌরসৃষ্টি
হয় বা হয় বা চূর্ণ।
জননী এসেছে প্রিয় সন্তান-

এই কি এই কি মোদের জননী
ঘোর-ঘন-মসিবরণা !
এই কি এই সে অভয়-দায়িনী
বিকট-বৃহৎ-দশনা !
এই সেই মাতা স্নেহে প্রাণ পোরা,
স্তন্য যাঁহার অমৃতের ধারা !
ছিছি ছিছি ছিছি একি সংশয়,
মায়েরে আজিও চেননা !
সোণার প্রতিমা কেন এইরূপে,
সে যে তোরি তরে জান না।

আয় রে আয় রে আয় ছুটে আয়
এযে মাতা—নহে অন্য,
রক্ত চরণে লুটায়ে সবাই
হওরে হওরে ধন্য।
রক্তের টিকা লও লও ভালে,
মায়ের আশীষ নেরে মাথে তুলে
মার বলে আজি বলীয়ান হয়ে
বিপদ করনা গণ্য।
জননী এসেছে মোদের মাঝারে
সুত-কল্যাণ জন্য।

বঙ্গের তীর্থক্ষেত্র।

তীর্থ শব্দের সাধারণ অর্থ "পবিত্র স্থান"। যে স্থানে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ বা রমণী পিতৃকুলের বা মাতৃকুলের শ্রাদ্ধ করিতে পারেন, অথবা তাঁহাদের কাহারও উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে পারেন, কিম্বা যে স্থলে গমন, পূজা, উপাসনা, পুণ্যক্রিয়াদি করিলে পাপক্ষয় হইতে পারে, তাহাই সাধারণতঃ তীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। সংস্কৃত ভাষায় তীর্থশব্দের অন্য অর্থ জল; দক্ষিণাবর্ত্তে তেলুগু, তামিল, মালায়লী, কাণাড়ী প্রভৃতি ভাষায় তীর্থ অর্থে জল বুঝায়। "মণে কুন্চম্ তীর্থং কুড়ুতা" এই তামিল ভাষার অর্থ "আমাকে কিঞ্চিৎ জল দাও"। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে যে স্থানে জল থাকিত না, সে স্থানে কোন তীর্থেরই উৎপত্তি হইত না; জলবিহীন স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত না। যেথানে দুই বা ততোধিক নদী একত্রে মিলিয়াছে সেই স্থান অতীব পবিত্র; সুতরাং তীর্থ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছে। যথা—গঙ্গা-যমুনা, যমুনা-সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী (একত্রে), কাবেরী ও গোদাবরী, বরুণী ও অসি, তাপ্তী এবং নর্ম্মদা, কৃষ্ণা ও কাবেরী ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে মনুষ্যেরা নানা স্থানে ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অনুগৃহীত মহাপুরুষদিগের ঐশ্বরীক কীর্ত্তিকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক স্থানকে তীর্থ বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে। যেথানে কোন সাধুপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যেথানে কোন মহাপুরুষের লীলা, তিরোভাব, প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছে, যেথানে কোন অলৌকিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, সেই সেই স্থান ক্রমশঃ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে ভারতবর্ষে অগণ্য তীর্থস্থল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর মনুষ্যের

মনের ভাব যত ভক্তিপ্রবণ হইয়া উঠে ততই তাহারা গ্রামেগ্রামে পাড়ায়-পাড়ায় তীর্থস্থান দেখিতে পায়। ভারতবর্ষের পল্লীতে-পল্লীতে অসংখ্য স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য, কিন্তু শাস্ত্রকর্ত্তারা যে সকল প্রধান তীর্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গণনীয় এবং তাঁহাই সর্ব্বসাধারণের দর্শনযোগ্য। স্থানীয় (Local) তীর্থগুলি স্থানবিশেষের লোকদিগের পক্ষে তীর্থস্থল বলিয়া গণ্য হইলেও তাহা সুপরিচিত নহে। বঙ্গদেশে যে সকল স্থান তীর্থস্থল বলিয়া গণ্য ও পরিচিত, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তদ্‌যথা—

জেলা	তীর্থের নাম।
বীরভূমি	... অট্টহাস, অপরাজিতা দেবী, তারাপীঠ, নল্লাটেশ্বরী (নলহাটি), বক্রেশ্বর।
চট্টগ্রাম	... আদিনাথ, কুমারীকুণ্ড, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রনাথ, ব্যাসকুণ্ড, বাড়বানল, ব্রহ্মকুণ্ড, স্বয়ম্ভুনাথ।
চব্বিশপরগণা ...	... খড়দহ, কলিকাতা (কালীঘাট), গঙ্গাসাগর, ধূমঘাট।
জলপাইগুড়ি ...	... জল্পেশ্বর, ত্রিস্রোতা, বরাহছত্র, সূর্য্যকুণ্ড, সহস্রধারা।
ত্রিপুরা	... জ্যোতির্ম্ময়, লবণাক্ষ।
হুগলী	... তারকেশ্বর, ত্রিবেণী।
বাঁকুড়া	... মদনমোহন (বিষ্ণুপুর)।
মেদিনীপুর ...	... বর্গভীমা (তমোলুক)।
কৃষ্ণনগর	... নবদ্বীপ, শান্তিপুর।
হাজারীবাঘ ...	... পরেশনাথ।
মুর্শিদাবাদ ...	... কীরিটেশ্বরী।
যশোহর	... পাণিপদ্ম।
ঢাকা	... শিববাড়ী।
বর্দ্ধমান	... কালনা, কাটোয়া, যোগাদ্যা।

বঙ্গদেশে এই তীর্থগুলিই শ্রেষ্ঠতীর্থ এবং ইহাদের উৎপত্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন কলিকাতায় কালীঘাটস্থ পীঠ একটি মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং গঙ্গা একটি মহাতীর্থ। বঙ্গদেশে ছোট ছোট বহুসংখ্যক তীর্থ বা পবিত্রস্থান অথবা পূজনীয় স্থল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সমুদয় বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইতেও কঠিনতর অথবা একেবারেই অসম্ভব। আমি কয়েকটি প্রধান তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হুগলী-জেলান্তর্গত সুবিখ্যাত তারকেশ্বরধামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবার বাসনা করিয়াছি। ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীহিন্দুর নিকট সুপরিচিত। ভারতবর্ষেরও বহুস্থানে ইহা সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তারকেশ্বর-ধাম যেমন প্রাচীন ও পবিত্র তেমনি কোটি কোটি হিন্দুর নিকট পূজনীয়।

বিখ্যাত তারকেশ্বরধাম হুগলীজেলান্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন। এখানে স্কুল, ডাকঘর, থানা, হাট, বাজার, সরোবর প্রভৃতি আছে এবং পথিক বা পরিব্রাজকদিগের অবস্থানের জন্য যথেষ্ট স্থানও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে স্বল্প বা বহুকাল পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করিতে পারেন। কলিকাতা (হাবড়া) রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে, কখন কখন দুই ঘণ্টার কম সময়ে তার-কেশ্বরে পৌঁছিতে পারা যায়। নিজ তারকেশ্বরধামে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর মহাদেবের মন্দির ৫ মিনিটে যাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যেই রেলওয়ে ষ্টেশন অবস্থিত।

তারকেশ্বরমহাদেব ও তাঁহার মন্দিরসম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত চারি জন লেখকের নিকট হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। সর্ব্ব-প্রথমে এই চারি জন লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। প্রায় একশত ছয় বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশীয় এক প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক

বঙ্গদেশে আগমন করিয়া তারকেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম প্রোফেসর (আচার্য্য) লা হেন্ হো। (Professors Monseiur La Hanhont.) মুশো লা হেন্ হো যৌবন বয়সে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাঁহার রচনায় যৌবনের চপলতা যথেষ্ট পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। তারকেশ্বরসম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম। তিনি লিখিতেছেন— "এক জন হিন্দু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণের মুখে তাড়্হেশ্বর দেবতার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমি তাড়্হেশ্বরে গিয়াছিলাম। ঐ স্থান একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, উহার অর্দ্ধেক অংশ প্রায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জঙ্গলের পরে বড় বড় বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। কয়েক জন ধনবান্ লোক এখানকার জমিদার বা ভূম্যধিকারী। একটি ছোট ঘরে (মন্দিরে ?) গর্ত্তের মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণের একটা পাথর আছে, তাহারই নাম তাড়্হেশ্বর শিভা অথবা দেবতা। এখানে আর কিছু দেখিবার পদার্থ নাই। ঐ দেবতাকে দেখিয়া যত না প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম, নিকটবর্ত্তী স্থানের সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগিগণকে দর্শন করিয়া ততোধিক আশ্চর্য্য ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এই গ্রামে আসিতে অনেক অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, পথিমধ্যে এক হিন্দু বণিক আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া এক দিন ও এক রাত্রি তাঁহার বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় এক দিবস এক হিন্দু বণিকের বাটীতে এবং এক রাত্রিতে এক কায়েত্যা (কায়স্থ ?) জমিদারের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি শ্রীরামপুর হইতে তাড়্হেশ্বরে গমন করিয়াছিলাম।" পরিব্রাজক সাহেব বাহাদুর তারকেশ্বরকে তাড়হেশ্বর নামে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। রাঢ়দেশের লোকেরা প্রাচীন কাল হইতে তারকেশ্বরকে তাড়েশ্বর বলিয়াও উচ্চারণ করে। বোধ হয়, ব্রাহ্মণের মুখে সাহেববাহাদুর তাহাই শ্রবণ করিয়াছিলেন।

ফরাসী পরিব্রাজক ফ্রান্সদেশের পারিশনগরে বসিয়া নিজের ভারত-ভ্রমণবিষয়ক যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, উপরি উক্ত কয়েক পংক্তি তাহারই কিঞ্চিৎ অংশের বাঙ্গালানুবাদ মাত্র। ইহাতে বুঝা গেল, তারকেশ্বরধাম সে সময়ে বনময় স্থান ছিল এবং তথায় গমনাগমনের পক্ষে সেকালে বিশেষ সুবিধা ছিল না। অনন্তর একজন ইংরাজ পুরুষ প্রায় ৬১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের সম্পাদিত ফ্রেন্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া (Friend of India) নামক প্রসিদ্ধ সমাচার পত্রে তারকেশ্বরসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম। সাহেব লিখিয়াছিলেন—"য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে ওলন্দাজেরা এবং তাহার পরে ফরাসীরা সর্ব্বপ্রথম তারকেশ্বর দর্শন করিয়াছিল। ইহার অনেক পরবর্ত্তী সময়ে ইংরাজেরা তারকেশ্বর দেখিয়াছিলেন। কয়েক জন ব্রাহ্মণজমিদার এই স্থানের অধিপতি, কয়েকজন কায়স্থ ভূম্যধিকারীও এখানকার প্রধান লোক। গ্রামটি ক্ষুদ্র, চারিপার্শ্বে ময়দান ও অরণ্য। এই বনে অনেক সাধু বসতি করেন। এতদঞ্চলে দস্যুভয় যথেষ্ট। অনেক প্রধান প্রধান লোক দস্যুদিগকে পালন করিয়া থাকেন। তারকেশ্বরনামক হিন্দুর দেবতা ঐ বন হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রবাদ আছে। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ঐ দেবতা বা মহাদেব থাকেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। কয়েক জন দীর্ঘ-কেশগুচ্ছসমাযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার পূজা করে এবং ঐ মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থান করে। নানা গ্রাম হইতে হিন্দুরা তারকেশ্বরে আসিয়া থাকে, এবং মুসলমানদের কেহ কেহও আসিতে বিস্মৃত হয় না। কয়েকজন ব্রহ্মচারিণীকে মন্দিরে দেখিয়াছিলাম, ইহারা শিবের কন্যা বলিয়া সম্মানিতা হয়। অনেকগুলি বৃহদাকার বৃষকে চরিতে দেখিলাম, ইহারা মহাদেবের বাহন বলিয়া গণ্য। হিন্দুরা এই ছোট মন্দির ও

যায় না ; খাদ্যাদি সুন্দর নহে ; অবস্থানের জন্য আশ্রম নাই ; কেবল দেবস্থান বলিয়া লোকের গমনাগমন হইয়া থাকে, নতুবা এই স্থল অন্যপ্রকারে আদৌ দর্শনযোগ্য নহে।” উপরিউক্ত দুই জন সাহেবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সেকালের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারি যে, তারকেশ্বর তখনও ধুমধামপূর্ণ বৃহৎ গ্রামে অথবা দোকান-বাজার-প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হয় নাই। বর্ত্তমান মন্দিরও তখন নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তখনকার মন্দিরের আকৃতি ক্ষুদ্র ছিল। আমি নিজে আটাইশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম তারকেশ্বরে গিয়াছিলাম, তখন রেলওয়ে ষ্টেশন কিম্বা অধিক সংখ্যক লোক বা দোকানাদি ছিল না। এই কয়েক বৎসর মধ্যে ক্রমশঃ তারকেশ্বরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। এখন সেখানে যাত্রী ও পথিকদিগের অবস্থান জন্য যথেষ্ট সুবিধা দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, উপরি উক্ত য়ুরোপীয় লেখকদিগের রচনায় তারকেশ্বরমহাদেব বা তাঁহার মন্দির কিম্বা ঐ গ্রামের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমার স্মরণ হয়, বহুবর্ষপূর্ব্বে পূরাতন “সোমপ্রকাশ”নামক সংবাদ-পত্রে তারকেশ্বর সম্বন্ধে এক ব্যক্তি এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ঐ প্রবন্ধ কয়েক সপ্তাহ ব্যাপিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এডুকেশন গেজেটেও উহা উদ্ধৃত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ঐ সোমপ্রকাশ বা এডুকেশন গেজেট বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই। ঐ সুদীর্ঘ প্রবন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক কথা লিপিবদ্ধ ছিল।

কতিপয় বর্ষ অতীত হইল, আমার প্রিয়বন্ধু বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় তাঁহার “তাম্বুল বণিক” নামক গ্রন্থে তারকেশ্বরসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—তারকেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির তাম্বুলীজাতীয় গোবর্দ্ধন

রক্ষিত মহাশয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ১০৯৮ সালে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কর্জ্জনাগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে জগদম্বা কালীকাদেবীর সম্মুখে ১১৮৭ সালে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। গোবর্দ্ধন এমন সদাচারী ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন যে, বিদেশে যাত্রা করিবার সময় অনেকে এখনও গোবর্দ্ধনের নাম উচ্চারণ করিয়া গৃহের বাহির হইয়া থাকে। তরুণাবস্থায় এক আত্মীয়ের কারবারে গোবর্দ্ধন সামান্য চাকুরী করিতেন। তদনন্তর চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া হুগলী জেলান্তর্গত সন্ধিপুরগ্রামে উপনীত হয়েন। সুপারি প্রভৃতির ব্যবসায়ে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সন্ধিপুরেই তিনি বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। রামনিধি, কালীচরণ, দাতারাম ও ভক্তরাম নামে তাঁহার চার পুত্র ছিল। সন্ধিপুরে গোবর্দ্ধন একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ধিপুরের নিকট বাগাণ্ডাগ্রামের কালীমন্দিরে তিনি পূজাদি করিতে গমন করিতেন। তথায় তাঁহার যত্নে শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকমুখে শুনা যায়, এখন যথায় তারকেশ্বরের মন্দির বিরাজিত ঐ স্থান টাউড়কাঁটার জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ও রামনগর গ্রামের অন্তর্ভূত ছিল। ঐ গ্রামে মুকুন্দ ঘোষ নামে জনৈক গোপ বাস করিত। রাখাল বালকেরা মুকুন্দ ঘোষের গরু চরাইবার জন্য ঐ বনে গমনাগমন করিত। ক্রমে জানা গেল মুকুন্দের একটি গাভী ঐ বনমধ্যস্থিত এক প্রস্তরখণ্ডের উপরে দুগ্ধবর্ষণ করে। এইরূপে প্রায় সমুদয় দুগ্ধবতী গাভী ঐ প্রস্তরে দুধ দেয়; কিন্তু ঘরে আসিয়া আর একবিন্দুও দুগ্ধ দেয় না। মুকুন্দঘোষ ঐ প্রস্তরখণ্ড উঠাইয়া আনাইয়া রীতিমত একটি মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে ঐ দেবতাকে স্থাপন করেন। ইহার কিছুদিন পরে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া গোবর্দ্ধন ঘোষ একটি মন্দির নির্ম্মাণ ও দুইটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। গোবর্দ্ধনের

"জন্মভূমি" পত্রিকায় তারকেশ্বরধামের সমীপবর্ত্তী (আনুমানিক সার্দ্ধতিনক্রোশ দূরবর্ত্তী) কৈকালাগ্রামনিবাসী "রাজকুমার বেদতীর্থ" স্বাক্ষরকারী কোন ব্যক্তি তারকেশ্বর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলেন—"তারকনাথদেবের মূর্ত্তি শিলাময়ী; এই মূর্ত্তি হস্তপদাদিবিশিষ্ট নহে। তারকেশ্বরধামের যে স্থানে এক্ষণে মুদী, ময়রা, মাণহারী প্রভৃতির দোকান আছে তাহা এককালে উলুঘাস প্রভৃতি বনোপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। অসভ্য বন্যজাতি ভিন্ন এই জঙ্গলে প্রায় অন্য কেহ প্রবেশ করিত না।" বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় মুকুন্দঘোষ সম্বন্ধে যে প্রবাদবাক্য লিখিয়াছেন, বেদতীর্থ মহাশয়ও তাহাই লিখিয়াছেন, কিন্তু বেদতীর্থের মতে মহারাজ ভারামল্লনামক নরপতি ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেন এবং মুকুন্দ তাঁহারই গো-রক্ষক ছিলেন। তারকেশ্বরের নিকট রামনগরগ্রামে ভারামল্লের রাজধানী ছিল। ভারামল্ল গোপদিগের মুখে বনের কাণ্ড শ্রবণ করিয়া শিলাময়ী মূর্ত্তিকে দর্শন করেন এবং ঐ প্রস্তরকে উঠাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করেন। বহুলোক নিযুক্ত হইয়া খননকার্য্য আরম্ভ করিল কিন্তু পাথরের মূল পাওয়া গেল না; পাথরকে কেহ উঠাইতে পারিল না। এ দিকে রাজামল্লকে সন্ন্যাসীর বেশে বাবা তারকনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়া আজ্ঞা করিলেন "তুমি এই স্থানেই আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও, আমি অন্যত্র যাইব না।" রাজা ভারামল্ল তদনুসারে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। স্থানে স্থানে জঙ্গল কাটাইয়া দেওয়া হইল এবং ক্রমশঃ উহা গ্রামে পরিণত হইয়া উঠিল। মহারাজ ভারামল্ল জীবনের অবশিষ্টাংশ দেবসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মুকুন্দঘোষও তাহাই করিতেন। মন্দিরের সম্মুখে ভক্তদের মৃতদেহ সমাধিস্থ হইয়াছিল, সেই সমাধির উপরে একখণ্ড

শিলা অদ্যাপি দেদীপ্যমান। বর্ত্তমান মন্দিরের অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র মন্দির আছে তাহাই ভারামল্লের নির্ম্মিত, বাহিরের মন্দির অপরের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; যে সময়ে বর্দ্ধমানজেলান্তর্গত কাইতি-শ্রীরামপুর-নিবাসী পণ্ডিত তারিণী চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তারকেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন, তখন বেদতীর্থমহাশয়কে উক্ত পণ্ডিতমহাশয় মন্দিরের রৌপ্যাবরণ খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তারকনাথবাবার আদি-মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তারকেশ্বরধামে বাবা মহাদেবের দুইটি প্রাচীন সরোবর আছে, তন্মধ্যে বেলপুষ্করিণীনামক পুকুরের জল কিঞ্চিৎ ভাল, অপরটির জল ভাল নহে। এই দুই পুকুর, রাজা ভারামল্ল-কর্ত্তৃক জঙ্গল খনন করিবার সময়ে, প্রস্তুত হইয়াছিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি এপর্য্যন্ত পঞ্চজন লেখকের নামোল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে চারিজনের প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু বিবরণ, পাঠকদিগের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য, সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে আমি আমার নিজের কথা কহিতে আকাঙ্ক্ষা করি। তারকেশ্বরধামসম্বন্ধে আমিও বহুকাল ব্যাপিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি। অনুসন্ধানের ফল অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। বারান্তরে তাহা লিখিবার ইচ্ছা রহিল। তারকেশ্বরধামের অগণ্য যাত্রী এবং বিশেষতঃ হিন্দু-সাধারণ এই পবিত্র, প্রাচীন ও সুপরিচিত তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তি, মাহাত্ম্য এবং প্রখ্যাতিসম্পর্কীয় আনুষঙ্গিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে অবগত হইবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি যথাশক্তি এই কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। প্রস্তাবান্তরে ঐ তীর্থের ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ভৌগলিক ও সামাজিক বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিব। (ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের বিদূষী রমণী।

একটা জাতির মধ্যে সভ্যতা আনিতে হইলে যে যে উপকরণগুলি আজ এমনই দিনে বিশেষ আবশ্যক বোধ হইতেছে, বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশের আর্য্যেরা সেগুলির প্রয়োজনীয়তা না বুঝিয়াছিলেন এমন নহে। তাঁহারা জানিয়াছিলেন, সভ্যতার সোপান শিক্ষাকে কেবলমাত্র পুরুষের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে একটা জাতিকে সম্পূর্ণভাবে সভ্য করিতে পারা যাইবে না। রমণীকুল যে একটা জাতির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; সেই জন্য স্ত্রীজাতিকে অন্ধকারে ফেলিয়া তাঁহারা একাই যে আলোকের দিকে ছুটিয়াছিলেন, তাহা নহে; শিক্ষার পথে রমণীকেও সহযাত্রী করিয়াছিলেন।

যতদূর পুরাকালের এদেশের আর্য্য-ইতিহাস আমরা অনুসরণ করিতে পারি, তাহার মধ্যেও বিদূষী রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদের পশ্চাদ্ভাগ ঘোর অন্ধকারময়, আর্য্যসভ্যতার যাহা-কিছু জানিতে পারা সম্ভব, তাহা একরকম এই বেদ হইতেই আরম্ভ করিতে হয়।

পঞ্চনদতীর হইতে উত্থিত হইয়া যে বেদগান এককালে সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, ত্রিসন্ধ্যায় যে গান মানবকণ্ঠোচ্চারিত হইয়া জল-স্থল-আকাশ পরিকম্পিত করিত, সেই বেদগান-প্রণয়নে অনেক হিন্দুরমণীও সাহায্যদান করিয়াছিলেন। আর্য্যপুত্র বলিয়া আমরা পুরুষেরা বেদের নামে যেমন গর্ব্ব করিতে পারি, তেমনি একালের রমণীরাও আমাদের সম্মুখে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারেন যে, আর্য্যকন্যা বলিয়া বেদের গৌরবের মধ্যে তাঁহাদেরও স্থান

কোন্ কোন্ রমণী বেদের মধ্যে তাঁহাদের রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নাম ঠিক্ জানিতে পারা যায় না; কেবল ঋগ্বেদ হইতে দুইএকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ঋগ্বেদের প্রত্যেক সূক্তের শিরোদেশে, সূক্তের দেবতা ও তাহার প্রণেতার নাম আছে। তাহা হইতেই জানিতে পারা যায় ঋগ্বেদে রমণীর রচনাও স্থান পাইয়াছে।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সংখ্যক সূক্ত একজন রমণীর রচিত, তাঁহার নাম বিশ্ববরা, ইনি অত্রীবংশীয়া। এই সূক্তের দেবতা অগ্নি।

আর একজনের নাম লোপামুদ্রা, ইনি ঋষি অগস্ত্যের পত্নী। ঋগ্বেদের ১৭৯ সংখ্যক সূক্ত ইহার রচিত। এই সূক্তের দেবতা রতি। এই অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার কথা পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত বাক্‌প্রণীত। ইনি ঋষি অম্ভ্রিনার কন্যা। বাক্‌প্রণীত এই সূক্ত বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। বেদান্ত-টীকাকারেরা বলেন যে, বেদান্তদর্শনের মূলবীজ এই সূক্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে।

প্রবাহমান কালস্রোতের সহিত ভারতে হিন্দুসভ্যতার উন্নতির গতি বেগবতী হইয়া উঠিয়াছিল। যে স্রোতের প্রারম্ভে আমরা রমণীকে দেখিয়াছি, সেই স্রোত যখন উচ্ছ্বাসময়ী, তরঙ্গময়ী সেখানেও সেই রমণী। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যখন দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই পর্য্যায়ে আমরা জনকয়েক রমণীরও সন্ধান পাই। শক্তিমান পুরুষ, অবলা স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাসম্বন্ধে এখানেও পরাজিত করিয়া উর্দ্ধাসন গ্রহণ করিতে পারেন নাই—রমণীও সমান আগ্রহে, সমান উৎসাহে, সমভাবে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে এতদূর পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহাঁর কথা জানিতে পারা যায়। ইনি মিত্রের কন্যা ছিলেন। মিত্রও একজন পণ্ডিত ছিলেন। অতি শৈশব হইতেই আপনার কন্যাটীকে তিনি শিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবং মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

বৃহদারাণ্যকের অনেক পৃষ্ঠা মৈত্রেয়ীর জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত একএকটা জটিল তত্ত্ব লইয়া তিনি যেরূপ পারদর্শিতার সহিত তর্ক করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ-অবলম্বনের জন্য যখন চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় মৈত্রেয়ীর সহিত তাঁহার একটা তর্ক হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিল, তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা এই সময়ে তিনি তাঁহার দুই পত্নীকে বিভাগ করিয়া লইতে বলেন। এই কথা হইতেই তর্কের উৎপত্তি হয়। তর্কে বিষয়সম্পত্তির অসারতার কথা মৈত্রা এমন সুন্দরভাবে সুযুক্তির দ্বারা প্রকটিত করেন, তাহা পাঠ করিলে আজকালকার সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতকেও মস্তক অবনত করিতে হয়।

সে সময় মিত্ররাজ-প্রতিষ্ঠিত একটী বেদশিক্ষালয় বিদ্যমান ছিল। মৈত্রেয়ী এই শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার জ্ঞান তিনি আপনাতে আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই।

মৈত্রেয়ী অপেক্ষাও বিদুষী আর একজন এই সময় ছিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর পিসী গার্গী।

বিদ্যাভিমানী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে সকল মুনিঋষিকে পরাজিত করিয়া, বিশ্বজয়ী হইয়া, অবশেষে এক রমণীর নিকট মস্তক অবনত করেন; সে রমণী গার্গী।

কোন একটা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার আবশ্যক হইলে

রাজর্ষি জনক বড়-বড় পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া এক সভার অধিবেশন করিতেন। ঐ সভাতে সেই প্রশ্নের আলোচনা হইত। এ আলোচনার মধ্যে শুধু পুরুষরাই যে স্থান পাইতেন তাহা নহে, রাজর্ষির সভা অনেক স্ত্রীরত্নও উজ্জ্বল করিতেন। পুরুষের সহিত সমান হইয়া রমণীগণও তর্ক করিতেন।

এক সময়ে রাজর্ষি এক যজ্ঞ করেন, এই যজ্ঞে দানের জন্য তিনি একসহস্র গাভী রাখিয়াছিলেন, প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গে দশটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রাও বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই বৃহৎ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা আসিয়াছিলেন।

যজ্ঞান্তে রাজর্ষি জনক সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ, ঐ স্বর্ণমুদ্রাসহ সহস্র গাভী তাঁহারই প্রাপ্য।

রাজর্ষির কথায় গাভী গ্রহণ করিবার জন্য কেহই উঠিতে সাহস করিতেছিলেন না। রাজর্ষি বড়ই শক্ত কথা বলিয়াছিলেন। সেই জনারণ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ কে আপনাকে পরিচয় দিতে সাহস করিবেন?

যখন কেহই উঠিলেন না তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঐ সহস্র গাভী গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। জ্ঞানে বিদ্যায় তিনি যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেন, যাজ্ঞবল্ক্য নিজেও সেজন্য বড়ই অভিমানী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্পর্দ্ধা দেখিয়া জনমণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিলেন না।

সেই সভার এক কোণে এক রমণী বসিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের ধৃষ্টতা তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। আসন পরিত্যাগ করিয়া তিনি

যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে চাহিয়া সেই রমণী তেজোগর্ব্ব ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ! তুমিই কি এই জনারণ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ ?" যাজ্ঞবল্ক্য দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—"হাঁ।" গার্গী বলিলেন, "আচ্ছা, শুধু কথায় হইবে না, তাহার পরিচয় চাই।"

তখন এক মহাতর্কের সূচনা হইল, গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কত শাস্ত্রীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। ব্রাহ্মণকুমারী গার্গীর প্রশ্নবাণে যাজ্ঞবল্ক্যমুনি দিগ্ধ হইতে লাগিলেন। অবশেষে সমগ্র পণ্ডিত অবাক হইয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণকুমারী তর্কে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যমুনিকে পরাজিত করিয়াছেন। সভামধ্যে তখন ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল।

আর একজন রমণীর নাম দেবাহুতি, ইনি এক মনুর কন্যা। দেবাহুতি বালিকা বয়স হইতেই শিক্ষার প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। জ্ঞানস্পৃহা তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, তিনি রাজকন্যা হইয়াও জ্ঞান-চর্চ্চার সুবিধা হইবে বলিয়া এক দরিদ্র ঋষিকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার নাম কর্দ্দম। কর্দ্দম সংসারবিরাগী পুরুষ ছিলেন, কিন্তু এই বালিকার জ্ঞানস্পৃহা এত প্রবল দেখিয়া, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী বুঝিয়া অবশেষে তিনি সংসারী হইতে সম্মত হন।

দেবাহুতি পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত বন-বাসিনী হইলেন। দিন দিন তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল; তাঁহার স্বামী সে স্পৃহা চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ করিয়া পত্নীকে দান করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন অরণ্যে স্বামীর পাদমূলে বসিয়া দেবাহুতি ব্রহ্মচারিণীর মত একাগ্রমনে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন; শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসনয়নাগ্রে জগতের কত সমস্যা, কত বৈচিত্র্য চিত্রিত হইয়া উঠিল; চিন্তাশীলা রমণী তাহার পূরণের জন্য প্রাণপণ

সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলমুনির জননী এই দেবাহুতি। কপিলই দর্শনশাস্ত্রের জন্মদাতা। তিনি জগতে প্রথম বিদ্যাবুদ্ধির শক্তি বাহ্যবস্তু হইতে রুদ্ধ করিয়া মানবের অন্তরে নিবদ্ধ করেন, তিনিই প্রথমে জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা লইয়া মানবের অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের নিগূঢ়তথ্য অন্বেষণ করেন, মানবের অন্তর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখেন, কোথায় দুঃখ ও শান্তির বীজাণু রহিয়াছে। তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন, কি করিয়া সেই দুঃখের বীজ ধ্বংস করিতে পারা যায়—কি উপায়ে মানবের মুক্তি আসে।

কিন্তু এই কপিলের শিক্ষালাভের মূলে বর্ত্তমান কে? কে তাঁহার ক্ষুদ্রদৃষ্টি জগতের ব্যাপকতায় প্রসারিত করিয়া দেন—মানুষের অন্তর অন্বেষণের বৃত্তি কে তাঁহার মধ্যে জাগাইয়া দেন? তাঁহার জননী দেবাহুতি। এমন জননী না পাইলে কপিলকে আমরা এভাবে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। দেবাহুতি আপনার পুত্রটীকে আপনি শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, কোন্ পথে কপিলের চিন্তাস্রোত প্রধাবিত হইবে তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। যে দর্শনশাস্ত্রের অমূল্য বীজ দেবাহুতি আরাধনায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পুত্রের সাহায্যে ফলফুলশোভিত বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া তুলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। বৌদ্ধেরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রমণীদিগকে শিক্ষিতা করিয়া দেশবিদেশে পাঠাইতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, রমণীদিগকে পুরুষেরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিতেন না, সেইজন্য রমণীপ্রচারকেরও আবশ্যক হইয়াছিল। এইরূপ রমণীদিগের মধ্যে একজন বিশেষরূপে বিদ্যাবত্তার গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সঙ্ঘমিত্রা—মহারাজ অশোকের আত্মীয়া। ইনি সিংহলে গমন

রাণীকে দলবলসহ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অবশেষে তিনি সিংহলেই বাস করিতে থাকেন। আজ পর্য্যন্ত সিংহলবাসীরা তাঁহাকে ভুলেন নাই—তাঁহার সম্বন্ধে অনেক উপকথা আজও সিংহলে শুনিতে পাওয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্য যখন বিশ্বগ্রাসী বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সিন্ধু উপকূল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সকল দেশে শিষ্যসহ গমন করিয়া আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন সেই সময় এই মহৎ কার্য্যে এক রমণীও সাহায্য দান করিয়াছিলেন, তিনি মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভারতীদেবী। এই ভারতী এক মহাবিদূষী ছিলেন।

মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের একসময় শাস্ত্রীয় তর্ক হয়। এই তর্কের সূত্রপাতে শঙ্করাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি যদি তর্কে পরাজিত হন তাহা হইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি মণ্ডনমিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন; আর মণ্ডনমিশ্র প্রতিজ্ঞা করেন তিনি যদি পরাজিত হন তাহা হইলে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। দুই জনেই মহা পণ্ডিত ছিলেন, এ তর্ক সামান্য ছিল না। দুইদলের দুই প্রধান পণ্ডিতের তর্ক—এ তর্কের বিচার করে কে? এত বড় পাণ্ডিত্য কার?

বিচারকের সন্ধানে বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন হইল না। মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী ভারতী দেবী এই মহা সম্মানের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায় ভারতী কত বড় বিদুষী ছিলেন।

তর্ক চলিতে লাগিল, ভারতী জয়মাল্য হাতে করিয়া বসিয়া রহিলেন। সে মাল্য কাহার গলায় অর্পণ করিবেন, কে সেই মাল্য পাইবার উপযুক্ত, ধীরভাবে তাহার নিষ্পত্তি করিতেছিলেন। যোগ্যা-

যে গুরুভার তিনি পাইয়াছেন তাহার অবমাননা করিলেন না, দেখিলেন স্বামী পরাজিত হইয়াছেন, অকুণ্ঠিতচিত্তে শঙ্করাচার্য্যের গলে সেই জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। প্রতিজ্ঞামত মণ্ডনমিশ্র শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। ভারতীদেবীও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। শঙ্করাচার্য্য তর্কে জয়লাভ করিয়া শুধু যে মণ্ডনমিশ্রকে লাভ করিলেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিদুষী ভারতীকেও পাইলেন। শঙ্কর যে মহাকার্য্যের ভার লইয়াছিলেন তাহার সাধনের জন্য ভারতীর মত রমণীরও বিশেষ আবশ্যক ছিল। ভারতীও প্রাণ মন ঢালিয়া শঙ্করাচার্য্যের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তখন ভারতী তাঁহার এক প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিলেন। ভারতীকে না পাইলে বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আমরা শঙ্করাচার্য্যকে যতটা সম্মান দান করিয়া থাকি তাহার কতক অংশ ভারতীর প্রাপ্য। ভারতী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্যের কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। শৃঙ্গেরীতে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তিনি শেষজীবন সেইখানে কাটাইয়াছিলেন। জগৎশুদ্ধ লোক যাঁহার নাম জানেন এবার তাঁহার কথাই উল্লেখ করিব। তিনি লীলাবতী—পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের কন্যা।

লীলাবতী অল্পবয়সে বিধবা হন। পিতা কন্যাকে আপনার কাছে রাখিয়া আপনার সব পাণ্ডিত্যটুকু দান করিয়াছিলেন। লীলাবতীর বিদ্যার পরিচয় দিবার আবশ্যক করে না। গণিতবিদ্যায় তিনি এতই পারদর্শিনী ছিলেন যে, অঙ্ক কসিয়া তিনি গাছের পাতার সংখ্যা বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি সমস্ত জীবন কেবল শিক্ষাকার্য্যেই কাটাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে যে কোন্ বিদ্যার চর্চ্চা হয় নাই তাহা জানিনা। যাদু-বিদ্যাও তখন একটা বিদ্যার মধ্যে ছিল। ভোজরাজ-মহিষী ভানুমতী

ইহার আবিষ্কার করেন। গ্রামে গ্রামে আজও তাঁহার নাম কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে। বালক-বালিকারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া আজও "ভানুমতীর খেল্" দেখিয়া থাকে। তাহার পর জ্যোতিষজ্ঞ খনার কথা। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান অসীম ছিল, তিনি স্বয়ং অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার মত এত-বড় জ্যোতিষীর নাম শুনিতে পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন, খনা অনার্য্যদিগের নিকট হইতে এই জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন, আর্য্যেরা তখন এ বিদ্যা জানিতেন না। এ কথা তাঁহার পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয়। আপনাদের বড় করিবার জন্য জাপানীরা অনেক শিক্ষা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। যাহা আমাদের মধ্যে ছিল না, তাহা আনিবার জন্য খনা যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া অনার্য্যের দ্বারস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুধু আমরা বিদুষীতার গৌরব দান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, তাঁহাকে পূজ্যপাদের আসনে বসাইতে হয়। এ ক্ষেত্রে মনে হয়, খনা পুরুষজাতিকেও পরাজিত করিয়াছেন।

খনার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আরও একজন, জ্যোতিষশিক্ষার্থ অনার্য্যদিগের গৃহে গমন করেন, তাঁহার নাম মিহির। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে বরাহের পুত্র।

রাক্ষসদিগের গৃহে এই খনা ও মিহির দিবারাত্র অক্লান্তপরিশ্রমে একত্রে জ্যোতিষবিদ্যা অর্জ্জন করিতেছিলেন, দুজনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ। কত অন্ধকারসমাচ্ছন্ন অমানিশায় শার্দ্দূলমুখরিত অরণ্যমধ্যে বসিয়া এই দুটী বালকবালিকা নক্ষত্রখচিত অসীম আকাশের রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছে। কোথায় ভরণী, কোথায় কৃত্তিকা, কোথায় মৃগশীরা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু তাহা

কেতু, কোন্ গ্রহ কোন্ দিকে ছুটিতেছে তাহার অনুসরণ করিতে করিতে কতবারই না তাহাদের চারিচক্ষু অসীম আকাশের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। গগনের কোন্ প্রান্তে বসিয়া মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি মানবের উপর মঙ্গল ও অমঙ্গলের ধারা বর্ষণ করিতেছেন, সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহাদিগকে কতই না ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

ভারতবর্ষের জ্যোতিষের গৌরব আজও পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই, পাশ্চাত্যজগৎ আজও পর্য্যন্ত তাহার গুণগান করেন। কিন্তু এ সকল গৌরবই স্তূপীকৃত হইয়া খনার পদপ্রান্তে পৌঁছিতেছে।

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর, খনার সহিত মিহিরের বিবাহ হয়। মিহির ও খনা বরাহের ঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে স্বামী অপেক্ষাও পারদর্শিনী ছিলেন। সে প্রমাণ ইঁহারা যখন শিক্ষাসমাপনান্তে অনার্য্যদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময়কার একটী ঘটনা হইতে পাই। জ্যোতিষশিক্ষা শেষ করিয়া খনা ও মিহির রাক্ষসদিগের নিকট হইতে ফিরিতেছিলেন। অনেক দিন তাঁহারা অনার্য্যদিগের সহিত বসবাস করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি রাক্ষসদিগের মায়া পড়িয়া গিয়াছিল, ইহা খুবই স্বাভাবিক। সেই মায়ার বন্ধন, তাঁহাদিগের বিদায়ের পথের অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছিল। আবালবৃদ্ধবণিতা প্রায় সকলেই এই দুইজনকে শেষবিদায় দিবার জন্ত গ্রামপ্রান্তস্থ এক নদীতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সেইখানে এক আসন্নপ্রসবা গাভী দাঁড়াইয়াছিল; গুরু মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! যে প্রাণীটী অল্পমুহূর্ত্তে সংসার-আলোকে আসিবে সেটী কোন রঙের হইবে বলিতে পার? মিহির গণনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার গণনাফল ঠিক

এখনও তুমি জ্যোতিষের সব শিখিতে পার নাই, এইগুলি লও ইহার সাহায্যে তোমার শিক্ষা শেষ করিও।

মিহির পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন না, গুরু তাঁহার শিক্ষায় বরাবরই সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু খনার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, খনার জ্যোতিষশিক্ষা যে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা তাঁহার ধারণা ছিল।

মিহির গুরুর হস্ত হইতে পুঁথিগুলি লইলেন, কিন্তু তাঁহার মন তখন ঠিক ছিলনা, তাঁহার মনে হইতেছিল এত দিনের এত পরিশ্রমে যদি জ্যোতিষবিদ্যা আয়ত্ত করিতে না পারিলাম, দূর হউক এই সামান্য কখানা পুঁথিতে আমার কি হইবে!

খরস্রোতা নদীর গর্ভে সেগুলি ফেলিয়া দিলেন। খনা অদূরে দাঁড়াইয়া তখনও পশ্চাদ্বর্ত্তী গ্রামের চিত্রখানি শেষবার দেখিয়া লইতেছিলেন। হঠাৎ এই ঘটনা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি মিহিরের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—কি করিলে! তখন সেই পুঁথিগুলিকে স্রোতময়ী তরঙ্গভঙ্গ লুকাইয়া ফেলিয়াছে। কথিত আছে সেই সময়েই ভূগর্ভের জ্যোতিষবিদ্যা ইহসংসার হইতে লুপ্ত হয়।

খনার শেষজীবন বড়ই হৃদয়বিদারক।

খনার শ্বশুর বরাহ, বিক্রমাদিত্য-সভার এক রত্ন ছিলেন। আকাশ-পটে সর্ব্বসমেত কতগুলি তারকা আছে এই কথা জানিবার জন্য বিক্রমাদিত্যের বড়ই আগ্রহ হয়। এই প্রশ্ন-মীমাংসার ভার মহারাজা বরাহের উপর অর্পণ করেন। কিন্তু বরাহ কোন্ বিদ্যাবলে তাহা বলিয়া দিবেন? ইহা তাঁহার জ্ঞানের অতীত।

খনা শ্বশুরের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, প্রশ্ন করিয়া সব ব্যাপার বুঝিলেন। তখন তিনি শ্বশুরকে আশ্বস্ত হইতে বলিলেন,—বলিলেন, আমি বলিয়া দিব।

হইলেন। মহারাজ ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন। বরাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি উপায়ে তুমি তারকার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। বরাহ বরাবরই এবিষয়ে অজ্ঞ, কাজেই তাঁহাকে খনার নাম উল্লেখ করিতে হইল।

বিক্রমাদিত্য খনার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দশম রত্নের স্থান দান করিতে চাহিলেন।

পুত্রবধূকে রাজসভায় আসিয়া বসিতে হইবে এ কথায় বরাহের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি এ অপমানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল—খনার জিহ্বা কাটিয়া দিলে, বাক্‌রোধ হইবে, তাহা হইলে রাজসভায় তিনি আর কোন প্রয়োজনে আসিবেন না।

বরাহ পুত্রের উপর সে ভার অর্পণ করিলেন। মিহির অস্ত্র হাতে খনার ঘরে উপস্থিত হইলেন। খনা প্রস্তুত হইয়াই বসিয়াছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, আমার ভাগ্যফল বহুদিন আমি গণনায় জানিয়াছি, তুমি ইতস্ততঃ করিও না। যাহা বিধিলিপি তাহা হইবেই, এই বলিয়া তিনি আপনার জিহ্বা বাহির করিয়া দিলেন—মিহির তাহার উপর অস্ত্রচালন করিলেন, ঘরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল, ধমনীর শেষ রক্তবিন্দুর সহিত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর প্রাণটুকুও বাহির হইয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সন্ধিপূজা।

তোমার আরতি তরে আজি তব মন্দির-প্রাঙ্গণ
পরিপূর্ণ বহুভক্তে ; কহে সবে, মহাসন্ধিক্ষণ
অষ্টমী—নবমী যুতা, সমাগত—সমাগতপ্রায় !
আরতি-প্রদীপ-হস্তে পুরোহিত চিত্রিতের ন্যায়
দাঁড়ায়ে, আরোপি নেত্র অচঞ্চল, তোমার বদনে।
কোন্ শুভ মুহূর্ত্তেকে, কোন্ মহাপুণ্যের লগনে
ভাতিবে ও-মুখে দীপ্তি ; স্নিগ্ধনেত্রে কখন মৃণ্ময়ী
চাহিয়া সন্তান-মুখে মুহূর্ত্তেকে সাজিবে চিণ্ময়ী।
চাহিয়া অযুত ভক্ত কৃতাঞ্জলি গললগ্ন-বাসে
মা তোর বদন পানে, ধূপে বায়ু রুদ্ধ হ'য়ে আসে।
নিস্তব্ধ অযুত বাদ্য, নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপ-শিখা
সহসা উঠিবে জাগি স্তম্ভিত এ চিত্রসম লিখা
মহাজন সিন্ধু, তার পরে শুধু উত্তাল কল্লোল
অধীর আনন্দোচ্ছ্বাস ;—তার পরে শুধু মা মা বোল।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সমসাময়িক ভারত।

৩

মুসলমান-বিপক্ষতা।

সৈয়দের অভিপ্রায় ও কথা-মত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাট Sir John Strachey-র সমীপে যে সম্ভাষণ-লিপি পঠিত হয়, তাহাতে এই কথাগুলি ছিল: "আমাদের কতকগুলি দেশ-ভাই, রাজনৈতিক অভাব-অভিযোগ-সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করেন, কিন্তু মহামহিম রাজ-সরকারের বিনীত প্রজা আমরা এই প্রবচনটির সত্যতা কখনই বিস্মৃত হই নাই:—'কোন কিছু চাহিবার আগে, তদ্বিষয়ক যোগ্যতা অর্জ্জন কর'। আমাদের ধ্রুববিশ্বাস,—যদি ইংরেজসরকারের অধীনে কৃতিত্ব লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, বিদ্যাশিক্ষাই তাহার একমাত্র উপায়। এবং আমাদের স্বধর্ম্মীদিগের মধ্যে কিরূপে বিদ্যাশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য...আমাদের প্রচেষ্টার মধ্যে ইংরেজসরকারের প্রতি রাজভক্তি এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থের উন্নতিসাধন—এই উভয়ই আছে বলিয়া আমরা গর্ব্বিত।" আলীগড়-কালেজই এই ইমারতের প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে যাত্রা সুরু করিয়া আরও বিস্তৃত আন্দোলন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই সৈয়দের মনোগত অভিপ্রায়। রাজনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে ভারতীয় মুসলমানকে পুনর্ব্বার জাগাইয়া তোলাই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য। কি বর্ত্তমানে, কি ভবিষ্যতে, ইংরেজসরকারের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প প্রথম হইতেই বর্জ্জিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, মুসলমানেরা আপনাদিগকে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের মিত্র বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকৃত হইল। সৈয়দ

পুনঃপুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, ভাল মুসলমান করিয়া তোলা ও রাজভক্ত প্রজা করিয়া তোলা—একই কথা। কেননা, পরস্পরকে না জানার দরুণই দুই জাতি এযাবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল। যে য়ুরোপীয় শিক্ষা মুসলমানজাতির পুনরুত্থানের মুখ্য উপায়, সেই শিক্ষাদীক্ষা যখন প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল, তখন উভয় জাতির ঘনিষ্ঠ সম্মিলন এক্ষণে অনিবার্য্য !

সৈয়দের জ্বলন্ত আগ্রহ ও রাজভক্তি, কোন সীমাই মানিত না—কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করিত না। যখন প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তা Blunt তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তখন তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—(সেই সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, কথাগুলা তাঁহাদের কাণে অবশ্যই অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল) ;—"ইংরেজ ও মুসলমানের মধ্যে এই একটা সহানুভূতির বন্ধন থাকে এই যে আমাদের ইচ্ছা, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কোন কালেই, কোন অবস্থাতেই, ইংরেজের সহিত আমাদের কোনপ্রকার শত্রুতার কারণ ঘটে নাই ; এমন কোন ঘটনা হয় নাই যাহাতে আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজের প্রতিশোধের ইচ্ছা জন্মিতে পারে, কিম্বা ইংরেজের শ্রীবৃদ্ধিতে আমাদের ঈর্ষা উৎপন্ন হইতে পারে।" অবশ্য সৈয়েদ অবগত আছেন যে, মুসলমানেরা এক সময়ে ভারতের রাজা ছিল, কিন্তু তিনি এই কথা বলেন :—"যখন ইংরেজেরা ভারতে স্বকীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিল, তখন ভারত, দীন বিধবার ন্যায় একজন পতির প্রতীক্ষায় ছিলেন...আমরাই আমাদের নিজের শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশে ইংরেজের শাসনবিস্তারকল্পে ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছি। আমরা ও ইংরেজ-জাতি—আমরা একই কাঁচির দুইটী ফলার মত একত্র সংযুক্ত...আমাদের জ্বলন্ত ইচ্ছা এই যে, ইংরেজের আমল ভারতে—শুধু দীর্ঘকাল নহে—আমাদের দেশের হিতের জন্য নিত্যকাল স্থায়ী হয়। তাই বলিতেছি, ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে

সহানুভূতি না থাকিবার কোন হেতুই নাই। এবং সহানুভূতির অর্থে আমি সেই ভ্রাতৃ-সুলভ সহানুভূতি, সখা-সুলভ সহানুভূতি বুঝি, যাহার নিদর্শন এক্ষণে আমরা Blunt সাহেবের মধ্যে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি।" সৈয়েদ আহমদ এই কথা বলিয়াছিলেন?—হাঁ, তিনিই বলিয়াছিলেন। অতএব, যাঁহারা মনে করেন,—মুসলমান ও ইংরেজের মধ্যে কতকগুলি ঘটনার স্মৃতি এখনও সজাগ রহিয়াছে, এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, উভয়ের মিলন-পক্ষে উহাই বাধা জন্মাইতেছে, এবং কোন হেতু উপস্থিত হইলে উভয়ের মধ্যে আবার বিরোধানল প্রজ্বলিত হইতে পারে,—তাঁহারা প্রকৃত ইতিহাস জানেন না···প্রত্যুত ইহাই কি ঠিক্ নহে যে, অতি-রাজভক্তির উৎসাহে সৈয়দই ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছিলেন? তিনি ত বেশ নিপুণভাবে ইতিহাসের উপর 'স্পঞ্জ' বুলাইয়া দিলেন: কিন্তু তোমার কি মনে হয়,—এই সমস্ত রেষারিষি, এই সমস্ত বিদ্বেষের ভাব, এই ধর্ম্মান্ধতা, যাহা অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বে অশনিনাদে ফাটিয়া বাহির হইয়াছিল, কোনও অলৌকিক মন্ত্রের বলে তৎসমস্তই একেবারে সমূলে নির্ব্বাপিত হইল? সৈয়দ যে ভ্রাতৃ-সুলভ সহানুভূতির কথা বলেন, তাহা হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস বইত আর কিছুই নহে। কিন্তু আসল কথাটা এই,—অনেক দিন হইল, ইংরেজ ভারত অধিকার করিয়া চুকিয়াছে; ইচ্ছাক্রমেই হউক অনিচ্ছাক্রমেই হউক, মুসলমানও সমস্তই ঘাড় পাতিয়া লইয়াছে—অন্ততঃ বাহ্যতঃ এইরূপ প্রতীয়মান হয়। পুরাতন ক্ষতের মুখটি আস্তে আস্তে পূরিয়া আসিতেছে; কিন্তু আর একটি নূতন ক্ষত বাহির হইয়াছে; তাহার জ্বালা আরো বেশী;—অপমানের ক্ষত, অভিমানের ক্ষত বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্ষতটা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেদিনকার বিজিত হিন্দু আজ মুসলমান অপেক্ষা অধিক ধনশালী, অধিক শিক্ষিত, অধিক সভ্য হইয়াই শুধু সন্তুষ্ট নহে—উহারা সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া, শাসনকর্ত্তাদের সহিত

একাসনে পাশাপাশি বসিবার জন্য মহাকোলাহলসহকারে দাবীদাওয়া করিতেছে! এই সেই অলোকিক মন্ত্র; ইংরেজ-মুসলমানের মধ্যে এত যে খোলাখুলি, এত যে গলাগলি, এত যে কোলাকুলি, তাহার ভিতরের কথাটি এই!

বেশ বুঝা যাইতেছে, মুসলমান এইরূপ হাত বাড়াইয়া দেওয়ায় ইংরেজও হৃদ্যতার ভাবে সেই হাতে খুব সজোরে একটা ঝাঁকানি দিলেন —অবশ্য প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া। সৈয়দ নানাপ্রকার ছলাকলায় ইংরেজকে যখন প্রসন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন, প্রথমে তাঁহার সেই সমস্ত প্রসাদন-চেষ্টা, ইংরেজের পাষাণ-শীতল 'চাপা-ভাবের' উপর পড়িয়া ব্যথিত হইল; এবং কয়েক বৎসর পরে তবে তিনি ইংরেজের নিকট অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইলেন!

ইংরেজ যে এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন সে কি অবিশ্বাসের ভাব হইতে? কিংবা ইংরেজ কি মনে করিতেছিলেন,—মুসলমানের পুনর্জাগৃতিকল্পে সাহায্য করিলে, মুসলমানের জাতীয় ভাব উত্তেজিত করিলে, একটা বিপদ আছে;—তাহা হইলে হয়তো এমন একটা মহাশক্তি সৃষ্ট করা হইবে, যাহা পরে সামলানো মুস্কিল হইবে—যথাপথে চালানো অসাধ্য হইবে, হয়তো তাহা হইতে কোন দিন একটা মহাঝটিকার উৎপত্তি হইবে?—ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্তু সৈয়দ 'জেদী' লোক; তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। প্রথমে Sir William Muir, পরে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্ত্তা—Sir John Struchey, Sir Aukland Colvin এবং বড়লাটেরা তাঁহার প্রচেষ্টার প্রতি অনুকূল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনুকূল বাণী লইয়া আলীগড় কালেজে যাত্রা করিলেন। Lord Litton প্রথম প্রস্তর পত্তন করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এইরূপ ভারতের বক্ষের উপর

Struchey বলিলেন :—"জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করিবার—এবং অতীতকে বিস্মৃত না হইবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমাদের আছে। কোন জাতির একটা ইতিহাস থাকা অতি উত্তম কথা। জাতি-গর্ব্ব ও ধর্ম্মগর্ব্ব আছে বলিয়া মুসলমানকে আমি শ্রদ্ধা করি। এবং এ কথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহাদের এই গর্ব্বভাবের সঙ্গে বিদ্যা ও বিজ্ঞানজনিত গৌরবের ভাব যখন মিশ্রিত হইবে, তখন তাহারা মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিবে, শুধু তাহা নহে, উৎকৃষ্ট নাগরিক হইবে, উৎকৃষ্ট রাজভক্ত প্রজা হইবে।" বহুবৎসর পরে যখন Struchey * ভারতবর্ষসম্বন্ধে একটা পুস্তক লেখেন, তখনও তাঁহার এইরূপ মত ছিল। "আমাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় মুসলমান-জনসাধারণের অভ্যুত্থান হইবে—এই কথার কোন ভিত্তি নাই। যদি ইস্‌লামের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক বিভ্রাটের কোন উপাদান থাকে, তাহা এই কথায় কাটিয়া যায় যে, মুসলমান, পৌত্তলিক হিন্দুকে খৃষ্টান অপেক্ষা বেশি ঘৃণা করে, এবং ভারতে মুসলমানের রাজত্ব পুনঃস্থাপিত হউক, ইহাও হিন্দুরা কখনই ইচ্ছা করিবে না…ভারতে আমাদের যেরূপ রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা তাহাতে দুইটি পরস্পর-বিদ্বেষী ধর্ম্ম পাশাপাশি থাকাই আমাদের আত্মরক্ষার একটা বিশিষ্ট উপায়। উচ্চশ্রেণীয় মুসলমান আমাদের বল-ভরসার স্থল—আমাদের দুর্ব্বলতার বিষয় নহে। হিন্দু অপেক্ষা উহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও অধিক বীর্য্যবান। উহাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ আমাদিগের সহিত সমান; এবং উহারা কোন অবস্থাতেই আমাদের রাজত্ব অপেক্ষা হিন্দুরাজত্ব বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিবে না।"

এ পরিষ্কার কথা। এই সম্মিলনটি বাহিক, এবং আলীগড়ই ইঙ্গ-ভারতীয়দিগের রাষ্ট্রনৈতিক মন্ত্রের প্রধান সাধন-ক্ষেত্র।

অবশ্য এই কথাগুলি তোমাদের কাণে পৌঁছিয়াছে :—"উহাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ আমাদের সহিত সমান।" এই কথাগুলি ইংরেজ আবৃত্তি করিতে বড়ই ভালবাসে। উহাদের এই কথার অর্থ কি ? অর্থ এই :—হিন্দুর যে আন্দোলনে ভারতীয় ইংরেজের স্বার্থহানির সম্ভাবনা, সেই একই কারণে—সেই একই প্রকারে মুসলমানেরও স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা রহিয়াছে। মনে কর, হিন্দুর হস্তে প্রভুত্ব আসিল। এ কথা ভুলিও না, সংখ্যায় হিন্দুরা অনেক বেশী। মতামতের শাসনতন্ত্র ও নির্ব্বাচনের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহারই অনিবার্য্য ফলে, অল্পসংখ্যক মুসলমান কি একেবারে ডুবিয়া যাইবে না ? আরও এক কথা ;—কে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে, যাহারা সংখ্যায় অধিক সেই হিন্দুরা যদি প্রভুত্ব পায়, তখন যাহাদের ধর্ম্মান্ধতাজনিত পূর্ব্বঅত্যাচার এখনো হিন্দুরা ভুলে নাই, সেই অল্পসংখ্যক মুসলমান-দিগকে নিষ্পেষিত করিবার প্রলোভন হিন্দুদিগের হইবে না ? আবার ইংরেজেরাও এই বিপদের আশঙ্কাটাকে বাড়াইয়া তুলিতে ত্রুটি করেন না। কত বিভীষিকা—দারুণ যুদ্ধের পূর্ব্বসূচনাস্বরূপ কত রক্তরঞ্জিত ঘনঘটা—দিগন্ত-গগনে তাঁহারা অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা বেশ বুঝেন, এই কথা সম্পূর্ণরূপে ঠিক নহে। তবু তাঁহারা মুসলমানের স্বার্থের দোহাই দিয়া, তাহাদের বিদ্বেষবুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিয়া অতি নিপুণভাবে তাহাদিগকে নাচাইয়া তুলেন। হিন্দুর উন্নতিতে যাহারা ভীত সেই মুসলমানদিগের পক্ষসমর্থনচ্ছলে তাহাদের দ্বারা শুধু আপনার কাজ উদ্ধার করা—এই নীতিকৌশলটি অতি চমৎকার!

শাসনকার্য্যে কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জন—ইহাই হিন্দুদের রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্য-তালিকার মুখ্য বিষয় ; এবং যাহাতে দেশের লোক বিড়ম্বিত না হয়

বসাইবার দাবী করিয়া থাকেন। ইহা কি ভারতবর্ষীয় ইংরেজের স্বার্থের অনুকূল ?—না। ইহা কি মুসলমান-স্বার্থের প্রতিকূল ?—হাঁ। কেননা এক্ষণে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে হিন্দু যে মুসলমানকে অতিক্রম করিবে, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তাই এই বিষয়ে ভিতরে-ভিতরে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে, "সিবিল সার্ব্বিল্" অর্থাৎ রাজসেবা-বিভাগের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ পদ দেশীয় লোকদিগের জন্য রক্ষিত হইবার কথা। কিন্তু এই নিয়ম জারী থাকা সত্ত্বেও,—বড়লাট ও প্রাদেশিক ছোটলাটেরা আপনার ইচ্ছামত পদাদি বিতরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কূট রাষ্ট্রনীতিই এই সব পদনির্ব্বাচনের নিয়ামক। কেননা, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে মুসলমান 'খিড়কিদরজা' দিয়া অনায়াসে রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইবে। যোগ্যতা না থাকিলেও, পরীক্ষায় নিম্নস্থান অধিকার করিলেও, অনেক মোটামোটা বেতনের কাজে মুসলমানেরা নিযুক্ত হইতে পারিবে। ইহা লইয়াই যত কিছু বিবাদ-কলহ। যৌগপদিক পরীক্ষার প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যে একটি অনুসন্ধান-সমিতি সংগঠিত হয়, তৎসমক্ষে মুসলমান সাক্ষীর একটা সুদীর্ঘ তালিকা অর্পিত হইল। সমিতির ইহাই কি ধ্রুব বিশ্বাস যে, ১০ জন মুসলমানের সাক্ষ্য একজন হিন্দুর সাক্ষ্যের তুল্য-মূল্য নহে ? যাহাই হউক, সমিতি সংখ্যার দোহাই মানিলেন। মুসলমানমাত্রই যৌগপদিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করিল ঃ প্রথমেই সৈয়দ আহমদ্ সুর তুলিলেন —আর সকলেই তাঁহার ধুয়া ধরিল। যখন রাষ্ট্রীয় মহাসভা সংস্থাপিত হইল, সৈয়দ ভাবিলেন এই আন্দোলন রাজদ্রোহদুষ্ট। তিনি মনে করিলেন, ইহাই দ্বিতীয় রাজবিদ্রোহের পূর্ব্বসূচনা। মনে করিলেন, "Indian Patriotic Association" সভায় নবাব ও রাজামহারাজা-

করিবেন, কিন্তু তাঁহার স্থাপিত সভা অনতিবিলম্বেই বিলুপ্ত হইল। প্রভুত্ব-প্রয়াসী বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। "যৌগপদিক পরীক্ষা নির্দ্ধারিত হইলে, আদালতে বাঙ্গালী ছাড়া আর কাহারও মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বাঙ্গালীদের উন্নতি দেখিলে অবশ্য আমি পরিতুষ্ট হইব...কিন্তু তুমি কি মনে কর, বাঙ্গালীর শাসনাধীনে রাজপুত ও অগ্নিমূর্ত্তি পাঠান শান্তভাবে অবস্থিতি করিবে?" আরও পরে ;—"যদি ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যায়, প্রভুত্ব কাহার হস্তে আসিবে? হিন্দু ও মুসলমান একই সিংহাসনের উপর বসিবে ইহা কি সম্ভব? কখনই না। একপক্ষ, অগত্যা আর একপক্ষকে ধরাশায়ী করিবে। আর এ কথাও যেন মনে থাকে, সংখ্যায় মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা স্বল্প হইলেও, হিন্দু উচ্চতর ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিলেও, মুসলমান নিতান্ত নগণ্য নহে—দুর্ব্বল নহে। ভারতের মুসলমানেরা বোধ হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আপনারাই সমর্থ হইবে। মনে কর যদি তাহা না পারে, তখন আমাদের মুসলমানভ্রাতৃগণ পাঠানেরা পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্য হইতে পঙ্গপালের মত এখানে আসিয়া পড়িবে, এবং উহারা উত্তরের সীমান্ত হইতে বাঙ্গলার শেষসীমা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ শোণিতধারায় প্লাবিত করিবে।"

এই যুদ্ধ-চীৎকারের কোন প্রতিধ্বনি হইল না। Patriotic Associationএ যে অদ্ভুতপ্রকারের জোটবন্ধন হইয়াছিল, সে জোট শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। পক্ষান্তরে, ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা এক্ষণে জীবন উদ্যমে পূর্ণ; এবং পক্ষান্তরে, বাঙ্গালী এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে রাজনৈতিক স্বত্বাধিকারের দাবী করিতেছে। মুসলমানের এই সমস্ত প্রচেষ্টা নিতান্তই কৃত্রিম, নিতান্তই গড়াপেটা। আসল কথা, শুষ্কডালের আগুন নিবিয়া আসিতেছিল।

ব্যক্তি) পশ্চাৎ হইতে সেই আগুনে ক্রমাগত ফুঁ দিয়া জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। Beck ও সৈয়দ আহমদ উভয়েই এক্ষণে লোকান্তরগত। তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যে রাষ্ট্রনীতি রহিয়া গিয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে একদল এক্ষণে তাহারই অনুসরণ করিতেছে। অন্য অনেক মুসলমান—যাঁহারা জ্ঞানালোকসম্পন্ন—তাঁহারা হিন্দুর মতে ভিড়িয়াছেন। ১৯০০ অব্দের রাষ্ট্রীয় মহাসভায় পঞ্জাবের কতকগুলি মুসলমান উপস্থিত ছিলেন; সভার প্রত্যেক অধিবেশনে, এইসব স্বদলত্যাগী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া, সৈয়দের মর্য্যাদারক্ষণপ্রয়াসী নবাবেরা ভীত হইলেন। যে সময়ে আলীগড়ে রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ খুব চলিতেছিল, আমি সেই ভরপূর যুদ্ধের সময়ে সেখানে গিয়া পড়িয়াছিলাম। এবং সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, আলীগড়ই সমস্ত ষড়যন্ত্রের একটা প্রধান আড্ডা। প্রত্যেকেই সেখানে যুদ্ধের জন্য বাণ শানাইতে বসিয়াছে। একজন নামজাদা নবাবের স্বাক্ষরে কতকগুলি প্রবন্ধ রচিত হইল, অথচ সেই স্বাক্ষরকারী ইংরেজির একবর্ণও জানে না। এখনকার প্রধানাধ্যক্ষ Morrisonও রাষ্ট্রনৈতিক-ব্রতে ব্রতী হইয়া, Beckএর স্থলাভিষিক্ত হইলেন। এলাহাবাদের Pioneer-পত্রে তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; এই সকল প্রবন্ধে একটা ব্যাপক কার্য্যতালিকার আভাস পাওয়া যায়:—সভাসমিতি, পুস্তকাগার ও সংবাদ-পত্রাদির সংস্থাপন। তিনি বলেন, মুসলমান লোক-মতের প্রভাব আসলে কম নহে —তবে ভাল বন্দোবস্তের অভাবেই উহা জাহির হইতে পারিতেছে না।

ভারতীয় মুসলমানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুক ঠুকিয়া একটা ভবিষ্যদ্বাণী করিব কি? না, এ বিষয়ে আমার কোন একটি ইচ্ছাও প্রকাশ করিব না। কেন না, যদি বলি—যাঁহারা মুসলমান-পুনরুত্থানের প্রবর্ত্তক

আর কিছুই হইতে পারে না। এই মুসলমান-চুব্‌ড়ির ঢাকাটা খুলিব কি? কি জানি যদি সাপ বাহির হইয়া পড়ে! আমি এ কথা স্বপ্নেও ভাবি না যে, মুসলমানকে অজ্ঞ করিয়া রাখিতে হইবে—জড়পিণ্ড করিয়া রাখিতে হইবে। মুসলমানকে শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন; তাহাতে কে আপত্তি করে? শুধু আমি এই কথা বুঝিতে পারি না—আপাততঃ হিন্দুর পথরোধ করিবার জন্য মুসলমানের জাতিগর্ব্ব কেন উত্তেজিত করা হইতেছে, পুরাতন বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা হইতেছে, ঈর্ষা ও জিঘাংসা বৃত্তিতে আহুতি দেওয়া হইতেছে; এইরূপে জানিয়া-বুঝিয়া অনৈক্যের বীজ বপন করা হইতেছে। বলিতে পার—ইহাতে খুব নিপুণতা প্রকাশ পায়, কিন্তু এইরূপ নীতিকে কি বলিয়া অভিহিত করিবে বল দেখি? এই নীতির দুইটা চোখ কাপড় দিয়া বাঁধা। ভবিষ্যদ্দর্শী সিদ্ধপুরুষ না হইয়াও এ কথা অনায়াসেই বলা যায়—মুসলমানের ধর্ম্মমত্ততা একবার উত্তেজিত হইলে সে য়ুরোপীয়েরও খাতির রাখিবে না। একবার রক্তের আস্বাদ পাইলে, সে তাহার দমনকারী ব্যক্তিকেও ভক্ষণ করিবে। এ কথায় Morrison সাহেব, "রামো! সে কি কখন হয়"—এইভাবে ঘাড় নাড়িয়া থাকেন। যখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা তাহাদের ধর্ম্মভ্রাতা এসিয়া ও য়ুরোপের মুসলমানদের সম্বন্ধে কিরূপভাবে কথা কয়, তখন তিনি উত্তর করিলেন "তাহারা কিছুই জানে না। তাহাদের গ্রামের কিছু দূরে কি হইতেছে তাই তারা জানে না, য়ুরোপের কথা কি জানিবে? আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ—তাহারা হিন্দুস্থানী বলে; খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান আরবী পড়িতে পারে। এই কারণেই, তাহারা নিজের ধর্ম্ম নিজের ইতিহাস এবং অন্যদেশীয় মুসলমানমণ্ডলীর ইতিহাস এ সমস্ত কিছুই জানিতে পারে না।" কিন্তু সেদিন আর্ম্মেনি হত্যাকাণ্ডের দুই

উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময় মুসলমানেরা কালিফের পক্ষ অবলম্বন করে। কোন-কোন বিশেষ তারিখে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে ইস্তাম্বুলের কালিফের সম্মানার্থ দীপালোক-উৎসবেরও অনুষ্ঠান করিয়াছে। এবং মহম্মদের উত্তরাধিকারী কালিফ্‌ও,—দূতের দ্বারা, তীর্থযাত্রীদিগের দ্বারা, এসিয়ার ভক্ত মুসলমানদিগের সহিত যোগসূত্র বন্ধন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আজকাল যেরূপ চলিতেছে,—ধর্ম্মশিক্ষার বিস্তার, আরবিভাষার শিক্ষাদান, ঐতিহ্যের উদ্বোধন—এই সমস্ত ব্যাপারে সর্ব্বদেশীয় মুসলমানের মধ্যে ঐক্যসাধন সহজ হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত, এমন একদিন আসিবে যখন বড়লাটের সহিত কালিফ্‌কেও গণনার মধ্যে আনিতে হইবে!

তাছাড়া এখন, ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই নামমাত্র মুসলমান। উহারা পুতুলপূজা করে, বর্ণভেদ মানিয়া চলে; হিন্দু দেশভাইদের সহিত উহাদের প্রভেদ কোথায়? খাঁটি মুসলমানেরা যদি পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে? পৌত্তলিকদিগকে ঠিক পথে ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে; বরং উহাতে করিয়া ধর্ম্মঘটিত দলাদলির ভাব আরও তীব্র হইয়া উঠিবে; যে দুই বিভিন্নসমাজ নিজ নিজ পার্থক্য ক্রমশঃ ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের প্রতি এতদূর উদার ও ক্ষমাশীল হইয়া উঠিয়াছিল যে, একই বেদীর উপর উভয়ে বলি উপহার দিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল না, সেই দুই সমাজ আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। কৃষ্ণকে যে পূজা উপহার দেওয়া হয়, তাহাতে আল্লার কোন ঈর্ষা নাই!...আমি জানি, ইহার মধ্যে একটা রাষ্ট্রনৈতিক কথা আছে। হিন্দুরা যে সকল সংস্কারের দাবী করিতেছে তাহার জন্য মুসলমানেরা এখনও পরিপক্ক হয় নাই। এবং

ফসলের ফলভোগ করিবে। কিন্তু মুসলমান হিন্দুকে যদি এই কথা বলিতে পারে তাহা হইলে ভাল হয় না কি? ভাই, তোমারও গলায় ফাঁস, আমারও গলায় ফাঁস, এবং এই ফাঁস প্রথমে আমাদেরি দ্বারাই প্রস্তুত হয়। মুসলমান-হিন্দুর মধ্যে যে বিবাদ তাহা স্থায়ী নহে। মুসলমানসমাজে শিক্ষা বিস্তার হইলেই এই বিবাদ রহিত হইয়া যাইবে।

আমি উভয়কেই একটি হিন্দু নীতিকথা স্মরণ করাইয়া দিই। দুইটা বিড়াল কোন গ্রামে গিয়া একখণ্ড মিঠাই দেখিতে পাইল। এই মিঠাইটা পাইবার জন্য দুইজনে ঝগড়া করিতেছে এমন সময় একটা বানর আসিয়া উভয়কে বলিল: "স্বস্তি! ভাই, কি লইয়া তোমরা বিবাদ করিতেছ?" উহার মধ্যে একটা বিড়াল বলিল,—"এই মিঠাইটা আমার।" অপর বিড়ালটা বলিল;—"না, ওটা আমার।" বানর বলিল, "আমার বোধ হয়, তোমাদের উভয়েরই উহাতে অধিকার আছে। একটা দাড়িপাল্লা আমার নিকট লইয়া আইস।" অতঃপর বানর, ঐ মিঠাইটাকে ভাঙ্গিয়া দুইটুকরা করিয়া পাল্লার দুইদিকে স্থাপন করিল। একটুকরা অপরটুকরা অপেক্ষা ওজনে বেশী হইল। ওজন সমান করিবার জন্য বানর একটুকরা উহা হইতে ভাঙ্গিয়া খাইল; এইরূপ ওজন সমান করিবার জন্য উহাকে ক্রমাগত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল; অবশেষে উহার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। বানর বলিল!—

"আমি শুধু আমার পরিশ্রমের অংশটুকু পাইয়াছি,—তাহার বেশী নয়। আমি তবে এখন আসি; ভাই তোমাদের মঙ্গল হোক্!"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিরী-ফরাদ।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ প্রান্তর।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পারস্যরাজ শয্যাত্যাগ করিয়া শিবিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, নদীতীরস্থ প্রান্তরে কোন অজানা-দেশের অচেনা-বসন্ত নবীন উল্লাসে খেলা করিতেছে। এক রাত্রির মধ্যে, বক্ষের শুভ্র তুষারের ওড়না—বৈধব্যের কঠোর আবরণ সরাইয়া, শৈল-শোভনা প্রান্তর-প্রকৃতি, একটী হরিৎ কাঞ্চনের ময়ূরপঙ্খী কিংখাব দিয়া নিজের সুন্দর অঙ্গটি ঢাকিয়াছে। তাতারের দিকে মুখ ফিরাইয়া সম্রাট একবার বসন্তানিল-কম্পিত সহস্রধাখণ্ডিত দীর্ঘশ্বাস, প্রান্তরের শষ্পগুচ্ছে, পুষ্পিত তরুগাত্রে, কুসুমগন্ধানুসারী ভ্রমরে উপহার দিলেন। জক্ষর্তিসনদীর বক্ষে যে শৈলটীর উপরে শিরী পূর্ব্বরাত্রে আরোহণ করিয়াছিল, রাজার দৃষ্টি সহসা তাহার উপর নিপতিত হইল। তখন সূর্য্যের রঙ ফুটিতেছে মাত্র, কিন্তু সূর্য ফোটে নাই। পর্ব্বতের যে অংশ দিয়া শিরীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি পতিত হইয়াছিল, তাহাতে শৈলদেহে একটী অনবচ্ছিন্ন রেখা-চিহ্ন পতিত হইয়াছিল। সেই রেখাঙ্কিত পথ ধরিয়া অরুণ-কিরণ-ধারা পর্ব্বতের শিখর হইতে তলদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া সম্রাটের বোধ হইল যেন শৈলগাত্রে একটী রক্তনদীর প্রবাহ চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রতিমূর্ত্তির ভগ্নাংশ পর্ব্বতের গাত্রে বিদ্ধ হইয়া অবস্থিত ছিল। সম্রাট সেগুলিকে রক্তপ্রবাহে ভাসমান এক একটী তাতার-

তাতারের দুর্দশার পূর্ব্বাভাস জাগিয়া উঠিয়াছে। দূরে শরীর-রক্ষী যুবকও প্রহরার কার্য্য ভুলিয়া নির্নিমেষনেত্রে সেই শৈলের পানে চাহিয়াছিল। সম্রাটের আগমন সে দেখিতে পায় নাই। সম্রাট ডাকিলেন "আমেদ"। যুবক উত্তর দিল না। আবার ডাকিলেন "আমেদ!" উত্তর পাইলেন না। তৃতীয়বার সম্বোধন করিলেন, উত্তর পাইলেন না। প্রাণহীন প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় পলকহীন দৃষ্টিতে যুবক ওখানে কি দেখিতেছে? সম্রাট, আমেদের নিকটে গিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে ধীরে করস্পর্শ করিলেন। যুবক ফিরিল না। সম্রাট তাহার কটীদেশ হইতে অস্ত্র উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, যুবক বজ্রমুষ্টি দিয়া অসিকোষ ধরিয়া আছে। আর একবার ডাকিলেন "আমেদ!"

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আমেদ একবার ফিরিল—সম্রাটের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। আবার মুখ ফিরাইল। সম্রাট বুঝিলেন, তাহার দৃষ্টি নিরর্থক। তিনি যুবকের দৃষ্টির সমরেখায় আর একবার পর্ব্বতের দিকে চাহিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার অধিক আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। সম্রাট বিস্মিত হইয়া শৈল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঘাটীতে ঘাটীতে প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাট দেখিলেন, সকলেরই আমেদের অবস্থা। কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। যে চাহিল, সে অভিবাদন করিল না। পশ্চাৎ হইতে জাফর আসিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন।

খসরু বলিলেন "জাফর কি দেখিতেছ?"

জাফর।—বসন্তানিল বহিতেছে।

খসরু।—আর কি দেখিতেছ?

জাফর।—ধুধু-মাঠ। আর দেখিবার কি আছে তা দেখিব?

খসরু।—প্রহরীদের মধ্যে কাহারও কিছু অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিলে না?

জাফর।—না দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। এ মরুভূমিতে আসিয়া তাহাদের হৃদয় রসহীন হইয়াছে, এরূপ স্থানে মিছামিছি যুদ্ধের অপেক্ষা করিয়া কতদিন তারা চিত্তের স্থিরতা রক্ষা করিতে পারে। জাঁহাপনা! তাহারা মানুষ ত বটে! খসরু মনে মনে বলিলেন—"তাহারা মানুষ বটে কিন্তু তুমি নও।" প্রকাশ্যে বলিলেন—তোমার কি অভিপ্রায়?

জাফর।—জাঁহাপনা! গোলামের অভিপ্রায় বহুদিন হইতেই ত বলিয়া আসিতেছি। বসন্তের আরম্ভে আজ যুদ্ধ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা শুভ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

খসরু।—বেশ, অদ্যই যুদ্ধ ঘোষণা কর।

চতুর্থ দৃশ্য।

গিরিপথ সেনাপতি ও সৈনিক।

সেনা।—এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা! যেখানে একজন লোক থাকলে হাজার লোকের গতিরোধ করতে পারে, সেখানে একজনও মানুষ নেই।

সৈ।—যেখানে যেখানে সৈন্য থাকলে আমাদের গতিরোধ করা সহজ, সে সমুদায় স্থানই জনশূন্য। নদীর পরপারে তাতার-প্রবেশের পথে, রন্ধ্রমুখে, পর্ব্বতের উপরে কোথাও একটী প্রাণী নেই। রন্ধ্রের অপরমুখ পর্য্যন্ত স্থানে পরীক্ষক সৈন্য গিছল, কিন্তু কোথাও তারা তাতারা সৈন্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পায়নি।

সেনা।—বেশ, তুমি বিশ্রাম নাও। তোমার এই পরিশ্রমযোগ্য পুরস্কার

(খসরু ও জাফরের প্রবেশ।)

খসরু।—সেনাপতি! সৈন্য অগ্রসর করতে আর বিলম্ব কি?

সেনা।—জাঁহাপনা! প্রবেশ-পথ পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলুম।

খসরু।—তারা কিছু সন্ধান পেয়েছে?

সেনা।—তারা তাতারনগরীর সীমা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করে এসেছে।

খসরু।—সকলেই পরীক্ষায় সফল হয়েছে?

সেনা।—এই বীর একপথ ধরে প্রায় তাতারের হৃদয় পর্য্যন্ত স্পর্শ করে এসেছে।

খসরু।—কি অনুভব করলে বীর?

সৈ।—জাঁহাপনা! প্রাণহীনের হৃদয়ের ন্যায় তাতার-হৃদয় নিস্পন্দ।

খসরু।—সেকি! রণোল্লাসের কোনও নিদর্শন পেলে না?

সৈ।—উল্লাস! নগরে জীবন আছে বলে বোধ হ'লনা।

জাফর।—কেমন ক'রে নিদর্শন পাবে জাঁহাপনা! আমাদের দীর্ঘ-সূত্রতার অবকাশে সমস্ত তাতারী সম্ভবতঃ গৃহত্যাগ করে পালিয়েছে। প্রাণহীন তাতারে কি স্পন্দনানুভব করবার প্রত্যাশা রাখেন জাঁহাপনা?

সৈ।—গোলামের সঙ্গে যারা যারা পথ পরীক্ষা করতে গিছলো, তাদেরও কেউ কোথাও একজনও তাতারীকে দেখতে পায়নি।

সেনা।—যেসব স্থান অধিকার ক'রে বসে থাকলে, তাতার-প্রবেশে আমাদের অনেক কষ্টস্বীকার করতে হয়, সে সকল স্থানে লোক নেই। এমন কি, রন্ধ্রপথেও একজন তাতারী সৈন্যকে দেখতে পাওয়া গেল না।

খসরু।—আপনি কি করেছেন?

জাফর।—উনি এইখানে দাঁড়িয়ে তাতারীদের পলায়নের কারণ নির্ণয় করছেন।

খস্রু।—জাফর! বারংবার এরূপ নির্ব্বোধের মত মর্য্যাদাহানিকর কথা কহিলে, আমি তোমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হ'ব।

জাফর।—জাঁহাপনা! আপনার ন্যায়, ধরণীজয়ী বাদশার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যখন আমি এই সকল কথা কইছি, তখন কি আপনি বুঝতে পারছেন না যে, জাঁহাপনাদত্ত শাস্তি পাবার জন্যই আমি ব্যাকুল। রমণীর রাজ্যে দৌত্য করতে গিয়ে, একটা অন্তঃপুর-রক্ষকের কাছে যে অপমান পেয়েছি, মহা অহঙ্কারী পারস্য-সম্রাটের প্রতিনিধির তার চেয়ে যন্ত্রণা আর কি হ'তে পারে? আপনার দত্ত শাস্তিই আমার শান্তি।

খস্রু।—তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যই ত আমার এত চেষ্টা এত আয়োজন।

জাফর।—ক্ষমা করুন জাঁহাপনা! দীর্ঘসূত্রের আয়োজনের চেয়ে কর্ম্মীর বিশ্রাম শতগুণে ভাল। আয়োজন করতে করতে সে নারী যদি আমাদের হাত-ছাড়া হয়ে, কোন অজ্ঞাত দূরদেশে পালিয়ে যায়, তাহ'লে আর এত আড়ম্বরের আয়োজনে লাভ কি?

খস্রু।—আপনি কি করেছেন সেনাপতি?

সেনা।—আমি সেই সব পরিত্যক্ত স্থান, জাঁহাপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রেই অধিকার করেছি। তাতার বিনাযুদ্ধেই একরূপ আমাদের করতল-গত।

খস্রু।—তবে আর কি জাফর! অগ্রসর হও। ধরণীর কোথায় লুকিয়ে সে রমণী আমাদের দৃষ্টির বাইরে উপস্থিত হবে! সেনাপতির কার্য্য সেনাপতি করেছেন। তুমি রমণীকে বন্দিনী করবার জন্য অগ্রসর হও।

সেনা।—একবারমাত্র পর্ব্বত-শিখরে কাড়াধ্বনি শুনেছিলুম। তার পর থেকে তাতারভূমি নিস্তব্ধ।

খসরু।—আমিও একবারমাত্র তাতারী বীরের রণকোলাহল শুনেছিলুম, তার পর আর কিছুই শুনিনি। এরা কি যুদ্ধনীতি জানেনা!

জাফর।—জানলে কখন এমন সুবিধার স্থান ত্যাগ করতোনা।

সেনা।—জানুক আর নাই জানুক—তাতারীর মনোভাব বুঝতে পারি আর না পারি, আমিত তাতারের রাজপ্রাসাদ যতক্ষণ অবরোধ না করছি, ততক্ষণ ফিরছিনা।

জাফর।—আমিও যতক্ষণ না সেই দাম্ভিকা রমণীকে ধ'রে এনে সম্রাটের পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছি, ততক্ষণ আর জাঁহাপনার কাছে মুখ দেখাচ্ছিনা। চলুন সেনাপতি! অপমানে জ্ঞানশূন্যযুবকের ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'রে, আমাকে কার্য্যের আদেশ করবেন চলুন।

সৈ।—আমি হুজুরদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

[খসরু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

খসরু।—সত্যই কি তাতারীর রণ অবহেলা!
সত্যই কি ঘরে ঘরে বিপন্নের মেলা!
সত্য কি তাতার তার কঠোর হৃদয়ে
ভীতিবিকম্পিত চিরকোমল কমল
আবরিয়া বসেছিল, তুলি বিশ্বমাঝে
সগর্ব্ব মস্তক তার প্রবঞ্চনাময়!
দুরন্ত শ্বাপদপূর্ণ, বাসনার ভীম
বনমাঝে—উন্মুক্ত ক্ষুধার দৃষ্টি'পরে
তৃণবিরচিত দুর্গে, অজ্ঞান বিধাতা
লুকায়ে কি রেখেছিল কাঞ্চনকুরঙ্গী।
অথবা আঁকিতে গিয়া প্রাণহীন ফুলে

সহসা সৌরভে মত্ত বিস্মিত বিজিত
চিত্রকর, মুগ্ধনেত্র কর বিকম্পিত—
ফেলে দেছে সমীরণে এ শিরী-কুসুম
মলয়ে সে ভেসে এসে পড়েছে তাতারে।

(আমেদের প্রবেশ।)

আমেদ। জাঁহাপনা!

খসরু। হতভাগ্য! প্রহরীর কাজে
নিযুক্ত রেখেছি তোরে। তোর রক্ষা তরে
মোরে কি নিযুক্ত তুই করিলি প্রহরী?

আমেদ। গোস্তাকি করেছি জাঁহাপনা! কিন্তু হায়
গোলাম তো এখনো জানেনা, আরো কত
ওচরণে করি অপরাধ। জাঁহাপনা!
শাস্তি নিতে তাই, আশ্রিতবৎসলপদে
মস্তক লুটাতে চাই—বিনা দ্বৈধে কর
রাজা মস্তক গ্রহণ।

খসরু। কি হেতু বৈরাগ্য
যুবা! নির্ভয়ে আমারে কও। নির্নিমেষ
নয়ন তোমার, অচলের কোন্ দৃশ্যে
বদ্ধ হয়েছিল? কি বিচিত্র কুহেলিকা
তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান ঘেরে রেখেছিল?

আমেদ। প্রহরীর কার্য্যে রত, ভ্রমিতেছিলাম
নিজ মনে। সহসা সুদূরে ওই শৈল-
শিরে, কক্ষচ্যুত তারা মত, সমুজ্জ্বল
কোমল আলোক—পুঞ্জ পুঞ্জ ধারা লয়ে-
উঠিল জাগিয়া। চেয়ে দেখি—কি বলিব

খসরু। বল বৎস! দ্বিধাশূন্য
হও, নির্ভয়ে সকল কথা কও।

আমেদ। রাজা!
গলদেশে হস্তার্পণে অচল বাড়ায়
কর। অভ্রভেদী দিগম্বর, ওই হের,
কুটীল কটাক্ষে চায়—ইঙ্গিতে সে বলে
হে আমায়—সাবধান! গুহ্যকথা—দন্তে-
দন্তে বেঁধে থাকো—অবাধ্য রসনা যদি
মূল ছিন্ন ক'রে ফেল তার।

খসরু। বল মূর্খ!
শীঘ্র বল। নহিলে জীবন যাবে।

আমেদ। লও প্রভু, অভাগার এখনি জীবন লও।

খসরু। ভাই! ভাই! আমি দীন উত্তর-ভিখারী।

আমেদ। শুন রাজা! যাক প্রাণ—আর বিভীষিকা!
শুন রাজা! তোমারে শুনাব। চেয়ে দেখি
দারুণ লাবণ্যময়ী সে তারকা-লতা
অচলের মাথা হ'তে, ঝাঁপ দিল
শৈলগাত্রে আত্মহত্যাতরে—প্রতিঘায়ে
আলোকাঙ্গ ভাঙ্গিতে লাগিল, প্রতিঘায়ে
নিশার গগণগাত্রে নাজানি কত যে
কোটী আলোকের ফুল, প্রস্রবণ-ধারা-
রূপে, ধরা-বক্ষে ঝরিতে লাগিল।

খসরু। তার পর?

আমেদ।—তার পর? প্রথমে উঠিল রবি

চারুগলে জ্যোতিপুষ্পমালা—করে বংশী
অধরে সঙ্গীতরাশি, কপালে অরুণ-
টীপ, মাথায় ওষধি—হাসিতে হাসিতে
উষারাণী অরুণ-তরঙ্গে দিল ঝাঁপ।

খসরু।—তার পর ?

আমেদ।—　　　দণ্ডহাতে ভৈরবমূরতি—
কি বিচিত্র ভীষণ সুন্দর!—জাঁহাপনা
শৈল কাঁপে, কাঁপিছে মেদিনী, গীতস্রোতে
এমন কম্পন! প্রচণ্ড ভৈরবদণ্ডে
কখন কি স্বর্গসুধা হয় নিঃসরণ!

[প্রস্থান।]

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি।)

খসরু।—আমেদ! আমেদ! উন্মত্ত আমেদ! একি!
একি অপরূপ ধ্বনি! কোন্ তারকার
দেশে, কে আজি লুকায়ে এসে, কে ভাঙে রে
মৃদুকরে সুধা-কাদম্বিনী! ধর্ ধর্
কে আছিস্ শীঘ্র ধর্—আন্ পাত্র, আন্
কমণ্ডলু!　　　[প্রস্থান।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

জাপানের অভ্যুদয়।

শিক্ষা।

সুশিক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নত হয়ও নাই, হইতে পারেও না। জাপানের উন্নতির মূলেও সুশিক্ষা। সুশিক্ষার ফলেই যুদ্ধবিগ্রহে, শিল্পবাণিজ্যে, রাজনৈতিক বিস্তারে এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই জাপানীরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। যে জাপানে ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একখানা সাহিত্য পর্য্যন্ত ছিল না, এবং গান, নৃত্য ও মল্লযুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না, আজ সেই জাপানে কত বিদেশী যুবক আসিয়া শিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কি জাপানের পক্ষে কম গৌরবের বিষয়!

ইহাদের প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে—"যে কোরিয়ার ভিতর দিয়া ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম এবং দর্শন জাপানে আসিয়াছে, সেই কোরিয়ার ভিতর দিয়াই চীনের সাহিত্য প্রথম এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।" জায়গীর-প্রথা-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানে কয়েক শতাব্দী কেবল চীন-দেশীয় শাস্ত্র এবং আচার-পদ্ধতির আলোচনা হইত, চীনা পুস্তক জাপানী ভাষায় অনুবাদিত হইত। এই সময় অনুবাদ-কাল (Translation period) নামে জাপানের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। জায়গীরপ্রথার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই রাজ্য-লিপ্সায় ব্যতিব্যস্ত থাকায় ১৫০০ খৃঃ পর্য্যন্ত সাহিত্যের কোনরূপ আলোচনাই হয় না। এই সময়কে তমোযুগ (Dark period) বলিয়া থাকে। আবার ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকার সহিত জানা-শুনা হওয়ায় এবং ছাপিবার অক্ষর আবিষ্কৃত হওয়ায় পুনরায় জাপানে শিক্ষা-বিস্তার আরম্ভ হইতে থাকে। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্পেন ও পর্তুগাল হইতে জেশুইট মিশন এদেশে আগমন

করেন, এই সময় অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে থাকে। এবং জাপানী শিক্ষা অবজ্ঞা করতঃ বৈদেশিক গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করে। গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক জাতির সংস্পর্শে জাতীয় শক্তির শিথিলতা ঘটিবার আশঙ্কায় স্পেনিশ ও পর্ত্তুগিজদিগকে তাড়াইয়া দেন। সে সময় কেবল ওলন্দাজগণ নাগাসাকি সহরে থাকিতে আদেশ পায়। বিদেশী গ্রন্থের আমদানী বন্ধ হয়। এই সময় হইতে জাপানীরা আগ্রহ-সহকারে সাহিত্য এবং দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। যখন ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং রুষবাসিগণ ক্রমেই এই দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন জাপানীরা ভূগোলশাস্ত্র এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র কানোর শিল্প-স্কুল ছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে সামুরাইজাতির নোনামক একখানা নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। তোকুগাওয়া সোগুনদের সময় জাপানের স্থানে স্থানে গান, নৃত্য, ধনুর্ব্বিদ্যা, যুযুৎস্থ প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এই সময় যুদ্ধবিদ্যার প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করায় শিল্পবিদ্যার চর্চ্চা একরূপ স্থগিত ছিল।

সিংহাসনারোহণের পরই বর্ত্তমান সম্রাট শিক্ষাবিভাগের সংস্কারে কৃতসংকল্প হয়েন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য জাতির শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া সেই শিক্ষার জোরেই উহাদিগকে দূরে রাখিব। বাস্তবিক কার্য্যতঃ তাহাই দাঁড়াইয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে রাজ-বিদ্রোহ হয়, উহা প্রশমিত হওয়া মাত্রই দলে দলে জাপানী, আমেরিকায় এবং ইউরোপে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ স্বদেশের উন্নতি-ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্রমে বিভিন্নপ্রকারের বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

বয়সে লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত স্কুলে পাঠাইতে হইবে। দেখিতে দেখিতে এই ক্ষুদ্র জাপানে ছেলেদের জন্য দুইটী সরকারী ও দুইটী বে-সরকারী এবং মেয়েদের একটী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখন শতকরা ৯১ জনের উপর ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়িতেছে। কেবল অনিবার্য্য কারণবশতঃই দুইচারিটী ছেলেমেয়ের পড়া হয় না।

কাউন্ট ওকুমা শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন—যদিও জাপান শিক্ষাবিষয়ে অসাধারণ উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে, তবুও চারিটী বিষয় আশানুরূপ শিক্ষালাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (১) জাপানীদের তেমন সাহিত্য নাই। চীনাদের সহস্র সহস্র অক্ষরমালা এবং সাহিত্য পাঠ না করিলে জাপানীদের স্বদেশসম্বন্ধীয় কোন জ্ঞানই জন্মে না। (২) জাপানীদের লেখ্য এবং কথ্য ভাষায় তেমন সামঞ্জস্য নাই। (৩) নিজেদের শিল্পবিজ্ঞান না থাকায় পাশ্চাত্য জাতির শাস্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া পাঠ করিতে হয়। (৪) নীতিশাস্ত্রের অভাব এবং শিন্তো, বৌদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রচলন। জাপানীদের ন্যায় যদিও আমাদের এতগুলি প্রতিবন্ধক নাই তবু শিক্ষাবিষয়েও ভারত আজ জাপানের নিকট নত।

যদিও জাপানগবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তবুও বহুল পরিমাণে শিক্ষাবিস্তারের দুইটী বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ভারতে গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতিও যেমন, সাধারণের চেষ্টাও তেমন। জাপানের তুলনায় ভারতে অন্ততঃ ২০টা বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ব্যতিরেকেও কেবল জনসাধারণের যত্নে এবং অর্থে পরিচালিত হইতে পারে, তাঁহারা এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনায়াসে নানারূপ কার্য্যকরী বিদ্যার প্রবর্ত্তন করিতে

তাহারাই বরং গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত বিদ্যালয়ে জীবনের অর্দ্ধাংশ পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন করতঃ জীবনের শেষাংশে শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীর পরিচর্য্যায় মানবজীবন সার্থক করুক। ভারতের শিক্ষিত সমাজ একটুকু যত্নবান হইলেই স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষাপ্রণালীর (বৈজ্ঞানিক) প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। জাপানের বিষয় ভাবিলে সহজেই অনুমিত হয় এরূপ কার্য্যে অর্থের চেয়ে সাধারণের উৎসাহ-উদ্যম বেশী চাই।

কিরূপে এদেশে, বর্ত্তমান শিক্ষার ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে এবং কিরূপ বিষয়ই বা শিক্ষা দেওয়া হয়, নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

১৮৭১ খৃঃ শিক্ষাবিভাগের মিনিষ্টার ক্যাবিনেটের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন। ১৮৭৩ খৃঃ শিক্ষাবিষয়ক আইন প্রচারিত হয়। কলেজ, উচ্চ এবং নিম্নবিদ্যালয়সমূহ এই সময় প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান সম্রাট স্বয়ংই এ সকল কার্য্যে বিশেষ অগ্রগামী হয়েন। এই সময় গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের জন্য একজন মিনিষ্টার, একজন সহকারী মিনিষ্টার সাধারণ (General), বিশেষ (Special), এবং শিল্প (Technical) বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটী ডাইরেক্টর কয়েকজন কাউন্সিলির, কয়েকজন সেক্রেটারী এবং কতিপয় ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ করেন। ইহা ছাড়া নিম্নবিদ্যালয়সমূহ জেলার শাসনকর্ত্তাদের এবং উচ্চবিদ্যালয়সমূহ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের এবং কলেজ ও দেশের যাবতীয় স্কুলসমূহই শিক্ষাবিভাগের মিনিষ্টারের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিবার বন্দোবস্ত হয়।

কিণ্ডারগার্টেন।—সমগ্র জাপানে ২৫৪টী কিণ্ডারগার্টেন আছে। এই স্কুলসমূহে সম্প্রতি ২৩৬৭১টী ছেলেমেয়ে পড়িতেছে। ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েরাই এখানে পড়িয়া থাকে। এসব

পাঠশালার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ঠিক্ বাপমায়ের মত। এখানকার ছেলেমেয়েরা পাঠশালার নাম শুনিলে জ্বর কিম্বা পেটের অসুখের ভাণ করে না। বাড়ীর চেয়ে স্কুলেই বরং ইহারা আরামে থাকে। এখানে নির্দ্দোষ গান ও খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং শিক্ষকেরা নানারূপ আমোদজনক গল্পচ্ছলে অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ছাত্রদের সহিত বেড়াইতে বাহির হন। ছেলেমেয়েগুলি সারি সারি জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিতে থাকে। সে দৃশ্য বড়ই মনোরম। গুরুমা এবং গুরুমহাশয় বাগানে লতাপাতা এবং ফলফুল দেখাইয়া মুখে মুখে অনেকটা শিখাইয়া থাকেন। উপদেশচ্ছলে অথচ আমোদের ভাবেই ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে অনেক বিষয় শিখান হয়। ভারতের ন্যায় এখানে পণ্ডিত মহাশয়ের তাড়না এবং প্রহারের ভয়েই শিক্ষণীয় বিষয় ভুলিয়া যায় না।

নিম্ন ও উচ্চ প্রাইমারী স্কুল।—আইনানুসারে পিতামাতা প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকেই ছয় বৎসর বয়সে স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য। ছাত্রদিগকে নিম্ন স্কুলে চারিবৎসরকাল অধ্যয়ন করিতে হয়। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে দৈনিক জীবনে যাহা কিছু দরকার হয় সে সমস্ত এই স্কুলেই শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতবাসী, জাপানের বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া হয়ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী তুলনা করিয়া, নুতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিতে পারেন, সেই জন্য ইহাদের পাঠ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নিম্নপ্রাইমারী স্কুলে জাপানীভাষা, নীতি প্রবন্ধ, অঙ্ক, ব্যায়াম, ড্রইং, গীত এবং হাতে নানারূপ জিনিস-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। নিম্নপ্রাইমারীর পর উচ্চপ্রাইমারী স্কুলে চার বৎসর পড়িতে হয়। এখানে উল্লিখিত বিষয়গুলি এবং ইতিহাস, ভূগোল ও সরলবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, এছাড়া প্রত্যেক ছেলে-

মেয়েকে কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্যবিষয়ক বিদ্যা, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুপ্রস্তুতপ্রণালী এবং ইংরাজী ভাষা, এই চারিটী বিষয়ের কোন একটা শিক্ষা করিতে হয়। মিউনিসিপালিটী অথবা গ্রাম্যসমিতি এক অথবা ততোধিক প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়া স্ব স্ব এলাকাধীন স্থানসমূহের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে।

১৯০২ খৃঃ জাপানে ২২০৩০ টা নিম্নপ্রাইমারী এবং ৬৩৫১ টা উচ্চপ্রাইমারী স্কুল ছিল। পল্লীগ্রামের নিম্নপ্রাইমারী স্কুলের ছেলে-দিগকে মাসিক ৵১০ এবং সহরের ছেলেদিগকে ।৴০ মাহিয়ানা দিতে হয়, আর পল্লী-গ্রামের ও সহরের ছেলেকে উচ্চ-প্রাইমারী পড়িতে যথাক্রমে ।৶১০ এবং ৸৶০ মাহিয়ানা দিতে হয়। শিক্ষকেরা দক্ষতানু-যায়ী মাসিক ২০ শিলিং হইতে ১০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। দক্ষতার সহিত ১৫ বৎসরকাল কেহ শিক্ষাবিভাগে কাজ করিলে পেন্‌সন্ পাইয়া থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও সেই পরিবারের সাহায্য বাবদ গবর্ণমেণ্ট কিছু পেন্‌সন্ দিয়া থাকেন। ১৯০২ খৃঃ ১০২৭০০ জন লোক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। ঐ বৎসর নিম্নশিক্ষার বাবদ ৪৪৭২৩৬১০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল।

মধ্যস্কুল।—জাপানে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০টী জেলা আছে (ফর্ম্মোসাদ্বীপসহ)। প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল আছে। এ ছাড়া আরো কয়েকটী মধ্যস্কুল গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হইতেছে। মধ্যস্কুলে ৫ বৎসর পড়িতে হয়। এ স্কুলে জাপানী ভাষা, চীনাভাষা, এবং ইংরাজী, ফরাসী অথবা জার্ম্মাণ ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ণবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, পলিটিকাল একনমি, ড্রইং, ব্যায়াম, এবং দৈনিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহারোপযোগী আইনগুলি শিক্ষা করিতে হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র জাপানে ৬৩টী মধ্যস্কুল ছিল। ১৯০২ খৃঃ উহার সংখ্যা ২৯২টিতে দাঁড়ায়। তন্মধ্যে ৩৪টী বে-সরকারী।

ঐ বৎসর ১০২৩০৪টী ছেলে মধ্যস্কুলে পড়িত। মধ্যস্কুলের জন্য ঐ বৎসর ৭৩৮২১০০৲ টাকা খরচ হয়।

উচ্চবিদ্যালয় (High School)।—যাঁহারা কলেজে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে পড়িতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই স্কুলে তিনবৎসরকাল বিশেষ বিশেষ বিষয় অধ্যয়ন করেন। সমগ্র জাপানে ৮টা গবর্ণমেণ্ট উচ্চবিদ্যালয় আছে। এই ধরণের স্কুল আমেরিকা কিম্বা য়ুরোপে নাই। প্রত্যেক স্কুলে তিনটী শাখা আছে—(১) আইন, সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি, (২) ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিদ্যা ও বিজ্ঞান ; এবং (৩) চিকিৎসাবিদ্যা। যাঁহার যে বিষয় কলেজে পড়িবার ইচ্ছা তিনি এই তিন বৎসরে সে বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করেন। এই স্কুলে প্রত্যেক ছেলেকেই ইংরাজী, ফরাসী এবং জার্ম্মাণ ভাষার যে কোন দুইটী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাপানে ২৪ জন বিদেশী শিক্ষক আছেন। ১৯০৩খৃঃ এই কয়েকটী স্কুলে ৪৭৮১ জন ছাত্র পড়িত এ বৎসর উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য ৫৯১৩৫০৲ খরচ হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়।—(Imperial University) আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নহে। প্রত্যেক ইউনিভার্সিটীতে এক এক বিভাগের একটীমাত্র কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলি একজায়গায় অবস্থিত। কেবল প্রচুর স্থানাভাবে কৃষিকলেজ সহরের প্রান্তদেশে অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় কলেজ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটী ইউনিভার্সিটী হল আছে। সেথানে বিভিন্নবিষয়ের ক্লাস আছে। সুশিক্ষিত গ্রাজুয়েট্‌গণ (as post graduates) সেথানে নানারূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। নূতন কিছু আবিষ্কার করিলে ডিগ্রিও পাইয়া থাকেন। সরকারী তিনটী বিশ্ববিদ্যালয়। দুইটী ছেলেদের ও একটী মেয়েদের জন্য। ছেলেদের একটী ইউনি-

ভার্সিটী কিওটোসহরে। অপর দুইটী টোকীও সহরে এতদ্ব্যতীত আর দুইটী বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। টোকিওতে আইন, সাহিত্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, বিজ্ঞান এবং ডাক্তারী কলেজ আছে। কিওটোতে কৃষিকলেজ বাদে আর সবরকম কলেজই আছে।

পূর্ব্বে জাপানের উত্তরস্থিত হোকাইদোদ্বীপে (Yesso Island) অল্পসংখ্যক কতিপয় অসভ্যজাতি বাস করিত। গবর্ণমেণ্ট ঐ জায়গাকে ভদ্রলোকের বাসোপযোগী করিবার জন্য স্থানে স্থানে সহর নির্ম্মাণ করেন। ছাপ্পোরো এই দ্বীপের রাজধানী। ১৮৭৬খৃঃ গবর্ণমেণ্ট এই সহরে ইম্পিরিয়াল কৃষিকলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজই জাপানের সর্ব্বপ্রথম কলেজ। ইহার ৮।৯ বৎসর পর জাপানে অন্যান্য কলেজ স্থাপিত হয়। ইউনাইটেড্ ষ্টেটের অন্তর্গত ম্যাছাচুছেটস্ (Massachusettes) কৃষিকলেজের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার উইলিয়ম্ স্মিথ ক্লার্ক, ছাপ্পোরো কৃষিকলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল হইয়া আইসেন। তিনি আরও কতিপয় আমেরিকান প্রফেসর সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই কলেজটিকে ঠিক আমেরিকানধরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। এই ইম্পিরিয়াল কৃষিকলেজই জাপানের সর্ব্বপ্রধান কৃষিকলেজ। এখন বৈদেশিক প্রফেসর একটিও নাই। এই কলেজে সম্প্রতি ১৫ জন প্রফেসর ১৩ জন সহকারী প্রফেসর এবং ৯ জন লেক্‌চারার ও ডেমনষ্ট্রেটর আছেন। প্রফেসরগণ প্রায় সকলেই য়ুরোপীয় ও আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত। ১৫ জন প্রফেসরের ৫ জনই জার্ম্মানি ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ডাক্তার (D.S.C.). আমরা দুইজন ভারতবাসী এবার সর্ব্বপ্রথম এই কলেজে যোগ দিয়াছি। এই কলেজের ক্লাস, লেবরেটরী, ফার্ম্ম, মিউজিয়াম, বটানিকাল গার্ডেন প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হয় না যে, পুষা কিম্বা ভারতের অন্যত্র সহজে এরূপ কলেজ স্থাপিত

প্রথমতঃ বৈদেশিক প্রফেসর লইয়াই সব কলেজ খোলা হয়। এখন ১০টীর বেশী বৈদেশিক প্রফেসর সমগ্র জাপানে নাই। যে সকল দেশী শিক্ষিত ব্যক্তি বিদেশে কতিপয় বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া ফিরিয়াছেন, তাঁহারাই প্রফেসরশ্রেণীভুক্ত হয়েন।

ডাইরেক্টরসাহেব অন্যান্য দেশীয় কলেজের সহিত জাপানী কলেজ তুলনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—The equipment of the University of Japan can fairly bear comparison with those of the famous Universities of Europe and America and the standard of instruction is also as high.

গবর্ণমেণ্ট ইউনিভার্সিটীর প্রেসিডেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় কলেজ সমূহের ডাইরেক্টরদের সহিত পরামর্শ করিয়া কলেজের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ প্রফেসর আছেন; কিওটোতে উহার কিছু কম। এছাড়া যথেষ্ট সহকারী প্রফেসর ও ডেমনোষ্ট্রেটর আছেন।

আইন এবং ডাক্তারী কলেজে ৪ বৎসর পড়িতে হয়। এবং অন্যান্য কলেজে তিনবৎসরকাল পড়িতে হয়।

১৯০৩ খৃঃ কলেজবিভাগে ৪০৭৬ জন ছাত্র ছিলেন। কলেজের জন্য গবর্ণমেণ্ট ঐ বৎসর ৩৫৭৪৫৪৫৲ টাকা খরচ করেন। ইউনিভার্সিটীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ৫৫০০ ছাত্র গ্রাজুয়েট্ হইয়াছেন। এখন প্রতি বৎসর ৫০০ শত ছেলের উপর ইউনিভার্সিটী অর্থাৎ কলেজ-বিভাগের গ্রাজুয়েট্ হইয়া থাকেন।

আইন কলেজ।—তিন বৎসর কাল আইন অধ্যয়ন করতঃ শেষ-পরীক্ষায় পাশ করিলে হোগাকুশি উপাধি পাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কোন পরীক্ষা

শতকরা অন্ততঃ ৯৯ জন পাশ করিয়া থাকে। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন কেহ রীতিমত কলেজে উপস্থিত না হইতে পারিলে তাহাকে পুনরায় এক বৎসর কলেজে উপস্থিত হইয়া গ্রাজুয়েট্ হইতে হয়। তবে কলেজে সকলই কার্য্যকরী (Practical) বিদ্যা বলিয়া সকলেরই বেশ জ্ঞান জন্মে। হোগাকুশীগণ ওকালতি করিয়া থাকেন। কোন কোন হোগাকুশী ষ্টেট্-পরীক্ষা পাশ করিয়া নো-হো-গাকুশী হইয়া থাকেন। নোহোগাকুশীদের কেহ বা জজ হইয়া থাকেন, কেহ বা রাজদূতের কার্য্য (Diplomatic Service—such as consul, legation &c.) করিয়া থাকেন।

ডাক্তারী কলেজ।—এই কলেজে ডাক্তারী এবং ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালী (Pharmacy) শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা ই-গাকুশী উপাধি পাইয়া থাকেন। কলেজের সঙ্গে হাঁসপাতালের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। কত কত ডাক্তার নূতন নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে (for research) নিয়োজিত আছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।—এখানে নয় রকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, যথা,—(১) সিবিল (civil); (২) নৌবিভাগীয় (Naval); (৩) মেকানিকাল; (৪) যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণবিষয়ক; (৫) ইলেক্ট্রিক্, (৬) স্থপতিবিদ্যাবিষয়ক; (৭) একস্‌প্লোসিভ্ অর্থাৎ গোলাবারুদনির্ম্মাণ-বিষয়ক; (৮) রসায়ণবিদ্যাবিষয়ক এবং (৯) খনিজবিদ্যাবিষয়ক। ইঞ্জিনিয়ারগণ কো-গাকুশী উপাধি প্রাপ্ত হন। জাপানীরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। জাপানে ইঞ্জিন, যুদ্ধজাহাজপ্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে।

সাহিত্য কলেজ।—এখানে জাপানী, চীনা, ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস এবং মনো-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

বিজ্ঞান কলেজ।—এ কলেজে অঙ্ক, জ্যোতিষশাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ণবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীবতত্ত্ব (Zoology) এবং ভূতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ রিগাকুশী উপাধি পাইয়া থাকেন।

কৃষি কলেজ।—আমাদের দেশ কৃষিকার্য্যের পক্ষে নিরতিশয় উপযোগী ক্ষেত্র। অথচ এত প্রকাণ্ড ভারতবর্ষে, পাহাড়পর্ব্বতসমাকীর্ণ একমাত্র বঙ্গদেশের চেয়ে ক্ষুদ্র জাপানের অনুরূপ কৃষি-কার্য্যের বন্দোবস্তটুকুও নাই। বিবেকানন্দসমিতির স্বামী সদানন্দ তাঁহার জাপানী শিক্ষা সমালোচনায় কতিপয় মাস পূর্ব্বে (গত আষাঢ় মাসে) বাঙ্গালীর সম্মুখে জাপানের কৃষি-প্রণালী উপস্থিত করিয়াছেন এবং জাপানীরা কি উপায়ে প্রস্তর-মিশ্রিত মাটীতেও এক কাণি জমিতে ভারতের তিন কাণির সমান শস্য উৎপাদন করে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও দিয়াছেন। নানারূপ প্রতিবন্ধকের ওজর দেখাইয়া আমরা শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ে হতাশ হই, অথচ সহজসাধ্য কৃষিকার্য্যের উন্নতির বিষয়েও শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া থাকি। জাপানে গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সহায়তা করিতেছেন। তিনশত কৃষিতত্ত্বজ্ঞ নানারূপ উপদেশ দিয়া সমগ্র জাপানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। জমি এবং সার পরীক্ষা করিয়া দিতেছেন। গাছের রোগের প্রতীকার বলিয়া দিতেছেন। জেলায় জেলায় একটী করিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে। কৃষিকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট অজস্র টাকা ব্যয় করিতেছেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট তেমন কিছুই পাইতেছি না সত্য, কিন্তু যদি দেশীয় রাজা, মহারাজা, জমিদারগণ স্বীয় স্বীয় এলাকাস্থ কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কিঞ্চিৎ বিধান করেন তাহা হইলে একমাত্র কৃষিকার্য্যের দ্বারাই অপর দেশীয় শিল্পবাণিজ্যকে পরাস্ত করা যায়। আমাদের দেশ এখন যে পরিমাণ চাউল, পাট এবং তুলা অন্যদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে

কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিলেই আরও অনেকটা উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

জাপানে দুইটী কৃষিকলেজ আছে। এই কলেজ শিবপুর কৃষি কলেজের ন্যায় নহে। আমার বোধ হয়, অজস্র অর্থব্যয়ে পুষার যে কলেজ হইতেছে সেখানেও একটা কার্য্যকরী বিদ্যার বন্দোবস্ত হইবে কিনা সন্দেহ। এখানকার কৃষিকলেজে ৪টী বিভাগ আছে (১) কৃষিতত্ত্ব, (২) কৃষিবিষয়ক রাসায়ণবিদ্যা, (৩) বনবিভাগীয় কৃষিবিদ্যা, (৪) পশু-চিকিৎসা। প্রথম দুইবিভাগের জন্য নো-গাকুশী উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে ছেলেদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রশস্ত আবাদী ভূমি এবং বন রহিয়াছে। আমাদের কলেজের আবাদী ভূমি (farm) এবং বন যথাক্রমে ১৫৬৭৪ এবং ১৩০৬৩০ একর বিস্তৃত।

এখানে ইউনিভার্সিটী বলিতে উল্লিখিত কয়েকটী কলেজই বুঝায়। স্কুলসমূহ ইউনিভার্সিটীর অন্তর্গত নহে।

নর্ম্মাল স্কুল। নর্ম্মাল স্কুল দুই প্রকার, নিম্ন ও উচ্চ। নিম্ননর্ম্মালস্কুলে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ এবং উচ্চনর্ম্মালস্কুলে মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। পুরুষদিগকে চারিবৎসর এবং স্ত্রীলোকদিগকে তিনবৎসর পড়িতে হয়। কিরূপে শিক্ষকতার কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে হয়, তাহা এখানেই শিখিতে হয়। স্ত্রীলোকদিগকে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সেলাই ও রন্ধন এবং নানারূপ গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয়। প্রত্যেক জেলাতেই অন্ততঃ একটী নিম্ননর্ম্মালস্কুল আছে। ছেলে ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্লাস আছে কোন কোন জেলায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্কুলই আছে। নর্ম্মালস্কুলের ছেলেমেয়েদের বাজার খরচ গবর্ণমেণ্টই বহন করিয়া থাকেন। ছাত্র পাঠ সমাপ্তে যথোপযুক্ত বেতনে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতার কার্য্য করিতে বাধ্য। নিম্নস্কুলের ছাত্রগণ ১০ বৎসর, উচ্চস্কুলের ছাত্রগণ ৭ বৎসর এবং মেয়েরা ৫ বৎসর

জাপানে ৫৪টী নিম্ন নর্ম্মালস্কুল আছে। পুরুষছাত্র-সংখ্যা ১১৯০০ এবং মেয়ের সংখ্যা ২০০০ জন। ১৯০২ খৃঃ এই স্কুলের জন্য ৪৫৩১৫৬০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। উচ্চনর্ম্মালস্কুল কেবলমাত্র টোকিওতে একটী ছিল। ১৯০২ খৃঃ হিরোশিমা সহরে অপর একটী স্থাপিত হইয়াছে। ১৯০৩খৃঃ উচ্চনর্ম্মালস্কুলদ্বয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৮৮২৬০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

উপরোক্ত স্কুল-কলেজ বাদে ৫টী ডাক্তারী স্কুল, একটী বৈদেশিক ভাষার, একটী শিল্প এবং একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় জাপানে অল্পদিনের মধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ কোন কোন বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্কুল আছে। এরূপ স্কুল জাপানে ৫৭টী। তন্মধ্যে বেসরকারী ৪৫টী। এই সকল স্কুলে সম্প্রতি ১৪৫৭৩ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ৯০২ খৃঃ এই সকল স্কুলের নিমিত্ত ৯৭৯৫৭৫৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

টেক্‌নিকাল স্কুল।—টেক্‌নিকাল্ স্কুলের জন্যই জাপান এত দ্রুত গতিতে শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ১৯০: খৃঃ জাপানে ৫৯২টী টেক্‌নিকাল্ স্কুল ছিল এবং ৩৪৬৬৫ জন ছাত্র ঐ সকল স্কুলে পড়িত। ঐ বৎসর টেক্‌নিকাল্ স্কুলসমূহের নিমিত্ত ৩৪২৩২১০৲ টাকা খরচ হয়।

এই দুই বৎসরের মধ্যে টেক্‌নিকাল্ স্কুলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। উচ্চ টেক্‌নিকাল্ স্কুল জাপানে ৭টী আছে। তন্মধ্যে দুইটী কৃষিতত্ত্ববিষয়ক, দুইটী বাণিজ্যবিষয়ক, এবং তিনটী নানারূপ প্রয়োজনীয় বস্তু-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবার প্রত্যেক বিষয়েই নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চ এই তিনটী বিভাগ রহিয়াছে। এই উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯০৩খৃঃ ২৯৭২টী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। ঐ বৎসর এই ৭টী স্কুলের জন্য ১২০৭২০৲ টাকা খরচ হয়। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট

১৯০২ খৃঃ উল্লিখিত স্কুল-কলেজ সমুদয় বাদে নানাবিষয়ক মোট ১৪৭৬টী স্কুল ছিল। উহার অধিকাংশই বে-সরকারী। ঐ বৎসর জাপানে ১৫টী মূক-বধির এবং অন্ধ বিদ্যালয় ছিল। ৫০টী লাইব্রেরী ছিল। বলা বাহুল্য, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই বাড়িয়া যাইতেছে। এবং গবর্ণমেণ্টও এসকল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

জাপানের সর্ব্বত্রই ছাত্র-সাহায্য-সমিতি নামক যথেষ্ট সমিতি আছে। ঐ সমিতি হইতে দরিদ্র ছাত্রদিগের অধ্যয়নের ব্যয় বহন করা হয়। কালে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উঁহারা ঋণ শোধ করিয়া থাকেন। স্থলবিশেষে কোন কোন সমিতি কিঞ্চিৎ সুদ লইয়া থাকেন; আবার কোন কোন সমিতি লয়েন না।

যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে স্কুল আছে। অনেক জায়গায় যুদ্ধ এবং যুযুৎসু শিখিবার ক্লব আছে। কিওটো সহরে একটী ক্লব্ আছে, উহার সভ্য সংখ্যা পাঁচলক্ষ পঞ্চাশহাজার। পালাক্রমে উহারা সপ্তাহে দুই দিন পৃথক্ পৃথক্ দল বাঁধিয়া গোলাগুলি লইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের ছেলেরা ধূলামাটী লইয়া খেলা করিয়া থাকে। এখানকার ছেলেদের খেলা ভিন্নরূপ। তাহারা দলে দলে সৈন্য সাজিয়া বাঁশী (bugle) বাজাইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জাতীয় নিশান উড়াইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। জাপানের অনেক জায়গায়ই খুব ছোট ছোট পাহাড় আছে। কোন পাহাড়ের নিকট গিয়া উহারা দুই দল হয়। একদল পাহাড়ের উপর যাইয়া কাগজ দিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করে। তৎপর দুই দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ফাঁকা বন্দুক এবং বাঁশের লাঠিই ইহাদের অস্ত্র। ক্রমে নিচের

লয়। মাঝে মাঝে দুর্গে আগুনও লাগাইয়া থাকে। অনেক সময় দুই একজন বয়স্ক ব্যক্তিও ছেলেদের যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিতে উহাদের সঙ্গে যাইয়া থাকে। আমাদের দেশে এরূপ খেলায় বিরত থাকিতে বরং শাসন করা হয়। এখানকার ছোট ছোট ছেলেগুলিও বিস্তর কষ্টসহিষ্ণু।

স্ত্রীশিক্ষা।—ভারতে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে অনেকের অনেক মত। হেতু দর্শাইয়া কেহ বলেন স্ত্রীশিক্ষায় দেশের উপকার, কেহ বলেন অপকার। কাযেই নিজে ঠিক মত কোন্‌টা বুঝিয়া উঠিতাম না। কিন্তু জাপানে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষায় যে দেশের সমূহ ইষ্ট সাধিত হয়, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের ন্যায় এদেশের স্ত্রীলোকেরা অন্ধকারে আবদ্ধপ্রায় কূপমণ্ডুকের মত নহে। তাহারা দেশের কত কাজ করিতেছে। মেয়েরাই কত স্কুল চালাইতেছে। মেয়েদের কত সভাসমিতি রহিয়াছে। কত সংবাদপত্রই মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। পোষ্টাফিষ, রেলওয়ে অফিষ, এবং সওদাগরি অফিষে মেয়েরা কত সুশৃঙ্খলভাবে কেরাণীর কায চালাইতেছে। সাধারণ দোকানদার অধিকাংশই স্ত্রীলোক। পুরুষেরা কল কারখানা অথবা কোন অফিষে গিয়া থাকেন। মেয়েরা দোকানের কাযে এদিকে ব্যস্ত। কেহ একদণ্ডের তরেও বসিয়া থাকে না। যেন সকলেই কলে পরিচালিত হইতেছে।

১৯০০খৃঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলেজ ছাড়া মেয়েদের অন্যান্য সকল রকম স্কুলই ছিল। ১৯০০খৃঃ এপ্রিলমাসে মেয়েদের ইউনিভার্সিটী অর্থাৎ কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯০৩খৃঃ ১২০ জন মেয়ে প্রথম বৎসর গ্রাজুয়েট হইয়া বাহির হন।

১৯০২খৃঃ জাপানে ৭০টী মেয়েদের উচ্চস্কুল (Girls' High School) ছিল। ঐ সকল স্কুলে সে বৎসর ১৭৫৪০ জন মেয়ে পড়িত। ঐ সকল

১৮৭১খৃঃ মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রথম আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর শিক্ষার জন্য কতকগুলি মেয়ে আমেরিকায় প্রেরিত হন, উঁহারা কয়েক বৎসর আমেরিকায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; উঁহাদের একজন য়্যাড্মিরাল উরিউ (Uriu) এবং একজন মার্শ্যাল মার্কুইশ্ ওইয়মার পত্নী।

কতিপয় শিক্ষিতা জাপানী রমণী মঙ্গোলিয়া, শ্যাম এবং চীনে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। মিস্ ইয়াসুই নাম্নী জনৈক জাপানী রমণীকে শ্যামের রাণী স্বয়ং শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন; তিনি ইংলণ্ড হইতে শিক্ষিতা হইয়া আসিয়াছিলেন।

কেবলমাত্র টোকিওসহরেই মেয়েদের ডাক্তারী, জর্ম্মান, টেক্‌নিকাল্; কৃষি, বাণিজ্য, চিত্র এবং সঙ্গীত বিদ্যার ৭৩টী স্কুল আছে। তন্মধ্যে ২০টী স্কুল কেবল মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। বৈদেশিক মিশনারীরাও টোকিও, ইয়াকোহামা, নাগোইয়া, ওশাকা, কোবে, কিওটো এবং অন্যান্য সহরে মেয়ে স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

দাতব্য হাঁসপাতাল, জাপানী মহিলাদের শিক্ষাবিষয়ক সমিতি (Japanese Ladies' Educational Society); রোগী-পরিচর্য্যার বিশেষ সমিতি (Special Society for nursing the sick); রেড্‌ক্রেশ-সোসাইটী; মহিলাদের স্বাস্থ্যবিষয়ক সমিতি (Ladies' Sanitary Society); পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকার জন্য সমিতি (Ladies' Orphan Society); শিশুসন্তানদিগের প্রতিপালন-সমিতি (Society for Nursing the Infants) এবং আরও কতিপয় বিশেষ কার্য্যকরী সমিতি কেবল মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। স্বয়ং রাজ্ঞীও কোন কোন সমিতির প্রেসিডেণ্ট্।

টোকিওতে লর্ড, ব্যারণ প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকের মেয়েদের জন্য একটী স্বতন্ত্র স্কুল আছে। লোর্ডবংশীয় ছাড়া অন্য কোন বিশিষ্ট

ভদ্রলোকের মেয়েও সেখানে পড়িতে পারেন, ঐ স্কুলটী স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সেদিন ঐ স্কুলের মেয়েরা সর্ব্বসমক্ষে নানারূপ ক্রীড়া প্রদর্শন করিলেন। সম্রাটের মেয়েরাও অন্যান্য মেয়েদের সহিত ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। অনেকরকম আমোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের খেলাটী উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, রক্তাক্তকলেবরে নিপতিত সৈন্যদের প্রতি রেড্ক্রেশ-সোসাইটীর মেয়েদের কর্ত্তব্য কি, তাহা সেদিন নোবল্বংশীয় মেয়েরা সর্ব্বজনসমক্ষে দেখাইয়া দিলেন। জনৈক যুদ্ধে আহত সৈন্য ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অপর ব্যক্তি কথঞ্চিৎ আহত হইয়া যেন চলনে অশক্ত হইয়া পড়িল। যাই উহাদের যুদ্ধে আহত হওয়া অমনি নিকটবর্ত্তিনী জনৈক মহিলা নিশান তুলিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে, এখানে আহত ব্যক্তি আছে, সেবা-শুশ্রূষার জন্য লোকের দরকার। অমনি এদিক ওদিক হইতে মেয়েরা দৌড়াইয়া আসিয়া কেহ ব্যাণ্ডেজ করিতে লাগিলেন, কেহ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন, কেহ ঔষধ দিতে লাগিলেন, কেহ মাথায় বরফজল দিতে লাগিলেন। আহত ব্যক্তিদের প্রথমটীকে মেয়েরা একরূপ খাটীয়ার উপর অতি সাবধানে শয়ন করাইয়া স্কন্ধে বহন করিয়া সেবা-শুশ্রূষার জন্য শিবিরে লইয়া গেলেন। অপর ব্যক্তির দুই হস্ত দুই জনের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অতীব সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে চালাইয়া লইয়া গেলেন। মেয়েরাও দেশের জন্য কত কি করিতেছে!

মাসিওনেস্ ওইয়ামা তাঁহার যুদ্ধবিবরণীতে লিখিয়াছেন "স্ত্রীজাতির উপর জাপানের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। যে সকল রাজকন্যা রুমালের চেয়ে ভারী জিনিষ কখন বহন করেন নাই, যাঁহারা ২।৩ জন পরিচারিকা ব্যতিরেকে কখন ঘরের বাহির হন নাই, যাঁহারা দুধ, সর,

নবনী ভোজনেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, আজ সেই সব রাজকন্যা একাকিনী ব্যাগ হস্তে অনশনে, অনিদ্রায়, বিজন অরণ্যে বা পার্ব্বত্য প্রদেশে ঘুরিতেছেন এবং নানারকমে আহত সৈন্যের সেবাশুশ্রূষায় নিয়োজিতা আছেন।”

পিতার চেয়ে মায়ের দোষগুণই ছেলেমেয়েরা অধিক পাইয়া থাকে। মানবের যাহা কিছু গুণ জাপানী মেয়েদের মধ্যে সে সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। এমন নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া জাপানীরা কেন স্বনামধন্য মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবেন না?

জাপানী মেয়েরা শিল্প ও চিত্রবিদ্যায় সিদ্ধহস্তা। উহা স্কুলে শিখিবারও একটী প্রধান বিষয়। গত বৎসর একটী উচ্চস্কুলের মেয়েরা ওলাউঠাক্রান্ত রোগীর জন্য দশহাজার কোমরবন্ধ তৈয়ার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহারা দশহাজার জোড়া মোজা সৈন্যদের জন্য প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়াছেন। এবং তদনুযায়ী কার্য্যও করিতেছেন। জাপানী মেয়েরা লক্ষ্মীস্বরূপা, একটী জিনিসও নষ্ট হইতে দেয় না। পাতের ভাতগুলি পর্য্যন্ত শুকাইয়া যুদ্ধসাহায্যে প্রেরণ করিয়া থাকে।

এই ত্রিশবৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বলিয়া কেন, প্রত্যেক বিষয়ে, জাপান যেরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, ইহাতেও যদি আমাদের ঘুম না ভাঙ্গে তবে আমাদের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। জাপানীদের মধ্যে ভূরি ভূরি বিশেষত্ব দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় এই জন্যই ভারত পরাধীন, এইজন্যই ভারতবাসী একটা জাতির মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। যতদিন না ভারতবাসী রাজা (native landholders) প্রজা, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ জনসাধারণ এক প্রাণে স্বদেশকে ভালবাসিতে জানিবে, যতদিন না নিজেরা নিজেদের শিল্প,

দেশের উন্নতি বাস্তবিকই সুদূরপরাহত। পক্ষান্তরে দেশের ধনৈশ্বর্য্য বিদেশীর পরিপোষণার্থে নিঃশেষিত হইবেই হইবে। দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট এবং ব্যাধি চিরদিনের তরে ভারতে আশ্রয় লইবেই। নিজেদের স্বার্থ নিজেরা যতটা বুঝি অন্যে কি তাহা বুঝে? অপরে কি তাহাদের স্বার্থের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াও আমাদের উন্নতির কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিবে? আমাদের দেশে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট। উহাদের ধর্ম্ম, সমাজ, আচার, রীতি, নীতি, পদ্ধতি, এমন কি, উহাদের দেশের আবহাওয়া পর্য্যন্ত বিভিন্নপ্রকারের। যাহা তাহাদের মতে ন্যায়, আমাদের মতে হয়ত অন্যায়। আবার যাহা তাহাদের মতে অন্যায় হয়ত আমাদের মতে ন্যায়। দেশকালপাত্রভেদে ওরূপ মতান্তর হইবারই কথা। তাই বলিতেছিলাম নিজেদের সাধ্যশক্তিতে যতটা আমাদের আয়ত্তাধীন দেশহিতব্রতে কেন তাহা উদ্‌যাপন করিব না?

জাপানের মোট ছাত্রসংখ্যার তালিকা (১৯০২ খৃঃ)।

শিক্ষাবিভাগ	ছেলের সংখ্যা	মেয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্রসংখ্যা
নিম্নশিক্ষা	৩৮৭৬৪৯৫	৩৫৯০৩৯১	৭৪৬৬৮৮৬
সরকারী উচ্চস্কুল	৭০৫২৩৮	২৩০৯৫৫	৯৩৬১৯৩
বেসরকারী উচ্চস্কুল	৪২৬৮	৩৪৩৭	৭৭০৫
কিণ্ডার গার্টেন সরকারী	১৩০৫১	১০৫২০	২৩৫৭১
কিণ্ডারগার্টেন বেসরকারী	২২৩৫	২১৩৭	৪৩৭২
সকলপ্রকার স্কুলবিভাগে	৪৬০১৩৮৭	৩৮৩৭৪৪০	৮৪৩৮৮২৭

পড়িতেছে। শতকরা ৯৪ জন ছেলে এবং ৮৬ জন মেয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে। জাপানে সাড়েচারিকোটী লোক। তাহার এক-পঞ্চমাংশের এখনও ছাত্রজীবন।

উপসংহার।

যে চারিটী বিষয়ে "জাপানের অভ্যুদয়" প্রবন্ধটী সমাপ্ত করিলাম, এই চারিটী বিষয়েই মৃতকল্প ভারতবাসীর মৃতসঞ্জীবনী লুক্কায়িত আছে। সে সুধার উদ্ধারসাধন না করিলে ভারত যুগযুগান্তের তরে মৃতাবস্থায় রহিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন, ভারতবাসী, তোমাদের জন্ত আমরা কত কি করিতেছি। রাজনীতির অভাব কিসের? রাজ-নীতিরাজ কার্জ্জনসাহেব স্বয়ং তোমাদের কর্ত্তা। রাজনীতির জোরেই ভারতের আয়তন-বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। তিব্বত-মিশন, পারস্ত-মিশন, আফগান-মিশন রাজনীতির জোরেই। ভারতের মঙ্গলের তরেই ইংরাজ ও জাপনীদের বন্ধুত্ব-সূত্রে (Anglo-Japanese Alliance) আবদ্ধ হওয়া। উহাও কুটীল রাজনীতির জোরেই। দরিদ্র প্রজা-পুঞ্জের রক্তশোষিত অর্থেরও যথাসম্ভব সদ্ব্যয় হইতেছে। কেননা, দিল্লীর দরবার, ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিসৌধ-নির্ম্মাণ, যুবরাজের অভ্যর্থনা, রাজার গোষ্ঠিগোত্রের অর্থাৎ বিলাতী সাহেবদের পরিপোষণ ভারতের অর্থে যেরূপ সুন্দরভাবে নির্ব্বাহিত হয়, কুত্রাপি তেমন হয় না। কয়জনের ভাগ্যে এমন রাজপূজা সম্ভবপর?

সমাজসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট দূরের কথা আমরা নিজেরাই সমাজ ভাঙ্গিতে মজবুত। সকলেই মুখে অনেক কথা বলিয়া থাকি, কাজের বেলায় ফাঁকা। আমরা এক শ্রেণীর লোকই মিলিতে মিশিতে জানিনা। কেমন করিয়া সমগ্র ভারতের নানাধর্ম্মাবলম্বী নানাজাতি এক হইয়া জাতীয় সমাজ গঠন করিবে? সমাজ-গঠনে দেশীয়

গণ্যমান্য ব্যক্তি দুইচারিটী একমতাবলম্বী হইয়া অগ্রসর হইলেই দলে দলে লোক তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে পারে। (who will bell the cat ?)।

শিল্পবাণিজ্যে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সহানুভূতি দেখা যায়, তাহাতে কারখানার প্রতি ট্যাক্স দিন দিন বাড়িবে ছাড়া কমিবে না, এবং লেবার য়্যাক্‌ট্‌ও ক্রমেই অসহনীয় কড়া হইয়া উঠিবে, নতুবা ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতি, বার্ম্মিংহামের কামার, গ্লাসগোর ইঞ্জিনিয়ারদের কিরূপে পোষাইবে ? রিপোর্টে প্রকাশ, জাপানে গড়ে দৈনিক ২২½ ঘণ্টাকাল কলকারখানা চলে, অথচ অন্নবস্ত্রহীন পরিশ্রমোপজীবী ভারতবাসী অতিরিক্ত পরিশ্রমে মারা যাইবে বলিয়া কি, উদার গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া লেবার য়্যাক্‌ট্‌ জারি করিয়াছেন ?

উচ্চশিক্ষা কি আর নিম্নশিক্ষাই কি, গবর্ণমেণ্টের উভয়েই অপরিসীম সহানুভূতি। টাকা ভারতের অথচ সেই টাকা ব্যয়ে ভারতবাসী শিক্ষিত হইবে এবিষয়েও ভারত পরমুখাপেক্ষী। কেরাণিগিরি-বিদ্যা ছাড়া কার্য্যকরী বিদ্যার আদৌ প্রচলন নাই, থাকিলে গবর্ণমেণ্ট স্বজাতীয় প্রেম রক্ষা করিতে পারিবেন কেন ? শিল্প-বাণিজ্যের বাবদ যে বিলাতে প্রতিবৎসর কোটী কোটী মুদ্রা যাইতেছে সে পথ কি বন্ধ হওয়া উচিত ? ভারতে রাজার দেশের লোকের ভাত বন্ধ, এও কি সম্ভবপর ? খবরদার ভাই সব, রাজনীতির সহিতেই শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ এবং শিক্ষার যোগ, কাযেই গবর্ণমেণ্ট যাহাই করুন আমাদের শিরোধার্য্য। মুখ ফুটিয়া কথা বলিলে রাজভক্তির লাঘব হইবে। দেশ দিয়াই কি করিব আর দেশের উন্নতি দিয়াই কি করিব, দুবেলা দুমুটো ভাত হইলেই যথেষ্ট। ইহাই আমাদের রাজনীতি।

"মুক্তি"

এখনকার—ও তখনকার।

মুক্তি—মোক্ষ—লয়—নির্ব্বাণ—প্রভৃতি শব্দগুলি আজকাল শিক্ষিত সমাজে এতই সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহাদের অর্থ আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার জন্য বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন নাই। এখন আমরা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছি যে, মোক্ষপদ একটা অনির্ব্বচনীয়, অননুভবনীয়, কিম্ভূতকিমাকার স্থান বা অবস্থাবিশেষ। আর, কি উপায়ে যে মুক্তিলাভ হয় সে সম্বন্ধেও আমাদিগকে আর কিছু বলিয়া দিতে হইবে না। সকলেই এখন জানিয়া লইয়াছি যে, প্রাচীন স্বার্থপর ঋষিগণ যে সকল বেদান্তাদি শাস্ত্র নিজেদের কাছেই লুকাইয়া লুকাইয়া রাখিতেন, সেই বইগুলির খানিক খানিক আবৃত্তি করিতে পারিলেই, এবং "আমিও যে ব্রহ্মও সে" এই কথাটা সময়ে সময়ে বলিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া যায়। অহো! ভারতের এমন দুর্দ্দিনেও যে আমরা এতগুলি মুক্তিতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ঘরে ঘরে বিরাজিত রহিয়াছি ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। পরম পুণ্যময় সত্যযুগে যে মহামূল্য রত্ন অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া কচিৎ কোনও গিরিকন্দরে কোনও বিশেষ সুকৃতিমান্ মহাপুরুষের আশ্রয়ে লুকায়িত থাকিত, আজ এই পাপপূর্ণ কলিযুগে সেই অমূল্যনিধি যে এত সুলভ হইয়া হাটে-বাজারে পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে, ইহার তুল্য আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? পুরাকালের অমিতপরমায়ু ঋষিগণ কঠোর তপস্যা দ্বারা যে

করিতেন, আমরা আজ ৬০।৭০ বৎসর পরমায়ুর মধ্যেই, বিনাতপস্তায় যে তাহা হাসিল করিয়া ফেলিতে সাহস বাঁধিতেছি, ইহার তুল্য বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে! পূর্ব্বকালের সেই চিরনির্ব্যাধি, বলবীর্য্য-সমন্বিত, শীতবাতাদি-ক্লেশসহিষ্ণু সাধনোপযোগী দেহ ধারণ করিয়াও ঋষিগণ যে কার্য্য দুষ্কর ভাবিতেন, আমরা আজ এই ম্যালেরিয়া-জর্জরিত, বলবীর্য্যবিহীন একটা অকর্ম্মণ্য দেহ ধারণ করিয়াও যে, সেই প্রাচীন মহাত্মাদিগের অসাধ্য-সাধনে আপনাদিগকে সক্ষম মনে করিতে পারি ইহা একটা নিতান্ত সামান্য কথা নহে। পুরাকালে যখন হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন, যখন শাসনপ্রণালীর গুণে সকলের জীবিকাবৃত্তি ধর্ম্মানুকূল ছিল, যখন রাজদণ্ডভয়ে কোনও প্রজা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পরিত না, যখন উঠা, বসা, খাওয়া, শোওয়া প্রত্যেক কার্য্যই এক একটি ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবন স্বভাবগত হইয়া দাঁড়াইত, তেমন দিনেও সেই মহাত্মগণ যাহা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ভাবিতেন,—আমরা আজ বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন থাকিয়া, ধর্ম্মবিগর্হিত যথেচ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, জীবনধারণার্থ অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলিকে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়া দিয়া, কচিৎ কখনও অনভ্যাসের-ফোঁটা-পরার মত একটা-আধটা সদাচরণ করিয়াই যে সেই ঋষিদুর্লভ কৈবল্য-প্রাপ্তির উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারি, ইহা কি সম্ভবাসম্ভব-চিন্তাশীল ব্যক্তির একটু ভাবিবার বিষয় নহে? প্রাচীনকালে সংস্কৃতভাষা সমগ্র আর্য্যজাতির মাতৃভাষারূপে বিদ্যমান থাকায়, শাস্ত্রগ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ এখনকার অপেক্ষায় অনেকগুণে সুসাধ্য ছিল, তথাপি সে সময়েও শাস্ত্রার্থ সম্যক্ উপলব্ধির জন্য উপনয়ন হইতে সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অর্থাৎ জীবনের প্রথম চতুর্থাংশকাল বেদাধ্যয়নের আবশ্যকতা ছিল, আর

নির্ব্বাচিত সংস্কৃতগ্রন্থের কিয়দংশমাত্র, শতকরা ২৫।৩০ নম্বর যাহাতে পাওয়া যায় এইরূপভাবে পাঠ করিয়া যতটুকু সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিলাভ হইতে পারে, তাহারই জোরে, শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ যে বুঝিয়া ফেলিতে পারি, ইহা অপেক্ষা অসাধারণ কার্য্য আর কি হইতে পারে? প্রাচীন কালের সংস্কৃতভাষাজ্ঞান ও শাস্ত্রাধ্যয়নের উক্তরূপ সুবিধা থাকিলেও যখন প্রাচীন ঋষিগণ অধীত শাস্ত্রার্থে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার জন্ত উর্ব্বর মস্তিষ্কের আবশ্যকতা অনুভব করিতেন এবং সেই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অধ্যয়নাবস্থায় গুরুগৃহে বাস করিতেন, এবং অধ্যয়নান্তে গৃহে সমাবর্ত্তন করিয়া অধীতশাস্ত্রের ধর্ম্মজ্ঞান অহরহঃ অনুষ্ঠানদ্বারা পরিপুষ্ট করিতেন, এবং ঐরূপে পরিপুষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মজীবন লাভের পর নির্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া সংযতমনে বহুকাল ধ্যানধারণা দ্বারাও যে বস্তু লাভ করা দুষ্কর মনে করিতেন, আজ আমরা সংস্কৃতভাষায় পূর্ব্বোক্তরূপ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাদির তো কথাই নাই, বাল্যকাল হইতে নানাকারণে শিথিলবীর্য্য হইয়া, একটু সামান্য চিন্তা করিতে হইলে অমনি মাথা গরম হইয়া উঠে, এরূপ মস্তিষ্ক লইয়া যতটুকু শাস্ত্রার্থবোধ সম্ভব হইতে পারে তাহাই বুঝিয়া, আবার যাহাও বা বুঝি তাহা কদাপি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়া যে, সেই দেববাঞ্ছিত পদ অধিকার করিতে উদ্যত হইতে পারি, ইহাতে কি আমাদের এককালে ধৃষ্টতা-প্রকাশ এবং সেই বন্দনীয় পদের মর্য্যাদার হানি করা হয় না? ফলকথা এই যে, পুরাকালে সুদীর্ঘ পরমায়ু, সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর, ধ্যানশীল মস্তিষ্ক, সংস্কৃত-ভাষায় অভিজ্ঞতা, ধর্ম্মানুকূল রাজশাসন, ধর্ম্মময় জীবন ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধাসত্ত্বেও ঋষিগণ যে বস্তুর তত্ত্ব নিগূঢ় ও দুজ্ঞেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমরা যে আজকাল এই মক্ষিকা-মশকাদির ন্যায়

ধর্ম্মপ্রতিকূল রাজ-শাসন, ধর্ম্মানুষ্ঠানহীন জীবন ইত্যাদি নানাবিধ অসুবিধাসত্ত্বেও সেই মোক্ষতত্ত্বকে এত সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে করিব যে, গুয়ে-গোবরা, কেলো-ভুলো, সকলেই ভগবদ্গীতার দুইটা শ্লোক আওড়াইতে পারিলেই, মুক্তিমার্গের অধিকারী হইবে ও মুক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, ইহা নিতান্ত বাতুলের যুক্তির অনুযায়ী বিচার ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় না।

একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি দুই ব্যক্তি এক নামের কোনও দ্রব্য বিভিন্ন মূল্যে ক্রয় করে; অথবা তাহার অন্বেষণের জন্য একজনের অপেক্ষা অন্যকে অধিক যত্ন, পরিশ্রম ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে লোকে সাধারণতঃ এই বলিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি অধিক মূল্যে ও অধিক পরিশ্রমে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হয়ত নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতারিত হইয়াছে, অথবা যে ব্যক্তি সুলভমূল্যে ও বিনাক্লেশে ঐ বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হয়ত খাঁটি বা আসল বস্তু চিনিতে না পারিয়া ঝুটা বা নকল বস্তু গ্রহণ করিয়াছে। মুক্তি পদার্থটির সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। হয় বলিতে হইবে যে, প্রাচীন ঋষিগণ বড়ই নির্ব্বোধ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তির জন্য ওরূপ অত্যধিক আয়াস পাইতে হইত, আর না হয় বলিতে হইবে যে, আমরা ওবিষয়ে কাণা, সুতরাং ঋষিদুর্লভ মুক্তিবস্তুটি না চিনিয়া সহজে যাহা করায়ত্ত করিতে চাহিতেছি তাহা আদৌ মুক্তিপদবাচ্য নহে। কিন্তু প্রাচীন ঋষিদিগের যে সমস্ত কীর্ত্তি শাস্ত্রাদিতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিতে সাহসী পুরুষ এ পর্য্যন্ত কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। কাজে কাজেই এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমারা যাহাকে মুক্তিপদ বলি তাহা আদৌ সেই দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-সেবিত মোক্ষবস্তু নহে।

মুক্তিমার্গের অধিকারী-নির্ণয়ের বাঁধাবাঁধি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মুক্তির স্বরূপ-জ্ঞান তাঁহাদের মতে অদ্বৈতজ্ঞানসাপেক্ষ। সুতরাং সেই পুরাকালীন ঋষিদিগের সাধনীয় মুক্তিবস্তুর স্বরূপ অবগত হইতে হইলে অদ্বৈতবাদাত্মক বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়া অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। কিন্তু সেই অদ্বয়জ্ঞানলাভের অধিকার, তাঁহারা যাহাকে-তাহাকে প্রদান করেন নাই। অধিকার-ভেদের কথা শুনিলেই আমাদের একটা বিরক্তির সঞ্চার হইয়া উঠে। আমরা মনে করি যে, যখন হাত, পা, নাক, চোখ ইত্যাদি সকলেই সমানভাবে পাইয়াছি তখন অদ্বয়জ্ঞানেরই বা সমান অধিকার কেন না থাকিবে? কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন দুগ্ধ ভিন্ন অন্য পদার্থ ভোজনে যেমন আমাদের অধিকার ছিল না, ক্রমে বয়োবৃদ্ধিসহকারে কত কি খাদ্যাখাদ্য-ভোজনের অধিকার জন্মিয়াছে; শৈশবাবস্থায় যখন 'চুষিলাঠিম' হাত হইতে বারংবার স্খলিত হইত, তখন যেমন আমাদের মুদ্গর-ক্রীড়ায় অধিকার ছিল না, পরে বয়োবৃদ্ধিসহকারে সেই অধিকার জন্মিয়াছে; বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়নকালে যখন সামান্য যোগ-বিয়োগের অঙ্ক বুঝিতে কঠিন বোধ হইত, তখন যেমন আমাদের কলেজ-ক্লাসের উচ্চ গণিত শিখিবার অধিকার ছিল না, বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে যেমন সে অধিকার জন্মিয়াছে,—এইগুলি যদি একটু অনুধাবন করিয়া দেখি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারি যে, অধ্যাত্ম-বিদ্যা- সম্বন্ধেও জ্ঞানবৃদ্ধির তারতম্যানুসারে অধিকারি-ভেদ থাকা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নহে। এই স্বাভাবিক নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ অদ্বয়জ্ঞানলাভের অধিকার আপামর সকলকেই প্রদান করিতেন না।

প্রাচীন ঋষিদিগের মতে যতদিন কোনও ব্যক্তি মুমুক্ষু না হন

দৃঢ়তাপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাঁহার উক্ত জ্ঞানলাভে অধিকার নাই। যদি আমরা বলি যে, যখন আমি পয়সা খরচ করিয়া বই কিনিতেছি ও পড়িতে চাহিতেছি তখন মুমুক্ষু অবশ্যই হইয়াছি। এরূপ উক্তির প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যতদিন তোমাদের ধনোপার্জ্জন-লালসা বলবতী রহিয়াছে, কামাদি রিপুগণ যতদিন প্রবলপরাক্রমের সহিত তোমাদিগকে পুত্তলিকার ন্যায় প্রতিনিয়ত পরিচালিত করিতেছে, ততদিন শুধু বই পড়িবার ইচ্ছা দেখাইয়া তোমরা কখনই বলিতে পার না যে, তোমাদের মোক্ষলাভের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা হইয়াছে; কারণ, মোক্ষেচ্ছা এবং ভোগবাসনা উভয়ে পরস্পর বিরোধী। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ঐ অবস্থা প্রাপ্ত না হই, ততদিন ঋষিদিগের মতে আমাদের অদ্বয়জ্ঞানে অধিকার নাই। এবং অধিকারী না হইয়া স্বেচ্ছামত একখানা বেদান্তগ্রন্থ লইয়া যদি আমরা পড়িতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, আমরা উহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিব না। আমরা যতই কেন আপনাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত মনে করি না, যতই কেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী হই না, তথাপি মুমুক্ষু না হইয়া বেদান্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কখনই উহার নিগূঢ়ার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না। কথাটা অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানীকে ভাল লাগিবে না, বুঝিতেছি—কিন্তু কি করিব, সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইলাম।

সংসারে সকল বস্তুরই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির কতকগুলি ক্রম ও প্রক্রিয়াবিশেষের আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বীজ হইতে কিরূপ ক্রমপরম্পরায় অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, মুকুল ও পুষ্প উদ্ভূত হইয়া পরিণামে ফলের উৎপত্তি হয়, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের পর সমুদ্রের জল সূর্য্যের উত্তাপে কিরূপে বাষ্পাকার ধারণ করিয়া শূন্যে উত্থিত হয় এবং বায়ুবেগে

সঞ্চালিত হইয়া পরিশেষে দেশদেশান্তরে গিয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়; আবার সেই সমুদ্রের জল শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যের উত্তাপবিহনে কেমন কঠিন হইয়া বরফের আকার ধারণ করে, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন: জীবজন্তুর জনন, মরণ, বর্দ্ধন ও পোষণসম্বন্ধেও কেমন এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির কতকগুলি ক্রম স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সেই ক্রমগুলি সকল সময়ে সকলের সম্বন্ধে একইরূপ লক্ষিত হয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে কারণবশতঃ জল বাষ্পাকারে পরিণত হইত বা যে কারণে বরফের আকার ধারণ করিত, এখনও সেই কারণে হইতেছে; বৃক্ষের ফল সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ক্রম অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইত এখনও সেই ক্রমানুসারে হইতেছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবজন্তুর জনন-মরণাদির যে ক্রমপরম্পরা লক্ষিত হইত, এখনও তাহাই হইতেছে। তবে শুধু বদ্ধজীবের মুক্তপুরুষে পরিণত হওয়ার ক্রমটাই তখনকার মত না হইয়া নূতন রকমের হইবে, এরূপ মনে করা যে সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত যিনি যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি ভাল করিয়া জ্ঞাত আছেন যে, তাঁহার ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে কেমন সেই বৃত্তি অবলম্বনের উপযোগী শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছে এবং যতদিন তিনি উপযুক্ত হন নাই ততদিন তাঁহাকে সেই কার্য্যকরণের অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। উকীলদিগকে ওকালতী পরীক্ষায়, ডাক্তারদিগকে ডাক্তারী পরীক্ষায়, কেরাণীদিগকে স্কুলের এণ্ট্রান্সাদি পরীক্ষায় অগ্রে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে, শিল্পী ও শ্রমজীবী-দিগকেও আপনাপন কার্য্যের উপযোগী শিক্ষালাভ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছে। যখন সংসারের সকল কার্য্যেই উপযোগিতা

কি অরাজকতা পড়িয়া গিয়াছে যে, সেখানে অধিকারবিধির কোনও মর্য্যাদা থাকিতে পারিবে না, যার যা খুসী তাই করিতে পারিবে ?

স্কুল-কলেজে যেমন জ্ঞানের তারতম্যানুসারে কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্রেণীর উপযোগী জ্ঞানলাভ প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া যখন বালকগণ সেই শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন যেমন তাহারা উচ্চতর শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তথাকার উপযুক্ত জ্ঞানোপার্জ্জন আরম্ভ করে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপার্জ্জন সম্বন্ধেও কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে, এবং এক এক শ্রেণীর উপযুক্ত জ্ঞানের সীমাও নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং যখনই কেহ এক শ্রেণীর জ্ঞাতব্য বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে পারেন, তখনই উচ্চতর শ্রেণীর জ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। যেমন রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তির উপযোগী পুস্তক অধ্যয়নের পূর্ব্বে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তেমনই "অদ্বয়জ্ঞানাত্মক বেদান্তশাস্ত্র" পড়িবার পূর্ব্বে "মুমুক্ষুত্ব" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক; আবার এম্-এ ক্লাসে পড়িবার পূর্ব্বে যেমন একে একে বি-এ, এফ্-এ, এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তেমনই মুমুক্ষুত্ব ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে "শম-দমাদি" তৎপূর্ব্বে "বৈরাগ্য" এবং তৎপূর্ব্বে "বিবেক" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক; আবার এণ্ট্রান্স-ক্লাসে পড়িবার পূর্ব্বে যেমন স্কুলের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তেমনই "বিবেক" ক্লাসের যোগ্য হইবার পূর্ব্বে বিহিতবিধানে গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা "চিত্তশুদ্ধি"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

ফলতঃ, অগ্রে চিত্ত-শুদ্ধি-সাধন না করিয়া এবং তৎ-পশ্চাৎ-সাধ্য বিবেকাদি সাধনচতুষ্টয়কে স্বভাবগত না করিয়া, শুধু বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই ঋষিবোক্ত অদ্বয়জ্ঞানসাপেক্ষ মোক্ষের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। স্বল্পবিদ্য বালক একখানা উচ্চশ্রেণীর গণিত-গ্রন্থ

সম্যক্ আবৃত্তি করিতে পারিলেও, যাবৎ সে প্রাথমিক গণিতগ্রন্থগুলির প্রত্যেক প্রকরণের অঙ্কসমূহ কাগজে-কলমে না কষিবে, তাবৎ সে যেমন উচ্চগণিতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, আমরাও পূর্ব্বোক্তরূপ সাধনবিহীন হইয়া শুদ্ধ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ঋষিপ্রোক্ত মুক্তিকে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীসত্যজ্ঞান শর্ম্মা।

বোবার কথা।

চিরবধির-শিক্ষাকাল।

বর্ত্তমান যুগ পৃথিবীর এক উন্নতির যুগ। বর্ত্তমানের এক বৎসর ভূতপূর্ব্বের দশ বৎসরের সমান। সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও নৈতিক জগতে উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সর্ব্বত্রই এক নূতনতর আলোকচ্ছটা প্রভাসিত হইতেছে। পৃথিবী সর্ব্বত্রই এই আলোকে উদ্ভাসিত। স্বল্পাধিক সর্ব্বত্রই এই আলোকের জ্যোতি বিকীরিত হইয়াছে। আমাদের চিরপূজনীয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষও এই আলোকলাভে বঞ্চিতা হয়েন নাই। ভারতবর্ষে মূক-বধির-শিক্ষার অভ্যুদয় বর্ত্তমান যুগের উন্নতির একতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত, ভারতের কোনও শাস্ত্র বা পুরাণে দুর্ভাগ্য মূক-বধিরদিগের শিক্ষাকল্পে কোনও অনুষ্ঠানের ইতিহাস পাওয়া যায় না। পরন্তু ইহারা চিরকালই ...

মূক-শিক্ষা প্রণালী ও পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে কেবল যে মূক-বধির বালক-বালিকাগণই উপকৃত হইতে পারে তাহা নহে—ফলে ইহার সর্ব্ববিধ শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতির যথেষ্ট উপকার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেহেতু শ্রুতিমান বালক-বালিকাগণের শিক্ষা-কল্পে, শিক্ষণীয় বালক-বালিকাগণের স্বভাবজ মানসিক গতির প্রতি শিক্ষকের বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকিলেও কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু বধিরদিগের শিক্ষাদান করিতে যাইয়া শিক্ষক যদি ছাত্রগণের মানসিক গতির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য ও বিফল মনোরথ হইতে হইবে। প্রত্যুত ছাত্রের মানসিক গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাদানের প্রয়াসফলে লোকশিক্ষার নানাবিধ তত্ত্ব ও প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে।

মূক-বধির কথাটা আমাদের দেশের অতি প্রচলিত কথা। সাধারণের ধারণা মূক হইলেই তাহাকে বধির হইতেই হইবে, মূকত্বের সহিত বধিরতার সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একটি বিষম ভ্রম। আমরা কি প্রকারে কথা কহিতে শিক্ষা করি? বাল্যকাল হইতেই যদি আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি ও খেলার সাথী ও প্রতিবাসিগণের সহিত মিলিত না থাকিতাম ও কথা দ্বারা ভাবের আদান প্রদান হয় বুঝিতে না পারিতাম তাহা হইলে আমরা কি শিক্ষা করিতাম? অবশ্য কোন না কোন উপায়ে মনোভাবের প্রকাশ আবশ্যক হইতই হইত। তখন তাদৃশ অবস্থায় প্রকৃষ্ট উপায় কি? বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে সঙ্কেত। বধির বালক স্বীয় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়াও তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সে অপরের ওষ্ঠস্পন্দন দর্শন করে

বুঝে না, কারণ সে কথা শুনিতে পায় না কাজেই কিছু বলিতেও পারে না। শ্রবণ ও কথনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আমরা জন্মাবধি যে ভাষা শুনি তাহাই আমাদের মাতৃভাষা। আমরা জন্মাবধি বঙ্গভাষা শ্রবণ করি ও বলি ও তাহাতেই আমাদের মনোভাবের আদান প্রদান করি, কিন্তু আমরা ভাষা জানিনা বলিয়া আমাদিগকে বোধ হয় মূক বলা যাইতে পারে না। যাহারা কোনও দিন কোন কথাই শুনিল না তাহারা যে মূক থাকিবে তাহাই স্বাভাবিক। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যাহার শ্রবণশক্তির অভাব সেই মূক হয়; কারণ সে কিছু শুনিতেও পায় না কাজেই বলিতেও পারে না। কিন্তু যাহার বাক্‌শক্তির অভাব সে বধির হইবার কোনও হেতু নাই। অপিচ মূকবধিরদিগের মধ্যে অনেকেরই বাক্‌যন্ত্রের কোনও দোষ পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু বাক্‌যন্ত্রের বিকলতাবশতঃ যাহারা মূক তাহারাও প্রায় কেহই বধির নহে। অতএব সাধারণতঃ বধিরতাপ্রযুক্ত মূক-দিগকে মূক না বলিয়া কেবল চিরবধির বলাই যুক্তিসঙ্গত। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-প্রভাবে চিরবধিরেরা প্রায় কেহই আর মূক নহে। শ্রুতিমান ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহারাও শিক্ষার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতেছে। চিরবধিরদিগের শিক্ষাপ্রদানকল্পে বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। অত্রত্য বধির বিদ্যার্থিগণ বধিরবিদ্যালয়ে অনেকস্থলে মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতঃ অপর শ্রুতিমান বিদ্যার্থিগণের সহিত উচ্চবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বিবিধ ভাষা, বিজ্ঞান ও দর্শনাদিশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন। তাঁহারা আমাদের দেশের মত কথার কাঙ্গাল বা অনুগ্রহের পাত্র নহেন। শ্রুতিমান ব্যক্তিগণ শ্রুতিশক্তির প্রভাবে যেমন সকল কথা বুঝিতে পারে, বধিরগণও তদ্রূপ দৃষ্টিপ্রভাবে সকল কথাই বুঝিতে

তাহারা কথা দেখিতেছে কি শুনিতেছে। শিক্ষাদ্বারা মূক-বধিরগণ কতদূর শিক্ষিত ও উন্নত হইতে পারে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয় তাঁহার মূক-শিক্ষাগ্রন্থে তাহার কয়েকটী জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে অন্ধ ও বধির বালিকা কুমারী হেলেন কেলার কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে মূক-শিক্ষার পাঠকগণের নিকট তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহাদিগের শিক্ষার উপায় বা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে সাধারণতঃ বালকবালিকাদিগের শিক্ষা কখন হইতে আরম্ভ হয় সে সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা উপযুক্ত।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধিই কখন্ হইতে শিক্ষালাভ করিতে থাকে ও কোন্ সময়ে কি উপায়ে কি শিক্ষা করে তাহার নির্দ্দিষ্ট কোনও মত প্রচারিত নাই, তথাপি শিশু যখন জন্মাবধিই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে তখন যে জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ হইতেই তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির ক্রমশঃ বিকাশ ও তৎসহ শিশুর কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানেরও উন্মেষ হয় তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অপিচ ডারউইন, স্পেন্সার, ও পিরেজ প্রভৃতি মনস্বিগণ স্বীয় গবেষণা দ্বারা শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার বিষয়গুলি অনেক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণের মতে প্রাক্তন জন্মবিদ্যার আভাসে বর্ত্তমান জন্মে মানবের স্বভাব গঠিত হয়। পূর্ব্ব জন্মে যাহা অভ্যাস, বর্ত্তমান জন্মে তাহা স্বভাবরূপে পরিণত হয়। জন্মাবধি কি প্রকারে কোন সময় হইতে শিশুর ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তির আরম্ভ হয় ও কি প্রকারে তাহা অনুমিত হইয়া থাকে, বোধ হয় তাহার সামান্য আভাস এস্থলে বাহুল্য হইবে না।

বহিঃপ্রকৃতি ও সমাজ আমাদের শিক্ষার দুইটী প্রধান উপাদান।

জন্মাবধি জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত ইহাদের নিকট শিক্ষালাভ করি। অবশেষে ইহাদের শিক্ষায় বিরক্ত হইয়া নিজের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করি, এবং আত্মদৃষ্টিজনিত অনেক শিক্ষালাভ করতঃ মানব ক্রমশঃ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই চীৎকার করিতে থাকে; এবং তাহাকে অগ্নিসেক ইত্যাদি দ্বারা শান্ত হইতেও দেখা যায়। ইহা হইতেই জরায়ুর আভ্যন্তরীক উত্তাপ অপেক্ষা বহির্বায়ুর শৈত্যানুভব শিশুর ক্রন্দনের কারণ অনুমান করা যায়। এবং ইহাও অনুমিত হয় যে, জন্মাবধিই শিশুর স্পর্শানুভব অপরাপর ইন্দ্রিয়-কার্য্য অপেক্ষা প্রাথমিক। আতুরঘরে যখন শিশু কাঁদিতে থাকে তখন প্রায়ই দেখা যায়, হয় ক্ষুধা না হয় মশকাদির কামড় বা শৈত্যানুভব তাহার ক্রন্দনের কারণ। এবং ইহাও দেখা যায় যে, তাহার ক্রন্দনের কারণ অপনোদিত হইলে সে আর ক্রন্দন করে না, স্থির হইয়া কেবল নিদ্রা যায়। এই প্রকারে কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইলে শিশুর অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়। এই সর্ব্বপ্রাথমিক অবস্থায় আমরা দেখিতেছি, শিশু জন্মাবধিই তাহার মনোভাব প্রকাশের উপায় করিয়া লয়, সেইটী তাহার ক্রন্দন। যখনই কোন বিষয়ের অভাবানুভব করে তখনই ক্রন্দন করিয়া তাহা ব্যক্ত করে ও সেই অভাব পূর্ণ হইলে সে শান্ত হয়। দ্বিতীয়, সুখ ও অসুখ অনুভব। শিশু উত্তাপ ভালবাসে, শৈত্য ভালবাসে না। মশকদংশনে কষ্টানুভব করে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে জন্মাবধিই মানবকে স্পর্শেন্দ্রিয়-জনিত সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা ও তৎসমুদয় ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা ও উপায় লইয়া জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর দুই তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশু কেবল আহার করে ও নিদ্রা যায়। এই সময়ের মধ্যে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল

আলোক দৃষ্টে আনন্দানুভব করে। খুব সন্নিকটবর্ত্তী উজ্জ্বল অগ্নি বা প্রদীপের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে! ইতঃপূর্ব্বে তাহার দৃষ্টিশক্তির কোন কার্য্যই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রসূতি এবং ধাত্রীদিগের নিকট ইহাও শুনা যায় যে, প্রায় এই সময় বা ইহার অব্যবহিত পরে শিশুর শ্রুতিশক্তিবিকাশের প্রারম্ভ হয়। শিশুকে শ্রুতিসুখকর শব্দ শ্রবণে তৃপ্ত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, জন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময় হইতেই ক্রমশঃ শিশুর ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ আরম্ভ হয় ও তৎসঙ্গে তাহার মস্তিষ্কেরও স্ফূরণ হইতে থাকে। এই মস্তিষ্ক ও অনুভবশক্তিনিচয়ের ক্রমবিকাশ ও তজ্জনিত যে জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ হয়, তাহাকেই শিশুর প্রাথমিকশিক্ষার ভিত্তিভূমিস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রকৃতি সর্ব্বদাই কর্ম্মনিরতা। শিশুর যেমন যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ক্রমশঃ পুষ্ট ও দৃঢ় হইতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই তাহার মানসিক শক্তিনিচয় ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে। আড়াই মাস তিন মাসের শিশু নিতান্ত পরিচিত কয়েকটি জিনিসের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে দেখা যায়। মাতৃস্তনবৃন্ত শিশুর একটি অতি পরিচিত জিনিস। অনেক শিশুকে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, সে এই বয়সে স্বীয় মাতৃস্তনের পরিবর্ত্তে অপর কোনও রমণীর স্তন মুখে লয় না বা লইতে চাহে না। এই সময়েই শিশুর দূরত্ব জ্ঞান অল্প অল্প জন্মিতে দেখা যায়; শিশু জানে না যে, হস্ত প্রসারণ করিয়া কোন জিনিস ধরিতে পারা যায়, অথচ নিকটস্থ কোন কোনও বস্তুলাভের আশয়ে হস্ত অগ্রসর করিয়া দেয়। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, সে বুঝিতে পারে তাহার অভিলষিত বস্তু তাহার শরীরলগ্ন নহে তাহা কিছু দূরে। এপ্রকারে ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর শারীরিক

অক্লান্ত উদ্যোগে সে অপরের ন্যায় কার্য্য করিতে চেষ্টা করে ও অনুকরণ দ্বারা অপরের ন্যায় তাহার ইচ্ছা ও অনুভব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকে। সে আদর ও অনাদরের পার্থক্য বুঝিতে পারে, ক্রোধ ও ভালবাসা বুঝিতে পারে, ইহাও বুঝে যে তাহার হাস্য, রোদন ও চীৎকার ইত্যাদি অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও তাহার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। সেইজন্যই শিশু তাহার অভিলষিত লাভের নিমিত্ত হাস্য-রোদনাদির কোনওকোনও উপায় আকাঙ্ক্ষা করে। যদিও সে কথা কহিতে পারে না তথাপি সে বাক্য ও ভঙ্গি দ্বারা অপরের মনোভাব অতি অল্পপরিমাণে বুঝিতে পারে। সে তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও ধাত্রী প্রভৃতি নিকট-আত্মীয়গণের স্বর চিনিতে পারে ও চেহারা, স্পর্শ ও শব্দানুভব দ্বারা একের সহিত অপরের পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম হয়।

শ্রুতিমান বালকবালিকারা প্রায় ৮।৯ মাস বয়সের সময় হইতেই কথা কহিতে শিক্ষা করে। এই সময়ে অপরের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে ও তদনুকরণে নিজের কণ্ঠ হইতে অনুরূপ স্বরনির্গমনের প্রয়াস পাইতে থাকে। এবং এই স্বরনির্গমনের প্রয়াসফলস্বরূপ অস্পষ্ট তা-তা, দা-দা, গু-গু প্রভৃতি শব্দে পিতামাতার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে। কথা কহিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্ব হইতেই বস্তুর নাম আছে, শিশু তাহা বুঝিতে পারে। যদিও নামের সহিত বস্তুর কোন সাদৃশ্য নাই। সে এইমাত্র বুঝে, বাবা বলিলে তাহার পিতা ও মা বলিলে তাহার মাতাকেই বুঝায়। বস্তুর নাম শিক্ষার পূর্ব্বেই সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান তাহার জন্মে। শিশু, সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন কথা দ্বারা প্রকাশ করিতে দেখে। তদনুসারে সেও

ও যখন ভাবভঙ্গিতে বুঝিতে পারে যে, সে যে উদ্দেশ্যে যে শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। সে অবিরত সেই শব্দটি উচ্চারণ করিতে থাকে ও নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট নামে ডাকিতে থাকে। ক্রমে যতই তাহার ভাষার সম্পদ বাড়িতে থাকে, ততই সে অপরাপর বিষয় ও ভাব সকল কথা দ্বারা ব্যক্ত করিতে থাকে। শিশু এই প্রকারে কথা বলিবার সামর্থ্যানুভব করতঃ নিরতিশয় আনন্দিত হয়। সে প্রথমতঃ এই উপায়ে বাক্যকথনব্রতে দীক্ষিত হয়। দেখা যাউক শিশুর এই প্রাথমিক ভাষাশিক্ষার উপাদান কি কি?

১। শিশুর নিরন্তর প্রত্যক্ষীভূত বস্তু, বিষয়, ব্যক্তি ও কার্য্যাদি।

২। ঐ সমুদয়ের অন্যকর্ত্তৃক উচ্চারিত নাম শ্রবণ।

৩। ঐ সকল নাম ও বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ।

৪। ঐ সকল নাম ব্যবহারে কৃতকার্য্যতা। এই সকল উপাদান লইয়া শিশু বিস্তীর্ণ অনুকরণীয় ও অনুশীলনযোগ্য ক্ষেত্রে উপনীত হয় ও ক্রমশঃ কৃতকার্য্য হইতে থাকে।

কেবল শ্রুতিশক্তির সাহায্যেই শ্রুতিমান বালকবালিকাগণ শিক্ষালাভ করে না, তাহারা দৃষ্টিরও সাহায্য গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য শ্রুতিই ভাষাশিক্ষার প্রধান সহায়, যেহেতু দৃষ্টিশক্তিবিহীন অন্ধ বালকবালিকারা অতি শৈশবেই ভাষা শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়। পরন্তু দৃষ্টিও ভাষাশিক্ষার অনেক সাহায্য করে। শিশু প্রায় সর্ব্বদাই বাক্যকথনসময়ে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মুখ লুকাইয়া কথা কহিলে শিশু তাহাতে বিরক্ত হয়, এমন কি, আবরিত মুখ হইলে তাহার আবরণ উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। শিশু অত্যন্ত মনোযোগসহকারে বক্তার ওষ্ঠাধরের কম্পন অবলোকন করে; কিন্তু ইহা দ্বারা তাহার বাক্যকথনের অতি অল্পমাত্রই সহায়তা হয়।

কারণ, ওষ্ঠাধর সঞ্চালন দ্বারা কেবলমাত্র কয়েকটি ওষ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণ-স্থান জ্ঞান হইতে পারে মাত্র। শিশু কিন্তু তাহার শ্রুত শব্দগুলির পুনরুক্তির চেষ্টা দ্বারা ও মুখাভ্যন্তরে দন্ত, জিহ্বাদির স্পর্শানুভব দ্বারা ও স্বীয় শ্রুতির সাহায্যে উচ্চারিত শব্দের যাথার্থ্য ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে শব্দ ঠিক উচ্চারিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিহ্বা ও ওষ্ঠাদির স্থান পরিবর্ত্তন করে ও শব্দ ঠিকরূপে উচ্চারিত হইলে আবৃত্তি দ্বারা তাহা অভ্যাস করিয়া লয়। এই প্রকারে শিশু পিতামাতার সহিত প্রথম প্রথম কথা দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, সর্ব্বদা মাতাকে প্রশ্ন করে, মাতাও সানন্দচিত্তে প্রথমতঃ ছোট ছোট কথায় অতি পরিচিত বস্তুগুলির নাম শিক্ষা দেন, ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর গান গাহিয়া শিশুর আনন্দবর্দ্ধন করেন। শিশু, মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয় কুটুম্বগণের নিকট হইতে ও খেলার সঙ্গিগণের নিকট হইতে নূতন কথা কহিতে ও নূতন ভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করে। শ্রুতি-মান বালকবালিকাগণ ঈদৃশ উপায়ে জীবনের অতি প্রথম হইতেই নানাবিধ শিক্ষার সহিত ভাষা শিক্ষা করিতে থাকে, কিন্তু বধির বালক-বালিকাগণের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। কারণ, যে শ্রুতিসাহায্যে শ্রুতিমান বালকবালিকারা কথা কহিতে শিক্ষা করে, চিরবধিরদিগের সেই শ্রুতিদ্বার রুদ্ধ।

[ক্রমশঃ]

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক।

সুখে।

(১)

আজি যদি বলি আমি তোমারে চাহি না স্বামি
যাবত জীবন,
যা' তুমি দিয়াছ মোরে দেখিয়াছি আঁখি ভ'রে—
পূর্ণ আজি মন,—
হেলা ভরে তবু তুমি আমার মানস-ভূমি
করোনা শ্মশান,
ভুলায়ে দি ‹না মোরে হেরেছি যা' আঁখি ভ'রে
সে তোমা‹রি দান !

(২)

এ আবেগ হ'বে গত আসিবে পূর্ব্বের মত
অনন্ত তিয়াষ,—
ভাণ্ডার ভরিয়া থাও— আরও দাও আরও দাও
মিটাইয়া আশ !
জলরাশি ল'য়ে নদী ছুটিতেছে নিরবধি
সাগরের মাঝে,
নদী সে ফুরায়ে যায়— অপূর্ণ সাগর চায়
পুনঃ কোন্ লাজে !

(৩)

আমার এ চিত্তমাঝে উঠিবে দিবস সাঁঝে
যে আকাঙ্ক্ষা রোল,
হে আমার অন্তর্যামি, নীরবে কহিব আমি

অপূর্ণ রেখোনা তারে　　　　জীবনের এই পারে
দিও সফলতা,
যেন এই বক্ষোমাঝে　　　　শেষদিনে শুধু রাজে
আশ্বাসের কথা।
মোহ নয়—ভ্রান্তি নয়—　　　　হইয়াছি নিঃসংশয়
জীবনে মরণে,
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে　　　　বিশ্বাসের হেমডোরে
অনন্ত বন্ধনে ;
ভুলে যদি কোনও দিন　　　　দীপশিখা হয় ক্ষীণ
অন্ধ গৃহকোণ,—
সহসা বিদ্যুৎবেগে　　　　শত বজ্র উঠে জেগে
আলোকি গগন !

(৫)

পাপে তাপে এ জীবন　　　　রাখিয়াছ অনুক্ষণ
হে আমার স্বামি,
নতশিরে দুঃখ বহি'　　　　রহিয়াছি সব সহি'
সারা দিবা যামি ;—
হৃদয়ে জেনেছি স্থির　　　　ধুলিমাটি পৃথিবীর
যদি লাগে গায়,
তব পাশে যাব নেবে　　　　স্বহস্তে ধোয়ায়ে দেবে,—
ভয় কিবা তায় !

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

গ্রাম্য ছড়া।

ও

প্রাদেশিক বাঙ্গালা।

বাঙ্গালির মাতৃভাষা বাঙ্গালা। ইহা বাঙ্গালিজাতিসাধারণের খাঁটি নিজস্ব। এই ভাষার বহু স্থানে বহুমূর্ত্তি; একপ্রদেশের লোকে অন্যপ্রদেশের গ্রাম্য ভাষা বুঝিতে অক্ষম। শিক্ষিত সমাজে এবং ভদ্রসাধারণে যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহা উচ্চ সাহিত্যের ভাষা। বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য ভাষার ন্যায় ইহার বিস্তৃতিলাভ অদ্যাপিও ঘটে নাই। উর্দ্দু, পারসি, হিন্দি, সংস্কৃত এবং ইংরেজি যেমন সমগ্র ভারতব্যাপী, বাঙ্গলা ভাষা তদ্রূপ হয় নাই অথবা তাহার চালকগণ অদ্যাপি সে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু ভাষাজননীর পুত্রকন্যাগণের মধ্যে তাহার প্রভুত উন্নতি ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, বঙ্গভাষা ইংরেজগণের ভারতরাজ্য-গ্রহণের পূর্ব্বে যে আকারে প্রচলিত ছিল, তাহা ইংরেজ রাজ্যাবলম্বনের প্রথম যুগে আবার অন্যরূপে প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবসাহিত্যপ্রচারযুগে বঙ্গভাষা গদ্য সাহিত্যে অথবা সাধারণ কথিত বাক্যে তত সৌষ্ঠব সম্পন্ন ছিল না। তৎকালে বাঙ্গালিসাধারণের ভাষায় হিন্দি, পারসি, উর্দ্দু, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত বাক্যের প্রাধান্য ছিল। আবার ইংরেজি ভাষার প্রথম প্রচলন-সময় হইতে তাৎকালিকের শিক্ষিতগণের দ্বারায় ইংরেজির প্রাবল্য লক্ষিত হইতে লাগিল।

এইরূপ বহুভাবে বাঙ্গালাভাষা ব্যবহৃত হইয়া রাজা রামমোহন

অত্যুন্নতাকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি প্রাদেশিকতার বিভিন্নতা যথেষ্ট আছে। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা পশ্চিমবঙ্গ বুঝে না, পশ্চিম-বঙ্গের চলতিকথা উত্তর-পূর্ব্ব-বঙ্গ বুঝিতে পারে না। আবার দক্ষিণ-বাঙ্গলার কথা পূর্ব্ব-পশ্চিম বাঙ্গলা বুঝিতে পারে না। এইরূপে একপ্রদেশের ভাষা অন্যপ্রদেশে দুর্ব্বোধ্য; কাজেই আমরা বলিতে বাধ্য যে, বঙ্গভাষা এখনো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

সুখের বিষয় যে, এইরূপ ভাষা-বিভিন্নতা লইয়াও আটকোটি বাঙ্গালি এক অখণ্ড বঙ্গদেশে একভাষী একজাতি বলিয়া পরিচিত আছে। এইতো কত ঝঞ্ঝা, কত উৎপাৎ, কত আপদবিপদ বঙ্গদেশের শ্যামল হৃদয়ের উপর দিয়া আসিল, চলিল, রহিল, তথাপি বাঙ্গালিজাতি এক মহাজাতি। উক্ত সাহিত্যই এই মহাসম্মিলনের জনয়িতা। লিখিত ও পঠিত ভাষা এক বলিয়া আমরা অদ্যাপি রাজকীয় দ্বিধাকার্য্যে এক অদ্বিতীয় মহাজাতি বলিয়া জগতে পরিচিত আছি। এইরূপ সাংঘাতিক আঘাতেও যখন আমরা সজীব আছি, তখন আমাদের উচিত যে, প্রাদেশিক ভাষার মিলনে এক মহা অদ্বিতীয় ভাষার প্রচলন করিয়া আমরা আমাদিগের ভাষা-জননীর মহাবিস্তৃতি সংসাধিত করি। এই কার্য্যে ছোট বড় সকল সাহিত্যিকগণই কার্য্যকরী গুণে আকর্ষিত হইলে তবে কার্য্য সহজ হইয়া আইসে। সাহিত্যালোচনার একভাষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যাহার যেমন শক্তি তিনি তেমনি ভাবে কার্য্য করিলে বঙ্গভাষার প্রাদেশিক বিভিন্নতা বিদূরিত হইতে পারে।

এই মহাকার্য্যসাধনোদ্দেশে আমরা সাহিত্য-পরিষদ এবং সাহিত্য-সভার সভ্যগণের নিকট অনেক আশা রাখি। প্রাদেশিকতা আলোচনা করিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাখরগঞ্জের কথা কলিকাতা, নদীয়া,

দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। অনেকেরই জানা আছে যে,—"বাঙ্গাল মাঝি" একরূপ ভবকর্ণধার, ইহার কথায় জীবনের অনেক রহস্য প্রকাশ-অপ্রকাশ থাকে। একদিন কোন স্থানে ঘটনাক্রমে শ্রাবণের তুফানে পড়িয়া মাঝির মুখে শুনিয়াছিলাম যে "কর্দ্দাজি হুপানে পাণিতো কদরাইছে হালিতো পাণি পালাম না। অ বাবু ফাল দিয়া ডগর নিবু ডর ক্যান্ হুপানে হজর কল্লাম। কৈমাবের তনসিয়া বোলি আমেতো থাম্মা হালাম হরিবোল হরি।" আমিতো শুনিয়াই অবাক। আমার সঙ্গী রাণাঘাট-নিবাসী হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্র নাথ রায় হাসিয়া অস্থির হইলেন। অনেক কষ্টে মাঝির কথার মর্ম্ম বুঝিয়া নৌকার ছাদে বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে বলেশ্বর পাড়ি দিলাম। আমাদের ঘামদিয়ে জ্বর ছাড়লো ; তখন মাঝির সঙ্গে অনেক-রূপ আলাপে বরিশালের গ্রাম্যভাষা শিখিতে লাগিলাম। এইজন্যই বলি প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা না হইলে বাঙ্গালি বাঙ্গালির কথা কিছুই বুঝিতে পারে না।

বাঙ্গালি বাঙ্গালির ভাষা বুঝিতে না পারিলে জাতীয় একতার মূলে মহা অন্তরায় উপস্থিত হয়। আমাদের মাতৃভাষার আরো উন্নতি চাই। প্রাদেশিক ভাষার বিভিন্নতা এতদূর গড়াইয়াছে যে, যে পশ্চিম-বঙ্গ শিক্ষাবিষয়ে অন্য প্রদেশ হইতে উন্নত হইয়াছে সেই অংশের গ্রাম্য-ভাষা কাটোয়া, বাঁকুড়া, রাজসাহী, ইত্যাদি জেলার লোকে বুঝিতে পারে না। এমন কি যাহার সার্থক লেখনি বঙ্গভাষায়যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, সেই ব্যাসপ্রতিম বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি নৈহাটি প্রদেশের ভাষা আমরা অদ্যাপিও বুঝিতে পারি না। কাঁঠালপাড়ার একটি বালিকা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিল যে "আপনার বাড়ি খেতে যাবো কি ? পাটুখানা সঙ্কুতে বেধে গেল"। ইহা শুনিয়া

পর ফরিদপুরের দক্ষিণভাগও বরিশালের উত্তরভাগের লোকে এক অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করে। যথা "ওমরদো হাঙ্গা দিন কারের পর খারাইয়া আছ কিলাগো। কুলোবধূ বারকরছো কি ঠ্যাকনা দিবে।" বলি শিক্ষিত পশ্চিম-উত্তর-মধ্য-দেশবাসী বাঙ্গালিভায়া ইহা তোমার জ্ঞানে পৌঁছিল কি?

ইহার পর আর একটা কথা আবার প্রসঙ্গাধীন মনে পড়িল। বঙ্গের রসিক কবি নাট্যকার মৃত রায় দীনবন্ধু বাবু তাহার সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছেন যে—

"কাটোয়ার কাষ্ঠ ভাষা কণ্টকের ধার
মেয়ে বলে বনিতায় ওকারে আকার।"

অর্থাৎ কাটোয়ার ভাষা যেন নীরস কাষ্ঠবিশেষ। তথাকার কৃষক, কবিগণ যে সকল গ্রাম্য কবিতা প্রস্তুত করিয়াছে তাহা অন্তদেশীয় কৃষকগণ তো দূরের কথা ভদ্রলোকেও বুঝিতে পারে না। ঐ অঞ্চলের একটি গ্রাম্যগীতি সংগ্রহকালীন আমি কলিকাতাবাসিনী ঝিগণের নিকট শুনিয়াছি এবং একটি চাকুরে ভদ্রলোকের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার মুখে শ্রুত আছি যে—

১। গাও কল্লো মাও কল্লো কঁড়ে রাড়ি আনা
ভাতারশালে কাপড় কাঁচে বরের নাহি জানা।
২। মাকড়ি লবঙ্গ বালা পুঁঠি তাবিজ বাজু কাণ
মারবো খ্যাংরা চটিজুতা পড়বে খান খান।
৩। ঘরজামায়ের তিনটে পা শালার কানে টুঁই
শ্বশুর শাশুড়ি পেয়ে বিন্দে নোনদ ঝুই মুই।
৪। আগুন বেগুন হাট বাটে হাঁড়ি কোণে লুই
চপড় থুয়ে নপড় মাগি সাপড়ো কাঠে রুই।
৫। আঠে কাটে পাঁঠা বাঁন্ধা ভোনার ঝিয়ে মাসি

বলি পাঠক ভায়া ইহার কিছু মর্ম্মগ্রহণ হইল কি ? গ্রাম্যকবিতা-গুলির অর্থবোধ হয়েছে কি ? তাহার পর বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লি-গ্রামের গ্রাম্য কবিতা সংগ্রহ জন্য আমি যখন খাঁটি রাঢ়দেশীয় লোকের তত্ত্ব লইতেছিলাম তখন একটি অর্দ্ধ গৃহিণী, অর্দ্ধ-পরিচারিকার কাল মিশ্‌মিশে মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ঐ অঞ্চলের স্ত্রীলোকমাত্রেই গ্রাম্যছড়া আর চণ্ডীগীতি জানে। এখন সময় নাই তাই একটি সামান্য ছড়া শুনিলাম, তাহা দ্বারা এই প্রবন্ধের উপকার ভিন্ন আমার গ্রাম্যকবিতা-সংগ্রহকার্য্য নিষ্পন্ন হয় নাই।

"ছাদন তলায় লোড়া মুড়ে জামাই শালা বোদে
নাপিত এলো চেলির রংএ সাবল দিদি খোদে।
ঐযে—আলু থালু বাগনাপাড়া বরের ঘানি রোগনা
কোনের ছায়া পাতি লাগি থড়ের টেমো টোমনা।
ঝুণুঝুণু লাটু মাটু বাজনা মাকড়ি ঝিনে ঝি
পান্তা ভাতে বেগুণ পোড়া তপ্ত ভাতে ঘি।" ইত্যাদি।

এখন আসুন দেখি সাহিত্যরথিগণ ইহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিলেন কি ? ইহার পর আমার জন্মভুমি "সোণার যশোহরে"র কোন কোন অংশের গ্রাম্যভাষার উদাহরণ দিয়া এই অংশ শেষ করিব। যশোহর জেলায় চারিরকম ভাষা প্রচলিত। আমার জন্মভূমি নড়াইল মহকুমায় সাধারণত কথার শেষাংশে একটা ধাক্কা দিয়া কথা বলা হয়। আর অনেকগুলি প্রচলিত দ্রব্যের কিরূপ একটা অদ্ভুত নাম ব্যবহার করা হয়। যথা—

হাৎনের উপর পাতা মান্দুর দেখ্‌তি বুজি পাওনা
ঘাইরে ঘাই ধ্যালা মারে দিনিক্যান উগ্‌তি বুজি দাওনা।

আবার ঝিনাইদহা উপবিভাগে নলডাঙ্গা অঞ্চলে দ্বিগুণ স্বর যোগে

ঘোষের ঘড়া কাকে নিয়ে দড়া দিয়ে বাঁধছে
কুলে গোরু সানকি খায় ক্যামন যেন ঠ্যাকছে।

আবার মাগুরা মহকুমার কথার সুর অতিকদর্য্য। ইহারা চলতি কথায় বলে যে—

অত ঘাপান ঘাপাস্‌নে লো বউ
ছাগলেতে খাবি ঘাস বাঘের * * কেউ।

তারকাচিহ্নিত কথাটি অতি অশ্লীল ইহা এই অঞ্চলের চলতি কথা। এইরূপ শব্দ ব্যবহারে এদিকে ভদ্রলোকেও লজ্জাবোধ করেন না। ইত্যাদি।

এইরূপভাবে বঙ্গভাষা বিভিন্নমূর্ত্তিতে প্রচলিত গদ্য পদ্য সমস্তরূপ সাহিত্যেই এই প্রাদেশিক বিভিন্নতা প্রচলিত আছে। পুরাতন বঙ্গের চলতি পুরাতন সাহিত্যকথন শুনিলে নব্যবঙ্গ হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া উঠিবেন ইহা নিশ্চয়। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে উচ্চ সাহিত্যের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু প্রাদেশিক সাহিত্য আলোচনা করিলে যাহা অনুমিত হয় তাহার একটা কিছু হেতু শ্রেস্ত চাই।

প্রত্যেক জেলাতে চলতি কথায় বস্তু, কার্য্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদি সকল অবস্থায়ই একটা কেমন বিভিন্ন ভাব আছে। যাঁহারা একটুকু তলাইয়া বুঝিয়াছেন তাঁহারা স্পষ্টই অনুমান করিতে পারেন যে, এই প্রাদেশিকতা হইতেই অখণ্ড বঙ্গভূমির অনেক স্থানে প্রকৃত জাতীয়তাবোধক একপ্রাণতা আসিতেছে না। প্রত্যেক দেশের লোকে প্রত্যেক দেশের ভাষা না বুঝিলে কখনো মনের মিলন হয় না। বঙ্গের যাহারা প্রকৃতপক্ষে এখনো পূর্ণ নিরক্ষর তাহাদের সঙ্গে শিক্ষিতের মনের মিল না হইলে শত কংগ্রেস, লক্ষ স্বদেশী আন্দোলন হইলেও

সাহিত্যই জাতীয়তা গঠনের প্রধান সহায়। এই সাহিত্যের সর্ব্বতোমুখী গতি যাহাতে অনুকূল হয় তাহা প্রত্যেক সাহিত্যিক এবং কর্ত্তৃপক্ষের করা উচিত। এই অর্থে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ একটুকু দৃষ্টি করিবেন কি? প্রত্যেক জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রাদেশিকভাষামিশ্রিত সাহিত্য পুস্তক পড়াইবার জন্য অতঃপর যত্ন করা কর্ত্তব্য। জাতীয়তা গঠন যদি জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হয় তবে আমাদের এই প্রস্তাবটিকে অবশ্য গ্রহণ করা উচিত। এইজন্য আমরা আশা করি অতঃপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য ভাষা এবং প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যে পুস্তক প্রণয়ন করিতে চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষার দ্বারা উক্ত সাহিত্য গঠন করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা প্রকৃত জাতীয়তা গঠন করা বুঝিতে পারেন না। প্রাদেশিক ভাষায় গঠিত গ্রাম্যছড়া কতদূর কবিত্বময় তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা" প্রবন্ধ পাঠ করুন।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থসমালোচনা।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি—আলিরাজা। শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল-সম্পাদিত। মূল্য ছয় আনা। আলিরাজা একজন মুসলমান বৈষ্ণব কবি। এমন এক সময় ছিল যখন ভাববিহ্বল মুসলমান কবিরা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিতেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুদের প্রতি তাঁহাদের কত অনুরাগ ছিল। সেই মধুর সেকালের জন্য আক্ষেপ জন্মে। আলিরাজার অপর নাম ওয়াহেদকানু; তিনি সাধারণতঃ কানুফকির নামে প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রামের ওশখাইন গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। সুলেখক মৌলবী আবদুল করিম এই পুস্তকে আলিরাজার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলিরাজা ভক্ত ও সাধক ছিলেন। তাঁহার পদাবলীর অনেকগুলি পদ বেশ সুমিষ্ট কবিত্বপূর্ণ, নিম্নে আমরা একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম,—

রূপ হেরি মোহিত সদায়॥
পরম সুন্দরী রাধা ভুবনমোহন।
হংসগতি জিনি অতি লজ্জিত খঞ্জন॥
ইন্দ্রাণী মেনকা গতি জিনিয়া ভঙ্গিমা
ভুজঙ্গ লেখন জিনি চূড়ার মহিমা॥
কমল পোতল তনু বায় ঢলি পড়ে।
সততে মোহিত রাণী মুরলীর স্বরে॥
হরির মুরলী ধনী পূজে রাত্র দিনে।
হরি রাধা কৃপা দানে আলিরাজা ভণে॥

ভণিতা না থাকিলে কে বলিতে পারিত ইহা মুসলমান কবির রচনা। ব্রজসুন্দর বাবু এই সকল দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পদাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট হিতসাধন করিতেছেন। তিনি উৎসাহলাভের যোগ্যপাত্র। পুস্তকের ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট হইলে ভাল হইত।

মূল্য তিন আনা। এই পুস্তকখানিতে বারজন মুসলমান কবির ৩৭টি পদ সন্নিবিষ্ট আছে। সৈয়দ আইনদ্দিন-রচিত একটি কাবতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

কালারে মোর মনোহর, তুমি আমার রসের গুণনিধি।
এথ রূপ গুণ দিয়া সৃজিলেক বিধি॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি কেহ নাহি সাথে।
একেলা আসিছ বন্ধু, প্রাণি লইয়া হাতে॥
বন্ধু এমেঘ আঁধার রাত্রি বিজুলীর ছটা।
ধীরে ধীরে বাড়াইও পাও পিছল হৈছে ঘাঁটা॥

মুসলমান বৈষ্ণব কবি—চতুর্থ খণ্ড।—শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল-সম্পাদিত। মূল্য চারি আনা। ৪৮ পৃষ্ঠার পুস্তকখানিতে পঁচিশ জন মুসলমান কবির পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রজসুন্দরবাবুর উৎসাহ ও গবেষণা প্রশংসাযোগ্য। পুস্তকের প্রান্তভাগে কয়েকজন মুসলমান কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও জীবনীগুলি সুপাঠ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক। কমর আলির একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

বিরহের জ্বালাএ মরি।
কোথাএ গেল প্রাণের হরি॥
বাঁকারূপ কালিন্দীর কূলে, দেখি না কদম্বতলে,
আরও বাঁশী বৃন্দাবনে ডাকে না রাধা প্যারি॥
শয়নে স্বপনে দেখি, আগে কান্দিমা থাকি,
সব শূন্য বৃন্দাবন আইসে না বংশীধারী॥
হীন কমর আলি ভণে, ভাবনা প্যারি তোর মনে।
আনিব তোর প্রাণের হরি দেইখবা দুই নয়ান ভরি॥

অনেক ভক্ত হিন্দু বৈষ্ণব পদকর্তার লেখনিমুখে এমন মধুর ও লালিত্যপূর্ণ পদের আবির্ভাব সর্ব্বদা দেখা যায় না। এই সকল পদাবলী বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। আশা করি, ইহা হিন্দুমুসলমানের প্রীতিবর্দ্ধনের সহায়তা করিবে।

শিবপূজা।

(শিবরাত্রির উপবাসের দিনে দেব দেব মহাদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে।)

১

শিব! শিব! শিব! ভোলা মহেশ্বর!
দাঁড়াইয়া আছি যুড়ি দুটি কর;
এই বিল্বদল ধর দেব ধর;
বম্ বম্ হর হর!
না জানি ভকতি, না জানি অর্চ্চনা,
ভরসা কেবল তোমারি করুণা!
এই রক্তজবা ধর ধর ধর,
বম্ বম্ হর হর!

২

এই উপবাসে নাহি গো বিশ্বাস,
যাগ যজ্ঞে দেব ভাঙ্গে না তরাস!
মনে হয় ভয় এ শুধু বিলাস;
বম্ বম হর হর!
তাই বলি দেব করহ আশ্বাস,
ঢাল ঢাল প্রাণে ভকতি উচ্ছ্বাস,
জাগুক্ পরাণে অপূর্ব্ব উল্লাস;
বম্ বম্ হর হর!

৩

ওহে মহাযোগী! কত কাল আর,
মায়া-ফণী, ফণা তুলি অনিবার,
বিষদন্তে তনু দংশিবে আমার?
বম্ বম্ হর হর!
যেই মহামন্ত্রে হে ফণিভূষণ,
ফণিমালা কণ্ঠে করহ ধারণ,
সেই মন্ত্রে ভাঙ্গ মায়ার দশন;
বম্ বম্ হর হর!

৪

ওহে নীলকণ্ঠ! ভখিয়া গরল,
জর জর তনু হ'য়েছি পাগল;
তপ্ত অশ্রুজল বহে অবিরল;
বম্ বম্ হর হর!
কেমনে করিলে হলাহল পান,
শিখাও সে যাদু, হ'য়েছি অজ্ঞান,
অমৃত পরশে বাঁচুক্ পরাণ!
বম্ বম্ হর হর!

৫

আমি শুনিয়াছি কাহিনী সরস,
তুমি শুধু প্রেম-ধুতুরার বশ!
কেঁদে যে লুটায় সেই তোমা পায়!
বম্ বম্ হর হর!

কর্ম্মযোগ মোর হয় নাই শিক্ষা,
ভক্তিযোগে মোর হয় নাই দীক্ষা ;
জ্ঞানযোগ ? সে তো অনল-পরীক্ষা :
বম্ বম্ হর হর !

৬

দুটি যোড়হাত,—মোর কর্ম্মযোগ !
দুই বিন্দু অশ্রু,—মোর ভক্তিযোগ !
শিবস্তোত্রপাঠ,—মোর জ্ঞানযোগ,
বম্ বম্ হর হর !
"শিব" "শিব" বলা,—মোর শঙ্খরব !
"শিব" "শিব" ধ্বনি,—যাগযজ্ঞ সব !
ইহা ধূপ ধূনা,—ইহাই উৎসব,
বম্ বম্ হর হর !

৭

আমার আমিত্ব তোমার তুমিত্বে,
ডুবে যাক্ দেব !—আমার অনিত্যে
কর আচ্ছাদন তোমার শিবত্বে !
হর হর বম্ বম্ !
বম্ বম্ বম্ ! হর হর হর !
বামে কন্যা গৌরী কি শোভা সুন্দর ;
জয় জয় গৌরী ! জয় মহেশ্বর !
বম্ বম্ হর হর !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

গোপীচাঁদ ও ময়নামতী।

গত অগ্রহায়ণমাসের 'ভারতী'তে "গোপীচাঁদ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছে, তাহা রঙ্গপুরবাসীর পক্ষে বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। রঙ্গপুরের সন্ন্যাসীরাজা গোপীচাঁদের খ্যাতি যে বিন্ধ্যাচল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্র কবির বীণায় ঝঙ্কার দিতেছে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। শুনিয়াছি, হিন্দীভাষায়ও গোপীচাঁদের সন্ন্যাসসম্বন্ধীয় গাথা প্রচলিত আছে।

গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি—তাঁহার মাতা ময়নামতীও (উল্লিখিত প্রবন্ধের "মৈনাবতী") ঐতিহাসিক। রঙ্গপুর অঞ্চলে "যুগী" বা যোগী নামক এক সম্প্রদায় আছে। তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী ও পুরুষপরম্পরাগত সঙ্গীতই গোপীচাঁদ ও ময়নামতীসম্বন্ধে ঐতিহাসিকতত্ত্বনির্ণয়ের প্রধান সহায়। যোগী সম্প্রদায়ের লোক প্রায়ই নিরক্ষর। গোপীযন্ত্রের সাহায্যে গোপীচন্দ্ররাজার কাহিনীগান এখনও ইহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্যতম উপায়—বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহাই প্রধান উপায় ছিল। নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত ডিমলাথানার অধীন হরিণচরা ও আটিয়াবাড়ী গ্রামে এখনও ময়নামতীর "কোট" বা বাসস্থানের নিদর্শন বর্ত্তমান। চতুর্দ্দিকস্থ মৃণ্ময় প্রাকার কালের নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া ক্ষীণকায় হইলেও এখনও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার আশা রাখে। প্রাকারের নিম্নস্থ পরিখাও সম্পূর্ণরূপে পঞ্চভূতে বিলীন হয় নাই।

যোগীদিগের মধ্যে প্রচলিত ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গানে বৌদ্ধযুগের স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। কালক্রমে এদেশীয় ক্ষমতাশালী [illegible] অনেক সময়েই যাহা ঘটিয়া থাকে ময়নামতীরও তাহা

ঘটিয়াছে—তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া "ময়নাবুড়ী" নামে স্থানীয় লোকের পূজার পাত্রী হইয়া পড়িয়াছেন। ভগ্নপ্রাকারের উপর তাঁহার পূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ভূমিবৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছে। দেঁওদা উপাধিযুক্ত রাজবংশীজাতীয় পুরোহিত তাঁহার পূজার মন্ত্র আবিষ্কার করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। জমীদারের "পুণ্যাহ"র সময়ই তাঁহার পূজার পক্ষে প্রশস্ত। অবশ্য যে ভক্ত "ময়নাবুড়ী"র নিকট মানত করিয়া অভীষ্টলাভ করতঃ ছাগাদি পশুর সদ্গতি করিতে প্রস্তুত তাহার পক্ষে কালাকাল নাই। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত ময়নামতী মাংসাহার করিতেন কি না জানি না। কিন্তু কালে পুরোহিতের কৃপায় নৃমুণ্ডমালিনী দেবীর সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব কল্পিত হইয়াছে—সুতরাং এখন তাঁহাকে ছাগশিশুর মস্তক হইতে বঞ্চিত রাখা নিতান্তই অভক্তের কাজ।

গ্রিয়ারসন্ সাহেব "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" নাম করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর Journalএ গোপীচাঁদ ও ময়নামতী বিষয়ক সঙ্গীত প্রথম প্রকাশ করেন (Asiatic Society's Journal Vol. XLVII 1878). এটী বাস্তবিক ময়নামতীর গানের একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। যোগীরা জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য এই গানের নানারূপ পালার সৃষ্টি করিয়াছে। নিরক্ষর সমাজে সকলে বৃহৎ গানের সকল অংশ আয়ত্ত করিতে না পারায় ভিন্ন ভিন্ন গানের দলে ভিন্ন ভিন্নরূপ পালার সৃষ্টি হইয়াছে—কোনটী বৃহৎ, কোনটী ক্ষুদ্র। দেশকালপাত্রভেদে এবং গায়কের রুচিভেদে মৌখিক গানের অংশবিশেষ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; বৌদ্ধপ্রভাবের স্থলে ক্রমশঃ হিন্দুপ্রভাব অধিকার বিস্তার করিয়াছে। গ্রিয়ারসন্ সাহেবের প্রকাশিত গানে যতটা বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষিত হয় তদপেক্ষা বৃহত্তর গানেও আজকাল সে প্রভাব ততটা পাওয়া কঠিন।

উল্লেখ আছে, সেই গীতে বৌদ্ধপ্রভাব অধিকতর পরিষ্কার আকার ধারণ করিয়াছে। "গোবিন্দচন্দ্র" ও "গোপীচন্দ্র" অভিন্ন ব্যক্তি। এই গীতের রচয়িতা দুর্লভ মল্লিক সম্ভবতঃ পশ্চিমবাঙ্গালার লোক। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে রঙ্গপুর অঞ্চলে আসিয়া অথবা অন্যপ্রকারে যোগী-দিগের গানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তিনি আর একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গীত লেখনীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং রচনার পর ইহার পত্র হইতে বৌদ্ধসন্ন্যাসীর প্রভাবলোপের বিশেষ কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কবি, বোধ হয় গোপীচাঁদ নামটী একটু সংস্কৃত করিয়া গোবিন্দচন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন। রঙ্গপুরের যোগিসম্প্রদায় "গোবিন্দচন্দ্র"কে চেনে না, তাহারা গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্র রাজার যশোকীর্ত্তনেই অভ্যস্ত। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে যে তাঁহার রাজধানী পাটীকানগরের উল্লেখ আছে তাহা এক্ষণে "পাট্‌কাপাড়া" নামে বিখ্যাত—ময়নামতীর কোটের অদূরে অবস্থিত। ময়নামতীর কোট ও পাট্‌কাপাড়া হইতে কিয়দ্দূরে ধর্ম্মপালের গড়। ইহার আকৃতি অনেকটা ময়নামতীর কোটের ন্যায়, কিন্তু আয়তন অনেক অধিক। এই ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ বাঙ্গালার বিখ্যাত পালবংশীয় কেহ ছিলেন। ডাক্তার বুকানান্ হ্যামিল্টন্ ধর্ম্মপালের সহিত ময়নামতীর স্বামী মাণিকচাঁদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ ময়নামতী ও ধর্ম্মপালের যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রিয়ারসন্ শ্লেজিয়ার এবং অন্যান্য অনেকে বুকানানের উপাখ্যানের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই উপাখ্যানের অনুসরণে উপন্যাস পর্য্যন্ত রচিত হইয়া বাঙ্গালী বাবুর ও গৃহলক্ষ্মীদের সময়ক্ষেপের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আমাদের মনে হয়, বুকানানের এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কিন্তু আপাততঃ সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

বঙ্গদেশীয় আখ্যায়িকা মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতে গিয়া কতকটা বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রবাদানুসারে ত্রৈলোক্যচাঁদ গোপীচাঁদের পিতা; কিন্তু যোগীদিগের মতে গোপীচাঁদের পিতার নাম মাণিকচাঁদ, মাতামহের নাম তিলকচাঁদ। মহারাষ্ট্রীয় প্রবাদানুসারে গোপীচাঁদের রাজধানী কাঞ্চনগর; যোগীদিগের মতে

গীতে কাঞ্চনা নগরে গোপীচাঁদের শ্বশুরালয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় প্রবাদে গোপীচাঁদের মহিষীর সংখ্যা ষোলশত এক। বঙ্গীয় কবিগণের কাহারও মতে ইহাদিগের সংখ্যা ১০০ কাহারও মতে ১২০। দ্বারিকাপুরীর অদুরবর্ত্তী আহমদনগরের কবি হয়ত মনে করিয়াছেন যে, ষোলশত মহিষীর কমে বড়লোকের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। মহারাষ্ট্রীয় আখ্যায়িকায় রাজমাতা ময়নামতী এবং রাজা গোপীচাঁদ উভয়েই জলন্দরের শিষ্য। বঙ্গীয় প্রবাদে গোরক্ষনাথ ময়নামতীর এবং জলন্দরি বা হাড়িপা গোপীচাঁদের গুরু। "গোবিন্দচন্দ্রের" গীতেও নৃপতির গুরুকে ভূগর্ভে প্রোথিত করার উল্লেখ আছে, তবে এখানে জলন্দারি-কর্ত্তৃক দগ্ধীকৃত মূর্ত্তি তিনটীই সুবর্ণের ; লৌহ ও রৌপ্যের কোন উল্লেখ নাই। জলন্দরির শিষ্যের নাম কানুফাই যে রূপান্তরিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় কবির কণিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য হইতে উপলব্ধি হয় যে, এককালে গোপীচাঁদ রাজার খ্যাতি করতোয়ার তীরে আবদ্ধ ছিল না, সুদূর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়াছিল। এই গোপীচাঁদ যে নিতান্ত সামান্য রাজা ছিলেন তাহা মনে হয় না। গ্রিয়ারসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, "Here Manikchandra reigned over the half dozen square miles of territory which constituted him a *Rajadhiraj*.

সেকালে রাজাধিরাজগণ সংখ্যায় অনেক ছিলেন স্বীকার করি, কিন্তু যেরূপ উত্তরবঙ্গ, আসাম, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নানাস্থানে গোপীচাঁদের খ্যাতির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে ষড়বর্গমাইল পরিমিত ভূমির অধীশ্বরের উত্তরাধিকারী বলিতে আমরা একেবারেই প্রস্তুত নহি।

ময়নামতী, মাণিকচাঁদ, গোপীচাঁদ ও যোগীজাতিসম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এ প্রবন্ধে এই পর্য্যন্তই।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মহানন্দির পরে ভারতে মহাবিপ্লব।

(অবশিষ্টাংশ)।

সম্রাট্ মহাপদ্মনন্দের অধিকারকালে সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে। এই কথা বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণ এবং পুরাণ-ব্যাখ্যাতা প্রাচীন চিৎসুখ যোগীন্দ্র, শ্রীধরস্বামী এবং নাগোজীভট্ট * প্রমুখ আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা কোন নুতন কথা নহে। বিষ্ণুপুরাণে মহর্ষি পরাশর লিখিয়াছেন,—ভূতলে

* আমরা এই প্রবন্ধে অনেকবার নাগেশ বা নাগোজীভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইনি পরবর্ত্তী কালীন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত। পূর্ব্বকালে চিৎসুখ যোগীন্দ্র ও স্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ কলির ধর্ম্ম বর্ণনা উপলক্ষে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির বিলোপ নিশ্চয় করিয়া যাইবার পর ইনি স্বগ্রন্থে ঐ বিষয়টি এতই দক্ষতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাহাতে ভারতীয় পণ্ডিতগণ বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

নিম্নলিখিত অত্যুচ্চস্তরের গ্রন্থরাশি দ্বারা নাগেশভট্ট বা নাগোজীভট্ট ভারতে মহাগৌরবান্বিত পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন ঃ—

পাতঞ্জল মহাভাষ্যের কৈয়টকৃত টীকার ভাষ্যপ্রদীপোদ্যত নাম্নী টীকা। (নাগোজীভট্ট ভিন্ন পাতঞ্জল মহাভাষ্যের মর্ম্ম বুঝিবার উপায় নাই।) পাণিনি ব্যাখ্যাত্মক বৃহন্মঞ্জুষা ; লঘুমঞ্জুষা ; পরমলঘুমঞ্জুষা ; বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর ; লঘুশব্দেন্দুশেখর (সিদ্ধান্ত কৌমুদীর টীকা) ; পরিভাষেন্দুশেখর ; শব্দরত্ন ; বিষমী টীকা (দীক্ষিতকৃত শব্দ কৌস্তুভের টীকা) ; জ্ঞাপকসংগ্রহ ; প্রত্যাখ্যানসংগ্রহ ; একশ্রুতিবাদ প্রভৃতি পাণিনিশাস্ত্রব্যাখ্যা। আচারেন্দুশেখর প্রভৃতি বারখানা শেখরাখ্য স্মৃতিগ্রন্থ। অশৌচনির্ণয় ; সাপিণ্ড্যপ্রদীপ প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ। যোগসূত্রবৃত্তি ; কাব্যপ্রকাশের প্রদীপনাম্নী টীকার প্রদীপোদ্যতনাম্নী চূড়ান্ত টীকা। রসগঙ্গাধরের মর্ম্মপ্রকাশনাম্নী বিস্ময়জনক টীকা। রসমঞ্জরী টীকা। গীতগোবিন্দ টীকা। চণ্ডীর টীকা। কুবলয়ানন্দ টীকা। সুধালহরী টীকা। বাল্মীকি রামায়ণের টীকা। অধ্যাত্ম রামায়ণ টীকা প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ। ইঁহার রচিত প্রত্যেক গ্রন্থই তত্তৎ জাতীয় গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কুশাগ্রীয় বুদ্ধির পরিচায়ক। ইঁহার সমান লোক পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে আর জন্মায় নাই। ইনি শব্দবিদ্যার অসাধারণ পণ্ডিত

ক্ষত্রিয়জাতি নির্ম্মূল হইয়াছে; আগামী সত্যযুগে ক্ষত্রিয়জাতি পুনঃ উৎপাদনের জন্য মরু ও দেবাপি নামা দুইজন ক্ষত্রিয়-রাজর্ষি যোগবলে হিমাচলের কলাপগ্রামে বিদ্যমান আছেন; কেবল বর্ত্তমান কলিতেই যে ক্ষত্রজাতি লোপ পাইয়াছে, এমন নহে, প্রত্যেক কলিতেই এইরূপে ক্ষত্রিয়জাতি নির্ম্মূল হন, এবং প্রত্যেক কলির পরবর্ত্তী সত্যযুগে দেবাপি ও মরুর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত ক্ষত্রিবীজপুরুষগণ ভূতলে আগমন করিয়া ক্ষত্রিয়জাতি প্রবর্ত্তিত করেন। সর্ব্বজ্ঞকল্প শ্রীধরস্বামী একাধিকবার ইহা বুঝাইয়াছেন,—"পঞ্চদশোত্তরসহস্রবর্ষপর্য্যন্তং শুদ্ধঃ ক্ষত্রিয়বংশঃ স্থাস্যতি অনন্তরং নন্দেন সর্ব্বক্ষত্রিয় নাশাৎ।" পরীক্ষিতের পরে ১০১৫ বৎসর মাত্র ক্ষত্রিয়জাতির স্থিতি। তৎপর নন্দ ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয় নাশ করেন। দৈব ও যুগশক্তি মিলিত হইয়া এই ধর্ম্মবিপ্লব সাধন করিয়াছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে এই বিষয় সবিস্তর বলিয়াছি।

* যাঁহারা ক্ষত্রিয়শব্দের শক্তিগ্রহ করিতে সমর্থ অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা উগ্রাদি সঙ্করগণকে ক্ষত্রিয় বলেন না; যাঁহারা মানব শব্দের শক্তিগ্রহ করিতে সমর্থ, তাঁহারা হস্তী বা অশ্বকে মানব বলেন না। যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন দ্বারা ক্ষত্রত্ব সিদ্ধ হয় না। যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রাণিগণের রক্ষা, স্বর্গকামনায় রণে প্রাণ পরিত্যাগার্থে দৃঢ়সংকল্প, শ্রৌত স্মার্ত্তধর্ম্মের রক্ষার্থে প্রাণধারণ, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মণ্যতা, সত্যবাদিতা, অদীনতা, সর্ব্বস্বদানশক্তি, অকৌটিল্য, অসেবা এবং অদাস্য এইগুলি ক্ষত্রিয়ের নিয়ত লক্ষণ। নহুষ, যযাতি, হৈহয়, কার্ত্তবীর্য্য, সগর, অংশুমান্, দিলীপ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, অম্বরীষ ও দাশরথি রাম-প্রমুখ লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন সম্রাট্গণ ক্ষত্রজাতিকে স্ব স্ব তপঃ প্রভাবে দিব্যভাবে আরোপিত করিয়া গিয়াছেন। যখন বিধাতার অলংঘ্য আদেশে নন্দের সময়ে দেবতারূপা এই ক্ষত্রিয়জাতি উচ্ছিন্ন

সম্পর্কজাত অশ্বসদৃশ জন্তুগণ সদশ্বগণের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, তেমনি ভারতের সেই সুমহতী দেবতারূপ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মরক্ষারূপ সুমহৎ কার্য্য সঙ্করগণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব ক্ষত্র-নাশই হিন্দুসমাজের সুমহান্ বিপ্লবের প্রথমাংশ।

ক্ষত্রিয় নাশ হইবার পরে, ক্ষত্রশোণিতসম্ভূত বিবিধসঙ্কর ও সঙ্করানুসঙ্করগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবল হইয়া তত্তৎ দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে উগ্রনামক জীব* শ্রেণীতে স্বয়ং মহাপদ্মনন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। † নন্দের সুমাল্য প্রভৃতি ৮ পুত্র ছিল। তাঁহাদের রাজ্যাবসানে নন্দের মুরানাম্নী পত্নীগর্ভে মৌর্য্যগণ উৎপন্ন হন। ‡

নন্দগণ, চন্দ্রগুপ্তাদি মৌর্য্যগণ, পুষ্পমিত্র অগ্নিমিত্র বসুমিত্র আর্দ্রকাদি শুঙ্গগণ, কণ ও কাণ্বায়নগণ সকলেই জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয় ও উগ্রসঙ্কর। ক্ষত্রিয়-নাশের পরে ক্ষত্রস্থানে এই সকল সঙ্কর প্রতিষ্ঠিত হন। "তৎসন্তানভূতা উগ্রাঃ রাজ্যে স্থাপিতাঃ।" (নাগেশঃ)।

ইঁহাদের সময়েই তুখার, মুণ্ডাস্র, মৌন ও গর্দ্দভিল প্রভৃতি যবনগণ কখন কখন প্রবল হইয়া উঠেন। § কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে সমাজ-বিপ্লবের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের বিবরণ উল্লেখ করা গেল না।

উগ্রাদি সঙ্করের শেষাবস্থায় কৈবর্ত্ত, মদ্রক ও পুলিন্দ নামক তিনটি শিথিলাচার ¶ ক্ষত্রসঙ্কর অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। নন্দাদি উগ্র ও

---

* মনু ১০ অং। ৯ শ্লোক। † নন্দাস্থাগ্রজে......। (নাগেশঃ)।

‡ নন্দস্যৈব পত্যন্তরস্য মুরাসংজ্ঞস্য পুত্রং (চন্দ্রগুপ্তং) মৌর্য্যাণাং প্রথমম্। (স্বামী)। মুরা নন্দের একতর পত্নী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার গর্ভজাত। চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে নন্দের স্থায় উগ্রক্ষত্রিয়। মুরা নন্দের অভিষিক্তা মহিষী ছিলেন না এই মাত্র। স্বামী মুরাকে পত্নী শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। § বিষ্ণু পুরাণ ৪।২৪।

¶ এই শিথিলাচার শব্দে চমকিয়া উঠিবার কারণ নাই। তথনকার শিথিলাচার

উগ্রাভাসগণ ক্ষত্রাভিমানী ছিলেন। গ্রামে না মানিলেও মোড়ল হইয়া ক্ষত্রত্বের ভাণ করিতেন। কিন্তু কৈবর্ত্ত, মদ্রক ও পুলিন্দগণ ক্ষত্রসঙ্কর হইয়াও ক্ষত্রাভিমানশূন্য আচারশিথিল জাতি ছিলেন।

ক্ষত্রিয়নামের কিছুকাল পরেই,—ক্ষত্রাভিমানী উগ্রাদি সঙ্কর এবং কৈবর্ত্ত, মদ্রক, পুলিন্দরূপ সঙ্কর মধ্যে প্রাধান্য লইয়া এক গুরুতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পুরাণকারগণ ও আচার্য্যগণ এই সংঘর্ষ অতি অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

যেমন সম্রাট্ মহাপদ্মনন্দের সময়ে নিখিল ক্ষত্রিয়বর্ণ নাশ পাইয়াছিল, সেইরূপ এই সংঘর্ষে অতি ভয়াবহ সম্রাট্ বিশ্বস্ফটিকের নেতৃত্বে ক্ষত্রাভিমানী সঙ্করগণও একেবারে নাশপ্রাপ্ত হয়। যেমন ক্ষত্রিয়গণ সমবেত সঙ্করদিগের হস্তে, তেমনই ক্ষত্রাভিমানী সঙ্করগণ আচারশিথিল সঙ্করগণের হস্তে নির্ম্মূল হন।

সম্রাট্ বিশ্বস্ফটিক এই শেষোক্ত সঙ্করদিগের নায়ক ছিলেন। তৎকালে উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ শোণিত-বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল, এরূপ আর কখনও প্লাবিত হয় নাই। ইহাই মহাবিপ্লব।

বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণের বচনের সমন্বয় ও ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই সকল কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। কথাগুলি বুঝিতে হইলে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দ্বারা অবরুদ্ধ জ্ঞান-দ্বার একটু খুলিয়া লইতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে * ;—

"মগধায়াং বিশ্বস্ফটিকসংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি। কৈবর্ত্ত-কটু-

---

* ইহা নাগোজীভট্ট ও ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসাকারের পাঠ এবং স্বামিকৃত অর্থ

পুলিন্দ-সংজ্ঞান্ ম্লেচ্ছপ্রায়ান্ ব্রাহ্মণান্ রাজ্যে স্থাপয়িষ্যতি উৎসাদ্যাখিল-ক্ষত্রজাতিম *।” বিষ্ণু—৪।২৪।

সঙ্করগণের রাজ্য চলিতে থাকিলে মগধে বিশ্বস্ফটিক সম্রাট্ হন। তিনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে ম্লেচ্ছ প্রায় করিয়া তাহাদিগকে কৈবর্ত্ত-কটু ও পুলিন্দ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন, এবং তাহাদের হস্তে শাসনকর্ম্ম অর্পণ করেন এবং উগ্রাদি সঙ্করগণকে উহাদের দ্বারা নির্ম্মূল করিয়া দেন।

এই বচনানুসারে কৈবর্ত্ত, কটু ও পুলিন্দগণ আচারশিথিল ব্রাহ্মণ-সমষ্টি মাত্র। কিন্তু ভাগবতের বচন দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ঐ জাতিত্রয়ে বহুতর ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট সঙ্করক্ষত্র ও নিখিল বৈশ্যজাতি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যথা :—

মাগধানাস্তু ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
করিষ্যতি পরোবর্ণান্ পুলিন্দ-যদু-মদ্রকান্। (১২।১। ১৯)।

স্বামী—ততশ্চ মগধায়াং রাজা বিশ্বস্ফূর্জির্ভবিতা। স প্রাগুক্তাৎ পুরঞ্জয়াৎ অতিপ্রসিদ্ধঃ পুরঞ্জয়ঃ সন্ বর্ণান্ ব্রাহ্মণাদীন্ পুলিন্দ-যদু-মদ্রক সংজ্ঞান্ ম্লেচ্ছ-প্রায়ান্ করিষ্যতি।

অর্থাৎ মগধে বিশ্বস্ফূর্জি রাজা হইবেন। তিনি পূর্ব্ববর্ণিত সম্রাট্ পুরঞ্জয় হইতেও অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রসঙ্কর ও বৈশ্যগণকে পুলিন্দ-যদু ও মদ্রক সংজ্ঞায় পরিণত করিয়া ম্লেচ্ছ-সদৃশ করিবেন।

বায়ু এবং মৎস্য পুরাণেও ঠিক্ পূর্ব্বোক্তরূপে “কৈবর্ত্ত-কটু পুলিন্দান্” কৈবর্ত্ত-কটু ও পুলিন্দগণের পুষ্টি, উত্থান ও শক্তি বর্ণিত আছে।

ভাগবত, বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্য এই চারি পুরাণেই পুলিন্দ বীরগণের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্য পুরাণের কৈবর্ত্ত ভাগবতের একস্থলে দাশ ও অন্যস্থলে যদু শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। মদ্রক শব্দ

পাণিনিসূত্র, হরিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ এবং অন্যত্রও উল্লিখিত আছে। মূলকথা কৈবর্ত্ত, যদু বা দাশগণ, কটু বা মদ্রকগণ এবং পুলিন্দগণ এই তিনটি জাতি প্রবল হইয়া উগ্রাদি সঙ্করগণকে নির্ম্মূল করেন। তৎপরই কৈবর্ত্ত-মদ্রক-পুলিন্দরূপ বিক্রান্ত জাতিত্রয় প্রাচীন ক্ষত্রিয়ের স্থলে দাঁড়াইয়া ভারতের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইয়া উঠেন।

বিশ্বস্ফটিকের সময়ে কৈবর্ত্ত, মদ্রক ও পুলিন্দরূপ শাসিতৃজাতিতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, নিখিল বৈশ্যজাতি এবং হতাবশিষ্ট সঙ্করগণ প্রবেশ করেন। তাহাতেই এই জাতিত্রয় অসাধরণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। যে কৈবর্ত্ত-প্রবাহে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সঙ্করক্ষত্র এবং সমগ্র বৈশ্যজাতি অণুপ্রবিষ্ট হইলেন, সে প্রবাহের মূলও তদনুরূপ ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণটি বিষ্ণু—এবং ভাগবতাদি পুরাণের সমর্থন করিয়া তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বর্ণ হইতেই সামরিক কৈবর্ত্তজাতির উৎপত্তি-প্রবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত পুরাণমতে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতেই মূল বিক্রান্ত কৈবর্ত্তজাতির উৎপত্তি। যথা :—

ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

এরূপ বীর্য্যসম্পন্ন মূল না হইলে বিশ্বস্ফটিক-যুগে সমাজের শ্রেষ্ঠ মানবগণ উহাতে অণুপ্রবেশ করিয়া একটা বলিষ্ঠ সম্প্রদায় গঠন করিয়া ভারতে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব ঘটাইতে পারিতেন না। বর্ণিত সম্রাট্ বিশ্বস্ফটিক ইঁহাদেরই * মহানায়ক ছিলেন।

---

* এই কৈবর্ত্তসম্প্রদায় দ্বাপর এবং ত্রেতাযুগেও বিক্রান্ত ছিল। ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্যবশতঃ ইহারা তখন এরূপভাবে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। তবে ইংরেজজাতি যেমন গুর্খা প্রভৃতি জাতিকে সৈন্যরূপে ব্যবহার করেন, ঠিক এই ভাবে ইহারা ক্ষত্রিয়গণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। এই সম্বন্ধে ভাগবতাদি প্রামাণিক পুরাণ, নীলকণ্ঠ ও মাধ্বাদি প্রামাণিক ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল কথা উঠাইতে গেলে কতকগুলি অবান্তর কথা উঠাইতে হয় এবং প্রবন্ধ

সমাজের শ্রেষ্ঠবর্ণগণের এইরূপে কৈবর্ত্ত নাম প্রাপ্তি বর্ত্তমান কলিতেই যে হইয়াছে এমন নহে, প্রত্যেক কলিতেই এইরূপ ঘটিয়া আসিতেছে। এই কৈবর্ত্তপ্রবাহ অনাদি ও অনন্ত। যথা :—

ত্রেতায়াং ব্রাহ্মণোত্তরাঃ প্রজাঃ। দ্বাপরে ব্রহ্মক্ষত্রোত্তরাঃ প্রজাঃ। কলৌ শূদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজাঃ। (সংস্কারমীমাংসাধৃত পুরাণ-বচন)। অর্থাৎ মানবগণ মধ্যে ত্রেতায় ব্রাহ্মণ, দ্বাপরে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এবং কলিতে কৈবর্ত্ত ও শুদ্রজাতি প্রধান হন।

কলৌ শুদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজাঃ। (ভাগবত ১২।৩।২২)।

দাশ = কৈবর্ত্ত। (শ্রীধরস্বামী)।

অর্থাৎ কলিযুগে কৈবর্ত্তজাতি ও শূদ্রজাতি প্রধান্য লাভ করে। মৎস্যপুরাণে শূদ্রপ্রাধান্যের আকৃতি বর্ণিত আছে। কৈবর্ত্ত-প্রাধান্যের ভয়ঙ্কর প্রকৃতি বিপ্লব-বর্ণনায় প্রদর্শিত হইয়াছে ও হইতেছে।

কতক বাহ্মণ ও বৈশ্য এই কৈবর্ত্ত-প্রবাহে প্রত্যেক কলিতে বিলীন হইলেও এই সম্প্রদায়কে মোটের উপর মূলত ক্ষত্রবৈশ্য সঙ্কর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। প্রাচীন শাস্ত্রে ইহারা মাহিষ্যনামে প্রক্ষিত ছিলেন 'প্রকৃত কথা এই, তিনযুগে স্বধর্ম্মপালনকারী মাহিষ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, কলিতে তাঁহারা শিথিলাচার মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত বলিয়া প্রথিত হন। পরবর্ত্তী সত্যে আবার মাহিষ্যের উৎপত্তি হয়; পরবর্ত্তী কলিতে আবার তাঁহারা শিথিলাচার হন। এই প্রবাহ অনন্তকাল চলিয়াছে। * যাঁহারা বিষ্ণু, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্ত বিক্রমী কৈবর্ত্তকে মাহিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা অতি গভীর ঐতিহাসিক তত্ত্বের দ্বারে আঘাত করিয়াছেন।

---

* মনু বলিয়াছেন, তপোবীজ প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে। উৎকর্ষকাপ-

এই সামরিক সম্প্রদায়ের মহানায়ক সম্রাট বিশ্বস্ফটিক, বহুতর ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট সঙ্করক্ষত্র এবং বহুতর বৈশ্যকে মদ্রক এবং পুলিন্দ জাতিরও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই কৈবর্ত্ত, মদ্রক ও পুলিন্দ ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে ক্ষত্র-বৈশ্য-শোণিত রহিল না। অর্থাৎ বিপ্লবযুগে যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ললাটে কৈবর্ত্ত, মদ্রক-পুলিন্দের ছাপা অঙ্কিত হয় নাই, সেরূপ কোন হিন্দুজাতিই ক্ষত্রবৈশ্য-শোণিত ধারণ করেন না।

বিপ্লবকারী মদ্রকসম্প্রদায়সম্বন্ধে হরিবংশে লিখিত আছে,—'হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৩২ অং ২৭-২৮) রাজা শিবির বৃষদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও মদ্রক নামা চারিপুত্র জন্মে। ইহাদের স্ব স্ব রাজ্য স্ব স্ব নামে বিখ্যাত হয়। মদ্রকগণ সিন্ধুনদের উভয়তট ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। মহাভারতের কর্ণ ও শল্যের বিবাদবর্ণনস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, পঞ্চনদদেশীয় মদ্রকগণকে ধিক্ থাকুক। মহর্ষি পাণিনি কতকগুলি সূত্রে মদ্রকগণের উল্লেখ করিয়াছেন। (মদ্রবৃজ্যোকন্ ৪।২।১৩১। ইত্যাদি. মদ্রকগণকে বাহীকও বলিত। কর্ণ বলিয়াছেন, দুরাচার মদ্রকগণ ব্রহ্মার সৃষ্টি নহে, বাহী ও হীক নামক পিশাচ ও পিশাচী কর্ত্তৃক উৎপাদিত! প্রান্তবর্ত্তী (Frontier) দেশবাসী বলিয়া উঁহারা তৎকালে কিরাতাদির সম্পর্ক বশতঃ ম্লেচ্ছপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। তথাপি মদ্রকগণের শ্রেষ্ঠ শল্য ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই মদ্রকগণ ক্ষত্রিয়শব্দ হইতে বঞ্চিত ও ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—পারসীক, মদ্রক, আরাম ও অম্বষ্ঠাদি ম্লেচ্ছগণ সিন্ধু, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদীর জল পান করে। (বিষ্ণু ২ অংশ। ৩ অং। ৯.১। শ্লোক)। বস্তুতঃ বর্ত্তমান পঞ্জাবী শিখের ন্যায় পঞ্জাববাসী বীর মদ্রকগণ ম্লেচ্ছাচার অথচ প্রসিদ্ধ বীরজাতি ছিলেন। সম্রাট বিশ্বস্ফটিকের সময়ে এই জাতিতে বহুতর ব্রাহ্মণ, সঙ্করক্ষত্র ও বৈশ্য প্রবিষ্ট হইয়া ...

তৎপর ইঁহারাও হিন্দুসমাজ সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া দেন। শাস্ত্রে মদ্রক নামে স্বতন্ত্র কোন জাতির অস্তিত্ব নাই। শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে এক প্রকার পুলিন্দজাতির বর্ণনা শাস্ত্রে আছে। তাঁহারাও মদ্রকে প্রবিষ্ট হন। পুলিন্দগণ হিমাচলপ্রত্যন্তবাসী মদ্রকমাত্র। ইঁহাদের মধ্যেও বহুতর ব্রাহ্মণ, সঙ্করক্ষত্র ও বৈশ্য প্রবিষ্ট হন। কৈবর্ত্ত, মদ্রক ও পুলিন্দ এই জাতিত্রয়ই আচারশিথিল প্রাচীন ক্ষত্রসঙ্কর। এই ত্রিজাতিই বিশ্বস্ফটিকযুগে নূতন বললাভ করিয়া একযোগে ভারতবর্ষ বিদলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। এই ত্রিজাতির অসামান্য শক্তি দ্বারা উগ্রাদি ক্ষত্রাভিমানী সঙ্করগণ বিনিপাতিত হন এবং ভারতবর্ষ কৈবর্ত্ত, মদ্রক ও পুলিন্দ বীরগণের চরণে অবনত হইয়া পড়ে।

ব্রাহ্মণগণ কথিত বর্ণত্রয়ে বিলীন হন বলিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণই যে ঐরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে। শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টই অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের অস্তিত্ব লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হতাবশিষ্ট ক্ষত্রসঙ্কর ও নিখিল বৈশ্যজাতি চিরতরে এই সামরিক বর্ণত্রয়ে বিলীন হইয়াছেন; সে অগস্ত্যোদর হইতে ইহাদের উদ্ধারসাধন আর হয় নাই হইবেও না। কথাগুলি শাস্ত্র বিস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা :—

> কলৌ ন ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি কলৌ ন বৈশ্যজাতয়ঃ।
> ব্রাহ্মণাশ্চৈব শূদ্রাশ্চ কলৌ বর্ণদ্বয়ং স্মৃতম্॥
>
> (নাগোজীধৃত মৎস্যপুরাণ)।

কলিতে ক্ষত্রজাতি নাই, বৈশ্যজাতিও নাই (মহানন্দের সময়ে ক্ষত্রিয়জাতি নাশ পাইয়াছে এবং বিশ্বস্ফটিক-কালে সমস্ত বৈশ্য মদ্রকাদি জাতিত্রয়ে মিশিয়া গিয়াছে), কলিতে আছে কেবল ব্রাহ্মণজাতি ও শূদ্রজাতি। অর্থাৎ কলিতে ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে।

> কলাবাদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ।
>
> (নাগোজীধৃত মৎস্যপুরাণ)।

কলিতে আদ্যজাতি ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজাতি শূদ্র এই দুই জাতি আছে। (মধ্যবর্ত্তী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি বর্ণিত প্রকারে লোপ পাইয়াছে)। কৈবর্ত্ত-মদ্রক-পুলিন্দ, ক্ষত্র-বৈশ্য শোণিতধারী হইলেও ক্ষত্র বা বৈশ্য নহেন, অতিদিষ্ট শূদ্র। ভাগবতে শূদ্র ও কৈবর্ত্ত স্বতন্ত্র বলিয়া লিখিত হইলেও কৈবর্ত্ত বা শিথিলাচার মাহিষ্য অতিদিষ্ট শূদ্রমাত্র।

যেমন মদ্রকগণ ক্ষত্রশব্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া একশ্রেণীর বিক্রান্ত অথচ আচারশিথিল জাতিতে পরিণত হন, সেইরূপে যদু-দাশ বা ক্ষত্রসঙ্করগণ ক্ষত্রশব্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া শিথিলাচার মাহিষ্য বা কৈবর্ত্তগণের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। পুরাণকারগণ ইঁহাদের হস্তেই অন্যান্য সমস্ত ক্ষত্রসঙ্কর নিহত হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে কৈবর্ত্ত-মদ্রক-পুলিন্দেতর অন্য কোন জাতিতে ক্ষত্রশোণিত নাই।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্য পুরাণ যাহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভাগবত তাহাদিগকে যদু ও দাশ এই দুইটি নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। কথাটি যেমনই ঐতিহাসিক তেমনই কৌতূহলাবহ :—

৺বঙ্কিম তদীয় কৃষ্ণচরিত্রে একটি হেঁয়ালী ছন্দঃ উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যদুবংশ তিনটি। একটি বেদোক্ত অনার্য্য যদুবংশ, একটি চন্দ্রবংশীয় যদুবংশ ও একটি সূর্য্যবংশীয় যদুবংশ। তিনি আরো বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ কোন্ যদুবংশে উৎপন্ন তাহা বলিবার উপায় নাই!" তিনি বলেন, বেদে যে যদুবংশের উল্লেখ আছে, সেই যদুবংশ অনার্য্য; কারণ উক্ত বংশের প্রবর্ত্তয়িতা যদু ও তুর্ব্বসুকে ঋগ্বেদ জাতিতে "দাস" বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত ঋকের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "যদু ও তুর্ব্বসু দাসজাতীয় লোক ছিল"। পাণিনি-মতে দাশৃ ও দাসৃ উভয় ধাতুর অর্থই "দেওয়া"। মৌলিক অর্থে দাশ ও দাস একই কথা। অতএব বেদের সময় হইতে

এমন একটা প্রবল যদুবংশ ভারতবর্ষে ছিল, যাহারা দাশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

হরিবংশে লিখিত আছে, যযাতিপুত্র যদু হইতে একটি যদুবংশ জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা চন্দ্রবংশীয় যাদব। আবার সূর্য্যবংশীয় রাজা ভীমের পুত্র যদু হইতে এক যদুবংশ উৎপন্ন হন, তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় যাদব। ৺বঙ্কিম হরিবংশ হইতে এই পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু ঐ উভয় বংশ যে শেষে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, তাহার বচনটি তিনি উল্লেখ করেন নাই। উহা তাঁহার সিদ্ধান্তের নিতান্ত প্রতিকূল *।

হরিবংশে আছে:—

"যযাতমাপ বংশস্তে সমেষ্যতি চ যাদবম্।
অণুবংশং চ বংশস্তে সোমস্ত ভবিতা কিল॥"

(বিষ্ণুপর্ব্ব ৩৭ অং। ৬৪ শ্লোক।)

অর্থাৎ (মন্ত্রী অন্ধক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,) হে কৃষ্ণ, তোমার এই সূর্য্যবংশীয় যদুবংশ, চন্দ্রবংশীয় যযাতিজ যদুবংশে মিলিত হওয়াতে চন্দ্রবংশনামেই প্রসিদ্ধ।

কাজেই শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য ও চন্দ্র উভয় কুলজ যদুবংশে উৎপন্ন এবং চন্দ্রবংশীয় বলিয়া প্রখ্যাত।

উক্ত শ্লোকের টীকায় পণ্ডিতবর্য্য নীলকণ্ঠ "উত দাসা যদুস্তুর্ব্বসুশ্চ" (অর্থাৎ যদু ও তুর্ব্বসু জাতিতে দাস) এই ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বেদোক্ত দাসজাতীয় যদু ও তুর্ব্বসুই চন্দ্রবংশীয় দাশ-যাদবগণের মূল বা আদিপুরুষ। সুতরাং যদুবংশ তিনটা নহে, বস্তুতঃ দুইটা, তাহাও আবার মিলিয়া শেষে চন্দ্রবংশীয় নামে খ্যাত হইয়াছে!!

প্রকৃত কথা এই, যদু ও তুর্ব্বসুসন্ততি যাদবগণের অনেকেই

আচারশিথিল ছিলেন এবং তাঁহাদের সাধারণ নাম দাশ ছিল। এই জন্য ভাগবত তাঁহাদিগকে যদু ও দাশ উভয়শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়াছেন।

এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন, সমাজবিপ্লবকারী বর্ণিত জাতিত্রয় কি উপকরণে নির্ম্মিত এবং কিরূপ শক্তিসম্পন্ন।

এই কৈবর্ত্ত (বিকৃত মাহিষ্য) মদ্রক এবং পুলিন্দরূপ বিপ্লবকারিগণ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহাও ইঙ্গিত করা আবশ্যক।

বিশ্রুতকীর্ত্তি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি নামক সুগভীর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে অগ্নিকুলের (রাজপুতজাতির) উৎপত্তিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"সমাজবিপ্লবকারী রাজন্যদিগকে" বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ "পুলিন্দ" প্রভৃতি জাতীয় কতকগুলি মনুষ্যকে রাজপুত্র নাম প্রদান করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া স্বদলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

প্রকৃত কথা এই, এই বিপ্লবের বহুকাল পরে কতকগুলি শক্তিশালী ব্রাহ্মণ মিলিত হন, এবং কৈবর্ত্ত-মদ্রক ও পুলিন্দসমাজ হইতে কতিপয় বলবান্ লোককে স্বদলভুক্ত করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শশাদিজাতীয় বীরগণকে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইঁহারাই বর্ত্তমান রাজপুতজাতি *। ইঁহারা তিনবার বিপ্লবকারী কৈবর্ত্তাদি রাজন্যগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত হন, এবং পরিশেষে বর্ণিত "বিপ্লবকারী রাজন্য শ্রেণিত্রয়কে" বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হন। ইহাই বর্ত্তমান বিক্রান্ত জাতিগুলির গূঢ় ইতিহাস। গৌড়দেশে সেরূপ শক্তিশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন না, বিশেষতঃ গৌড়ে ঐ

* এস্থলে ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে ওছওয়াল্ প্রভৃতি মারওয়ারি বণিক্‌গণ বাণিজ্যব্যবসায়ী রাজপুত মাত্র।

জাতিত্রয়ের প্রভাব বিশেষভাবে বদ্ধমূল ছিল বলিয়া এদেশে কৈবর্ত্ত-মদ্রক ও পুলিন্দের রাজপুত্রীকরণ হয় নাই; কাজেই গৌড়দেশে রাজপুতনামক কোন কল্পিত জাতির সৃষ্টিও হয় নাই। কিন্তু গৌড়দেশে শূদ্রগণ সহজে মার্জ্জিত হইয়াছেন। এ সকল কথা আজ ভাঙ্গিয়া বলিবার স্থান ও অবসর নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এখন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, রাজপুত্রীকৃত ও অরাজপুত্রীকৃত বিক্রান্ত কৈবর্ত্ত মদ্রক পুলিন্দগণ, এবং নানা শ্রেণীর শূদ্রগণ বর্ত্তমান আছেন; তাহা ছাড়া হিন্দুসমাজে অন্য কোন বর্ণ বা জাতি বিদ্যমান নাই। ভারতবন্দ্য নাগোজীভট্ট পাঠ করিলেই আমাদের কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।

পরীক্ষিতের পর কিঞ্চিৎ কাল ক্ষত্রিয়জাতি ছিল; তাহারও পরবর্ত্তী পাঁচশত বৎসর সদাচার সঙ্করক্ষত্র বিদ্যমান ছিল; তৎপর কৈবর্ত্ত মদ্রক ও পুলিন্দাখ্য সঙ্করত্রয় প্রবল হইয়া অন্যান্য সমস্ত সঙ্কর নির্ম্মূল করিয়া সমস্ত বৈশ্যজাতি এবং বহুতর ব্রাহ্মণকে স্বসমাজভুক্ত করিয়া লন; উহার পর প্রায় সহস্র বৎসর ঐ জাতিত্রয়ের প্রাধান্য থাকে। তৎপর অর্থাৎ কলির প্রথম ২৫০০ বৎসর পর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হয়। উহাও বর্ণিত বিপ্লবের শেষাংশ মাত্র। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বা বিপ্লবের শেষাংশটি ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই সময়ই রাজপুতজাতির সৃষ্টি। বস্তুতঃ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত-মদ্রক, পুলিন্দ ও শূদ্রগণের সমষ্টি মাত্র।

বর্ণিত বিপ্লবকারী জাতীয় নৃপতিগণের রাজত্বে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সদাচার কি পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই বিধ্বস্ত সমাজই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই সমাজ প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ছায়ামাত্র। এই সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কতদূর অনুকূল শাস্ত্রজ্ঞ সহৃদয় পাঠক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

চীৎকার করেন, তাঁহাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করা সহজ নহে, ইহা আমরা স্বীকার করি।

বর্ণিত মহাবিপ্লব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়াছে এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যে দীর্ঘকাল টিঁকিতে পারে না, তাহা স্বয়ং ব্যাসদেব সন্ন্যাসপদ্ধতিতে বলিয়াছেন। যথা,—

"চত্বার্য্যব্দ সহস্রাণি চত্বার্য্যব্দ-শতানিচ।
কলের্যদা গমিষ্যন্তি তদা ত্রেতা-পরিগ্রহঃ।
সন্ন্যাসশ্চ ন কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণেন বিজানতা।"

(নির্ণয়ধৃত ব্যাসবচন।)

অর্থাৎ কলির চারিহাজার চারিশত বৎসর পরে কোন বিবেচক ব্রাহ্মণই সন্ন্যাসগ্রহণ ও অগ্নি আধান (গার্হপত্যাদি অগ্নিস্থাপন) যেন না করেন। করিলে তাহার ফল হইবে না। এখন কলির ৫০০৭ম বৎসর চলিতেছে; সুতরাং ৫০০৭—৪৪০০=৬০৭ বৎসর পূর্ব্বেই মহাবিপ্লব নিতান্ত প্রবলভাবে ব্রাহ্মণশরীরে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে।

সম্রাট্ বিশ্বস্ফটিক সুমহতী ঐন্দ্রী শক্তির প্রভাবেই এই বিপ্লব সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার কতিপয় শতাব্দী পরে কতকগুলি তেজস্বী ব্রাহ্মণ গিরিগুহা হইতে নির্গত হইয়া বিশ্বামিত্রের ন্যায় কেবল স্বকীয় তপঃপ্রভাবে ঐন্দ্রী শক্তির বিরুদ্ধে মহাবিপ্লবকে নূতন আকারে স্থাপিত করিতে যত্নপর হন। এই যত্নের ফলে এক বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের কৈবর্ত্ত, মদ্রক ও পুলিন্দগণ ক্রমে "রাজপুত্র"নামে এক অভিনব নাম ও মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

এই রাজপুত্রীকরণের* আনুষঙ্গিক ক্রিয়াবলী দ্বারা এই মহাবিপ্লবের

---

* রাজপুত্রদিগের মধ্যে অনেকে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। [illegible]

ইতিহাস অজ্ঞব্যক্তির নিকটে আবৃত রহিয়াছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানিগণের চক্ষে সেই মহাবিপ্লব কিছুমাত্র আবৃত হয় নাই। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই মহর্ষিগণ কলিতে হরিনাম জপই জীবের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞগণ এই সুমহতী কথার সার গ্রহণ করিতে পারে না।

পাঠক, যদি সম্রাট্ বিশ্বস্ফটিকের রাষ্ট্রনীতি বুঝিতে চাহেন, তবে প্রথমতঃ ৺রাজা রামমোহন রায়কে মনে মনে চিন্তা করুন। তৎপর তাঁহাকে মগধরাজধানীতে সমগ্র ভারতের রাজরাজেশ্বররূপে অভিষিক্ত করুন। জাঠপ্রমুখ বিবিধ বিক্রান্ত সম্প্রদায়কে তাঁহার ভক্ত, তাঁহার অনুরক্ত ও তাঁহার আদেশপ্রতিপালনার্থ প্রাণদানে সমুত্থিত বলিয়া মনে করুন, তাঁহার ভ্রূকুটিতে সমগ্র ভারতবর্ষকে কম্পিত ও তটস্থ মনে করুন এবং তাঁহাকে যুগধর্ম্মে ও কালধর্ম্মে অদ্বিতীয় কার্য্যকুশল পণ্ডিত বলিয়া মনে করুন।

শ্রীপ্যারীমোহন দাস।

রহিয়াছে তাহাও বিপ্লবের ইতিহাসবিরুদ্ধ নহে। প্রকৃত কথা এই চন্দ্রসূর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইবার পরে যে সকল ক্ষত্রসঙ্কর পরস্পর হতাহত করিয়া বর্ণিত শিথিলাচার জাতি ভাবে বিদ্যমান রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রসূর্য্যবংশের শোণিতধারা বিদ্যমান রহিয়া গেল। কাজেই রাজপুত্রীকৃত বা অরাজপুত্রীকৃত মল্লকাদি সম্প্রদায়েও সেই শোণিতধারা বিদ্যমান রহিল, বস্তুতঃ ইহাদের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের দাবী লূতাতন্তুবৎ অতি সূক্ষ্মসূত্রের উপর লম্বিত রহিয়াছে। এইজন্য নাগোজীভট্ট উগ্রসূতাদি সঙ্করগণকে চন্দ্রসূর্য্যবংশীয়গণের সন্তানস্থানীয় (তৎসন্তানভূতাঃ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পথে যেতে যেতে।

১

পথে যেতে যেতে এক রমণীর রূপ
নিরখি মুখরচিত্ত বিস্ময়েতে চুপ!
সে নারীর প্রতি অঙ্গে,
জ্যোৎস্না ঝরিছে রঙ্গে।
হেরি তাহা উড়ে ঘুরে, একি অপরূপ,
এ দুটি চাকার আঁখি, হইয়া লোলুপ!

২

কহিলাম মনে মনে, কুসুমেরি হাস
নারী ও বদনে হেরি; কুসুমেরি বাস!
রূপের তরঙ্গ ভঙ্গে
হিল্লোল খেলিছে রঙ্গে!
দোলি পূর্ণিমার যেন উদ্দাম উচ্ছ্বাস!
রাসযামিনীর যেন উদ্দাম উল্লাস!

৩

রূপে ভোর, ঘরে আসি, "মা মা মা মা" রবে
নেত্র মুদি বসিলাম ধ্যানের উৎসবে!
তখনি সে নারী আসি,
সম্মুখে দাঁড়াল হাসি!
কাঙ্গাল নয়ন মোর লাবণ্য বৈভবে

৪

কহিলাম "মাগো বল্ কোন্ পুণ্যফলে
পাইলাম দেখা তোর ? পাদপদ্মতলে
পড়িতেছি লুটাইয়া !
বল্ বল্ মা অভয়া,
কোন্ যোগবলে, আর কোন্ মন্ত্রবলে ?
আপনি বুঝিতে নারি আপন কৌশলে।

৫

কহিলেন আহ্লাদিনী "মা মন্ত্র মধুর !
সেই মন্ত্রে আছে বাছা শকতি প্রচুর।
প্রতি নারীমূর্ত্তিমাঝে
আমারি মুরতি রাজে !
কামী, হেরি নারীরূপ, হয় রে লোলুপ ;
ভক্ত কিন্তু সেইরূপে হেরে বিশ্বরূপ !"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ফিরিঙ্গির বাণিজ্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

"I trust in the passion of Jesus Christ in whom I place all my confidence to break the spirit of the Moors."—Commentaries.

মুরবণিকদিগকে ধ্বংস করিবার জন্যই আলবুকার্ক এদেশে আসিয়াছিলেন। তাই তিনি একবার বলিয়াছিলেন—"আমি মুসলমানদিগকে চিরদিনের জন্য উৎখাৎ করিয়া, মহম্মদের প্রজ্বলিত হুতাশন চিরনির্ব্বাপিত করিয়া পরমেশ্বরের বাসনা পূর্ণ করিব।" ফিরিঙ্গিদিগের সমরাভিযান তাই কোন কোন ইতিহাসে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ফিরিঙ্গির যুদ্ধাভিযান ধর্ম্মের আবরণান্তরালে অবস্থান করিয়া এদেশের বাণিজ্য সংহার করিতেছিল। ক্রুশের প্রতিষ্ঠা-কামনায় ফিরিঙ্গিগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল না—ভারতের অমূল্য ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া লিস্‌বনে কুবেরের ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তাহারা আসিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আলবুকার্ক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গোয়ানগর সেই প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি না হইলে ফিরিঙ্গির কোন আশা নাই। তাই তিনি ছলে-বলে-কৌশলে এবং দেশীয় বিভীষণনীতিকুশল রাজন্যবর্গের গৃহবিবাদে ও সাহায্যে গোয়া-নগর জয় করিয়া শোণিতস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

রণজয় করিয়াই বিজয়ী ফিরিঙ্গি ঘোষণা করিলেন—যে যাহা লুণ্ঠন করিয়া পাইবে তাহা তাহারই হইবে। লুণ্ঠনপরায়ণ ফিরিঙ্গিগণ

শাণিত কৃপাণ-তাড়নে অসংখ্য মুসলমান প্রাণ হারাইল—নাগরিকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল—মুসলমান রমণীগণ ফিরিঙ্গির পাশবিক অত্যাচারে ধর্ম্মহীনা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। গোয়ানগর শ্মশানতুল্য হইয়া উঠিল। সেই মহাবিপদে রক্ষা পাইয়াছিল কেবল ব্রাহ্মণগণ ও কৃষককুল। আল্‌বুকার্ক আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।

গোয়া বিজয়ের পর আল্‌বুকার্ক নৃপতি ইমান্যুয়েলের নিকট যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশে দেখিতে পাওয়া যায়—"গোয়া অধিকারকালে তুর্কীদিগের ৩০০ শত লোক নিহত হইয়াছে। যাহারা পলায়ন করিয়াছিল তাহাদিগের মৃতদেহে বানাস্তরি হইতে গথ্‌ডালে পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়াছিল। অনেকে সন্তরণ করিয়া নদী পার হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা তাহাদিকে জলমধ্যে নিমজ্জিত করিয়াছি। তাহার পর আমি নগরে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলাম। চারিদিন পর্য্যন্ত হত্যাকাণ্ডের বিরাম ছিল না। আমরা কাহাকেও মার্জ্জনা করি নাই। ব্রাহ্মণগণ ও কৃষককুল কেবল রক্ষা পাইয়াছে। ছয় সহস্র মুরের শোণিতে ধরণীপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইয়াছিল। এই বিরাট ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।"* লুণ্ঠনকার্য্যে নরহত্যা করিয়া এতদূর আত্মপ্রসাদ লাভ কেবল ফিরিঙ্গির ইতিহাসেই শোভা পায়।

গোয়ায় যখন রণদুন্দুভি নিস্তব্ধ হইল তখন আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগিজদিগের সহিত বন্দিনী মুসলমান রমণীগণের বিবাহ দিতে লাগিলেন। সুন্দরী যুবতীর লোভে অনেক ফিরিঙ্গিই খ্রীষ্টধর্ম্মের বাধা ও অনুশাসন ভুলিয়া মুসলমান রমণীদিগের পাণিগ্রহণ করিল এবং গোয়ায় বাস

---

* It was indeed a great deed and will carried out.—Albuquer-

করিয়া ভারতবাসী হইল। অনেক হিন্দু এবং মুসলমানও স্বার্থান্ধ হইয়া তখন খ্রীষ্টানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গোয়ায় ফিরিঙ্গির রাজ্য সংস্থাপিত হইল। আল্‌বুকার্ক তাঁহার নৃপতিকে জানাইলেন—'গোয়া একটী অতি বিখ্যাত স্থান। যদি সমুদয় ভারতবর্ষও একদিন ফিরিঙ্গির হস্তচ্যুত হয় আর কেবল গোয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ পুনঃরায় অধিকার করিতে বিলম্ব হইবে না।' কিন্তু ইতিহাস বলিয়া দিতেছে যে, গোয়ায় অধিকার বিস্তার করিয়া রাজ্য স্থাপনই ফিরিঙ্গিদিগের পতনের কারণ হইয়াছিল। আল্‌বুকার্ক মনে করিয়াছিলেন যে, সকল ফিরিঙ্গিই তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক, সাহসী, সমরকুশল, স্বার্থশূন্য। কিন্তু উহাই তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। উত্থানের পর পতন এবং পতনের পর পুনরুত্থান ইহাই বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়ম। সুতরাং তাহার সূত্রনির্ম্মাণে বিধাতাই ব্যস্ত ছিলেন। আল্‌বুকার্কের তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি সে সূত্র দেখিতে পাইয়াছিল না।

পর্ত্তুগীজনরপতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, কেবল উচ্চবংশের প্রধান প্রধান সৈনিকদিগের সহিত মুসলমান রমণীগণের বিবাহ দেওয়া হউক। কিন্তু আল্‌বুকার্ক নৃপতির সেই শাসনবাক্য উপেক্ষা করিয়া ফিরিঙ্গিমাত্রেরই মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।* ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায় দুই সহস্র ফিরিঙ্গিবণিক এদেশীয় মহিলাগণের পাণিগ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী অর্থাদি লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং আল্‌বুকার্কও এদেশীয় মহিলার পাণিপীড়ন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

আল্‌বুকার্কের বিজয়বার্ত্তা ভারতীয় নৃপতিদিগের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিল। ক্যাম্বের রাজা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত

সন্ধি সংস্থাপন কামনায় দূত প্রেরণ করিলেন এবং দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য দিউবন্দর ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। হনোবর-রাজ গোয়ায় দূত পাঠাইয়া সখ্যের প্রস্তাব করিলেন, ফিরিঙ্গির প্রধান ও প্রাচীন শত্রু কালিকাটের জামোরিণ পর্য্যন্ত আল্‌বুকার্কের সহিত মৈত্রী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বরাজ্য মধ্যে পর্ত্তুগীজ-দুর্গ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থান দিতেও সম্মত হইলেন।

বিজয়ী আল্‌বুকার্ক তখন গোয়া সুরক্ষিত করিতেছিলেন। ফিরিঙ্গি-কারিকরগণ এদেশীয় শিল্পকুলের সাহায্যে গোয়ানগর দুর্ভেদ্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। তখনও আদিলশাহের সাহসী সেনাকুলের ভয়ে আল্‌বুকার্ক ভীত ছিলেন। তিনি কেবল আদিল-শাহকেই ভয় করিতেন। তাই দুর্গ-নির্ম্মাণ ও নগর-সংরক্ষণ-কার্য্য যতদূর সম্ভব সত্বর সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। দুর্গের নিমিত্ত প্রস্তরের প্রয়োজন হইল। আল্‌বুকার্ক কালবিলম্ব না করিয়া মুসলমানদিগের সমাধি-মন্দিরসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই সকল প্রস্তর দিয়া গোয়ায় ফিরিঙ্গির দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। *

সেকালে মালাক্কাদ্বীপ অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। চতুর্দ্দশশতাব্দীর অতি বিখ্যাত ভৌগলিক আবুল্‌ফেদা বলিয়া গিয়াছেন যে, আরব এবং চীন বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া সে সময়ে মালাক্কা প্রখ্যাত ছিল। মুসলমান, পারশিক, হিন্দু এবং চৈণিক বণিকগণ তখন মালাক্কায় বাণিজ্য করিত। গোয়া জয় করিয়াই ফিরিঙ্গিসর্দ্দার আল্‌বুকার্ক মালাক্কাযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মুসলমান-বাণিজ্য যাহাতে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন

* ......Threw down the sepulchres of the Moors to provide for the fortifications ....."

করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেই উদ্দেশ্য সফলীকৃত করিবার জন্য আল্‌বুকার্ক বহুপ্রযত্নে পারস্য উপসাগর এবং লোহিতসাগরের প্রবেশপথ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতেই নীল এবং ইউ-ফ্রেটিশ নদী-তীরবর্ত্তী স্থানে মুসলমান-বাণিজ্য চিরবিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরই ফিরিঙ্গিসর্দ্দার মালাবারতীরের মুসলমান-বাণিজ্য ধ্বংস করিলেন। গোয়ানগর সুরক্ষিত হইয়া সেই একদা সমৃদ্ধ বাণিজ্যের কলঙ্কমলিন সমাধিমন্দির রক্ষা করিতে লাগিল। তখনও মালাক্কা বাকি ছিল।

মালাক্কাদ্বীপপুঞ্জে প্রভুতপরিমাণে মসলা উৎপন্ন হইত এখনও হইয়া থাকে। মুসলমান বণিকগণ সেই সমুদয় মসলা আনিয়া মালাবার-তীরে ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয় করিত। আল্‌বুকার্ক সেই সকল সাধারণ বিক্রয়বিপণী রুদ্ধ করিয়াও নিরস্ত হইলেন না—কোন্ মূর্খ তাহা হইতে পারে! বাণিজ্যের জন্মভূমি করায়ত্ত করিবার জন্য তাই ফিরিঙ্গি সৈন্যগণ সাজিতে লাগিল।

এদিকে ফিরিঙ্গি সৈন্যাধ্যক্ষগণ ইতিপূর্ব্বেই দলবলসহ সমুদ্র তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোত দেখিলেই তাহারা সে সমুদয় ধরিয়া গোয়ার বন্দরে প্রেরণ করিতেছিল। গোয়া যাহাতে ফিরিঙ্গিদিগের বিজয়কীর্ত্তিস্বরূপ ইতিহাসে স্থান পায়, গোয়াই যাহাতে বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠে, দাক্ষিণাত্যের সমুদয় বাণিজ্য যাহাতে গোয়ায় আসিয়া ফিরিঙ্গির থলি পূর্ণ করিয়া দেয়, এই মানসেই আল্‌বুকার্কের আদেশে সমুদ্রপথে বাণিজ্যতরণীর অবাধগতি রহিত হইয়াছিল। ফিরিঙ্গিগণ, যে প্রকারে হউক, বাণিজ্যপোত দেখিলেই তাহা গোয়ায় প্রেরণ করিতে লাগিল। গোয়ায় আসিয়াও নিস্তার ছিল না। বণিকদিগকে তথা হইতে আবার হরমুজের (ormuz) বন্দরে যাইতে বাধ্য করা হইতে লাগিল। লোহিতসাগরের বাণিজ্য

যাহাতে অতল সলিলে ডুবিয়া যায়, যাহাতে ফিরিঙ্গির বাণিজ্য লোহিত সাগরে একাধিকার লাভ করে, এই মানসেই গোয়ায় সমবেত বাণিজ্য-পোতগুলিকে হরমুজবন্দরে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। যে জাতি এতদূর উদ্যমশীল, এতদূর কৌশলী, এতদূর তীক্ষ্ণচক্ষুঃ, সে জাতির ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে অলৌকিক বলিয়া পরিচিত হইবে না ত কি? সে জাতি ভারতবর্ষের স্বার্থান্ধ, কলহনিপুণ, অন্তর্বিবাদে ক্ষীণ, সৌভাগ্যের সূত্রপাতেই উল্লসিত এবং ধৈর্য্যবিহীন নৃপতিদিগের চিতা-ভস্মের উপর কীর্ত্তির তাজমহল নির্ম্মাণ করিবে না ত কি? আল্‌বুকার্ক সেই তাজমহল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। ডাগামা ভিখারীর মত এদেশে আসিয়া যে তাজমহলের মূল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, আল্‌বুকার্ক সম্রাটের ন্যায় সেই ভিত্তির উপর মন্দির গড়িয়া তুলিতে-ছিলেন। বিশাল য়ুরোপখণ্ডে পর্ত্তুগাল একটী অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র। য়ুরোপের অন্যান্য বিরাট-শক্তির নিকট পর্ত্তুগালের শক্তি তপনের সম্মুখে ক্ষুদ্র দীপশিখা সম ছিল। কিন্তু সেই ক্ষীণ দীপশিখার গর্ভে যে প্রলয় তেজ গুপ্ত ছিল, তাহা য়ুরোপীয় শক্তির ইতিহাসকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

যে মুসলমানবাণিজ্য বহুকাল ধরিয়া ভারতসমুদ্রের একমাত্র ছত্রপতিস্বরূপ বিরাজ করিতেছিল, যাহাদিগের বাণিজ্যতরণী আফ্রিকা হইতে পারস্য উপসাগর, পারস্য উপসাগর হইতে মালাবার-তীর এবং মালাবার হইতে মালাক্কাদ্বীপপুঞ্জে রাজত্ব করিয়া বেড়াইত—মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গির কৌশলে ও রণনিপুণতায়, প্রবঞ্চনায় ও প্রলোভনে সেই বাণিজ্য ও বিজয়বৈজয়ন্তী-সুশোভিত বাণিজ্যপোতসমূহ ভারতসমুদ্রের নীল জলে ডুবিয়া গেল—মুসলমানের ভারতের বাণিজ্যশ্রী অনাথিনীর মত কাঁদিয়া উঠিল। সে রোদনধ্বনি আর কেহ শুনিল না—তাহা অনন্ত জলভঙ্গরবমধ্যে মিলাইয়া মিশাইয়া গেল। নিরপেক্ষ ইংরাজ

ঐতিহাসিক তাহা দেখিয়া কহিলেন—The achievement would have been a splendid one for the greatest of European powers. Accomplished by one small Christian kingdom it makes the history of Portugal read like a romance. *

পঞ্চম অধ্যায়।

The strategic design for converting the Indian Ocean from a Moslem to a Christian traderoute was complete. It only remained for his (Albuquerque) successors to fire in the details.—Sir W. W. Hunter.

মালাকাজয়ের জন্য ফিরিঙ্গিগণ সাজিতেছিল। আল্‌বুকার্ক সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সুমাত্রার পসুম্মারাজ ও যবদ্বীপের অধিপতি তাঁহার কোন বিঘ্ন ঘটাইলেন না, বরং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মালাকারাজ ইতিপূর্ব্বেই কয়েকজন ফিরিঙ্গিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। আল্‌বুকার্কের কামান বজ্রনিনাদে ডাকিয়া কহিল 'যদি ভাল চাও, বন্দীদিগকে প্রত্যর্পণ কর।' মালাকারাজের ইচ্ছা ছিল যে, ফিরিঙ্গিদিগের সহিত যুদ্ধাদি করিবেন না। কিন্তু বিধি-লিপি অবশ্য ঘটিবে। মালাকার মুসলমান ও গুজরাতী বণিকগণ তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। আল্‌বুকার্কেরও ইচ্ছা ছিল যে যদি যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা হইলে তিনি অস্ত্রগ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাহা ঘটিল না। মালাকারাজ সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না।

তখন দশখানি তরণী কতকগুলি ফিরিঙ্গিসৈন্য মালাকার তীরে অবতরণ করিল এবং নিমেষমধ্যে তীরবর্ত্তী গৃহস্থদিগের পর্ণশালায়

* Sir W. W. Hunter.

অগ্নিসংযোগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গুজরাতি বাণিজ্যপোত পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিল। বিপদের সংবাদ পাইবামাত্র মালাক্কারাজ বন্দীকৃত ফিরিঙ্গি রুই-দা-অরজ্ঞো এবং তাহার কয়েকজন সঙ্গীকে আল্‌বুকার্কের নিকট প্রেরণ করিলেন বটে, কিন্তু গোপনে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মালাক্কার তখন ২০.০০০ সহস্র যোদ্ধা প্রস্তুত ছিল।

অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর্ত্তুগিজবাহিনী বিপুলবিক্রমে নগর-মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলমান সৈন্তগণ নগরমধ্যস্থিত একটী সেতুরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা নিতান্ত কাপুরুষের মত উহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মালাক্কারাজ স্বয়ং হয়, হস্তী প্রভৃতি লইয়া তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মূরসৈন্তদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা মুহূর্ত্তে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহাদিগের মসজিদ্ আল্‌বুকার্কের হস্তগত হইল। মালাক্কারাজ ২০০০ সহস্র সৈন্তসমভিব্যাহারে ফিরিঙ্গিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফিরিঙ্গির তীক্ষ্ণ বর্শার আঘাতে তাঁহার হস্তীর মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ক্ষিপ্ত মাতঙ্গ তখন হস্তিপাকে শুণ্ডবেষ্টনে ধরিয়া নিহত করিল। নৃপতি আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই বিষম গোলোযোগের মধ্যে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিল না। তিনি সেই সুযোগে পুত্র ও জামাতাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। আল্‌বুকার্ক তখন মুরসৈন্তদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। উন্মত্ত ফিরিঙ্গিগণ সেতু অধিকার করিয়া রহিল। সেনাপতির আদেশে নগরের উভয়প্রান্তে অগ্নিসংযুক্ত হইল। সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী মুহূর্ত্তে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে মলাক্কারাজ পুনঃরায় আল্‌বুকার্কের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আল্‌বুকার্ক কহিলেন—আমি ক্ষমা করিব না। যদি

মালাক্কার অধিপতি পর্ত্তুগাল-নৃপতির বশ্যতা স্বীকার করেন তবেই ক্ষমা করিতে পারিব। কিন্তু তাহা ঘটিল না। চতুর মলয়-সৈন্যগণ অগ্নিপোত লইয়া ফিরিঙ্গির জাহাজে অনলসংযোগ করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিল, তাহারাও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

আল্‌বুকার্কের সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে তখন একটা আত্ম-কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতেছিলেন, মালাক্কায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লাভ নাই। সুতরাং অনর্থক এ যুদ্ধে প্রয়োজন কি। আল্‌বুকার্ক চতুর ছিলেন, বাগ্মীও ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মুসলমানদিগকে মালাক্কা হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেই কাইরো এবং মক্কা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলেই ভেনিসের স্বাধীন মসল্লার বাণিজ্য লুপ্ত হইয়া যাইবে। ভেনিস তখন মসল্লার জন্য বাধ্য হইয়া পর্ত্তুগালের ভিক্ষাপ্রার্থী হইবে। সর্দ্দারের অখণ্ডনীয় যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে ফিরিঙ্গিদিগের অধিক সময় লাগিল না। তখন তাহারা নবোৎসাহে পুনঃরায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ফিরিঙ্গির কামানের গোলায় মালাক্কাবাসিগণ নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। মুরগণ মালাক্কা হইতে বিতাড়িত হইল—অনেকে নিহত হইয়া রক্ষা পাইল। আল্‌বুকার্ক তখন ফিরিঙ্গিদিগকে আদেশ করিলেন—যাহাকে পাও তাহাকে হত্যা কর। ফিরিঙ্গিদিগের কৃপাণাঘাতে কত শির ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল তাহার সংখ্যা কে করে! কেবল নয়ন শেঠী নামক একজন হিন্দু আল্‌বুকার্কের আদেশে রক্ষা পাইল। ফিরিঙ্গিগণ লুণ্ঠনকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া কাহার ধন-সম্পত্তি ছাড়িল না—কেবল নয়নশেঠীর কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শ করিল না। শেঠী কিছুদিন পূর্ব্বে বন্দীকৃত ফিরিঙ্গি অরঙ্গোর কিছু সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া আল্‌বুকার্কের নিকট নিষ্কৃতিলাভ করিল।

মালাক্কা জয় করিয়া আল্‌বুকার্ক নয়নশেঠীর হস্তেই উহার

শাসনভার অর্পণ করিলেন। এদিকে মালক্কারাজ কাননে-কান্তারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাহায্যের চেষ্টায় নানা স্থানে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে কেহই অগ্রসর হইল না। লিঙ্গদ্বীপের রাজা মালাক্কার অধীন ছিলেন। বিপদের সময় তিনিও সাহায্য করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বুঝিলেন না যে, মালাক্কা ফিরিঙ্গির হস্তে প্রদান করাও যাহা, মসল্লার বাণিজ্যকে পদাঘাতে দূর করিয়া দেওয়াও তাহাই। মালাক্কারাজ যখন দেখিলেন যে, নিজের দেশে সাহায্য পাওয়া অসম্ভব, তখন তিনি চীনদেশে দূত প্রেরণ করিলেন। চীনের নরপতিও বিমুখ হইলেন। তিনি কহিলেন 'আমি এখন তাতারদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত আছি, এ সময় মালাক্কার কোন সাহায্য করিতে পারি না।' শুনিতে পাওয়া যায় যে, চীনদেশের কয়েকজন বণিক মালাক্কাতীরে মলয়বণিকদিগের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া চীনরাজ মালাক্কার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন না।*

রাজ্যভ্রষ্ট, স্বজনবন্ধুহীন মালাক্কারাজ আর অধিক দিন জীবিত থাকিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মালাক্কার উত্থানের আশা চিরতিরোহিত হইয়া গেল। ভারতসমুদ্রের বাণিজ্য বহুবৎসরের জন্য ফিরিঙ্গির চরণ চুম্বন করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিল। চঞ্চলা বাণিজ্যশ্রী ফিরিঙ্গির শ্বেতবর্ণে রত্নহার স্থাপন করিয়া পর্ত্তুগালের সিংহাসনতলে মণিরত্ন উপহার প্রদান করিতে লাগিল। আল্‌বুকার্কের কর্ম্ম ফুরাইল। প্রতিষ্ঠার তাজমহলে উন্নতশিরে ফিরিঙ্গির বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়া দিল।

আল্‌বুকার্ক তখন মালাক্কায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন ;

---

* Portuguese in India—Danvers.

অতি সত্বর "এ ফেমোসা" (A Famosa) নামক সুরক্ষিত দুর্গ মালাক্কায় ফিরিঙ্গির অসীমশক্তির জাগ্রতমূর্ত্তিস্বরূপ দণ্ডায়মান হইল। তাহার প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত অতীত যুগের কর্ম্মবীর মালাক্কাসিংহাসনাধীপদিগের ইতিহাস গাহিতে লাগিল। আল্‌বুকার্ক মালাক্কার রাজাদিগের সমাধিমন্দির চূর্ণ করিয়া মুসলমানের মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া সেই সকল প্রস্তরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। মালাক্কারাজের ১৫০০ শত বিশ্বস্ত অনুচর ও ভৃত্য ফিরিঙ্গির তাড়নায় রাজসমাধিমন্দির চূর্ণ করিয়া খণ্ড খণ্ড শিলারাশি বহিয়া আনিতে লাগিল, আর কেহ বা সেই সকল শিলাখণ্ডে ফিরিঙ্গির বিজয়-মন্দির গড়িতে লাগিল।

ফিরিঙ্গির দুর্গে, ফিরিঙ্গির বাণিজ্যপোতে, ফিরিঙ্গির কামানে-ক্রপাণে মালাক্কাদ্বীপ ধীরে ধীরে সুশোভিত হইয়া উঠিল। আল্‌বুকার্ক তখন পর্ত্তুগাল অধিপতির নামে স্বর্ণ ও প্রচলিত মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যদি কেহ মালাক্কা-রাজের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাইয়া উহা ফিরিঙ্গির টঙ্কশালায় অর্পণ না করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। প্রাণভয়ে ভীত মালাক্কাবাসিগণ রাশি রাশি পুরাতন মুদ্রা আনিয়া ফিরিঙ্গির টঙ্কশালা পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। নৃপতি ইমানুয়েলের নামাঙ্কিত নূতন মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া মালাক্কার গৃহে গৃহে ফিরিঙ্গির শক্তি ও প্রতিষ্ঠা জাগাইয়া রাখিল। নবপ্রচলিত মুদ্রা লইয়া ফিরিঙ্গি রাজপুরুষগণ মহাসমারোহে নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বহুমূল্য আস্তরণে সজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহারা নগর পরিভ্রমণ করিলেন এবং পথিমধ্যে মুষ্টি মুষ্টি নবমুদ্রা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিস্মিত নাগরিকগণ মহা আনন্দে সে সমুদয় কুড়াইয়া লইল।

আল্‌বুকার্ক তখন মালাক্কার হৃতশ্রী পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বস্থানে শান্তি সংস্থাপিত

করিয়া রাজকার্য্যে হিন্দুদিগকেই সমধিক অধিকার প্রদান করিলেন। আবার মালাক্কার বন্দরসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যপোতে পূর্ণ হইয়া গেল।

মালাক্কা জয় করিয়া সুদক্ষ গভর্ণর আল্‌বুকার্ক মহানন্দে নৃপতি ইমান্থ্যয়েলের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রাজা ইমান্থ্যয়েল পুলকিত-চিত্তে খ্রীষ্টানের বিজয়কাহিনী পোপের নিকট নিবেদন করিলেন। কৃপাণ ও ক্রুশের সমরে ক্রুশের জয়বার্ত্তা পাইয়া পোপ মহাসমারোহে রোমনগরে উৎসব করিলেন। সমগ্র খ্রীষ্টরাজ্য সেই উৎসবে সম্মানিত হইল—মুসলমানের বাণিজ্য চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল—ফিরিঙ্গি বহুবৎসরের জন্য ভারতসমুদ্রের একমাত্র সম্রাট হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

"The mere dross of India is so great that, if the Portuguese possessions be properly farmed by your officers, the revenues from them alone would suffice to repay a great part of these expenses to which we are put."*

আল্‌বুকার্ক নিশ্চিন্তমনে গোয়া ত্যাগ করিয়া মালাক্কা-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখন হনোবরের রাজভ্রাতা মল্‌হররায় গোয়ার শাসনকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। আদিলশাহ দেখিলেন ইহাই সুযোগ। তিনি সে সুযোগ ত্যাগ না করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুলাদখাঁকে গোয়া জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। জলদস্যু তিমোজা ও মলহররায়ের সহিত পুলাদখাঁর যুদ্ধ বাধিল। তাঁহারা সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। পুলাদখাঁ বালেস্তেরিম নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া গোয়া বিজয়ের জন্য

প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারিলেন। কিন্তু আদিলশাহের সেরূপ আদেশ ছিল না। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে জয় হইলে পুনরায় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত গোয়া অভিমুখে অগ্রসর না হইয়া উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করা হয়। পুলাদখাঁ তখন বিজয়গৌরবে স্ফীত। তিনি তাঁহার প্রভুর আদেশ অবহেলা করিয়া সম্মুখে যে কয়খানি রণতরী পাইলেন তাহা লইয়াই গোয়া আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। ফিরিঙ্গি রডরিগো রাবেলো চারিশত নাম্বার সৈন্য সমভিব্যাহারে পুলাদখাঁকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন।

আদিলশাহ দেখিলেন, তাঁহার উদ্ধত সেনানায়কের অবাধ্যতায় বিধিদত্ত সুযোগ পাইয়াও তিনি গোয়া অধিকার করিতে পারিতেছেন না, তাই বড় আশা করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রসুলখাঁকে পাঠাইয়া দিলেন। গোয়ায় মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ফিরিঙ্গিগণ যখন শুনিল যে, রসুলখাঁ অসংখ্য কামান ও সৈন্যসামন্ত লইয়া গোয়া অবরোধ করিতে আসিতেছেন, তখন তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

পুলাদখাঁ তাঁহার প্রভুর কার্য্যে একান্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, গোয়াবিজয়ের সম্মান তিনি একাই গ্রহণ করিবেন; কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং যখন শুনিলেন যে, তাঁহার অন্যতম বৈরী রসুলখাঁ সেই যশোরাশির অংশীদার হইয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি একান্ত উদ্ধত হইয়া উঠিলেন এবং রসুলখাঁর আদেশ ও উপদেশ মানিয়া চলিতে অসম্মত হইলেন। পুলাদখাঁকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার ইচ্ছায় রসুলখাঁ ফিরিঙ্গিদিগের সহিত যোগ দিলেন এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে পুলাদখাঁকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং বালেস্তারিমে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

করিতেন। কিন্তু যে সকল পর্ত্তুগীজ সেনানায়কগণ তখন গোয়ায় ছিলেন তাঁহারা রসুলখাঁর কৌশলে পরাজিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, প্রবল শত্রুর সন্তোষবিধান করিতে পারিলেই গোয়া রক্ষিত হইবে। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, বালেস্তারিম সুরক্ষিত করিয়া রসুলখাঁ মিত্রভাবে গোয়ানগরমধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইল। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে! তখন গোয়ায় ১২০০ অধিক সৈন্য ছিল না অথচ রসুলখাঁর সপ্তসহস্র সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। সুবিটমের ফিরিঙ্গিগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। রসুলখাঁ গোয়া অবরোধ করিয়া রহিলেন। ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে অনেকেই প্রাণভয়ে রসুলখাঁর সহিত যোগদান করিল।

রুমীতুর্কের ভীতি তখন পর্য্যন্তও ফিরিঙ্গিদিগকে নিতান্ত আকুল করিত। বিপদকালে সকল ভয়ের ন্যায় রুমীতুর্কভীতি আরও প্রবল হইয়া অবরুদ্ধ ফিরিঙ্গিদিগকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল! আল্‌বুকার্ক তখন কোচিন, কন্নন্থর, ভাটফল প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা পাইয়াই বিপক্ষদল যেন মন্ত্রৌষধিস্পর্শে হীনবল হইয়া পড়িল। কয়েকবার সামান্য যুদ্ধের পর রসুলখাঁ পরাজয় স্বীকার করিলেন। তিনি যেমন বীরের মত আসিয়াছিলেন তেমনি যদি পূর্ব্বেই বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেন তাহা হইলে হয়ত ফিরিঙ্গির ইতিহাস অন্যরূপ হইত, তাহা হইলে হয়ত আল্‌বুকার্ক আর গোয়ায় অবতরণ করিতেন না— ফিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠা-মন্দির হয়ত চূর্ণ হইলেও হইতে পারিত! কিন্তু রসুলখাঁ কৌশল করিয়া গোয়া অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। আদিলশাহের শেষ আশা ডুবিয়া গেল। রসুলখাঁ ও তাঁহার সৈন্যগণ কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি মাত্র লইয়া

স্বদেশে প্রস্থান করিল।* ইতিপূর্ব্বে যে সকল ফিরিঙ্গি গোপনে রসুল খাঁর সহিত যোগদান করিয়াছিল, আল্‌বুকার্ক তাহাদিগের বিচার করিলেন। বিচারে ফার্ণাও লোপেস এবং তাঁহার অনুচরবর্গের দক্ষিণ বাহু ও বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তিত করা হইল!

গোয়ায় শান্তি স্থাপিত করিয়া আল্‌বুকার্ক কালিকাটে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আল্‌বুকার্কেরও শত্রুর অভাব ছিল না। তাহারা গোপনে পর্ত্তুগাল-অধিপতিকে জানাইল যে, 'গোয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে দুর্গ নির্ম্মাণও অতি ব্যয়-সাপেক্ষ কার্য্য। এইরূপ কুস্থান রক্ষার জন্য বৃথা বলক্ষয় এবং অর্থনাশ না করাই সঙ্গত।' নৃপতি ইমানুয়েলও তাই আলবুকার্কের নিকট তদ্রূপ আদেশ পাঠাইলেন। আল্‌বুকার্কের শিরে বিধাতার বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি যে গোয়ার জন্য এত যুদ্ধ করিয়াছেন, যাহার রক্ষার জন্য এত অর্থনাশ করিয়াছেন এবং যে গোয়া রক্ষা হইলে ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গির রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেই গোয়াসম্বন্ধে নৃপতির এইরূপ অভিমত জানিয়া স্বদেশপ্রেমিক স্বার্থশূন্য আল্‌বুকার্ক নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। শেষে তিনি নৃপতিকে যে দীর্ঘ-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার প্রতিছত্রে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়, সেই পত্রের প্রতি অক্ষরে তাঁহার গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পায়। আল্‌বুকার্ক লিখিয়াছিলেন—

আপনি আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি গোয়া অধিকার করিয়াছি। আমাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এদেশে যে সম্মিলনী হইয়াছিল, গোয়াই তাহার কেন্দ্র ছিল। সেই জন্যও আমি গোয়া অধিকার করিয়াছি। গোয়ানদীতীরে তুর্কগণ যে

* The enemy then all retired to the mainland, taking with th...

সমুদ্রের রণতরী প্রস্তুত করিয়াছিল—সেই সকল তরণীপূর্ণ কামান, গুলি, বারুদ এবং রুমীদিগের যুদ্ধজাহাজ যদি আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে আমরা ফুৎকারে উড়িয়া যাইতাম! পর্ত্তুগালের অতি বৃহৎ, মহাশক্তিশালিনী রণতরণীসমূহ আসিলেও আমাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিত না। কিন্তু গোয়া অধিকার করিবার পর হইতেই সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে—আমরা যাহা চাহিতেছি তাহাই পাইতেছি। গত ১৫ বৎসরের নৌযুদ্ধে এদেশে পর্ত্তুগালের যত সম্মান ও প্রতিষ্ঠা না ঘটিয়াছে, এক গোয়া-বিজয়ে তাহা হইয়াছে।

যাঁহারা গোয়ার কাহিনী লিখিয়া রাজসিংহাসনতলে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনি যদি মনে করেন যে, কেবল কোচিন ও কন্নঙ্করের দুর্গ থাকিলেই এদেশে ফিরিঙ্গির রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে তবে আপনি নিতান্ত ভ্রম করিবেন—কারণ তাহা অসম্ভব। যদি পর্ত্তুগাল-রণতরী একবার একটীমাত্র যুদ্ধে পরাজিত হয় তাহা হইলে পর্ত্তুগালের এমন কোন দুর্গাদি এদেশে নাই যে, আমরা আর স্বাধীনভাবে একটী দিনও এদেশে থাকিয়া আপনার ধনসম্পত্তি রক্ষা করিব। ভারতীয় নৃপতিগণ যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা, আমাদিগকে সেই মুহূর্ত্তেই দূর করিয়া দিতে পারিবেন। কারণ দেখুন যদি কখনও কোন ফিরিঙ্গি এদেশীয় কোন লোকের নিকট হইতে কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, অমনি ইহারা দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়—যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। কিন্তু গোয়ায় সেরূপ হইবার উপায় নাই। কোন মুরবণিকের উপরই অত্যাচার হউক অথবা ফিরিঙ্গিরই নিগ্রহ হউক—গোয়ার অধিনায়ক ভিন্ন আর কাহারও নিকট সে কথা যাইবার যো নাই।......এদেশে যাঁহারা আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে এতদূর ভগ্নমনোরথ করিয়াছি যে, ক্যাম্বের অধিপতির ন্যায় একজন মহাশক্তিশালী নরপতি

পর্য্যন্ত আমার তুষ্টিসাধন জন্য ব্যগ্র হইয়া দূত প্রেরণ করিয়াছেন—স্বেচ্ছায় বন্দী ফিরিঙ্গিদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, দিউএর ন্যায় একটী অত্যাবশ্যক স্থানে তিনি আমাকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত দিয়াছেন। এ কথা এতদূর আশ্চর্য্য যে, আমি নিজেই ইহা বিশ্বাস করিতে সাহসী নহি। কালিকাটের জামোরিণ আমাকে নিতান্ত অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি যেন তাঁহার রাজধানীর নিকটে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করি। এমন কি, তিনি পর্ত্তুগাল-সিংহাসন-তলে বার্ষিক রাজকর* পর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত আছেন। এ সকলই আমাদের গোয়া অধিকারের ফল বলিয়া জানিবেন। এ সমুদয়ের জন্য আমাকে ভারতীয় নৃপতিদিগের সহিত একটী যুদ্ধও যুঝিতে হয় নাই।

আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যদি দিউ এবং কালিকাটে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া উহা সুরক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলে সুলতানের সহস্র রণতরী আসিলেও এ সকল স্থান কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ভারত-নীতি আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার মন্ত্রিগণও যদি সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারাও একবাক্যে বলিবেন যে, কেবল নৌশক্তি থাকিলেই আপনি ভারতবর্ষের ন্যায় একটী বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইতে পারিবেন না। মুসলমানগণও চাহে যে, আপনি এদেশে দুর্গাদি নির্ম্মাণ না করেন, কারণ তাহারা বেশ জানে যে, যে রাজ্য কেবল নৌবলের উপর প্রতিষ্ঠিত সে রাজ্য অধিক দিন থাকে না। তাহারা চাহে যে নির্ব্বিবাদে আপন আপন দেশে বাস করিয়া মসলাদি লইয়া স্থলপথে তাহাদিগের পূর্ব্বপরিচিত হাটে-বাজারে যাইয়া বিক্রয় করিবে। তাহারা আপনার প্রজা হইতে চাহে না—তাহারা আপনার সহিত মৈত্রী করিতেও চাহে না, আপনার সহিত বাণিজ্য-ব্যবহার করিতেও প্রস্তুত নহে। তাহারা যদি এ সকল কিছুই না চাহে তাহা হইলে তাহারা কি গোয়ায় ফিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠা দেখিয়া

কখনও তুষ্ট হইবে? গোয়ার মত একটী বিখ্যাত ও নিতান্ত আবশ্যক স্থানে আমরা প্রতিদিন শক্তিসম্পন্ন হইতেছি ও গোয়াকে সুরক্ষিত করিতেছি, ইহা দেখিয়া কি তাহারা আমাদিগকে বিধিমতে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে না?

যাহারা গোয়ার বিষয় আপনাকে জানাইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে যে, গোয়া পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আদিলশাহের ন্যায় একজন মহা প্রতাপান্বিত নরপতির নিকট হইতে রাজ্যলাভ করা আরও কত দুরূহ। আদিলশাহ এতদূর দুর্দ্ধর্ষ যে, যদি তিনি পারেন, তাহা হইলে পর্ত্তুগালের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা চূর্ণ করিয়া যে প্রকারেই হউক গোয়া উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেনই করিবেন। যখনই আদিলশাহের কোন সেনাপতি গোয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন, শত্রুর শক্তি পরীক্ষা না করিয়াই কি আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিব? ইহাই যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আর যুদ্ধ-বিগ্রহে কাজ নাই—মুসলমানগণ এদেশের কর্ত্তা হউক। কর্কের ন্যায় হীনশক্তি জাহাজগুলির উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত অর্থব্যয়ে আপনি তাহা হইলে ভারতবর্ষের মুরদিগের মধ্যে আপনার শক্তি ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করুন।

যে সকল অলস লোক আপনাকে বলিয়াছে যে, গোয়া রক্ষা করিতে প্রভুত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহাদিগের কথার প্রত্যুত্তরে আমি বলিতে চাহি যে, ভারতবর্ষের তুচ্ছ আবর্জ্জনারও মূল্য এত অধিক যে, পর্ত্তুগালের অধিকৃত ভূসম্পত্তি যদি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই আমাদের যে ব্যয় হইতেছে তাহার অধিকাংশ উঠিবে।

তাহারা যদি এ কথা আপনাকে বলিয়া থাকে যে, আমি গোয়া

এতদূর আগ্রহ, তাহার উত্তর এই যে, ভারতবর্ষের খেলা অন্যরকমের দেখিবার ইচ্ছায়, তাহাদিগের মত হইলে, আপনার আদেশ পাইবামাত্র আমিই সর্ব্বপ্রথমে দুর্গপ্রাকারে কুঠারাঘাত করিতাম এবং বারুদ-খানায় স্বহস্তে অনলসংযোগ করিতাম। কিন্তু আমি যতদিন জীবিত আছি এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের হিসাবনিকাশ আপনার নিকট দিবার জন্য আমি দায়ী, ততদিন গোয়ার অঙ্গহানি করা হইবে না। আমার শত্রুগণ যে গোয়ার অঙ্গহানি দেখিয়া হাসিবে তাহা আমার সহ্য হইবে না। যতদিন পর্ত্তুগাল হইতে আর একজন শাসনকর্ত্তা আসিয়া আমার স্থান অধিকার না করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আমার নিজ ব্যয়ে গোয়া রক্ষা করিব।

যাঁহারা গোয়ার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান তাঁহারা যদি আমার সহিত একমত হইতে না পারেন তাহা হইলে মহারাজ, জানিবেন যে এখনও একজন মানুষ গোয়া শাসন করিতেছে। যদিও আমি বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হইয়াছি তবুও যদি মহারাজ এরূপ আদেশ করেন যে, মুসলমান-দিগের রাজ্য, আমি যদৃচ্ছা সাহায্যকারী সৈন্যাদির মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে এই রাজ্যের শাসনভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। চারিজন অশিক্ষিত অভদ্র পর্ত্তুগীজ, মন্দির-মধ্যে অচল পুত্তলিকার ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিয়া আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়াই আপনি আমাকে আপনার সামান্য তহশিলদারজ্ঞানে বর্ষে বর্ষে আমার কাজকর্ম্মের হিসাবনিকাশ চাহিবেন না—বরং আমাকে উপযুক্ত সম্মান করিবেন এবং ধন্যবাদ দিবেন, কারণ আমার যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই ব্যয় করিয়া আমি আমার আরদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিব।

সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন, আজ হউক কা'ল হউক অথবা দুইদিন

তাহা হইলে বুঝিব যে, ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গির রাজত্বের অবসানই পরম-পিতার অভিপ্রায়। মহারাজ, ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, আমার হস্তে যতদিন শাসনভার ন্যস্ত আছে ততদিন আমি কাল্পনিক রাজ্যের মনোমোহন চিত্র লিখিয়া আপনার নিকট পাঠাইতে পারিব না। বাহুবলে যে সকল রাজ্য জয় করিব এবং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সুরক্ষিত করিব, আমি কেবল সেই সকল চিত্রই প্রেরণ করিব। গোয়া সম্বন্ধে ইহাই আমার অভিপ্রায়।

নরপতি ইমান্যুয়েল অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি আল্‌বুকার্কের তেজোদৃপ্ত লিপি পাঠে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন এবং লিখিলেন যে গোয়া রক্ষা কর। আমি বুঝিয়াছি গোয়া-নগরের উপরেই ভারতবর্ষে পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। আল্‌বুকার্ক পরিতৃপ্ত হইলেন—ভারতবর্ষের অদৃষ্টপরীক্ষা সমাপ্ত হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভারত।*

(দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ-পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।)

যথা দেশ দেশান্তর, পর্য্যটিয়ে পান্থবর,
হেরে নানা দৃশ্য মনোরম ;
নবীন বান্ধব সনে, নব প্রেম আলাপনে,
করে সুখে সময় যাপন ;
কিন্তু যদি সে সময়, সমুখে উদয় হয়,
স্বদেশ-সম্ভূত তরু-লতা,
সব দুঃখ তিরোহিত, স্মৃতি-পথে বিকটিত,
স্বদেশের সুধাময় কথা॥
আমরাও সেই মত, অবিরত থাকি রত,
নানা মত কাজেতে জড়িত।
থাকিয়াও দেশান্তরে, থাকি যেন দেশান্তরে,
নানা ভাবে চিত আন্দোলিত॥
বিদেশের রীতি নীতি, বিদেশের কাব্য স্মৃতি,
অধ্যয়ন দিবস যামিনী।
তাই আজ পান্থরূপ, হেরি মেলা অপরূপ,
মনে পড়ে ভারত কাহিনী॥
প্রকৃতি প্রমোদোদ্যান, ভারত সুখদ স্থান,
স্বর্ভাবের শোভার নিলয়।
মাধবী-মল্লিকাশ্রম, কোকিলের কুঞ্জবন,
গর্ভ যার হীরা মণিময়॥

---

* চৈত্র সংক্রান্তি শনিবার ১৭৮৯ শক—শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত "চৈত্রমেলার" সভায় পঠিত।

তুঙ্গ শৃঙ্গ অগোচর, অভ্রভেদী ধরাধর,
চারি ধার করে যার রোধ।
লক্ষ লক্ষ স্রোতস্বতী, বহে যথা বেগবতী,
হেরে যারে হয় হেন বোধ॥

ভারত স্বরূপযুতা, প্রকৃতির প্রিয় সুতা,
স্বভাবের শোভার প্রতিমা।
প্রবাহিনী শত শত, সেবিয়া কিঙ্করী মত,
সম্পাদিছে সৌন্দর্য্য গরিমা ;
ভারত দুর্ল্লভ দেহে, প্রকৃতি জননী-স্নেহে,
পরায়েছে বিচিত্র ভূষণ।
পর্ব্বত প্রাচীর দিয়া, জল দল বিস্তারিয়া,
রাখে তারে করিয়া বেষ্টন॥

কিন্তু কি বিরূপ কথা, নিদারুণ মনোব্যথা,
আছে যার এমন সম্বল,
কিসের কারণে তার, অশ্রুনীরে অনিবার
ভাসমান নয়ন যুগল॥?

প্রকৃতির দুঃখ গেল, এইতো বসন্ত এল,
পাত হলো শীতের পীড়ন।
হিমালয় ক্ষীণকায়, বিগত উত্তর বায়,
মৃদু বহে মলয় পবন॥

নবীন পল্লব ভরা, নব ফুলে আলো করা,
শোভে তরু নগরে গহনে।
পাইয়ে নূতন প্রাণ, সুতানে করিছে গান,
সুললিত বিহঙ্গমগণে॥

চক্রে ঘোরে ঋতু ছয়,　　হিমান্তে বসন্তোদয়,
সুপ্রফুল্ল স্বভাব সহসা।
কিন্তু সে বসন্ত কবে,　　প্রকাশিয়ে যবে যাবে,
ভারত গো! তব হীন দশা॥

কেমনে সুখের দিন,　　অনন্তে হইল লীন?
আর কি তা আসিবে না ফিরি।?
কোথায় প্রতাপশালী,　　প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডাবলী,
অস্ত গেল ধরায় আঁধারি॥?

বলহে ভারতবাসী,　　অকর্ম্ম মৃত্তিকারাশি,
ভীরুতায় ভীরুতা ভবন।
পড়ে কিনা পড়ে মনে,　　দাশরথি চারিজনে,
পড়ে মনে কুরুক্ষেত্রে রণ?

কেমনে কামিনীকুল,　　কেশরিণী সমতুল,
দুর্গাবতী গরা রাজ্যেশ্বরী,
স্বরাজ্য করিতে ত্রাণ,　　সমরে ত্যজিল প্রাণ,
সুকৃপাণ নারী করে ধরি॥?

হেন সব বীরবর,　　ভারতের প্রভাকর,
কোথা গেল আঁধারি ভুবনে।
যে দেশে পদ্মিনী সতী,　　জনমে সে দেশ-গতি,
হেন হবে, কে জানে স্বপনে॥

যথা রাম রঘুবরে,　　পিতৃসত্য রক্ষা তরে,
রাজ্যসুখ পরিহার করে।
যে দেশে পাণ্ডবগণ,　　রাখিতে আপন পণ,
বিপিনে বিপিনে কাল হরে॥

শাক্যসিংহ যেই দেশে,　　সহজে সন্ন্যাসী-বেশে
পাশরিয়ে পিতৃরাজ্য-ধন।
ধরম প্রচার তরে,　　ফেরে দেশ দেশান্তরে,
যাউক বা থাকুক জীবন॥

কোথায় কোকিল-স্বর, কালিদাস কবিবর,
কোথা বালমিকী তপোধর্ম।
বিদ্যার আশ্রয়স্থল, কোথা ব্যাস পাতঞ্জল,
গোতম কপিল ঋষিগণ॥

যাদের সমান আর, ত্রিজগতে পাওয়া ভার,
ত্রিজগতে ঘোষে এই রব।
কোথায় বা পরাসর, ভাস্কর পণ্ডিতবর,
জ্যোতিষের মূলাধার সব॥

ক্ষণকাল প্রকাশিয়ে, ধরাধাম আমোদিয়ে,
কোথা গেল আঁধারি ভুবনে।
যে দেশেতে লীলাবতী, জনমে, সে দেশ-গতি,
হেন হবে কে জানে স্বপনে॥

হায় কি হইল শেষ, দাহন করিছে দেশ,
সুরায় অনল স্রোতস্বতী।
কত শত পরিবার, পুড়ে হল ছারখার,
হৃদি ফাটে দেখিয়ে দুর্গতি॥

কি কব লোকের গুণ, সুরাতে হতেছে খুন,
তবু তায় না ছাড়িতে পারে।
প্রদীপ পতঙ্গ প্রায়, প্রমত্ত হইয়ে যায়,
না ভাবি কি হল, হবে পরে॥

জননীর হাহাকার, বনিতার অশ্রুধার;
দ্রবিতে কি পারে কভু তায়।
সন্তানের আর্ত্তনাদ, পরিজন-কুৎসাবাদ,
ভুধরে মলয়াঘাত প্রায়॥

লোকের কি ব্যবহার, সদা করে কদাচার,
বলিতে অনল দহে কায়।
সবে তাই ধরে পরে, অখ্যাতি ঘোষণা করে,
কঠোর কুলিশাঘাত প্রায়॥

বীর্য্যহীন শীর্ণকায়,　　　দেহ ভরা ভীরুতায়,
মুখে মারে আকাশ পাতাল।
প্রচুর ধনের আশে,　　　মনোবীর্য্য গর্ব্ব নাশে,
হাতে সদা তোষামোদ-জাল॥

ছি ছি, হে ভারতবাসী,　　　এমন কুকর্ম্মরাশি,
সাজে কি ভারতবাসী হোয়ে।
ক্ষণতরে ক্ষমা দাও,　　　নয়ন মিলিয়া চাও,
উঠ উঠ দিন যায় বোয়ে॥

এই বেলা ভাঙ্গ ঘুম,　　　ভারতে লেগেছে ধুম,
উঠেছে যে নব্য সম্প্রদায়।
নিষ্কষিয়ে জ্ঞান-অসি,　　　বিনাশিয়ে ভ্রমরাশি,
দেশের উন্নতি দিগে ধায়॥

নব রাগে হয়ে স্ফীত,　　　নব তেজে উত্তেজিত,
নব রসে হোয়ে বলীয়ান।
ভারত গো! তোমা তরে,　　　আত্ম সমর্পণ করে,
আজ তার দেখ গো প্রমাণ॥

দেখ সব একত্তরে,　　　সৌহৃদ্য-শৃঙ্খল পোরে,
তব কথা করে উত্থাপন।
দুঃখের যামিনী ঘোর,　　　ত্বরায় হইবে ভোর,
দেখ মাতা মিলিয়ে নয়ন॥

নারীকুল শিল্পকাজ,　　　চারিদিকে হেরি আজ,
আশালতা উত্তেজিতা হয়।
ফিরে পাব কত দিন,　　　হবে তুমি শোকহীন,
আস্যে তব হাস্যের উদয়॥

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা।

ভারতবাসিনী রমণীগণের শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম একদল, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন সাব্যস্ত করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। মার্কিনে, বিলাতে ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সভ্যদেশে সম্প্রতি যেরূপ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতেছে ভারতরমণীগণেরও সেইরূপ ব্যবস্থা করা ইঁহাদের লক্ষ্য। নৃত্যগীতাদি কলাশিক্ষা এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণকেও বোর্ডিংএ রাখায় ইঁহাদের কোন আপত্তি নাই। দ্বিতীয় দল বলেন, স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখা প্রয়োজন তবে অধিক নহে। লিখিতে পড়িতে ও হিসাব-কিতাব করিতে শিখিলেই যথেষ্ট হইল। ইঁহারা কিন্তু শিক্ষা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। বস্ত্রালঙ্কারের ন্যায় ইহাও একপ্রকার বিলাসের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং তাহা না হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় বলিয়া মনে করেন না এবং সেই হেতু তাহার জন্য ব্যয়বাহুল্য বা সুবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত নহেন।

তৃতীয় দল স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

চতুর্থ দল দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভূত হইলেও তাঁহাদের কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমতী তপস্বিনী মাতাজী মহারাণীর প্রবর্ত্তিতা মহাকালী-শিক্ষা-প্রণালী ইহারা হিন্দুরমণীর সবিশেষ উপযোগী

সকলেই আপন আপন মত সমর্থন করিবার জন্য নানাবিধ যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং অন্যমতাবলম্বীকে ভ্রান্ত মনে করেন। ইহা স্বভাবসিদ্ধ ও মানবপ্রকৃতির বিশেষত্ব। আমরা কোন পক্ষেরই ওকালতনামা না লইয়া পুরাকাল হইতে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের আলোচনা করিব এবং অতীতের পার্শ্বে বর্ত্তমানকে রাখিয়া তুলনা করিয়া দেখিব তাহাতে যাহা হয় তাহাই হইবে। স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণের কি মত ও বিধান আছে তাহাই প্রথম বিবেচ্য।

১৯খানি স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুর ইহসংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য উঠা-বসা-প্রভৃতি অতি সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া, আধ্যাত্মিক গুরুতর সাধনাদি পর্য্যন্ত নানা ব্যাপারের নানা প্রকার বিধি-নিষেধ আছে। বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা বা বিধিনিষেধ লক্ষিত হয় না।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন। স্ত্রীশিক্ষার সাপক্ষে এই বচনটীই সর্ব্বত্র উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ইহা স্মৃত্যুক্ত বচন নহে। যদি বলেন যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের বচন বা বিধিনিষেধ স্মৃত্যুক্ত বিধিনিষেধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এ স্থলে আমরা মস্তক অবনত করিতে পারিলাম না। যাঁহারা মহা-নির্ব্বাণতন্ত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে কলিতে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে মন্বাদি স্মৃতির স্থান অধিকার করাইবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আছে। ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবকে বক্তা করিয়া বলিয়াছেন যে, কলিতে বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া তন্ত্রমার্গই অবলম্বন করিতে হইবে অন্যথা বিশেষ প্রত্যবায় ও মহা অনর্থ সঙ্ঘটিত হইবে। "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং" ইত্যাদি আদেশ রৌরবাদি নরকভোগের ভয় প্রভৃতি দেখানও হইয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় নাই। আর্য্যসমাজ তাহার সাধনার অংশটুকু লইয়া, যে অংশটুকু মন্বাদি স্মৃতির স্থান

অধিকার করিবার জন্য দাবী করিয়াছিল, তাহা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে যেখানে কোন বিরোধ নাই তাহাই গ্রাহ্য হইয়াছে। উদ্ধৃত বচনে যে শিক্ষণীয়া শব্দ আছে তাহার অর্থই বা কি? বিদ্যালয়ে গুরু, উপাধ্যায়, প্রফেসর, মাষ্টার, পণ্ডিত বা গুরুমার নিকট অথবা তদ্বৎ অন্যকোন ব্যক্তির নিকট গ্রন্থাদি পাঠে যে বিদ্যালাভ হয় তাহাই বর্ত্তমান শিক্ষা নামে অভিহিত হয়। যদি কোন গৃহলক্ষ্মী, আদর্শপত্নী, পতিব্রতার মূর্ত্তি, স্ত্রীজ্ঞাতব্য সর্ব্বব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী হইয়াও লিখিতে ও পড়িতে না পারেন, তিনি অশিক্ষিতা। নব্যকোষে স্ত্রীব্যাপারে শিক্ষাশব্দের অর্থ, রচনা করিতে পারে। উদ্ধৃত বচনের শিক্ষণীয়া শব্দের অর্থ এ নহে যে, বালকের ন্যায় বালিকাও গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষকাল বিদ্যাশিক্ষা করিবে!

নানাবিধ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুগৃহে বাসেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিদ্যালয় বা স্কুল তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এবং মাষ্টার, পণ্ডিত ও গুরুমা গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া বালকদের ন্যায় বালিকাদের শিক্ষাদানের সাপক্ষে যাঁহারা উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করেন, তাঁহারা বচনোক্ত শিক্ষণীয়া শব্দের অর্থের বিচার না করিয়াই তাহা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ বা ব্যবস্থা নাই, অথচ নারীগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, শিষ্টাচার ও পাতিব্রত্য-পালন সম্বন্ধে বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমানে শিক্ষাশব্দের যে অর্থ করা হয়, শাস্ত্রকারেরা শিক্ষাশব্দের সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

পুরুষ ও নারী যেমন আকৃতি ও প্রকৃতিতে পৃথক্, ভগবানের সৃষ্টির

ও বহির ভেদে দুই অংশে বিভক্ত। সুসভ্য সমাজ পুরুষকে বহিরংশের এবং রমণীকে অন্তরংশের অধিকার দিয়া সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। তদনুসারে তাহাদের শিক্ষা, কার্য্য ও বেশভূষাও আবহমানকাল পৃথক হইয়া আসিতেছে, (বর্ত্তমানে সভ্যসমাজে এই ব্যবস্থার যে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহার ফল কি ও পরিণামেই বা কি হইবে, তাহার আলোচনা করিবার এ স্থান নহে) আর্য্য শাস্ত্রকারেরাও পুরুষ ও স্ত্রীগণের শিক্ষাসম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পুরুষকে সমাজের বহির্দ্দেশে থাকিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তজ্জন্য বহুদিনের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার আলোড়ন করা তাঁহার প্রয়োজন। সেই জ্ঞানভাণ্ডার গুরুপরম্পরার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে তাহা গ্রন্থাকারে একত্রে সন্নিবেশিত থাকিলেও তাহার রহস্য উদ্ভেদ-কল্পে গুরুর প্রয়োজন। এই কারণে গুরুর নিকট শিষ্য কিরূপে বিদ্যালাভ করিবে, তাহাতে কি প্রকারে কোন অন্তরায় না ঘটে তাহার জন্য বিবিধ বিধিনিষেধ আছে। আর স্ত্রী, পুরুষকে অবলম্বন করিয়া ভার্য্যা, কন্যা, ভগিনী, জননী প্রভৃতিরূপে মানবের শান্তিস্থান, সাধনস্থান, সুখসচ্ছন্দের স্থান গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া সমাজের অন্তরাংশ অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এখানকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা পুস্তকপাঠে হয় না, গৃহে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হাতে-হেতেরে শিক্ষালাভ করিতে হয়। এখানে গুরুবিশেষ নাই, দশজনের দেখিয়া দশজনের কাছে শিখিয়া কার্য্যদক্ষ হইতে হইবে। শিষ্টাচারাদি সমাজ-শাসনের অন্তর্ভূত বিষয়গুলি ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, তাহা পুস্তকপাঠে শিখিতে হয় না, পুরস্ত্রীপরম্পরায় তাহা প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে। যে সময় বালক গুরুগৃহে বাস করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিবে, বালিকা সেই সময় স্বগৃহে মাতাদির নিকট অথবা স্বামীগৃহে শ্বশ্রূ প্রভৃতির নিকট গৃহকার্য্য

ধর্ম্মাদি শিক্ষা করিয়া গৃহলক্ষ্মীনামের যোগ্যা হইবেন এবং সুসন্তান প্রসব করিয়া সৃষ্টির কার্য্য সুনিষ্পাদিত করতঃ অন্তে অনন্ত শান্তিধামে অনন্ত শান্তিসুখ ভোগ করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। বালকদিগের ন্যায় গুরুসকাশে গ্রন্থাদি পাঠপূর্ব্বক বিদ্যার্জন তাঁহাদের আদৌ প্রয়োজন মনে করা হয় নাই। সুতরাং তাহার ব্যবস্থাও নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের বচনের ন্যায়, গার্গী মৈত্রেয়ীর নামও সর্ব্বদা শ্রুত হয়, এবং তাঁহাদিগকে স্ত্রীশিক্ষার সাপক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রায়ই আহ্বান করা হয়। তাঁহাদের নাম করিয়া অপরে সাক্ষ্যদান করিলেও আর তাঁহাদের সাক্ষ্য দান করা হইল না। দৈবঘটনায় এই দুইচারিটী নাম গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা আদর্শস্বরূপা। এরূপ কত শত শত গার্গী মৈত্রেয়ী ভারতকে পুণ্যভূমি করিয়া, সুসন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া, দেশের জাতির ও জনসাধারণের হিত-সাধন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শিক্ষার বর্ত্তমানের অর্থে ইঁহারা শিক্ষিতা রমণী নহেন। ইঁহাদের বিদ্যা বিএ, এমএর বিদ্যা নহে, সে বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, সে জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। সে বিদ্যা স্কুলে-কলেজে পড়িয়া লাভ হয় নাই, তাহা স্বগৃহের প্রাঙ্গণে স্বামী পুত্রের মধ্যে থাকিয়া তাহাদেরই কার্য্য করিতে করিতে লব্ধ হইয়াছে। তাহা উপাধ্যায়, শিক্ষক বা গুরুমার কাছে শিক্ষা নহে, সৎসঙ্গের ছায়ায় থাকিয়া তাহা লব্ধ। ব্রহ্মচারিণী গার্গী, পতিব্রতা সংসারে বীতস্পৃহ তত্ত্বজ্ঞানপিপাসাবতী মৈত্রেয়ী নগর-গ্রামপল্লী হইতে বহুদূরে অরণ্য-মধ্যে হিংসাদ্বেষবিহীন বিলাসবর্জ্জিত শান্ত, পুণ্য আশ্রমপদে অনবরত ধর্ম্মের বায়ু সেবন করিয়া, ধর্ম্মময় জলপান, ধর্ম্মময় বন্য ফলমূল ভোজন করিয়া দিবানিশি সৎসঙ্গ জাহ্নবী জলে স্নান করিয়া যে নির্ম্মল পবিত্র সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কোথায়?

খনারও নাম শুনিতে পাওয়া যায় ; লীলাবতীর সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। খানার সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে খনার বচন দেখিয়া ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বঙ্গদেশীয়া রমণী। বহুদর্শনের গুণে ও অনুভব-বলে এবং পিতা বা ঐরূপ অন্য কোন বিদ্বান জ্যোতিষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ করিয়া আপনার তীব্র বুদ্ধির সাহায্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়া চলিত কথায় সেইগুলি পদবদ্ধ করেন। এরূপ পদসিদ্ধান্ত বঙ্গদেশে বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায় তবে তাহা একত্রে সংগৃহীত নাই। ইঁহারা যে বিদ্যালয়ে বা পাঠশালে পড়িয়া বিদুষী হয়েন নাই, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। খনা লিখিতে পড়িতে জানিতেন কি না, সে বিষয়েও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তাঁহার বচন দেখিয়া ইহাই বোধ হয় যে, যদিও বা জানিতেন তাহা অতি সামান্য।

প্রাচীন ভারতে যে বর্ত্তমানের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না তাহার আর এক প্রমাণ সংস্কৃত নাটকগুলি। নাটককারেরা যখন বিদ্বান বা শিক্ষিত ব্যক্তিকে কথা কহাইয়াছেন তাহাদের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু অশিক্ষিত বা স্ত্রীলোকের ভাষা প্রাকৃত দিয়াছেন। অন্ততঃ ভাষাজ্ঞানব্যাপারে স্ত্রীগণ অশিক্ষিত ছিলেন।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা অন্যপ্রকার ছিল ; গৃহকার্য্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, পাতিব্রত্য, শিষ্টাচার প্রভৃতি তাঁহাদের শিক্ষার বিষয়ীভূত ছিল। তবে যে স্ত্রীগণের লেখাপড়া শিক্ষা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল এমন নহে। বড় বড় পণ্ডিতেরা কখন কখন আপনার কন্যাকে, ধনাঢ্য লোকেরা পণ্ডিতের সাহায্যে তনয়াকে লেখাপড়া শিখাইতেন। সেরূপ শিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে যাইয়া গুরু বা

প্রথমে ইহার প্রচলন করেন। আধুনিক সময়ে এমনও দেখা যাইত যে, কোন বড়লোকের বাড়ীতে পাঠশালা থাকিলে দুই একটী ছোট মেয়েও ছেলেদের সঙ্গে পাঠশালায় লিখিত ও পড়িত।

পাতিব্রত্যই প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকের প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল। এই পাতিব্রত্য ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পতি স্ত্রীর দেবতা, বিলাসের বস্তু নহে। এবং স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ কেবল সামাজিক ব্যাপার নহে, কেবল সুখসাধক নহে। ইহা চিরন্তন, মৃত্যুতেও ইহার চ্ছেদ হয় না, জীবন্তে ত কথাই নাই। ভারতরমণীর পাতিব্রত্য একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব, এখানে তাহার আলোচনার সম্ভাবনা নাই, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি জানকী, মায়ামানুষবিগ্রহ আদিপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের ভার্য্যারূপে অবতীর্ণা হইয়া, স্বামীসহ বনবাস, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ত্রিভুবনবারণ রাবণের প্রলোভন ও ত্রৈলোক্যশ্রী বামপদে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অভূতপূর্ব্ব অগ্নিপরীক্ষা দিয়া সাক্ষাৎ বৈশ্বানরের শিরে আরূঢ় হইয়া, সংসারে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত্রিভুবনে পুণ্যভূমি ভারত ব্যতীত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এ আদর্শ সেই প্রাচীন শিক্ষার ফল। দক্ষযজ্ঞের অপূর্ব্বদৃশ্য, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত সতীর পিতৃপ্রাপ্ত দেহের পরিত্যাগ অতি মহান আদর্শ ভারতের আর্য্যজাতির মধ্যেই লক্ষিত হইয়াছে, এ ব্যাপার সেই পুরাতন শিক্ষার ফল। সাবিত্রী যে তেজে সাক্ষাৎ যমকেও পশ্চাদ করিয়া প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মৃতপতির প্রাণদান করিতে পারিয়াছিলেন, সে সেই পুরাতন শিক্ষার ফল। অত্রিপত্নী অনসূয়া সতী কিনা তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য দেবত্রয় অত্রির আশ্রমে গমন করেন এবং পতিব্রতার শক্তিপ্রভাবে তিনটী নবপ্রসূত শিশুরূপে পরিণত হইয়া দত্তাত্রেয়ের উৎপত্তি করেন, এই

রাজভবনে দাসদাসীসেবিতা রাজকুমারী সুকন্যা, অন্ধ চ্যবনের পাণিগ্রহণ করিয়া দাসীর ন্যায় তাঁহার যে সেবাশুশ্রূষা করিতেন, এবং পরিণামে আপনার পাতিব্রত্যবলে অশ্বিনীদ্বয় দ্বারা স্বামীকে যে নবযৌবনসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন, সে সেই প্রাচীন শিক্ষার ফল। দময়ন্তী দিক্‌পালগণকে তুচ্ছ করিয়া নলরাজাকে স্বামিরূপে বরণ করেন, পরে কলির তাড়নে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে অপার পাতিব্রত্য রক্ষা করিয়া প্রাণ হইতে প্রিয় ইষ্টদেবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া জগতে ধন্যা হইয়া গিয়াছেন, সে সেই প্রাচীন শিক্ষার ফল। যে সকল স্বর্ণগর্ভা রমণী, ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, ও দর্শনকার ও শাস্ত্রকারগণকে জগতে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই প্রাচীন শিক্ষার ফল।

অতি আধুনিক সময়েও যে সকল পুরন্ধ্রী হিন্দুর গৃহে অধিশ্বরী ছিলেন, তাঁহারা নিরক্ষর বা আধুনিক মতে অশিক্ষিতা হইলেও, আপনাদের শিক্ষাবলে গৃহে গৃহে যে সুখ-শান্তি রাখিতেন, তাহা এখন কোথায়? তথায় প্রসূতির সুচর্য্যা হওয়ায় তাঁহাদের শরীর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ থাকিত এবং সন্তানও সুস্থ ও সবল হইত। তাঁহাদেরই সুশিক্ষার গুণে বালকবালিকার অকালমৃত্যু অনেক স্থলে নিবারিত হইত, এবং স্ত্রীগণ এখনকার ন্যায় রুগ্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত না। তাঁহাদের গুণে হিন্দুর ঘরে, শিষ্টাচার, লোকাচার ও ধর্ম্মাচরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। সে পুরন্ধ্রীকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, তাঁহাদের অধিকৃত স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। যে শিক্ষার গুণে পুরাণ, ইতিহাস ও জাতীয় ইতিবৃত্ত তাঁহাদের নখাগ্রে থাকিত, এবং তাহারই আবৃত্তি করিয়া তাঁহারা গৃহের বালকবালিকাদিগের চিত্তবিনোদন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান করিতেন সে শিক্ষার আদর গিয়াছে, সুতরাং দেশের কথার পরিবর্ত্তে,

বিদেশের কথা শিখিতেছে, দেশের আদর্শ অনাদরে দূরে ফেলিয়া বিদেশীর আদর্শে মুখ দেখিতেছে, দেশের শিষ্টাচার ভুলিয়া বিদেশীয় শিষ্টাচারে সামাজিক জীবন বিকৃত করিয়া জাতীয়ত্বের গোর করিতে বসিয়াছে। ইহারা সাধনধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা-শিক্ষাবিভাগ• হইতে বিতাড়িত। তাহাতে যে মহাবিষময় ফল উৎপন্ন করিতেছে। তাহার পরিণাম কি ভয়াবহ তাহা ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

মিশনারীরা যখন দেখিলেন যে, ভারতের ধর্ম্ম হিন্দুরমণীর হস্তে ন্যস্ত, তথায় তাঁহারা হিন্দুর বালিকার শিক্ষাব্যপদেশে তাহার প্রাক্‌পুরুষ-ক্রমাগত দেশীয় ভাবের ও ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশে বালিকাদিগের এবং পরে জেনানামিশনের প্রবর্ত্তন করেন। কালচক্রে ও পরিবর্ত্তনস্রোতে লোকের বালিকার কথঞ্চিৎ লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ক্রমে হিন্দু বালিকা মিশনারীর বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল। স্বধর্ম্মের জন্য মিশনারীরা ধর্ম্মপ্রাণ লোকের নিকট যথেষ্ট অর্থ পাইয়া থাকেন, সেই অর্থব্যয়ে প্রলোভনেরও ছড়াছড়ি করিতে লাগিলেন, এদিকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কি বীভৎস ব্যাপার হয় অভিভাবকেরা তাহার কোন সংবাদই রাখেন না, রাখিলেও সে বিষয় লইয়া আন্দোলন বা বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করেন না। এই সকল মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী বা গুরুমারা প্রত্যহ যথানিয়মে হিন্দুদেবদেবীর অশ্রাব্য নিন্দাবাদ করিয়া বালিকাদিগকে স্বধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ করিবার জন্য যত্নবতী হয়েন। তাঁহারা জানেন যে, বালক-হৃদয়ে যে সংস্কার পড়িয়া যাইবে তাহা দুরপনেয়। এক দিন না এক দিন সে বিষবীজ অঙ্কুরিত হইয়া যে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন করিবে, তাহার বায়ুতে হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব শুকাইয়া যাইবে, জাতীয়ত্বের লোপ ও ধর্ম্মের অন্তর্ধান হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের রাজ্য বিস্তার করিবে।

সরলপ্রাণ বালিকা গুরুমার মুখে প্রতিদিন শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুকে পাথর, শিবকে তদ্বৎ, তুলসীকে বৃক্ষ প্রভৃতি মনে করিতে থাকে, এবং গৃহে পিতামাতা বা অন্য কাহাকে তাঁহাদের পূজা করিতে দেখিলে, পরিহাস ও উপদেশ দিতেও ত্রুটি করে না, তজ্জন্য হয়ত ভর্ৎসিত হইয়া গৃহের গুরুজনের বাক্যও আবার গুরুমার বাক্য অপেক্ষা গুরুতর জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করে, কিন্তু চিত্তে যে চিড়টুকু রহিয়া গেল তাহা আর সারিল না, তাহা ক্রমে বাড়িবে, মাতা হইতে সন্তানে সে চিড় প্রবর্ত্তিত হইবে ও আয়তনে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এবং হয়ত পরিণামে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গুরুমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। হিন্দুর মেয়ে খ্রীষ্টানী বিদ্যালয়ে গিয়া অনাচার, কদাচার ও কুশিক্ষা বিস্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাচারবহুল ও ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানবিহীন বালকগণের বিদ্যালয়ে শিক্ষা এই প্রকার স্ত্রীশিক্ষার সহিত মিলিত হইয়া, হিন্দুর ও মুসলমানের ধর্ম্ম ও জাতীয়ত্বকে যার-পর-নাই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবার ইচ্ছায় মিশনারীরা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মিশনী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বিকৃতবুদ্ধি শিক্ষিত দল দ্বার খুলিয়া দিলেন। যে গৃহের দালানে শ্রীমৎভাগবৎ রামায়ণ প্রভৃতি শ্রুত হইত, সেই গৃহের দ্বিতলে বা গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া মিশনী ঠাকুরাণী হিন্দুর দেবদেবীর ও ধর্ম্মের অশ্রাব্য নিন্দা আরম্ভ করিলেন। শাবল লইয়া পাকা দেয়ালে আঘাত দেওয়া আরম্ভ হইল, শাবল ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল বটে, কিন্তু দেয়ালকে ক্রমে দুর্ব্বল করিতে লাগিল, কোথাও বা একটু আধটু ফাট ধরাইল, কোথাও বা দুই একখানা ইষ্টকও খুলিল, যখন কুলের কুলবধূ, কন্যা বা ভগিনী মিশনীর প্রলোভনে গৃহের বাহির হইয়া দাঁড়াইল, যখন কুশিক্ষার ফল শিক্ষিতার যথেচ্ছাচারে প্রতি-ফলিত হইতে লাগিল

কেহ কেহ চক্ষু বলপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন— ইজ্জতের ভয়।

অনেকে সাহেব মেমের সঙ্গের প্রলোভনে, লালমুখের মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, কোথাও বা পুরস্কারে পুতুল বা কাপড়খানার খাতিরে মিশনারী হস্তে কন্যা, ভগিনী বা স্ত্রী ও বধূকে সমর্পণ করিয়া থাকেন এবং বলেন যে একটু আধটু ধর্ম্মের বা দেবদেবীর নিন্দা করিলেই বা তাহাতে আর কি আসে যায়। কয়টা মেয়ে তাহাতে খ্রীষ্টান হয় বা নাস্তিক হয়? কথাটা কেমন বলুন দেখি? ভাল, মিশনীঠাকুরাণী বা গুরুমা যদি কৃষ্ণ, বিষ্ণু বা মহাদেবের নিন্দা না করিয়া বালিকার পিতা বা পিতামহকে অশ্রাব্য গালি দেয়, জিজ্ঞাসা করি বালিকার অভিভাবক কি তাহা সহ্য করিতে পারেন, বোধ হয় সহ্য করা দূরে থাকুক, লগুড় হস্তে মহামারি ব্যাপার উপস্থিত করেন। তিনি না হউন, তাঁহার পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি যাহাদিগকে ইহপরকালের নিশ্রেয়লাভের একমাত্র উপায় মনে করিয়া পূজা অর্চ্চনা ও স্তব স্তুতি করিয়া শান্তিসুখলাভ ও আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতেন, তাঁহার পক্ষে আপনার কন্যা বা ভগিনীকে তাঁহাদেরই নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে দেওয়া নিতান্ত অসার ও কাপুরুষের কার্য্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিশনারী বিদ্যালয় বা মিশনী হিন্দু বা মুসলমানের বালিকার শিক্ষাস্থলে শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে না। যিনি বাস্তবিকই হিন্দু বা মুসলমান তিনি কখনই বালিকাকে শিক্ষার্থ এরূপ কুস্থানে পাঠান না, মিশনীর দ্বারা শিক্ষা দেওয়ান না।

এই কারণেই ক্রমে বে-মিশনারি বালিকাবিদ্যালয় হইতে আরম্ভ হইল। এক ভস্ম আর ছাই। বিদ্যালয়ে কোন প্রকার ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা রহিল না। বালকের উপযোগী শিক্ষা বালিকার পক্ষেও

পড়িয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহার চিত্তকম্পনের কাঁটাটীকে উত্তরাভিমুখে নিয়ত রাখিবার জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন তাহাই সরাইয়া লওয়া হইল। তাহার পর বালিকা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে বদ্ধ রহিল, খেলাধূলা বাদে তাহার যে সময়টুকু রহিল তাহাও পাঠাভ্যাসে অতিবাহিত হইতে লাগিল, তবে সে বেচারা গৃহকার্য্য স্ত্রীজ্ঞাতব্য শিষ্টাচার প্রভৃতি শিখে কখন? অথচ বিদ্যালয়ে এ সকল শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। সেই বালিকাকে ১১।১২ বৎসর বয়সে-না হয় ২।৩ বৎসর পরেই পরের ঘরে যাইয়া একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের মধ্যে পড়িয়া সকলের মানরক্ষা করিয়া দশজনের একজন হইয়া থাকিতে হইবে, যোগীর ন্যায় রাগ লোভ প্রভৃতি দমন করিতে হইবে, চাকর-চাকরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহদেবতাপর্য্যন্ত সকলের খবর লইতে হইবে, আর কত প্রকার ব্যাপার আছে যাহা শিক্ষা না থাকিলে নিন্দা হয় ও কষ্ট পাইতে হয়। এ শিক্ষা বালিকার কোথায় হয়? যে সকল বে-মিসনারী বিদ্যালয় আছে তাহাতে ত এরূপ কোন শিক্ষারই ব্যবস্থা নাই। সরকারের ধর্ম্মব্যাপারে নিরপেক্ষতা থাকায়, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-বিশেষের শিক্ষা দেওয়া নিষেধ। এ আইনটী কেবল হিন্দুর জন্যই হইয়াছে; কারণ খ্রীষ্টানের ছেলের বা মেয়ের খ্রীষ্টানী বিদ্যালয়ে ধর্ম্মভিত্তিক শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহাকে কলাশিক্ষা সহ ধর্ম্ম শিক্ষা রীতিমত দেওয়া হয়। মাদরাসায় মুসলমানের শিক্ষাও সেইরূপ হয়। কেবল ধৌত বিদ্যালয়ে মুসলমান বা খ্রীষ্টানের বালকবালিকা থাকুক আর নাই থাকুক, ধর্ম্মশিক্ষা নিষেধ। তাহার পর ধুয়া উঠিল ধর্ম্মশিক্ষা না দেওয়া হউক নীতিশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম্মহীন নীতিশিক্ষা যে কিরূপ নীতিশিক্ষা তাহা বুঝা যায় না। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া নীতিশিক্ষা হইতেই পারে না, আর যদি বা হয় তাহা নিরপেক্ষ

বা দায়িত্ববর্জ্জিত নাস্তিক শিক্ষা। এমন কি, কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে যে সকল বড় বড় বিদ্যালয়ে সরকার হইতে একটী পয়সাও পাওয়া হয় না, তাঁহারাও ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন না। অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম্মে নানা সম্প্রদায় থাকায় বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা দুষ্কর। তাঁহারা যে ভ্রান্ত, মহাকালীপাঠশালা তাহা সপ্রমাণিত করিয়াছে। কৈ, মহাকালীপাঠশালার ধর্ম্মশিক্ষাব্যাপারে আজ ১৩ বৎসরের মধ্যে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক আপত্তি উপস্থিত হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মে নানা সম্প্রদায় থাকিলেও একটী সাধারণ স্থান আছে, সেখানে সকলেই এক। আর এক কথা, গোঁড়ামির দিন চলিয়া গিয়াছে। বিল্বপত্রকে তেকরকার বা মলমস্নার পাতা বলা, কালীকে আঁধারে ঠাকুর বলার কাল গিয়াছে, যদিও বা থাকে তাহা জনকয়েক অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই আছে। তাহারা গণনার মধ্যেই আইসে না। ধর্ম্ম ও নীতিহীন শিক্ষা বালক অপেক্ষা বালিকার পক্ষে অধিকতর অনর্থকারী।

পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীমতী মাতাজী মহারাণী স্ত্রীশিক্ষাকে নূতন মূর্ত্তিতে জনসাধারণের সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করেন। এক্ষণে লোকে সেই স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যার অনুরূপে সিদ্ধান্ত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। বাঙ্গালার স্ত্রীশিক্ষাবিভাগের কর্ত্রী মিস্ লিলিয়ান এক মহাকালীপাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া এবং বালিকার ধর্ম্মনীতি শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়া ডাইরেক্টরের অনুমতি লইয়া হিন্দু-বিদ্যালয়মাত্রে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থায় কোনপ্রকার আপত্তি নাই বলিয়া ঘোষণা করেন। এবং মহাকালীপাঠশালায় যেরূপ শিক্ষা হয়, প্রায় তাহার সকলগুলির অনুমোদন করেন, কেবল শিক্ষাবিভাগের নির্দ্ধারিত পুস্তক পড়ান হইবে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। গভর্ণমেণ্টও

যাহাতে বেমিসনারি শিক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণাদির উচ্চজাতির শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। মিস্ লিলিয়ান বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে পূজনীয়া মাতাজী এই শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতকরণের ভার লয়েন। কিন্তু নানা কারণে এবং লোকাভাবেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে বক্তব্য এই যে সকল শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইবে তাহাদেরও শিক্ষা যদি ধর্ম্ম ও নীতিহীন হয় তবে সেই এক ভস্ম আর ছাই হইয়াই থাকিবে। তাহার পর উচ্চশিক্ষার কথা। উচ্চশিক্ষা হিন্দু বা মুসলমান রমণীর প্রয়োজন বা উপযোগী কি না সে বিষয়ে বিতর্ক না করিয়াই দেখা যায় যে তাহা সময় সাপেক্ষ। তাহা লাভ করিতে যে সময় লাগে তাহার বহুপূর্ব্বেই হিন্দু ও মুসলমানের বালিকার বিবাহ হইয়া যায় এবং তাহারা সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রে নূতন শাসনপ্রণালীর অধীনে গিয়া পড়ে। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় সে বিষয় প্রসঙ্গমধ্যেই আসিতে পারে না।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা প্রাচীন মতের বর্ণে বর্ণে অনুসরণ করেন। কিন্তু কালক্রমে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই পরিবর্ত্তন অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে বালকের ন্যায় বালিকার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এতাবত দেখা গেল যে, পুরাকালে বালকবালিকা উভয়ের বিশুদ্ধ শিক্ষা হইত। বালককে সেই শিক্ষার জন্য স্থানান্তরে গুরু-গৃহে যাইতে হইত, কিন্তু বালিকার স্বীয়গৃহেই শিক্ষাস্থান ছিল; সে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য গৃহকার্য্যে নৈপুণ্য, ধর্ম্মকর্ম্ম ও শিষ্টাচার শিক্ষা এবং যথানিয়মে পাতিব্রত্যপালন। আর্য্যসমাজের নিয়মানুসারে চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কারণ ব্রহ্মচারী, যতি, ভিক্ষুক সকলেই গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া সাধনাদি করিতে সক্ষম হয়েন। [illegible]

ত্যাগীর ভার গৃহস্থের উপর, দীনদরিদ্র অনাথের ভার গৃহস্থের উপর। গৃহস্থের যাবতীয় ভার গৃহলক্ষ্মী হিন্দুরমণীর উপর ন্যস্ত, সন্তানের পালন, পোষণ ও চরিত্রগঠন সেই গৃহলক্ষ্মীগণের হস্তে ন্যস্ত, ধর্ম্ম সেই গৃহলক্ষ্মীগণকেই অবলম্বন করিয়া অদ্যাপি দণ্ডায়মান। এই সকল গুরুভার বহনোপযোগী শিক্ষা কি বিদ্যালয়ে সম্ভব? সকলেই মনে করিতেন বিদ্যালয়ে সে শিক্ষা হইতে পারে না। মহাকালীপাঠশালা আজ বার বৎসর কাল দেখাইয়া দিতেছে যে, সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা হয়,—গৃহলক্ষ্মীর, অন্ততঃ হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীর উপযোগী সাধারণশিক্ষা বিদ্যালয়ে হইতে পারে। বর্ত্তমানে যে সকল বেমিসনারী বিদ্যালয় আছে তাহার শিক্ষাও বিজাতীয়, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। মহাকালীপাঠশালা বিদ্যালয়কে প্রায় গৃহের মতনই করিয়া রাখিয়াছে। বালিকারা আপন আপন গৃহে যে ভাব দেখে, বিদ্যালয়ে যদি তাহা না দেখে, আসল আচরণ প্রভৃতিতে বিভিন্নভাব দেখে, তবেই তাহাদের মনে ক্রমশঃ অসামঞ্জস্য বদ্ধমূল হইয়া যায়, শৃঙ্খলায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ চিত্ত বিরুদ্ধভাবে ভাবান্বিত হইয়া পড়ে। কালের গতিকে হিন্দুর গৃহে যে সকল শিক্ষা লোপ পাইতে বসিয়াছে, বিদ্যালয়ে সেই সকল শিক্ষা দিবার জন্য মহাকালী পাঠশালা সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছে, হিন্দুর মেয়েকে বিকৃতভাবে ভাবাপন্ন না করিয়া অথবা মেম না সাজাইয়া হিন্দুর জাতীয় ভাবে ভাবান্বিত করিয়া দিতেছে, ধর্ম্মে অনুরাগ ও গুরুজনে ভক্তির বীজ হৃদয়ে রোপিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, অত্যুচ্চ পাতিব্রত্যের পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া তাহার মলমূত্রগুলি শিখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদিগকে ভাষাজ্ঞান এবং যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের জ্ঞানও দিবার যত্ন হইতেছে, হিসাবপত্রও শিখান হয়। রন্ধনাদি গৃহকার্য্য ও যাবতীয় শিষ্টাচার শিখাইবার ব্যবস্থাও আছে। সুতরাং ভূগোল,

ইতিহাস, জ্যামিতি বা ইংরাজি পড়িবার প্রয়োজন নাই এবং অবকাশও হয় না।

সেই জন্যই মনে হয় যে, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা-প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ব্যস্ত তাঁহারা যদি মহাকালী-পাঠশালাকে অবলম্বন করিয়া সেই মীমাংসা করেন তাহা হইলে সে কার্য্য বাস্তবিকই অতি সহজ হইয়া আইসে।

পরমপূজনীয়া মাতাজী মহাকালী-স্ত্রীশিক্ষার যে পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন তদ্দ্বারাই কঠিন ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যার সিদ্ধান্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমানের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, স্ত্রীগণের কার্য্যক্ষেত্র, কর্ত্তব্য ও সমাজের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বধর্ম্মভিত্তিক ও তদনুমোদিত নীতিশিক্ষার স্থূলশিক্ষাই পরম হিতকর বলিযা বোধ হয়।

যে দেশের রমণীসমাজে সীতা, সতী, সাবিত্রী প্রভৃতি আদর্শরূপে দণ্ডায়মান সে দেশের রমণীগণের শিক্ষাপ্রণালীতে পাতিব্রত্যশিক্ষার মুখ্যস্থান অধিকার করা উচিত। যে শিক্ষা হিন্দুর বালিকাকে কুমারী অবস্থায় সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি করিতে চেষ্টা করে, যে শিক্ষা রমণীগণকে দেবীপদবী দান করিয়া সমাজে অত্যুচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে, যে শিক্ষার গুণে গৃহ সুখশান্তির, সঙ্ঘশক্তি ও মিলনশক্তির আধার, সেই শিক্ষাপ্রণালীর পুনরুদ্ধার হওয়া প্রয়োজন, প্রাচীনের সহিত বর্ত্তমানের মিলন করিয়া স্ত্রীগণের শিক্ষাবিধানপূর্ব্বক রমণীকুলের পুনরুন্নতি, তাঁহাদের দেবীত্ব পুনঃস্থাপিত এবং মাতৃক্ষেত্র বিশুদ্ধ করিয়া সুসন্তান দ্বারা দেশের, জাতির ও সমাজের মুখোজ্জ্বল করাই স্ত্রীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই। দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী জনগণ যদি প্রবর্ত্তিত মহাকালী-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আপনাপন বুদ্ধি ও বিচারের সাহায্যে যুক্তি করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে অচিরাৎ কৃতকার্য্য হয়েন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি স্ত্রীশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বালকগণের মাত্র জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অর্দ্ধব্যবস্থা হইবে। ক্ষেত্রশুদ্ধি প্রথমকল্প হওয়া প্রয়োজন। জাতীয়ত্ব যাহাতে কোনপ্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা প্রয়োজন, বিদেশীয় বিকৃত ভাব সকল উভয় স্ত্রী ও পুরুষ সমাজে প্রবেশ করিয়া জাতীয় ভাবের মর্ম্মস্থান কৃন্তন করিতেছে তাহার উপায় না করিয়া অন্য ব্যবস্থা করিলে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা হইবে। স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গ এত গুরুতর ব্যাপার হইলেও নেতৃগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে না কেন? তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

শিখ-স্বাধীনতা।

(৩)

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজবণিকদিগের নবীন কোম্পানীর এজেন্টগণ, বান্দার অধীন শিখ-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহিতায় বহুদিন রাজদরবারে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের যে সকল বিজ্ঞ প্রতিনিধি ('Factors') ব্যবসায়-বাণিজ্যবিষয়ক কতিপয় অধিকারলাভের জন্য আবেদন করেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা স্বজাতীয় সিংসর্দ্দারের বীরোচিত মৃত্যু অবলোকন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দ্বারা স্বজাতীয় বিপুল সাম্রাজ্য-গঠন; কিন্তু সাধারণ খালসা-সৈন্য এই মহৎ কল্পনা এবং গোবিন্দের নিগূঢ়

উপদেশের মর্ম্ম মনে স্থান দিতেও পারেন না। (১) এখন হইতে স্নে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়া পলাসীর যুদ্ধাবসানে পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে বণিক উমিচাঁদ তাহাতে এক প্রধান অভিনেতার প্রধান অংশ অভিনয় করে। কিন্তু সেই শিখ-সম্প্রদায়,—নানকের বিশেষানুরক্ত শিষ্যবর্গ, যাহারা বাহ্যিক শোভা প্রদর্শনের নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ করিত, তাহারা পলাসী-বিজেতা ক্লাইভের হেয় মিথ্যাবাক্যে পরাজিত হয়। (২) ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে যথার্থ শিখদিগের ক্রমোন্নতি হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহাদের দ্বারা অযোধ্যার উজীরের প্রতি অত্যাচার নিবারণের অভিপ্রায়ে, হেষ্টিংস দিল্লীর দরবারে একজন ইংরেজ-এজেণ্ট রাখিবার কল্পনা করেন। (৩) কিন্তু শিখগণ যেমন অপরকে ভয় দেখাইতে সক্ষম ছিল, তেমনি ভয় করিতেও জানিত; সুতরাং অনতিকালমধ্যে তাহারা

---

(১) See Orme's History, ii. 22.

কানিংহাম বলেন, এই মিশন্ ১৭১৫ হইতে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের কতকাংশ পর্য্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করে এবং ডেপুটেশনের সার্জ্জেন মিঃ হ্যামিল্টনের যথার্থ স্বদেশ-প্রীতির ফলেই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৭খানি গ্রামের অধিকার এবং ইংরেজদিগের দস্তকযুক্ত পণ্যদ্রব্যসমূহ শুল্কের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়। এই শেষোক্ত অধিকারটী ভারতবর্ষে ইংরেজ ইতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনা, কারণ ইহার দ্বারা ব্যবসায় শক্তিশালী হয়, বৃটীশ প্রজার প্রয়োজনীয়তা প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত করে এবং তাহাতে যে বণিকদিগের পকেট পূর্ণ হয় সেটা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

গুরুগোবিন্দের 'গ্রন্থে,' ইংরেজসম্বন্ধে চারিটী উল্লেখ আছে। প্রথম, 'অকাল-স্তুতে,'—ভারতের অধিবাসী জাতিসমূহের মধ্যে ইয়রোপীয়গণ উল্লিখিত হইয়াছে; ২য় এবং তৃতীয় 'কল্কী' অধ্যায়ের চতুর্বিংশ 'ওয়াস্তরে' ;—এই স্থলে ইয়ুরোপীয়গণের নিয়মানুযায়ী কার্য্যপ্রণালীর প্রশংসা করা হইয়াছে; চতুর্থ উল্লেখ পারস্য 'হিকায়তে' —এখানে তাহারা রাজ্যলোলুপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

(২) ফরষ্টার বলেন যে, উমিচাঁদ শিখজাতীয় ছিল।" তিনি যে ভগ্নহৃদয়ে পৃথিবী হইতে অবসরগ্রহণ করেন, তাহা উইলসন্ স্বীকার করেন না!

(৩) Brown's India Tracts, ii.

বৃটীশ রেসিডেণ্টকে মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে তাহাদের স্বপক্ষে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। এই সময় শিখদিগের ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিল্লীর নিকটে ছাউনী করিয়া সিন্ধিয়ার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল (১)। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন বলেন,—"শিখদিগের শরীর দীর্ঘ,......আকৃতি ভয়ঙ্কর এবং চক্ষু সুতীক্ষ্ণ;......ইউফ্রেটিসের আরবদিগের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহারা আফ্‌গানদিগের ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে;......তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা ২৫০,০০০ কিন্তু একতার অভাবে এই বিপুলবাহিণী বিভীষিকা উৎপাদন করিতে বড় পারে না।" (২) বিজ্ঞ এবং অনুসন্ধান-নিপুণ ফর্‌ষ্টারমহোদয়ও শিখদিগের এইরূপ বিপুলবাহিনীর কথা বিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি অপরাপর প্রথম শিখ-বিবরণ-লেখকগণ অপেক্ষা নানাবিষয়ে বিজ্ঞতার ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীর সমর অনুষ্ঠিত হয়; একদল পাঁচহাজারী শিখসৈন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ আলিগড় অধিকার করে। মারাঠাগণ বিধ্বস্ত হইলে শিখদল ছত্রভঙ্গ হইয়া বৃটীশ কমাণ্ডারের নিকট উপস্থিত হয় এবং অনুরাগ-প্রকাশ করে। যে সকল প্রধান শিখ-সর্দ্দার এইভাবে ইংরেজ-শিবিরে উপনীত হন বা যাঁহাদের কার্য্যকারিতা ইংরেজ-সেনাপতি-কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাঁহাদের মধ্যে কইথুলের (Kythul) ভাই লালসিং, জিন্দের গোষ্ঠীপতি সর্দ্দার ভাগসিং এবং থানেশ্বরের ভাঙ্গসিং অন্যতম। (৩) ইহার দুই মাসের মধ্যে লাসোয়ারির যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং

(১) রুদোরের সর্দ্দার দুলটচা সিং যমুনাতীরে থাকিয়া সিন্ধিয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। এই সর্দ্দার পরে সিন্ধিয়ার অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

(২) Francklin's Shah Alum.

উত্তর-ভারতে মারাঠা-শক্তি হীনবল হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ অন্ধ সম্রাট্ শাহ আলম পুনরায় চাটুবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া অলীক রাজ-গৌরবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠেন, কিন্তু অচিরেই বিজেতাদিগের কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে তাঁহার সে অহঙ্কার অবনমিত হয়; এবং সম্রান্ত ইংরেজমহোদয়গণকে মহান্ তাইমুরলঙ্গের 'রাজ্যের তরবারী' ("the sword of the State") বলিয়া বিঘোষিত করায়, প্রভুভক্ত মোগল-সৈন্যের মনে আনন্দের বিকাশই পরিলক্ষিত হয়। (১)

অধ্যবসায়শীল যশোবন্তরাও হোলকার এই সময় অপার ভারতে (Upper India) অভিযানে বহির্গত হইবার কল্পনা করেন; কর্ণেল মনসন প্রস্থান করিলে তাঁহার সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ উপস্থিত হইল ভাবিয়া তিনি জয়াশায় এবং রাজ্যলাভের সুখ-স্বপ্নে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। দিল্লী আক্রান্ত এবং ধোয়াবপ্রদেশ সৈন্য-শ্রেণীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু স্যর ডেভিড্ অক্টারলনির ও ডিগের কার্য্যকুশলতায় এবং সাহসিকতায় সেই বীর লুণ্ঠনকারী পুনরায় রাজপুতনায় প্রত্যাবৃত হইতে বাধ্য হন। এই আহবের মধ্যে কর্ণেল বারনের অধীন একদল ইংরেজবাহিণী সেহারানপুরের নিকট সাম্লিতে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে কইথুলের লালসিং এবং জিন্দের ভাগসিং সসৈন্য সাহায্যার্থে উপনীত হওয়ায় অবশেষে পরিত্রাণলাভ করে। (২) পূর্ব্বোক্ত শিখ-সর্দ্দারদ্বয়ই ইকারাও নামক এক মারাঠাসেনাপতিকে আক্রমণ ও নিহত করায় লর্ড লেকের

---

(১) Mill's History of British India.

(২) ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের শিখ-সর্দ্দারদ্বয়ের এই উপকার এবং ১৮০৩ অব্দে দিল্লী নগরে শিখগণের প্রতিবন্ধকতার বিষয় ইংরেজ পরিদর্শকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই অথবা ইহা ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা লিপিবদ্ধ হওয়ার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। (Mill's History

প্রশংসা ও ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ইহারাও দিল্লী ও পাণিপথের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল। অন্যান্য শিখসর্দ্দারও তাহাদের মিত্রপক্ষের সহযোগে কার্য্য করিতে থাকেন; কেবল বুরিয়ার সেরসিং কর্ণেল বারনের বিরুদ্ধাচরণ করে; এবং লাদোয়ার গুরদত্ত সিং অবাধ্যতার ভাব প্রকাশ করায় ইংরেজসেনাপতি বাধ্য হইয়া শেষোক্তকে তাহার আবাসপল্লী ধোয়াব এবং কারনাল নগর হইতে বিতাড়িত করেন।

১৮০৫ খৃঃ অব্দে হোলকার এবং আমীরখাঁ পুনরায় উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই শিখ এবং আফগানগণ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু ক্ষিপ্রপদে লর্ডলেক আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাদের অভিযান পলায়ন বা প্রস্থানে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহারা কিয়দ্দিবস পাতিয়ালায় অবস্থান করেন; এই সময় তথাকার দুর্ব্বল নরপতি ও তদীয় পত্নীর মধ্যে যে মনোমালিন্যের রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল, সেই আলোকপথ নিরীক্ষণ করতঃ আগন্তুকদ্বয় কিছু আর্থিক লাভবান হইতেও নিরস্ত হন না। ইত্যবসরে ইংরেজবাহিনী কারনালের নিকটবর্ত্তী হইলে, হোলকার উত্তরদিকে যাত্রারম্ভ করিয়া পথিমধ্যে যেখানে সুবিধা পাইলেন, সেইখানেই কর আদায় করিলেন, কিন্তু সাতলেজ প্রদেশের কোনও শিখ-সর্দ্দারই তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইল না। পাঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া তিনি এইভাব প্রকাশ করেন যে, অপর কেহও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবে না, তজ্জন্য তিনি অন্যান্য সকলেরও সহায়তা প্রার্থনা করেন। তত্রাচ রণজিৎসিং বহুদিন দূরে অবস্থান করেন; অবশেষে যখন অমৃতসরে হোলকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় সুচতুর নবীন সর্দ্দার তাঁহাকে জানান যে, ইংরেজদিগের

কারের নিমিত্ত তাঁহাকে তাহার সাহায্য করা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। আমীরখাঁ সকলকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করেন যে, নিরীহ মোসলমান-দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য কাহারও পক্ষাবলম্বন করিতে তাঁহার ইচ্ছা আদৌ নাই; এবং ইহা সত্য যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যশোবন্তরাও দ্রুত পেশোয়ারে উপনীত হইবার অধীরতা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু লর্ডলেক সসৈন্য বিয়ামতীরে অবস্থান করায় এবং ইংরেজ-সেনাপতির দাবী সামান্য হওয়ায় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়; তাহারই বলে হোলকার নীরবে নির্ব্বিবাদে মধ্যভারতে প্রস্থান করিতে সম্মত হন।

ইংরেজ-দলপতির অধীনে লালসিং এবং ভাগসিংহের কার্য্য-কারিতার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ইহাঁরা লর্ডলেকের অভিযানসময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন। তৎপর তাঁহারা পাতিয়ালায় উপনীত হইলে অক্ষম ও নামসর্ব্বস্ব সর্দ্দার সাহেবসিং-কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হন এবং লেকের হস্তে দুর্গের চাবি প্রদান করতঃ ইংরেজদিগের বিপক্ষতাচরণরূপ তাঁহার পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ভাগসিং, রণজিৎ সিংহের মাতুল হইতেন, তাঁহার সাহায্যও কম প্রয়োজনীয় নহে। রণজিৎসিং নাকি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়া ইংরেজ-শিবির পরিদর্শন করিতে গমন করেন; উদ্দেশ্য—যাহারা সিন্ধিয়া এবং হোলকার উভয়েরই শক্তি খর্ব্ব করিয়াছে, তাহাদের সামরিক বল ও কৌশল স্বচক্ষে দেখিয়া তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা। বিশেষতঃ যে সর্দ্দার পলাতকরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত নিজ সৌভাগ্য-শৃঙ্খলের গ্রন্থি একত্রিত করিলে কোনরূপ স্থায়ী লাভ ও সুবিধা হইতে পারে কিনা। যশিসিং কুলালের দৌহিত্র এবং ভাবী মহারাজের বিশ্বস্ত সহচর ফতেসিং আলহুওয়ালিয়া তাঁহাদের সমস্ত

সিংহের সহিত একত্রে এরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, যাহার ফলে হোলকার অমৃতসর হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইবেন এবং যে পর্য্যন্ত উক্ত উভয় সর্দ্দার একত্রে মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত ইংরেজগণ কোনও ক্রমেই তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণের কল্পনা করিতে পারিবেন না। লর্ডলেক, কোটোচের মুন্সরচাঁদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, মুন্সরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সর্দ্দারগণকে বশীভূত করিয়া রণজিৎ সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। এমতে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে না হওয়ায় ইংরেজ-দলপতি আম্বালা এবং কারনালের পথে সদর ছাউনীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

সিরহিন্দের কতিপয় শিখ-সর্দ্দারের সহিত লর্ডলেকের সংস্রব ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে এবং কার্য্যকালে তাহাদের নিকট হইতে যে সাহায্য পান তাহার মূল্যও কম নহে। দিল্লীর সমরনিবৃত্তির অব্যবহিত পরেই জিন্দের ভাগসিংহ উক্ত নগরের নিকটবর্ত্তী এক জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং ১৮০৪খৃঃ অব্দে তাঁহাকে এবং কইথুলের লালসিংকে একত্র আর এক সম্পত্তি প্রদত্ত হয়। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে এই সর্দ্দারগণ প্রায় ১১,০০০ পাউণ্ড আয়ের অতিরিক্ত একটী সম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব লাভ করেন এবং ঐ একই সর্ত্তে হান্‌সি এবং হিসারজেলাও প্রদান করিবার অভিপ্রায় লর্ডলেক প্রকাশ করেন। কিন্তু এই দুই স্থান একরূপ মরুসদৃশ সুতরাং লাভজনক নহে বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন। অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারও কার্য্যদক্ষতার অনুরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং সকলকেই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, এই সকল সম্পত্তি প্রত্যেকে বিনাকরে ভোগ করিতে পারিবে। লর্ড ওয়েলেস্‌লির policy যখন কঠোরভাবে সমালোচিত হইতে থাকে, সেই সময় শিখ-সর্দ্দারগণের সহিত পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্ত ও ঘোষণা করা হয়; ইংরেজসাম্রাজ্য যমুনা-

(formal) সন্ধি-প্রস্তাব গঠিত হয়, ভরতপুরের সহিত ভারতসরকারের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং সির্‌হিন্দের শিখসর্দ্দারগণ কিছু জানিতে না পারিলেও ইংরেজদিগের সহিত তাঁহাদের সংস্রব কার্য্যতঃ শূন্য হইয়া গেল।*

এই সময় রণজিৎসিংহের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন হইয়া উঠে, কারণ শিখদিগের উপর তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করেন। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য—ভাঙ্গিসম্প্রদায়ের দুর্ব্বল সর্দ্দারগণের হস্ত হইতে লাহোর ছিন্ন করিয়া লওয়া। রণজিৎ লাহোরেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং ভাঙ্গিগণ কুস্‌সুরের নিজামুদ্দীনখাঁর সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও, তিনি কুনিয়াসম্প্রদায়ের সাহায্যে সমগ্র ভাঙ্গিসম্প্রদায়কে বশ্যতাধীনে আনয়ন করেন। ১৮০১-২ খৃঃ অব্দে পাঠানকে অবিবেচকতার জন্য অনুতাপ করিতে হয়; ইহার দুর্গ আক্রমণ করা দুরূহ হইলেও ইহার অনুচরবৃন্দ এক নূতন প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হয়। এই কৃতকার্য্যের পর রণজিৎ তুরাণ্-তারণের (Turrun Tarun) পবিত্রসলিলে অবগাহন করিতে গমন করেন, পরে আলহুলওয়ালিয়া-সম্প্রদায়ের ফতেসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ বন্ধুতার নিদর্শনস্বরূপ শিরস্ত্রাণ বিনিময় করেন। ১৮০২ অব্দের মধ্যে মিত্রগণ শেষ ভাঙ্গিদলপতির বিধবার হস্ত হইতে অমৃতসর গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের একত্র লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি শিখ-রাজ্যের অপর রাজধানীর অধিপতির অংশে প্রদত্ত হয়। ১৮০৩ অব্দের কোটোচের মুন্সরচাঁদ উন্নতির অলীকমোহে

* "The original grants of Jeend, and Kythul, and others and similar papers of assurance, are carefully preserved by the several families; and the various English documents show that Bhag Singh of Jeend, was always regarded with much kindliness by Lord Lake, Sir John Malcolm, and Sir David Ochterloney."—

মুগ্ধ হইয়া জলন্দর-ধোয়াবের উর্ব্বর অংশখানি অধিকার করিবার নিমিত্ত দুইবার প্রয়াস পান, কিন্তু রণজিৎ ও তাঁহার মিত্রগণকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতে হয়। পরবর্ত্তী বৎসর পুনরায় তিনি গিরি-নিবাস পরিত্যাগ করতঃ হোসিয়ারপুর এবং বিজ্‌ওয়ারা আক্রমণ করেন; কিন্তু এবারও রণজিৎসিং উপস্থিত হওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ গুর্খাদিগের সহিত যোগদান করেন। গুর্খারাও সমগ্র হিমালয়-ব্যাপী এক সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিচরণ করিতেছিল।*

পাঞ্জাব-পরিত্যাগের এক বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পরে শাহ জুমান, ভ্রাতা মেহমুদকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত এবং অন্ধ হন। মেহমুদও পরে ১৮০৩ অব্দে তৃতীয় ভ্রাতা শাহসুজাকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত দশায় উপনীত হইয়া পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। এইরূপ ঘটনাপরম্পরাতেই আমেদশাহার বেপথমান সাম্রাজ্যের অধঃপতন নিকটবর্ত্তী হয় এবং রণজিৎসিংহও দুরাণী-শাসনকর্ত্তাদের উপর স্বীয় ভুজবল বিস্তার করিতে বিলম্ব করেন না। ১৮০৪-৫ অব্দে রণজিৎ পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ঝাঙ্গ এবং খাসিওয়ালের মোসলমানদিগের নিকট হইতে অভিনন্দন এবং উপঢৌকন প্রাপ্ত হন এবং সুলতানের মোজাফ্‌ফর-খাঁ বিপুল ধনরত্ন প্রদান করিয়া আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পান। রণজিৎসিংহও শুভযাত্রার শুভফল পাইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে রাজধানী লাহোরে প্রত্যাগমন করতঃ হোলী উৎসব নির্ব্বাহ করিয়া হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানমানসে যাত্রা করেন। তাঁহার এই গঙ্গাস্নানের অপর একটী উদ্দেশ্যও ছিল;—পাঞ্জাবের পূর্ব্বদিকের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করাও তাঁহার হৃদ্গত ভাব ছিল। ১৮০৫ অব্দের শেষ ভাগে তিনি আর একবার পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হন এবং

ঝাঙ্গের অধিপতির উপর অধীনতা-শৃঙ্খলের গুরুভার আরও বর্দ্ধিত করেন ; কিন্তু হোলকার এবং আমীরখাঁ তখন আসিয়া পড়ায় প্রথমতঃ ফতেসিং অবশেষ রণজিৎ স্বয়ং শিখ-রাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। এই সময় বিপদের কালমেঘ আকাশ ছাইয়া ঘনাইয়া আসিল বলিয়া প্রতীয়-মান হয় ; পরাক্রান্ত মারাঠাদলের একজন প্রথিতযশা দলপতি একদল আফগান ফৌজ লইয়া অভিযানে বহির্গত হইবার অভিলাষ করেন এবং সুশিক্ষিত ইংরেজসৈন্যও অমৃতসরের অদূরে আসিয়া উপনীত হয়।

এই অবস্থায় শিখদিগের এক মন্ত্রণাসভা আহূত হয়, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সর্দ্দারই তাহাতে যোগদান করেন। যে একনিষ্ঠতা এবং ভগবানের অনুগ্রহের প্রতি আত্ম-নির্ভরতার ফলে পূর্ব্বতন শিখগণ আমেদশাহের উপর জয়লাভে সক্ষম হয়। তদ্রূপ একাগ্রতা ও অনুরাগ পরবর্ত্তী শিখদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইবার সুযোগ পায় না। ইহারা সকলেই অসভ্য ও অশিক্ষিত জীবের ন্যায় সমুদয় রীতিনীতি ও শাসনশৃঙ্খলার মস্তকে পদাঘাত করতঃ স্ব স্ব উদ্দাম চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যগ্র এবং বিলাস-বাসনা ও সাংসারিক আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতে উৎকণ্ঠিত হয়। গুরু গোবিন্দের প্রচারিত শিখ-ধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য অন্য আকারে বিকশিত হইবার নিমিত্ত পুনরায় কৃষকদিগের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিতে চেষ্টিত হয়। স্বাধীনতা এবং পরস্পর ঐক্যবন্ধনের বিশৃঙ্খল রীতিনীতি, বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না ; এতদ্দারা সমগ্র জনসমবায়কে মণ্ডলাকারে একত্রিত করা যায় মাত্র ; কাজেই প্রাথমিক শিখ-'মিশল্' কার্য্যতঃ ধ্বংসের পথে যাত্রা করে। বিপুল জনসঙ্ঘ তাহাদের গ্রাম্য স্বাধীনতায় কর, শুল্ক, প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারগণ এবং তাহাদের বেতন-

এবং লুণ্ঠন-কার্য্য প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাহাদের ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতার আয়তন বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হয়। কেহ কেহ ইংরেজদিগের সহিত যোগদান করিতে, অপর কেহ বা মারাঠাদিগের সহিত সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বিনিময় করিতে অভিলাষ প্রকাশ করে, কিন্তু সকলেই রণজিৎসিংহের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে থাকে। রণজিৎ কিন্তু সমস্ত আগন্তুক আক্রমণকারী—যাহারা তাঁহার সাম্রাজ্য-গঠনরূপ উচ্চাভিলাষের একমাত্র পরিপন্থী,—তাহাদিগকে বিদূরিত করিতে একান্ত উদ্গ্রীব ছিলেন। সত্যই রণজিৎ দেশের সমস্ত অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিনাশ করতঃ সকলকে একতা-সূত্রে বদ্ধ করিতে প্রকৃষ্ট প্রাজ্ঞের ন্যায় পরিশ্রম করেন। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিখসম্প্রদায় সমূহকে একটী মাত্র মহা-জাতিরূপে এবং দেশকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা রণজিতের মুখ্য কামনা ছিল।

হোলকার প্রস্থান করিলে রণজিৎসিং ইংরেজ-সরকারের সহিত এক অনির্দ্ধারিত সন্ধিসূত্রে অথচ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বৎসরেরই শেষভাগে তিনি, নাবার (Naba) সর্দ্দার ও পাতিয়ালার রাজার মধ্যে কলহের মীমাংসা করিয়া দিতে আমন্ত্রিত হন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষের যমুনার পরবর্ত্তী রাজ্য-সমূহের সহিত সংস্রবত্যাগের যে নিয়ম পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হয়, সেই নিয়মানুযায়ী, তাঁহারা প্রথমতঃ উক্ত বিবাদ মিটাইতে আপত্তি করেন কিনা তাহা নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায় না। রণজিৎসিং সাত্লেজ অতিক্রান্ত হইয়া, অবনতির নিম্নসোপানে অবরোহণকারী মোসলমান সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে লুধিয়ানা গ্রহণ করেন; বিজিত শত্রু পরাক্রান্ত জর্জ্জ টমাসের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বহির্গত হন। রণজিৎ পরে উক্ত স্থান নিজের আত্মীয় জিন্দের ভাগসিংকে অর্পণ করিলে, নাবার যশোবন্তসিং—যাহাকে সাহায্য করিতে তিনি

পাতিয়ালার সাহেবসিং যাহাকে দমন করিতে তিনি গমন করেন, ইহারা উভয়েই মারাত্মক শালিসির দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া আনন্দিত হন। রণজিৎ উপঢৌকনস্বরূপ কতিপয় যুদ্ধসরঞ্জাম এবং কিছু ধনরত্ন সহ প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ কাঙ্গরার গিরিশ্রেণী-অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার তথায় গমনের একটী উদ্দেশ্য ছিল—'জ্বালামুখী' দর্শন।*

এই সময় কোটোচের সুন্দরচাঁদ অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে গিয়া গুর্খাদিগের পরম শত্রু হইয়া উঠেন। এই ক্ষমতাশালী সর্দ্দার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে কার্য্য করিলে দেশের সাধারণ শত্রুদিগের বিরুদ্ধে অনেককেই একত্রিত করিতে পারিতেন, কিন্তু রাতারাতি রাজ্যপাট সুসজ্জিত করতঃ রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবার সুখ-স্বপ্নে বিমোহিত হইয়া তিনি উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই শত্রুর শিবিরে হানা দেন—কুহলুর বা বিলাসপুরের সর্দ্দার এইভাবে তৎকর্ত্তৃক নিষ্পেষিত হইয়া নেপালের সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। উমরসিং আপা আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করতঃ অভিযানে বহির্গত হন; এবং সুন্দরের সহযোগী নলঘরের নবীন সর্দ্দার বীরত্বের সহিত আক্রমণকারীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেও ১৮০৫ অব্দের পূর্ব্বেই সাতলেজ এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে গুর্খা-ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। এই বৎসরেই উমরসিং সাতলেজ নদী উত্তীর্ণ হইয়া কাঙ্গরা আক্রমণ করেন। রণজিৎ যৎকালে জ্বালামুখী দর্শনে আগমন করেন, সুন্দর তৎকালে তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন, কিন্তু শত্রুর দুর্গ সুদৃঢ় এবং জয়লাভের নিমিত্ত প্রভূত আত্মত্যাগীর

* গবর্ণমেণ্টের নিকট মেট্‌কাফ্‌ ১৮০৯ অব্দের ১৭ই জুন তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহাতে প্রকাশ যে, প্রকাশ্যভাবে মালোয়া-শিখদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপযোগী শক্তি রণজিৎসিংহের এই সময় ছিল না।

প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায়, নিজের ক্ষমতার উপরই নির্ভর করিতে মুন্দরকে উপদেশ দেওয়া হয় ;—এই নূতন শত্রুকে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্যই অনুসৃত হইল না।*

কুস্মুরের সর্দ্দার পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া মস্তকোত্তলন করায় ১৮০৭ অব্দে রণজিৎসিং সর্ব্বপ্রথম তাহা দমন করিতে অগ্রবর্ত্তী হন। কুস্মুরের ক্ষমতাপন্ন সর্দ্দার নিজামুদ্দীন পরলোকগত হইলেও তৎস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি অদৃষ্টপরীক্ষার নিমিত্ত একবার ব্যর্থ প্রয়াস পান। এই বিদ্রোহ দমন এবং সম্ভবত বৃহৎ পাঠান-উপনিবেশ বশ্যতাধীন করিতে এবং সর্ব্বশেষে সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিনষ্ট করতঃ সকলকে একতার বন্ধনে একত্রিত করিবার কল্পনা অহর্নিশি রণজিতের মনে জাগরূক থাকিত। রণজিৎ এবং তদীয় পিতার বৃদ্ধ বন্ধু সূত্রধর যশির পুত্র রামঘরিয়া যোধসিংকর্ত্তৃক কুস্মুর আক্রান্ত হয়। নিজের অধীনস্থ লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস এবং একতার অভাব প্রযুক্ত কুস্মুরের তৎকালীন সর্দ্দার কুতবুদ্দীন বিপক্ষদলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে অক্ষম হন। তত্রাচ তিনি মাসাবধিকাল দক্ষতা-সহকারে শত্রু-সৈন্যের সহিত সংগ্রাম-ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, পরে স্ব-ইচ্ছায় বিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পন করতঃ জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত সাতলেজের অপরতীরে একখণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হন। রণজিৎ অতঃপর মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইয়া এই প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর অধিকার করেন, কিন্তু তদন্তর্গত দুর্গ এমনি বিপুল বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্ম-

---

* গুর্খাদিগের হস্তে মুন্দরচাঁদের পরাভবের প্রধান কারণ,—পলাতক রোহিলা-সর্দ্দার গোলাম মহাম্মদের প্ররোচনায় নিজের রজপুতবাহিণীর বহিষ্করণ ও আফ্গান-সৈন্য নিযুক্ত করা।

গুর্খারা বিদ্রোহী প্রজার হস্ত হইতে নাহনের সর্দ্দারকে উদ্ধার করার মানসে যমুনা অতিক্রম করে এবং ১৮০৩ অব্দে পরস্পরবিরোধী রাজপুতনৃপতিগণের

রক্ষায় দণ্ডায়মান হয় যে, তিনি কিছু অর্থ পাইয়াই সন্তুষ্টচিত্তে জয় হইল ভাবিয়া প্রস্থান করেন। রণজিৎ কিন্তু এই ঘটনার পরাজয় স্বীকার করেন না; তিনি তৎকালে ভাওয়ালের নবাবকে এক পত্রে এই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তৎপ্রতি অনুরাগবশতঃই তিনি আফগানশাসনকর্ত্তাকে দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন। (১)

১৮০৭ অব্দে রণজিৎসিং মোহকুমচাঁদ নামক এক বীরক্ষত্রিয়কে নিজের অধীনে সৈন্যদলে নিযুক্ত করেন। মোহকুম অতিশয় প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী ছিল। এই প্রভুভক্ত নূতন কর্ম্মচারীকে দলে লইয়া রণজিৎ, পাতিয়ালারাজ ও তাঁহার কুমন্ত্রনাদাত্রী পত্নীর মধ্যে কলহ নিবারণ করিতে অগ্রসর হন। এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে হোলকার ও আমীরখাঁর পক্ষে যেরূপ লাভজনক ছিল, এখন লাহোরের অধিপতির পক্ষেও তদ্রূপ লাভজনক। রাণী নিজের শিশুপুত্রের ভরণপোষণ নিমিত্ত দুর্ব্বল নরপতির হস্ত হইতে বিপুল সম্পত্তি বাহির করিয়া লইবার ইচ্ছা করেন এবং একগাছি হীরার হার এবং একটী কাঁসার কামান (২) লোলুপ রণজিৎকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষভুক্ত করেন। রণজিৎ সাতলেজ অতিক্রম করিয়া আসিয়া শিশুর অনুকূলে বাৎসরিক পঞ্চাশহাজার টাকা ডিক্রি দেন। ইহার পর তিনি আম্বালা এবং গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঘর নামক স্থান আক্রমণ করেন; প্রথমতঃ তিনি বিতাড়িত হন, পরে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিজয়লক্ষ্মীকে করতলগত করেন। ডুলেলওয়ালা-সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ দলপতি এই সময় লাহোর-সৈন্যদলে ছিলেন, তিনি নারায়ণঘরে

(১) Murray's Runjeet Singh.

(২) এই কামানটীর নাম—কুড়ি খাঁ; ১৮৪৫-৪৬ অব্দের যুদ্ধে ইহা ইংরেজ-হস্তে পতিত হয়।

মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, রণজিৎসিং তাঁহার সম্পত্তি জলন্ধর-দোয়াব গ্রহণ করিবার মানসে তাড়াতাড়ি প্রত্যাবৃত্ত হন। এই বৃদ্ধ দলপতির পত্নী তেজস্বিতায় পাতিয়ালারাজের ভগিনীর অনুরূপ ছিলেন এবং কথিত আছে তিনি সুসজ্জিত হইয়া তরবারি হস্তে রাহুনের দুর্গপ্রাচীরের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করেন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আবার পাঞ্জাবের অনেকানেক স্থান তাহাদের স্বাধীন শিখ অধিপতিগণের হস্ত হইতে ছিন্ন হইয়া নূতন লাহোর রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন হয় এবং মহকুমচাঁদ এই সময় সাতলেজের বামদিকস্থ নব-বিজিত প্রদেশসমূহে নূতন বন্দোবস্তী কার্য্যে ব্যাপৃত হন। কিন্তু রণজিৎসিংহের এইরূপ ক্রমিক রাজ্যবৃদ্ধির সংবাদে সিরহিন্দের শিখসর্দ্দারদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; তাহারা জিন্দ, কৈইথুল প্রভৃতির সর্দ্দার এবং পাতিয়ালার দেওয়ান সমভিব্যাহারে ১৮০৮ অব্দের মার্চ্চমাসে ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে ডেপুটেশন হস্তে দিল্লীনগরে উপনীত হন। চিস্সাতলেজ (cis-sutlej) রাজ্যের সর্দ্দারদিগের সহিত ইংরেজদিগের সম্বন্ধ একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল না; গবর্ণর-জেনারেল এই সময় কার্নালের নিকটবর্ত্তী কুঞ্জপুরের মুসলমান খাঁকে আশ্বাস প্রদান করেন যে, তাহার পৈতৃক সম্পত্তির বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। অপরপক্ষে শিকরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখসর্দ্দারদিগের উপকার বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, তাহারাও পেন্সন্ পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সম্মিলিত রাজ্যসমূহের ডেপুটিগণের যদিও বিশ্বাস ছিল যে, বিপদের সময় তাহারা পরিত্যক্ত হইবে না, তত্রাচ তাহারা দিল্লীর ইংরেজকর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে কোন আশাভরসা পাইল না। এইরূপ অবস্থায় বিপদের সময় তাহাদিগকে অবনতির গহ্বর হইতে কে রক্ষা করিবে? নিরুপায়বোধে তাহারা লাহোরের

রণজিৎসিংহও তাহাদের আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিবিরে আসিয়া সম্মিলিত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতেছিলেন।

১৮০৫ অব্দে যে গবর্ণর-জেনারেল যমুনাপারের রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত মোচন করিয়া, যমুনাতীরই ইংরেজ-রাজ্যের সীমা বলিয়া প্রচার করেন, সাহজুমানের অভিযানের পর তিন চারি বৎসর কাল লোকের মন যে আশা, আশঙ্কা, উদ্বেগে উত্তেজিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিজের কোনই জ্ঞান বা পরিচয় ছিল না। যদি শিরহিন্দের শিখগণ তৎকালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইত। কিন্তু ১৮০৮ অব্দের প্রারম্ভে তাহাদিগকে যে আশা ও উৎসাহ দেওয়া হয় তাহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নহে—তাহার পশ্চাতে একটী নূতন বিপদের ছায়াপাত হইয়াছিল; কারণ বিশ্বাস হয় যে, ফরাসী, তুর্কি এবং পারস্য-সম্রাটগণ ভারতবর্ষ লইয়া টানা-হেঁচ্ড়া করিবার কল্পনা করিতেছেন। তদ্ধেতু অপর এক নূতন গবর্ণর-জেনারেল কেবল যমুনাপারে নহে,—ইন্ডাস্-পারেও সন্ধিবন্ধনের নিমিত্ত উৎসুক হন। (১) আফগানদিগের এবং শিখদিগের সহিত আংশিকরূপে সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ হইবার নিমিত্ত নেপোলিয়ান যে কল্পনা করেন, তাহাতেও ভয়ের মাত্রাই বৃদ্ধি করে। মিঃ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন শাহসুজার দরবারে প্রেরিত হন এবং ১৮০৮ অব্দে মিঃ মেট্‌কাফ্ বাঞ্ছিত ফললাভের আশায় রণজিৎসিংহের নিকট উপস্থিত হন। পাতিয়ালা, জিন্দ এবং কইথুলের সর্দ্দারগণকে মৌখিক ভরসা দেওয়া হয় যে, তাঁহারা ইংরেজসরকারে স্বাধীন নৃপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

(১) Mr. Auber's Rise and Progress of the British Power in

মিঃ মেট্‌কাফ্, রণজিৎসিং-কর্ত্তৃক তদীয় নববিজিত সহর কুসুরে অভ্যর্থিত হন; সর্দ্দারের মনোগত ভাব সাহেব তাঁহাকে সমগ্র শিখ-জাতির দলপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং লাহোর অধিকার হেতু শিরহিন্দের উপর তাঁহার অধিকতর দাবী হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন। ফরাসীদিগের অভিযান যে তাঁহার স্বার্থের প্রতিকূল হইবে, এ ধারণা রণজিতের মনে সঞ্জাত হয় না, তাঁহার যত আশঙ্কা—পার্শ্বে যে শক্তি বর্দ্ধিততেজে মস্তক উত্তোলন করিতেছে কেবল তাহাকে দেখিয়া; কাযেই সাত্‌লেজ পর্য্যন্ত নিজের সীমা নির্দ্দেশ (১) কারবার প্রস্তাব তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি অকস্মাৎ মিত্রতার বন্ধন ছিন্ন-করতঃ তৃতীয়বার সাত্‌লেজের দক্ষিণদিকে অগ্রসর হন। ফরিদকোট্‌ ও আম্বালা আক্রান্ত ও অধিকৃত এবং মালেরকোট্‌লা ও থানেশ্বর হইতে কর সংগৃহীত হয় এবং পরিশেষে পাতিয়ালারাজের সহিত একটা মৌখিক সন্ধির প্রস্তাব স্থির করেন। ইংরেজ-দলপতি রণজিতের এই সকল কার্য্যে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন করা পর্য্যন্ত সাতলেজতীরেই রসিয়া থাকেন। (২)

লাহোরের শাসনকর্ত্তার এইরূপ প্রকাশ্য বিদ্রোহিতায়, গবর্ণর-জেনারেলকে সাতলেজ্‌তীরে মেট্‌কাফের সাহায্যের নিমিত্ত এবং রণজিৎ-সিংহকে উক্ত নদীর উত্তরদিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য পাঠাইতে প্রবৃত্ত করান। তদনুসারে ১৮৯৯ অব্দের জানুয়ারী মাসে স্যর ডেভিড্‌ অক্‌টারলোনির সৈনাপত্যে একদল ইংরেজ-সৈন্য যমুনা

(১) Moorcroft ascertained that Runjeet Singh had serious thoughts of appealing to the sword, so unpalatable was English interference. The well-known Fukeer Uzeezoodeen was one of the two persons who dissuaded him from war.—Cunningham, p. 200.

উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হয়। তিনি বুরিয়া এবং পাতিয়ালা হইয়া লুধিয়ানার অভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হন; ক্রোরাসিংহিয়া-সম্প্রদায়ের নামতঃ দলপতি যোধসিংকুল্‌সিয়া ব্যতীত শিখ্‌হিন্দের সমস্ত সর্দ্দারকর্ত্তৃক ইংরেজ-সেনাপতি অভ্যর্থিত হন। কিন্তু এই সময়ে তিনি একবারে আশঙ্কা-শূন্য হইতে পারেন না, কারণ রণজিৎ যদি প্রকাশ্যেই ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতা বিনষ্ট করেন। অক্‌টারলোনী কতিপয় সর্দ্দারের সহিত দেখা শুনা করেন,—তাঁহারা রণজিৎ-কর্ত্তৃকই দ্বিগুণতর শান্তি স্থাপন করিতে প্রেরিত হন। সর্দ্দারদিগের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, প্রকৃত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে নিজের দলবলের সমীপ-বর্ত্তী হইতে পারেন, তদভিপ্রায়ে তিনি তথায় কিছু টালবাহনা করিতে লাগিলেন। (১)

ইংরেজ-সৈন্যের এইরূপ নিকট-অবস্থান হেতু রণজিৎসিং কিছু অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন, তত্রাচ তিনি তাহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছিলেন। তিনি অনুযোগ করেন যে, মেট্‌কাফ্‌ নিষ্প্রয়োজনে সাত্‌লেজের দক্ষিণতীরে তাঁহার অধিকারের নিকট কালক্ষেপ করিতেছেন; তৎসম্বন্ধে ইংরেজসরকার কেবলমাত্র প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সর্ব্বশেষ বিজয় পুনঃপ্রত্যর্পণ এবং নদীর উত্তর প্রদেশ হইতে সৈন্যশ্রেণী সম্পূর্ণ স্থানান্তরিতকরণ,—ইহাই পরবর্ত্তী সন্ধির মূল ও অনিবার্য্য ভিত্তি হইবে। (২) এদিকের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বিলাতের সংবাদে গবর্ণর-জেনারেল বিশ্বাস করেন

(১) অক্‌টরলোনীর এই সময়ের কার্য্যকলাপ কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় না। তাহাতেই তিনি অপমানিত জ্ঞানে সৈন্য-পরিচালন-ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন। (Sir David Ochterloney to Government, 19th April, 1809).

(২) অক্‌টরলোনী-কর্ত্তৃক ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে পত্র লিখিত হয়, তাহাতেই এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

যে, নেপোলিয়ন ভারতবর্ষে আসিবার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তদনুসারে প্রচারিত হয় যে, রণজিৎসিংহের অন্যায় আক্রমণ হইতে সাতলেজের দক্ষিণতীরের প্রদেশগুলি রক্ষা করাই ইংরেজদিগের উদ্দেশ্য। রণজিৎসিংহ অবশ্য দক্ষিণতীর হইতে তাঁহার সৈন্যদল সরাইয়া লইবেন এবং শেষবারের কাড়িয়া লওয়া রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন, অবশ্য তাঁহার প্রথম বিজয়লভ্য প্রদেশগুলিসম্বন্ধে কোন আপত্তি নাই। অধিকন্তু সমস্ত সন্দেহ দূরীকরণার্থে অক্‌টারলোনীর অধীনস্থ সেনাদল লুধিয়ানা হইতে কার্‌নালে ফিরাইয়া আনা হইবে, তথায় তাহারা স্থায়ী শিবির সন্নিবেশিত করিবে। কিন্তু ইংরেজসেনাপতি যে স্থানে আছেন, সেই স্থানেই তৎকালে সৈন্য রাখার সুবিধার বিষয় জানাইলে, সরকারবাহাদুর অন্ততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত তথায় তাহাদের অবস্থানের আদেশ করেন। এইভাবে লুধিয়ানা ইংরেজ-সৈন্যের আড্ডায় পরিণত হয়।

১৮০৯ অব্দের প্রারম্ভে অক্‌টারলোনি এক ইস্তাহার জারি করেন যে, চিস্‌-সাতলেজের রাজ্যসমূহ ইংরেজ-আশ্রয়াধীন; লাহোরের সর্দার যদি তাহার কোনরূপ ক্ষতি করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে সৈন্যের সাহায্যে তাহার প্রতিরোধ করা যাইবে। রণজিৎসিং এতদিনে বুঝিলেন, ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষ আর বায়না করিতেছেন না এবং শঙ্কিত হইলেন যে, পাঞ্জাবের বর্ত্তমান স্বাধীন দলপতিবৃন্দ যদি তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে তাহা অবশ্যই পরিগৃহীত হইবে। তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যের সমস্ত আশাভরসা যে একেবারে বিনষ্ট হইবে। এমতে অবিলম্বে তিনি বিজ্ঞতার সহিত বর্ত্তমান কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায়মত তিনি সৈন্যদল উঠাইয়া লইলেন এবং শেষবারে বিজিতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ১৮০৯ অব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে অমৃতসরে এক সন্ধিপত্র দস্তখত করিলেন। সাত-

লেজের দক্ষিণদিকস্থ যে সকল প্রদেশ তিনি প্রথমে অধিকার করেন, তাহা তাঁহারই থাকিয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যতে নদীর উত্তর এবং পশ্চিমদিকে রাজ্য বিস্তৃত করিবার আকাঙ্ক্ষা তিনি মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না।

সাতলেজ এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানের কতিপয় শিখ এবং অল্প-সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সর্দ্দার, ইংরেজ-আশ্রয়ে অবস্থান করায় তাঁহারা কি সর্ত্তে পরিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা এই সময়ে অনুভূত হয়। অকটারলোনি বলেন যে, সর্দ্দারগণ যে সময় প্রথম সাহায্যান্বেষণ করেন, তৎকালে ইংরেজদিগের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের মাত্রা অপেক্ষা রণজিৎসিংহ হইতে সন্ত্রাসের মাত্রাই অত্যধিক ছিল, সুতরাং যে সময় যে কোন প্রস্তাব—এমন কি, নিয়মিতরূপে করপ্রদানের সর্ত্ত করিলেও তাঁহারা স্বীকৃত হইতেন। ইংরেজদিগের অনুগ্রহলাভে সক্ষম না হইলে, তাঁহারা নিজের বাহুবলে সে সময় পাঞ্জাবের পরাক্রান্ত সর্দ্দারের কবল হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইতেন না। এমতাবস্থায় তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়াই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে। এরূপ করা ভিন্ন তৎকালে তাঁহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। যাহা হোক্, সর্দ্দারগণ ভাবিয়াছিলেন যে, বিনা প্রত্যুপকার আশাতেই এই সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। গবর্ণর জেনারেলের এই নূতন আশ্রিতগণের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করার প্রবৃত্তি হয়; তাই উক্ত সনের ৩রা মে তারিখে এক ঘোষণাদ্বারা রণজিৎসিংহের আক্রমণ হইতে সিরহিন্দ এবং মালোয়ার সর্দ্দারদিগকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব স্বীকার করেন; স্ব স্ব রাজ্যের অভ্যন্তরে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কোনপ্রকারের কর প্রদান করিতে হইবে না বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় সাহায্য করা এবং অন্যান্য

সর্দ্দারগণ এইরূপে রণজিতের আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাইবামাত্র প্রবলে প্রবলে কলহ বা প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচর করিতে আরম্ভ করে; এবং যদিও গবর্ণরজেনারেলের মত ছিল না যে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজবশ্যতাধীনে—ইহা প্রচার করা হয়, তত্রাচ মেট্‌কাফ্‌ বুঝাইয়াছেন যে, সর্দ্দারগণ একত্রিতভাবে যেমন রণজিতের আক্রমণ হইতে রক্ষিতব্য, তেমনি একজনের অপর একজনের দৌরাত্ম্য হইতেও অবশ্যরক্ষিতব্য, —ইহা প্রচার করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়; নতুবা যে (লাহোরের রাজা) তাহাদিগকে এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, তাহারই প্রতি তাহারা আকৃষ্ট হইবে। মেট্‌কাফের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়; এবং ১৮১১ অব্দের ২২ আগষ্ট তারিখে দ্বিতীয় ঘোষণাদ্বারা সর্দ্দারগণকে পরস্বাপহরণ হইতে সতর্ক করিয়া এবং রণজিতের আক্রোশ হইতে রক্ষার ও স্বাধীনতা বজায় রাখার পুনঃ আশ্বাস প্রদান করা হয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অন্যায় আক্রমণ সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইল না এবং যোধসিং কুলসিয়া, অক্‌টারলোনীর আগমন হেতু ইংরেজসরকারের প্রতি বিনয়-নম্রতা-প্রদর্শনের আবশ্যকতা পরিহার করিতে চেষ্টিত হওয়ায় ১৮১৮ অব্দে একদল সৈন্য, তিনি যে সকল প্রদেশ অন্যায়রূপে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করাইবার নিমিত্ত প্রেরিত হয়। (১)

দক্ষিণ প্রদেশের বা মালোয়া-শিখগণের বিবরণ আর অধিক লেখার প্রয়োজন নাই। সম অবস্থাপন্ন সর্দ্দারদিগের এবং তাঁহাদের আশ্রিত

---

(১) দলপতি যোধসিং সম্প্রতি রণজিৎসিংহের মুলতানবিজয়ী সৈন্যদল হইতে অবসর লইয়া প্রত্যাবৃত হন। মহারাজা (রণজিৎ) অতিসম্ভ্রমের চক্ষে তাঁহাকে অবলোকন করিতেন। বশ্যতাধীন শিখগণ এবং শাসক ইংরেজকর্তৃপক্ষ উত্তরাধিকারবিষয়ক যে সকল রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইতে তাঁহার মনে

ও সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ সর্দ্দারদিগের স্বার্থনির্দ্ধারণার্থ ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষগণ এই সময় নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হন। তাঁহারা হিন্দু-উত্তরাধিকার-আইনের সহিত বিভিন্ন জাতির নানারূপ আচার-পদ্ধতি প্রভৃতির একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টিত হন। তৎপর তাঁহারা শিখ-রাজ্যের এবং বৃটীশসাম্রাজ্যের সাধারণ সীমারেখা নির্দ্দেশ করেন। এই ভাবে নানাকার্য্য দ্বারা তাঁহারা শিখদিগের সহিত ইংরেজসরকারের সংস্রব গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া তুলেন।

এই সময় সাতলেজের উভয়তীরে শিখরাজ্যে যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতারও কম পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা এস্থলে তৎসম্বন্ধে যোসেফ্ কানিংহামের নিজের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।—

"In the Sikh States on either side of Sutlej, the British Government was long fortunate in being represented by such men as Capt. Murray and Mr. Clerk, Sir David Ochterloney and Liet. Colonel Wade—so different from one another, and yet so useful to one common purpose of good for the English power. These men, by their personal character or influence, added to the general reputation of their countrymen, and they gave adoption and flexibility to the rigid unsympathising nature of a foreign and civilised supremacy. Sir David Ochterloney will long live in the memory of the people of Northern India as one of the greatest of the conquering English chiefs and he was among very last of the British leaders who endeared himself, both to the army which followed him and to the princes who bowed before the colossal power of his race.

"Nevertheless, the best of subordinate authorities, immersed in details and occupied with local affairs, are liable to be biassed by views which promise immediate and special advantage. They can seldom be more than upright or dexterous administrators, and they can still more rarely be men whose minds have been enlarged by study and reflection as well as by actual experience of the world. Thus the ablest but too often resemble merely the practical man of the moment ; while the supreme authority, especially when absent from his councillors and intent upon some great undertaking is of necessity dependent mainly upon the local representatives of the Government whose notions must inevitably be partial or one-sided, for good, indeed, as well as for evil. The author has thus, even during his short service, seen many reasons to be thankful that there is a remote deliberative or corrective body, which can survey things through an atmosphere cleared of mists, and which can judge of measures with reference both to the universal principles of justice and statesmanship, and to their particular bearing on the English supremacy in India, which should be characterised by certainty and consistency of operation, and tempered by a sprit of forbearance and adaptation."

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দাতীতং গগণসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।

গুরুগীতা।

শিষ্য।—কয়েকটী বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আপনিই এই সংশয়চ্ছেদ করিতে সমর্থ, অতএব কৃপা করিয়া অতি সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করিবেন যাহাতে আমাদের সহজে ধারণা হইতে পারে।

লোকপ্রবাদ আছে যে দীক্ষিত না হইলে পশুত্ব দূর হয় না, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? মানবে পশুত্ব কিরূপে সম্ভব হয়?

গুরু।—এস্থলে চতুষ্পদবিশিষ্ট পশু বলা উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ধর্ম্মহীন মানব পশুর তুল্য। ভগবান্ বলিয়াছেন যে আহার নিদ্রা, ভয়, ও মৈথুন এই সকল ক্রিয়া মনুষ্যেরও আছে এবং পশুদিগেরও আছে। একমাত্র ধর্ম্মই মানবগণের অতিরিক্ত। অতএব ধর্ম্মহীন্ মানব পশুর তুল্য। ১

অদীক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হয় না। একারণ শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে লোকপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, দীক্ষিত না হইলে পশুত্ব দূর

১। আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ।
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং॥
ধর্ম্মোনরানামধিকেন বিশেষো।
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥—উত্তর গীতা

হয় না। মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, হে মহেশ্বরী, অদীক্ষিত ব্যক্তির দোষ শ্রবণ কর। অদীক্ষিত মানবকৃত শ্রাদ্ধ এবং তাহার নিজের শ্রাদ্ধ সকলই নিষ্ফল হয়।২

রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন ও শারীরযন্ত্রণ প্রভৃতি কোন কার্য্যই হয় না। অদীক্ষিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে রৌরবনামক নরকে গমন করে। যেরূপ শিলাতে বীজ বপন করিলে তাহার অঙ্কুরমাত্রও উৎপন্ন হয় না, বীজ নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ অদীক্ষিত লোকের জপ-পূজাদি কিছুই সফল হয় না, সকল ক্রিয়াই বিনষ্ট হয়।৩

কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত আছে যে, যাহা ব্যতীত শত শত উপাসনা করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয় না। শ্রীগুরুর নিকট সেই দীক্ষাগ্রহণ অতি যত্নের সহিত অবশ্যকর্ত্তব্য। ৪

অতএব দীক্ষা ব্যতীত যখন ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হইতে পারে না, তখন অদীক্ষিত ব্যক্তি ধর্ম্মহীনতা হেতু পশুর তুল্য বটে।

শিষ্য।—কীদৃশ ব্যক্তির নিকট দীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য ?

২। অদীক্ষিতানাং মর্ত্তানাং দোষং শৃণু মহেশ্বরী
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বংযাতি হ্যধোগতিং
মৎস্যসূক্ত।

৩। নাদীক্ষিতস্য কার্য্য স্যাত্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ
নতীর্থগমনে নাপি নচ শারীরযন্ত্রণৈঃ
অদীক্ষিতোপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ
অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদি কাঃ ক্রিয়াঃ
নভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ।
রুদ্রযামলঃ।

৪। উপবাস শতৈ নাপি যাং বিনা নৈব সিদ্ধতি।
তাং দীক্ষামাশ্রয়েদ্‌যত্নাৎ শ্রীগুরোর্মন্ত্র সিদ্ধয়ে॥
কুলার্ণবতন্ত্রঃ।

গুরু।—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবে। রুদ্রযামলে কথিত আছে যে, সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সকল কর্ম্ম সাধন করিবে। ৫

শিষ্য।—সদ্‌গুরু কিরূপ, তাঁহার লক্ষণ কি? কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন।

গুরু।—যে ব্যক্তি সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক বিদিত তাঁহাকে সদ্‌গুরু বলে। যিনি বৈরপ্রকল্পনাহীন, অথচ বিবিধ বিকল্প ভ্রান্তিকে নষ্ট করিতে সমর্থ তিনি সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুকে শিবতুল্য জানিবে। যিনি সত্যবাদী সাধুশীলসম্পন্ন, গুরুভক্ত, দৃঢ়ব্রত, স্বল্পাচাররত, দানাদিসৎ-ক্রিয়ান্বিত, কপটতা ও লোভরহিত এবং মহদ্‌বংশোদ্ভব, তিনি সদ্‌গুরুশব্দবাচ্য। এইরূপ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে মনের শান্তি ও পরমপদ লাভ হয়। ৬

বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত আছে, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রপরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, কার্য্যদক্ষ, সুবাক্যবাদী, শ্রীমান্, স্বাঙ্গসম্পন্ন, কুলীন (কৌল), শুভদর্শন, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী, তিনি সদ্‌গুরুশব্দে অভিহিত। ৭

৫। সদ্‌গুরো রাহিত দীক্ষা
সর্ব্ব কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ রুদ্রযামলঃ।

৬। স এব সদ্‌গুরু যস্যাৎ সদসদ্ ব্রহ্ম বিত্তম। গুরুগীতা।
নানাবিকল্পবিভ্রান্তিনাশঞ্চ কুরুতে তু যঃ।
সদ্‌গুরু সতু বিজ্ঞেয়ো নতু বৈরপ্রকল্পকঃ।
অতএব মহেশানি সদ্‌গুরুঃশিব আদিতঃ।
সত্যবাদীচ সৎশীলো গুরুভক্তোদৃঢ়ব্রতঃ।
স্বল্পাচাররতাম্মানো দানাদি শীলসংযুতঃ।
কাপট্য লোভবিস্তাদী মহাবংশসমুদ্ভবঃ।
ঈদৃশঃ সদ্‌গুরুস্তস্য সঙ্গতো যত্নবান্ ভবেৎ।
তদেব মনসঃ শান্তিং প্রাপ্নোতি পরমং পদং।
প্রাণতোষিণী ৩৪১ পৃষ্ঠা।

৭। সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ।
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী সদ্‌গুরুসাভিধীয়তে। বিশ্বসারতন্ত্রঃ।

রুদ্রযামলে গুরুর লক্ষণ উক্ত আছে যে, শান্ত দান্ত সাধুবংশজ, বিনয়ী তাপসবেশধারী শুদ্ধাচারী সুপ্রতিষ্ঠ পবিত্রাত্মা কার্য্যদক্ষ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন আশ্রমী ধ্যানপরায়ণ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ এবং নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ মহাত্মাই উপযুক্ত গুরু। ৮

এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন গুরুর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আরও গুরু সর্ব্বশাস্ত্রার্থে পারদর্শী হওয়া অত্যাবশুক। ৯ যেহেতু যেমন লৌহদ্বারা প্রস্তর তারিত হইতে পারে, প্রস্তরদ্বারা প্রস্তর তারিত হওয়া কোন মতেই সম্ভব হয় না, তদ্রূপ অভিজ্ঞ বা জ্ঞানবান ব্যক্তিই অজ্ঞানীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। অজ্ঞান ব্যক্তি কখনই অজ্ঞানের উদ্ধারকর্ত্তা হইতে পারে না। ১০ সুতরাং মূর্খের নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করা কোন মতেই সঙ্গত হয় না। উক্ত লক্ষণ ব্যতীত আরও অন্যান্য তন্ত্রোক্ত গুরুর লক্ষণ আছে। তুমি সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ একারণ সেই সকল উল্লেখ করিলাম না।

শিষ্য।—যদি উপযুক্ত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন গুরু না পাওয়া যায় তবে কি করা কর্ত্তব্য ?

গুরু।—গীতায় উক্ত আছে যে, যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখের স্পৃহাহীন এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বিরহিত তিনিই মুনিপদবাচ্য। ১১

৮। শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধিয়তে। (রুদ্রযামলে।)

৯। সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্তাচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে। (কুলার্ণবতন্ত্রে।)

১০। অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং নমূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ
শিলাং সন্তারয়েল্লোহো নশিলা তারয়েচ্ছিলাং। (কুলার্ণবতন্ত্রে।)

১১। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

কিন্তু দুর্ব্বাসামুনি ক্রোধহীন ছিলেন না তথাপি অন্য লক্ষণ অধিক থাকা হেতু তিনি যেমন মুনিপ্রবর, তদ্রূপ সদ্‌গুরুর সকল লক্ষণ না থাকিলেও অধিক লক্ষণ থাকিলেই তিনি সদ্‌গুরুর উপযুক্ত। ১ অতএব সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন উপযুক্ত গুরু না পাইলে যাহাতে সুলক্ষণের ভাব অধিক লক্ষিত হইবে, তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিবে। তথাপি অদীক্ষিত থাকা কোন মতেই সঙ্গত নহে।

শিষ্য।—সদ্‌গুরুর অভাবে, গ্রন্থ হইতে মন্ত্র শিক্ষা করিয়া সাধনা করিলে হানি কি?

গুরু।—উহা অতি অসঙ্গত মত। সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতীত স্বয়ং গৃহীত মন্ত্র সাধন করিয়া কোন মতেই শান্তিধাম পাইতে পারে না। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন যে, হে অজ! যে সকল ব্যক্তি গুরুর চরণ আশ্রয় না করিয়া সাধন করেন তাঁহারা বিশেষ চেষ্টায় ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে জয় করিয়াও, দুর্দ্দমনীয় তুরগস্বরূপ অতি চঞ্চল মনকে বশীভূত করিতে পারেন না। তাঁহারা সমুদ্রমধ্যগত কর্ণধারহীন পোতস্থিত বণিকের ন্যায় উদ্ধারের উপায় দেখিতে পান না। প্রত্যুত সংসারসমুদ্রে অবস্থানপূর্ব্বক শত শত বিপদজালে সমাকীর্ণ হন ও ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। ২ মহাদেব বলিয়াছেন যে, গ্রন্থে দর্শন করিয়া যে নরাধম মন্ত্রগ্রহণ করিবে সহস্র সহস্র মন্বন্তরেও তাহার নিষ্কৃতি ৩

১। অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তীতিন্যায়াৎ।

২। বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তে যন্তু মতি লোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসন শতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণ
বণিজইবোজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

৩। কল্পে দৃষ্টাতুমন্ত্রং বৈ যো গৃহ্নাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতিং নৈব জায়তে॥ তন্ত্রসার কৃত বচন।

হইবে না। স্বপ্নাবস্থায় মন্ত্র প্রাপ্ত হইলেও গুরু দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক। ৪ ঐ স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র কুঙ্কুমদ্বারা বটপত্রে লিখিয়া গুরুর নিকট দিবে, গুরু তদ্দর্শনে অবগত হইয়া তাহাকে সেই মন্ত্র প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে, নচেৎ উঁহা নিষ্ফল। ৫ অতএব গ্রন্থ হইতে স্বয়ং মন্ত্র শিক্ষা করিয়া কোন মতেই সাধনা হইতে পারে না। গুরু বরণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু ত্যাজ্যগুরুর লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে কখন গুরুত্বে বরণ করিবে না।

শিষ্য।—ত্যাজ্য গুরুর লক্ষণ কি ?

গুরু।—অপুত্রক, মৃতপুত্রক, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, বামন, হীনাঙ্গ, কপটাচারী, রোগী, বহ্বাশী ও বহুপ্রলাপকারী ব্যক্তি* গুরুর উপযুক্ত নহেন। এই সকল দোষহীন ব্যক্তিই শিষ্যসম্মত গুরুর উপযুক্ত।৬

রুদ্রযামলে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মানন্দরহিত, রূপহীন, শ্বিত্ররোগী, হিংসাপরায়ণ, সর্ব্বদা অর্থগ্রহণাকাঙ্ক্ষী, লোকনিন্দিত, নেত্ররোগা-

---

৪। স্বপ্নলব্ধেতু কলসে গুরোঃ প্রাণান্নিবেদয়েৎ।
(প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)।

৫। বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা বিফলং ভবেৎ॥
তন্ত্রসার কৃত বচন।

* আত্মগরিমা, পাণ্ডিত্যপ্রকাশ বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থ সাধন ব্যতীত বাক্‌চাতুরী বা বহুবাক্য প্রয়োগ করা হয় না। স্বার্থপরতাযুক্ত বাক্‌চাতুরীতে মিথ্যার সংস্রবও অবশ্য থাকে। বিশেষতঃ বহুজল্পক ব্যক্তি কখনই সদ্‌গুরুর লক্ষণ ধ্যানস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহার মন স্বার্থপরতায়ই নিহিত থাকে। সুতরাং বহুজল্পক ব্যক্তি গুরুর যোগ্য নহেন।

৬। অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুষ্ঠীচ বামন স্তথা।
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ
এতৈ র্দোষৈ র্বিহীনো যঃ সগুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥
তন্ত্রসার কৃত বৈশম্পায়ন সংহিতা শ্লোকঃ।

ক্রান্ত, কলঙ্কিত, পরদারকারী, কৃপণ ও মিথ্যাবাদী, ইহার কোন দোষ কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুত্বে গ্রহণ না করিয়া ত্যাগ করিবে। ১

বীরমিত্রোদয়ধৃতকল্প চিন্তামণি যথা—সংস্কার-রহিত, বেদশাস্ত্রজ্ঞান-হীন, মূর্খ, শ্রুতিস্মৃতিবিহিতক্রিয়াশূন্য, রুক্ষস্বভাব, কুৎসিত, সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজাদি-মন্ত্রজ্ঞানহীন, ইত্যাদি আগমোক্ত বহুদোষযুক্ত গুরুকে দীক্ষাকার্য্যে ও অগ্নিস্থাপনাদি সকল ক্রিয়াবিষয়ে জ্ঞানিগণ আগ্রহের সহিত পরিত্যাগ করিবেন। ২

শিষ্য।—পৈত্রিক গুরুবংশের মধ্যে শাস্ত্রোক্ত গুরুর লক্ষণসম্পন্ন জ্ঞানী না থাকিলে অন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে কি ?

গুরু।—শাস্ত্র অনুসারে তাহাই কর্ত্তব্য। ভগবান উমাপতি সাধারণ জনগণকে তাহা বুঝাইবার জন্যই সদ্‌গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন। পৈত্রিক গুরুবংশীয়ের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্নের অভাবে অজ্ঞানীর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণের নিয়ম থাকিলে কখনই সদ্‌গুরুর লক্ষণ এবং ত্যাজ্য গুরুর লক্ষণ পৃথক বলিতেন না। পরম কারুণিক শিবের উহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ অজ্ঞানীর নিকট দীক্ষিত হইয়া পতিত না হয়।

এক অন্ধ অন্য অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে গিয়া যেমন উভয়ে পতিত

১। বর্জয়েচ্চ পরানন্দরহিতং রূপবর্জ্জিতম্।
শ্বিত্রিণং জনহিংসার্থং সদার্থগ্রাহিণস্তথা।
সকলঙ্কং নেত্ররোগপীড়িতং পরদারগম্।
বহ্বাশিনং হি কৃপণং মিথ্যাবাদী নমেবচ। রুদ্রযামলঃ।

২। সংস্কাররহিতো মূর্খো বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াশূন্যঃ শুষ্কভাবঃ সুকুৎসিতঃ।
সন্ধ্যাতর্পণপূজাদিমন্ত্রজ্ঞানবিবর্জিত।
ইত্যাদ্যোর্বহুভি দোষৈ রাগমোক্তৈশ্চ যত্নতঃ।
বর্জ্জনীয়ো গুরু প্রাজ্ঞৈ দীক্ষাস্থ স্থাপনাদিষু।
বীরমিত্রোদয় ধৃত কল্প চিন্তামণৌ।

হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানীর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিলে গুরু ও শিষ্য উভয়ই পতিত হইয়া থাকে।

অজ্ঞান গুরুর প্রভাবে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতা, যোগের পরিবর্ত্তে বিয়োগ এবং সংযমের পরিবর্ত্তে মদ্যমাংসাদি লোলুপতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং গুরুশিষ্য উভয়ে অযথা মদ্যপানাদিতে আসক্ত হইয়া পাষণ্ডমধ্যে গণ্য হইতে দেখা যায়। অতএব অজ্ঞানী বা মুর্খের নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, ইহা সকলেরই ধারণা থাকা উচিত।

শিষ্য।—পৈত্রিক গুরুবংশে কেহ জ্ঞানী না থাকিলে অন্ত কোন জ্ঞানীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগ করা দোষ হয় না কি?

গুরু।—না, তাহাতে গুরুত্যাগ করা হয় না। কেননা, যাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা হয় তিনিই গুরু। তন্ত্রে উক্ত আছে যে, যিনি মন্ত্রদাতা তিনি গুরু, মন্ত্র পরমগুরু, যিনি ত্বংপদবাচ্য তিনি পরাপরগুরু এবং যিনি অহংপদবাচ্য তিনি পরমেষ্ঠী গুরু। ৩ তোমার পিতা যাঁহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহার পুত্রাদি যদি মূর্খ হয় তবে সেই মুর্খের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে তুমি কখনই পার না, তাহাতে তোমার গুরুত্যাগ-দোষও ঘটে না। তদ্রূপ যাহার জ্ঞান নাই জ্ঞানোৎপাদনের জন্য তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা কোনও মতেই সম্ভব হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অন্য জ্ঞানীর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিলে গুরু ত্যাগ করা দোষ হয় না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত শাস্ত্রসঙ্গত বাক্য।

৩। মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রোহি পরমো গুরুঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিষ্য।—নবরত্নেশ্বরে উক্ত আছে যে, পারম্পর্য্যবিহীন যে ব্যক্তি দীক্ষার নিমিত্ত গুরু বরণ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। ১। এই বচন অনুসারে কেহ কেহ বলেন যে, পৈত্রিক গুরুবংশজ ব্যক্তি মূর্খ হইলেও তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। পরে অন্য উপ-গুরুর নিকট পূজাদি অভ্যাস করিলেই হয়। কুলপরম্পরায় এক মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াও কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, বলেন যে স্বকুলমন্ত্র সিদ্ধ হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ কথা কি ?

গুরু।—ঐরূপ অসঙ্গত যুক্তি পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য নহে। উহা অজ্ঞান সামাজিক লোকের উক্তি। কারণ সে কথার সত্ত্ব, তত্ত্ব-বিচারে অচলভাবে থাকে না; পণ্ডিতগণ সে কথাকে সত্য বলেন না।

পারম্পর্য্য কাহাকে বলে এবং আগম আম্নায় মন্ত্র ও আচারাদি সমস্তই সদ্‌গুরুর মুখনির্গলিত বচনামৃত দ্বারা লাভ হয়। ১ পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণ প্রকৃতার্থ বুঝিতে না পারিয়া উক্তরূপে বলিয়া থাকেন। পাণ্ডিত্য দ্বারা তন্ত্রার্থ বোধ হইতে পারে না। ভৈরব ডামরে উক্ত আছে যে, বিদ্যাবলে যে ব্যক্তি আগমের অর্থ বিচার করে এবং অপরকেও তদনুরূপ ধর্ম্মার্থ উপদেশ প্রদান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। ২

১। পারম্পর্য্যবিহীনো যো দীক্ষার্থং গুরুমাশ্রয়েৎ।
ব্রহ্মহত্যাফলং তস্য কা কথা মন্ত্র ভাবনৈঃ॥   নবরত্নেশ্বরে।

১। পারম্পর্য্যা গমাম্নায়ং মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে।
সর্ব্বং গুরুমুখাল্লব্ধং সকলং স্যান্নচান্যথা॥

২। বিদ্যাবলেন যঃ কশ্চিদাগমার্থং বিচারয়েৎ।
পরান্ দিশতি ধর্ম্মার্থং সপচেন্নরকে ধ্রুবং॥
ভৈরবডামর উত্তরভাগ।

বংশপরম্পরার নাম পারম্পর্য্য নহে। তন্ত্রে পারম্পর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ উক্ত আছে, যথা—

পাশচ্ছেদ করাদ্দেবি রঞ্জনাৎ পরতেজসঃ।
জাতিভিঃ ছিদ্য মানাচ্চ পারম্পর্য্য মিতীরিতং॥

পারম্পর্য্য শব্দ ব্যুৎপত্তিস্ত সপ্তদশোল্লাসে বিশেষতঃ মন্ত্র প্রদান কালে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি সিদ্ধ সাধ্য, সাধ্য সিদ্ধ ও সাধ্য সাধ্য। প্রভৃতি অকথহ চক্র বিচার করা আবশ্যক, যেহেতু সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ মন্ত্র অনায়াসে সিদ্ধ হয়। সাধ্য মন্ত্র বহু পরিশ্রমে বহু দিনে সিদ্ধ হইতে পারে, অরি মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত সাধন করিলে অনিষ্ট ঘটনার সম্ভব, তিথি নক্ষত্র ও রাশি গণনা করা এবং মন্ত্র অরিমিত্রাদি দোষে দূষিত না হয় তাহাও দেখা আবশ্যক। অপরন্ত জনন, জীবন, তারণ, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি এই দশপ্রকার মন্ত্র-সংস্কারকে দশবিধ সংস্কার বলা যায়। মন্ত্র প্রদান কালে গুরু স্থান বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ দশবিধ সংস্কার করিয়া থাকেন। অজ্ঞান গুরু দ্বারা ঐ সকল বিচার কোনক্রমেই হইতে পারে না, সুতরাং অজ্ঞান মূর্খের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

অকথহ চক্রের বিশেষ বিবরণ, কোন্ মন্ত্র অরি ও কোন্ মন্ত্র মিত্র হইবে তাহার বিবরণ এবং দশবিধ মন্ত্রসংস্কার কিরূপে করিতে হয় ঐ সকলই তন্ত্রসারে উক্ত আছে।

স্বকুলমন্ত্র সিদ্ধ হয়, এই বাক্যের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়াই কুলপরম্পরায় এক মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া থাকে। সদ্গুরু কুলাকুল চক্র গণনা করিয়া স্বকুলমন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন, যেহেতু স্বকুলমন্ত্র গ্রহণ করিলে সিদ্ধ হয়, অকুলমন্ত্র সিদ্ধ হয় না। এই কুলাকুল চক্র ও তাহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে উক্ত আছে। অজ্ঞানগণ মনে করে যে পূর্ব্বপুরুষ-কর্ত্তৃক গৃহীত মন্ত্রকে স্বকুলমন্ত্র বলে, বাস্তবিক তাহা নহে।

দুষ্ট বা মূর্খ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অসঙ্গত উপদেশকে সঙ্গত মনে করিলে অসঙ্গত ব্রতাচারী ও পতিত হইতে হয়। সুতরাং যাহাতে ঐরূপ ভয়ঙ্কর দোষাশঙ্কা, তাহা না করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, সাধনা করা দূরের কথা গুরুর সহিত অযথা মদ্যাদি উপভোগ করিয়া পতিত হইতেছে। উহাই মূর্খ গুরু হইতে গৃহীত মন্ত্র ও উপদেশের বিষময় ফল। ঘটনাবশতঃ মূর্খের নিকট মন্ত্র গৃহীত হইলে সদুপদেশের জন্য উপগুরুর আশ্রয় গ্রহণের বিধান আছে বটে, কিন্তু স্থানানুসারে মূর্খের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা শিষ্যের অভিপ্রায় নহে। ত্যাজ্য গুরুর লক্ষণগুলিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

শিষ্য।—অনেকে ইচ্ছা-থাকা-সত্ত্বেও সামাজিক নিন্দার ভয়ে ভীত হন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রজ্ঞানহীন, অতএব শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মবোধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পৈত্রিক গুরুবংশীয় অনুপযুক্তকে ত্যাগ করিয়া অন্য সদ্‌গুরুর নিকট গ্রহণকারীকে গুরুত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে; একারণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেহ কেহ অনুপযুক্তের নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করেন, কেহ বা ঐ নিন্দার ভয়ে অদীক্ষিতাবস্থায় সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন।

গুরু।—উহা সাধু সমুচিত নহে। কেননা তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ ঐরূপ সাধারণ লোকের অজ্ঞানবিজৃম্ভিত মিথ্যাপ্রবাদের ভয় করেন না। শাস্ত্রবিরুদ্ধ অযথা মিথ্যা প্রবাদের ভয়ে ভীত হইয়া পরমার্থ নষ্ট করা অজ্ঞানীর কার্য্য।

সামাজিক নিয়মের কথা স্বতন্ত্র। পুষ্পবিল্বপত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যান স্থলে পঠিত্বা ইত্যাদি করুক এবং পূজাদির মধ্যে বিবিধ বিষয় চিন্তাদি করুক তথাপি সাধারণ জনগণ তাহাকে আহ্নিকপূত বলে এবং মদ্য মাংসাদির সহিত গুরুকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিলেই ভক্ত সাধক বলে। ইহা সামাজিক গুরু ও সামাজিক শিষ্যের লক্ষণ, তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষীর সহিত উহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

শিষ্য।—অন্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পৈত্রিক গুরুবংশীয় ব্রাহ্মণ যদি অভিসম্পাত করেন তবে উপায় কি ?

গুরু।—যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং গুরুকে প্রগাঢ় ভক্তি করে তাহার আবার অভিসম্পাতের ভয় কি ? তন্ত্রে উক্ত আছে যে অসুর, নাগ ও দেবতা যে কেহ অভিসম্পাত করুন না কেন, গুরু তাহাকে রক্ষা করেন, কাল মৃত্যু হইতেও গুরু রক্ষা করিতে পারেন।৪ এমন কি, সাক্ষাৎ শিব রুষ্ট হইলেও * গুরু শিবের কোপানল হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

কিন্তু গুরুর কোপানল হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।৫

শিষ্য।—যাহার গুরু জীবিত না থাকেন তাহাকে কে রক্ষা করিবেন ?

গুরু।—ওরে! গুরুর অভাব নাই। গুরুদেব ভক্ত শিষ্যের অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন।

পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহকে যে গুরু মনে করে, সেই সামাজিক শিষ্যের সামাজিক গুরুর মৃত্যু হয়। ভক্ত শিষ্যের সদ্‌গুরুর বিনাশ নাই শিবকে সাধারণ জনগণ দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু মঙ্গলময় শিব

৪। অসুরৈঃ পন্নগৈর্বাপি সুরৈর্বাশাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্ বাপি গুরু রক্ষতি পার্ব্বতি॥ গুরুগীতা।

* শিব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করেন, গুরু রুষ্ট হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। এই বাক্যটী সাধারণের মনে বড়ই অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানিগণ জানেন যে গুরু মানুষ নহেন। গুরুর দেহ গুরুরূপ ব্রহ্মের আধারস্বরূপ, বিশেষতঃ গুরু জ্ঞানদাতা, জ্ঞান হইতেই মোক্ষ লাভ হয়। অতএব শিব রুষ্ট হইলেও যদি গুরু জ্ঞান দান করেন তবেই মুক্তি হয়। সুতরাং আর কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানদাতা গুরু রুষ্ট হইলে জ্ঞান প্রাপ্তির অভাব হেতু সম্পূর্ণ বিপদাশঙ্কা থাকে, শিব জ্ঞান দান করেন বটে, কিন্তু যাহার গুরু না হয়েন তাহাকে জ্ঞান দান করেন না, যেহেতু জ্ঞান দান করা গুরুর কার্য্য।

৫। শিবেরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

সর্ব্বদাই সাধুগণের অন্তর্ব্বাহে থাকিয়া মঙ্গল সাধন করেন। দয়াময় গুরুদেব তদ্রূপ সর্ব্বদা ভক্ত শিষ্যের অন্তর্ব্বাহে থাকিয়া মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন।

মস্তকে সহস্রদলকমলস্থিত রত্নসিংহাসনোপরিস্থিত পরম শিবের সমীপে গুরু অবস্থিত আছেন। পূজাধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের ইহাই গুরুচিন্তার স্থান। ৬

ইহা মনে করিতে পার যে, কখন কখন ভক্তগণেরও লৌকিক ক্লেশ দেখা যায়, তাহার হেতু প্রারব্ধকর্ম্ম। প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ না করিলে ক্ষয় হয় না ইহা বেদবাক্য। ৮ নলরাজা ও যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মগণকেও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিতে হইয়াছিল। কোন দুর্বিনীত ব্রাহ্মণ যদি স্বার্থের ব্যাঘাত হেতু নিরপরাধী কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন এবং কাকতালিয় ন্যায়ানুসারে সেই নিরপরাধী ব্যক্তির কোন দৈব ঘটনাবশতঃ কোনও ক্লেশ উপস্থিত হয়, তখন তিনি বলিয়া থাকেন যে, আমার কোপদৃষ্টিতে উহার ঐ ক্লেশ হইয়াছে। অন্যান্য অজ্ঞানগণও তাহাই মনে করিয়া থাকে। বাস্তবিক নির্দ্দোষীকে অভিসম্পাত করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

কোন সিদ্ধপুরুষও যদি অকারণে কোন ভক্তের প্রতি অভিসম্পাত বা সিদ্ধ তেজ প্রয়োগ করেন, তবে সেই অভিসম্পাতকারী ব্রাহ্মণেরই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ৭

৬। ধ্যায়েন্নিরঞ্জনং দেবি রত্নসিংহাসনোপরি।
তস্যান্তিকে নিজগুরুং পূজাধ্যানপরায়ণঃ॥
নির্ব্বাণতন্ত্রে দশম পটলে।

৬। প্রারব্ধ কর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয় ইতি শ্রুতেঃ।

৭। সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতেঽশিবং
শ্রীমদভাগবত ৯ স্কন্ধঃ।

তপস্তা ও বিস্তা এই উভয়ই ব্রাহ্মণদিগের সকল বিঘ্ননিবারক বটে, কিন্তু দুর্ব্বিনীত ব্যক্তির পক্ষে তাহাই বিপরীত ফলজনক হয়। ৮

এরূপ অবস্থায় যাহার তপস্যা বিদ্যা ও ব্রহ্মণ্য নাই, যে প্রবঞ্চকতা, শঠতা ও মদ্যপানাদিতে পণ্ডিত সুতরাং ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য নহে তাহার আবার অভিসম্পাতের ভয় কি ?

এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত দুর্ব্বাসা ও অম্বরীষ-সম্বলিত প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। আমি তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

রাজা অম্বরীষ দ্বাদশীর ব্রত যথাবিধানে সমাপন করিয়া পারণের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষিকে অতিথি-রূপে আগত দর্শন করিয়া যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। দুর্ব্বাসা সম্মত হইয়া, নিত্যকর্ম্মাদি সম্পাদনার্থ পবিত্র কালিন্দীর তীরে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া এবং দ্বাদশী অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট বুঝিয়া, ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজগণ! কি উপায়ে আমার ব্রত ও তিথি রক্ষা হয়? ব্রাহ্মণগণ বলিলেন যে, জলমাত্র ভক্ষণকে শাস্ত্রকারগণ ভোজন ও অভোজন দুইই বলিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! আপনি জল মাত্র পান করিয়া ব্রত সমাপন করুন! এই অনুমতিক্রমে অচ্যুতকে স্মরণ করিয়া জলপান করিলেন। এমত সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং যোগবলে রাজার আচরণ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে রাজাকে তিরস্কার করিতে করিতে

৮। তপো বিদ্যাচবিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তুরন্যথা॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

তাঁহার বিনাশ হেতু কালানল তুল্য অগ্নিময়ী এক ব্রহ্মশাপমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। সেই প্রজ্জলিত মূর্ত্তি রাজসমীপে গমনোদ্যত হইলে, তাঁহার রক্ষার্থ ভগবান্ পরমপুরুষকর্ত্তৃক আদিষ্ট সুদর্শনচক্র ঐ শাপময়ী মূর্ত্তিকে নষ্ট করিয়া, দুর্ব্বাসাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, দুর্ব্বাসা সভয়ে প্রাণ রক্ষার্থ ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মার নিকট, তৎপরে শঙ্করের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই রক্ষা পাইলেন না। পরে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর পাদমূলে পতিত হইলেন। বিষ্ণু কহিলেন, হে দ্বিজ! অম্বরীষকে শীঘ্র গিয়া শান্ত কর। দুর্ব্বাসা ভগবানের আদেশে অম্বরীষ-সন্নিধানে গিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। রাজর্ষি লজ্জিত ও কৃপাপরবশ হইয়া ভগবচ্চক্রের স্তব আরম্ভ করিলেন। সুদর্শনচক্র স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজার প্রার্থনাতে তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত হইল। দুর্ব্বাসা পরিত্রাণ পাইয়া ভূপতিকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যিনি মূর্ত্তিমান ব্রহ্মশাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ সেই সিদ্ধ তেজস্বী দুর্ব্বাসা পর্য্যন্ত অকারণ ব্রহ্মশাপ প্রদান করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন অশেষ দোষসংযুক্ত ব্রহ্মণ্যহীন কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্রধারী পাষণ্ডের অভিসম্পাতে কিছুই অনিষ্ট হয় না, বরং সেই অভিসম্পাত তাহাদের নিজেরই অনিষ্টোৎপাদন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ গুরুভক্ত ও দেবভক্তগণের কোনও অনিষ্টই করিতে পারে না। কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি বিনা অভিসম্পাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং শিষ্যের অভিসম্পাতেও অপরাধী গুরু পরিতাপযুক্ত হইয়া থাকেন।

শিষ্য।—শুনিতে পাই মারণ-উচ্চাটনাদি আভিচারিক কার্য্য করিতে অজ্ঞ বা দুষ্টবুদ্ধি লোকও সমর্থ হয়; যদি অভিচার দ্বারা অনিষ্ট করে তবে তৎপ্রতিকার কিসে হয়?

গুরু।—এই জনশ্রুতিও ঠিক নহে, কেননা নির্দ্দোষীর প্রতি

অভিচার প্রয়োগ করিলে সেই সেই অভিচারকর্ত্তা স্বয়ংই তাহার কুফল ভোগ করিয়া থাকে। *

এসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দস্যুপতির আখ্যান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

একদা এক দস্যুপতি আপন স্বার্থসিদ্ধিমানসে দ্বিপ্রহরাতামসী নিশিতে ভদ্রকালীকে নরবলি দিবার জন্য জড়ভাবাপন্ন মহাত্মা জড় ভরতকে চণ্ডিকার মন্দিরে উপনীত করিল। চোর পুরোহিত ভরতকে স্নানানন্তর পুষ্পমাল্যাদিতে বিভূষিত করিয়া, তাঁহার ছেদনার্থ এক ভীষণ খড়্গ ধারণ ও উত্তোলন করিল। নিরপরাধী এক ব্যক্তিকে এইরূপে বধ করিতেছে, দেবী ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার পাষাণময় দেহে দুর্বিসহ ব্রহ্মতেজঃ প্রকাশ হইতে লাগিল এবং ঐ ভয়ঙ্কর অন্যায় কর্ম্মে দেবী অতিশয় রুষ্ট হইলেন। এবং অট্ট অট্ট হাস্য করিতে করিতে পীঠস্থান হইতে সেই দুষ্ট চোরগণের উপরি পতিত হইয়া খড়্গ দ্বারা তাহাদের শিরশ্ছেদ করিলেন।

অতএব অকারণে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে, সেই অত্যাচারকারিগণের দুর্দ্দশা ঈশ্বরসমীপে এইরূপেই ঘটিয়া থাকে। কোন ব্রাহ্মণ বা গুরুবংশীয় বা গুরুপুত্র কিম্বা অন্য যে কেহ বিনা অপরাধে অভিসম্পাত বা অভিচার করিলে তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। গুরুর লক্ষণ বা ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিহীন ক্রূরস্বভাব প্রবঞ্চক ও দুষ্টস্বভাব হইলে তিনি ত্যাজ্য। তাঁহাকে ভক্তি বিশ্বাস করিলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। [ক্রমশঃ]

শ্রীকালীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

---

* এবমেব খলু মহদভিচারাতিক্রমঃ
কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি।
শ্রীমদ্ভাগবৎ ৫ স্কন্ধ ৭৯ শ্লোক।